নবযুগের মহাপুরুষ

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোলটী সন্ন্যাসী শিষ্য ও আটটী গৃহী শিষ্য এবং
যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের ছয়টী সন্ন্যাসী শিষ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

নিবেদন

প্রায় পনের বৎসর পূর্বে আমি যখন রেঙ্গুনস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটীর ভার লইয়া কাজ করিতেছিলাম তখন মান্দ্রাজ হইতে স্বামী তপস্যানন্দ আমাকে তৎসম্পাদিত 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকার রামকৃষ্ণ জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যার জন্য ঠাকুরের শিষ্যগণ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। উক্ত গুরুভ্রাতার অনুরোধে প্রবন্ধটি সযত্নে লিখিত এবং 'বেদান্তকেশরী'তে ১৯৩৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধের বহু পাঠকের অনুরোধে এবং স্বর্গত স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দজীর উৎসাহে ঠাকুরের শিষ্যদের জীবনী পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধে লিখিতে আরম্ভ করি, এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে তেরটি জীবনী ইংরাজীতে লিখিত হয়। তন্মধ্যে এগারটি জীবনী চারিটি ইংরাজী মাসিকে প্রকাশিত হয়—'প্রবুদ্ধ ভারতে' স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ ও সুরেশচন্দ্র দত্ত; 'বেদান্ত কেশরী'তে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার; 'হিন্দু মাইণ্ডে' স্বামী শিবানন্দ, এবং 'হিউম্যান এ্যাফেয়ার্সে' স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ। স্বামী শিবানন্দ ও মনোমোহন মিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধদ্বয় বজবজ বিবেকানন্দ সংঘ কর্তৃক এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধত্রয় পরিবর্ধিত আকারে যথাক্রমে কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, বোম্বাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টার ও আজমীর রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু নানা কারণে ইংরাজীতে এই সকল জীবনী রচনা বন্ধ হইয়া যায়।

১৯৪৫ খ্রীঃ বেলুড় মঠে অবস্থানকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বিস্তৃত বাংলা ও ইংরাজী জীবনী এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বিস্তৃত বাংলা জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই। তখন তথ্যসংগ্রহার্থ ঠাকুরের সকল শিষ্যের জীবনী পড়িতে হয়। উপরোক্ত জীবনীদ্বয় লিখিত ও প্রকাশিত হইবার পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্বামী তুরীয়ানন্দের বিস্তৃত বাংলা জীবনী লিখিতে আরম্ভ করি। তখন উপাদান

সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুনরায় ঠাকুরের শিষ্যদের জীবনী অধ্যয়ন করিতে হয়। সেই সুযোগে বাংলায় তাঁহাদের কয়েকটি জীবনী লিখিয়া 'উদ্বোধন', 'বিশ্ববাণী' ও 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশ করি। ক্রমে ঠাকুরের ষোলটি সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, অখণ্ডানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, ত্রিগুণাতীত, শিবানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, সুবোধানন্দ,তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দের জীবনী এবং ঠাকুরের আটটি গৃহী শিষ্য—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র দত্ত, দুর্গাচরণ নাগ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জীবনী লিখিত হয়। তৎসঙ্গে স্বামিজীর ছয়টি সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী স্বরূপানন্দ, প্রকাশানন্দ, আত্মানন্দ, শুদ্ধানন্দ, পরমানন্দ ও বিমলানন্দের জীবনী রচিত হয়। এই পুস্তকে উক্ত ত্রিশটি জীবনী প্রদত্ত। প্রত্যেকটি জীবনী স্বতন্ত্র বলিয়া পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই। যে কোন জীবনীই পৃথক্ ভাবে পড়া যাইতে পারে। বিস্তৃততর অধ্যয়নের উপযোগী পুস্তকাবলীর নাম যথাস্থানে উল্লিখিত। আমি এই পুস্তকের সংগ্রাহক ও সঙ্কলয়িতা মাত্র। মালাকার যেমন নানা বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গাঁথে সেইরূপ আমি নির্ভরযোগ্য পুস্তকসমূহ ও প্রবন্ধাবলী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছি। ইহার যে যে প্রবন্ধ যে যে মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত। ঠাকুরের চারিটি শিষ্যা গৌরী মা, গোপালের মা, গোলাপ মা ও যোগীন মার জীবনী এবং স্বামিজীর শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতার জীবনী মৎপ্রণীত 'সাধিকামালা' পুস্তকে প্রদত্ত। মৎপ্রণীত 'দেশ বিদেশের মহামানব' পুস্তকে স্বামিজীর অন্যতমা শিষ্যা ভগ্নী ক্রীষ্টিনের জীবনী প্রকাশিত। সেইজন্য এই পাঁচটি জীবনী এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী সারগর্ভ সূত্রস্বরূপ এবং তৎশিষ্যগণের জীবনী উহার ভাষ্যস্থানীয়। ভাষ্য না পড়িলে যেমন সূত্রের গভীরার্থ হৃদ্গত হয় না তদ্রূপ ঠাকুরের জীবনীর গূঢ়ার্থ বুঝিতে হইলে তৎশিষ্যগণের জীবনী উত্তমরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। শিষ্যগণের এক একটি জীবনী ঠাকুরের বৃহত্তর জীবনীর এক একটি অধ্যায়রূপে পঠনীয়। সৌর করের প্রাখর্য বুঝিতে হইলে সৌরকরতপ্ত

বালুকারাশি স্পর্শ করিতে হয়; কিংবা সৌরালোকের ইয়ত্তা করিতে হইলে তদুদ্ভাসিত বস্তু দেখিতে হয়। কারণ, সূর্য্যের দিকে তাকান কষ্টকর। সেইরূপ ঠাকুরকে বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবনের পরে তৎশিষ্যগণের জীবনী অধ্যয়ন অপরিহার্য। ফরাসী মনীষি রোমাঁ রোলাঁ সত্যই বলিয়াছেন, 'ঠাকুরের দিব্য জীবন ছিল বহুমুখী। তাঁহার বিরাট জীবনের এক একটি দিক্ তাঁহার এক এক শিষ্যে মূর্ত হইয়াছে। যখন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইতেন তখন তিনিই তথায় পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেন।' স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। স্বামিজীর জীবনের বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গের জীবনী আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে যে নবযুগ প্রবর্তিত তাহা বাংলায় আরব্ধ হইলেও অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ভারতে তথা সুদূর পাশ্চাত্যে প্রসারিত। ঠাকুরের এবং স্বামিজীর শিষ্যবর্গই এই নবযুগের প্রবর্তক ও প্রচারক। সেইজন্য তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে নবযুগের মহাপুরুষ এবং তাঁহাদের জীবনে নবযুগের ভাব-ধারা প্রবাহিত।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রধান সহকারী ছিল শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার ও শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়া এই বৃহৎ পুস্তক রচনা সম্ভব হইত না। উক্ত তরুণ বন্ধুদ্বয় কলেজের ছাত্র' অসংখ্য অসুবিধা সত্ত্বেও উভয়ে অক্লান্তভাবে আমাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীমান্ বীরেন্দ্র সমস্ত পুস্তকের একটি প্রুফ দেখিয়াছে এবং প্রেসে যাতায়াতের সব কাজ করিয়াছে। শ্রীমান্ রবীন্দ্র প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া মনোযোগের সহিত আমার শ্রুতিলিপি করিত। এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সে আমার পাশে বসিয়া ধীর ভাবে লিখিয়াছে। পরমানন্দের বিষয় এই যে, গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ মন্দিরে বসিয়াই স্বামিজীর এবং তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ ও শিষ্যবর্গের এই সকল জীবনী লিখিত। বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে এই বৃহৎ পুস্তক প্রকাশের গুরু ব্যয়ভার বহন করার জন্য আমি কলিকাতা

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই পুস্তকের সমগ্র উপস্বত্ব তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে উৎসর্গীকৃত। 'মাস পয়লা'র সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটী প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। আমার দৃষ্টিক্ষীণতা এবং অন্যান্য অনিবার্য্য কারণে যে সকল ভূল ত্রুটি থাকিয়া গেল সেগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হইবে। ঠাকুরের শিষ্যদের জীবনীর প্রথমে যে প্রণামমন্ত্রসমূহ প্রদত্ত হইল তন্মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দেরটী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক এবং অবশিষ্টগুলি স্বামিজীর শিষ্য শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক রচিত। বজবজ বিবেকানন্দ সংঘ ও এণ্টালি (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের সৌজন্যে দুইটি দুইটি চারিটি ব্লক প্রাপ্ত। দুঃখের বিষয়, সুরেশচন্দ্র দত্তের কোন ছবি পাওয়া গেল না। কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে একটী ব্লক পাওয়া গিয়াছে। এখন এই পুস্তকখানি ঠাকুরের ও স্বামিজীর শিষ্যবৃন্দের পূতজীবনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে। ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
৪ঠা কার্তিক, ১৩০৬
শ্যামাপূজা দিবস

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বিষয়-সূচী

মহাপুরুষ বন্দনা

(১)

মহাপুরুষগণের জীবনী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমরাও আমাদের জীবনকে সমুন্নত ও সুমহৎ করিতে পারি।

—লংফেলো

(২)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

—ভাগবত

হে প্রণতপালক, তোমার চরণযুগল সঙ্কটনাশক, মনোরথপূরক, তীর্থাস্পদ, শিব ও ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্তজনের দুঃখনাশক এবং ভবসাগরের তরণীস্বরূপ। হে মহাপুরুষ, তোমার সেই চরণ-কমলকে বন্দনা করি।

(৩)

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্
তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

শুদ্ধচিত্ত আত্মজ্ঞ পুরুষ যে যে লোক এবং যে সকল ভোগ্য বস্তু কামনা করেন সেই সেই লোক এবং ভোগ্য বস্তু তিনি প্রাপ্ত হন। সেই হেতু অভ্যুদয়প্রার্থী ও নিঃশ্রেয়সকামী ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চনা করিবেন।

(৪)

যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমৎ উর্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥

—গীতা

যে যে ব্যক্তি বা বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীমান্ বা শক্তিসম্পন্ন সেই সকলই আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

(৫)

জিশু খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমরা পৃথিবীর লবণ (সার) স্বরূপ।....তোমরা জগতের আলোকস্বরূপ।'

—বাইবেল

(৬)

মহাপুরুষগণ এবং তাঁহাদের অনুভূত আধ্যাত্মিক জ্ঞান কোন ব্যক্তি বা দেশের সম্পদ্ নহে। তাঁহারা ও তাঁহাদের সিদ্ধি-সম্পদ্ সর্বদেশের সকল সাধকের ধন।

—এমার্সন

নবযুগের মহাপুরুষ

এক

স্বামী অদ্বৈতানন্দ *

"প্রৌঢ়ায়াদ্বৈতপাদায় শিবধ্যানপরায় চ।
কারুণ্যপূর্ণচিত্তায় সত্যনিষ্ঠায় তে নমঃ॥"

স্বামী অদ্বৈতানন্দ ছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলটী সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে অন্যতম। বেলুড় মঠের আদি এগার জন ট্রাষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনি যে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপেক্ষাও প্রায় আট বছরের বড় ছিলেন। এইজন্য ঠাকুর তাঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন। তদনুযায়ী ঠাকুরের শিষ্যগণ ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে 'গোপালদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পূর্বাশ্রমে স্বামী অদ্বৈতানন্দের নাম ছিল শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ। কোন কোন গ্রন্থে তাঁহার পদবীকে ভুলক্রমে 'সুর' বা 'সেন' বলা হইয়াছে। কিন্তু বেলুড় মঠের মূল ট্রাষ্ট-দলিলে তাঁহার 'ঘোষ' পদবীটী উল্লিখিত আছে। সুতরাং ইহাই বিশ্বাসযোগ্য। গোপালচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী জগদ্দল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কার্যোপলক্ষে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী সিঁথি গ্রামে বাস করিতে থাকেন। সিঁথি-নিবাসী ধনী ব্যবসায়ী বেণীমাধব পালের চীনাবাজারে যে দোকান ছিল তাহাতে গোপালচন্দ্র কর্ম করিতেন। বেণী পাল ছিলেন ব্রাহ্ম ভক্ত এবং প্রত্যেক বৎসর তাঁহার সিঁথিস্থ বাসভবনে ব্রাহ্ম উৎসব করিতেন। উক্ত উৎসবাদিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। এই সকল উৎসবের কোনও একটিতে গোপালচন্দ্র ঠাকুরকে সেখানে প্রথম দর্শন করেন। তিনি বলেন, ঠাকুর একটী

* বিশ্ববাণী, বৈশাখ, ১৩৫৬

উৎসবে ভাবাবিষ্ট হইয়া এত ধর্ম্মসঙ্গীত ও নৃত্যাদি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ অসহ্যভাবে উত্তপ্ত হয় এবং শরীরকে শীতল করিবার জন্য তিনি পার্শ্ববর্ত্তী একটী পুষ্করিণীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। উত্তপ্ত দেহ হঠাৎ শীতল হওয়ায় তাঁহার সর্দি লাগে। এই সর্দি হইতে তাঁহার গলায় ব্যথা ও পরে দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই গলরোগে ভুগিয়াই ঠাকুর দেহত্যাগ করেন।

গোপালচন্দ্র বিবাহিত ছিলেন। তিনি প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে বিপত্নীক হন। বৃদ্ধ বয়সে পত্নীশোকে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। তাঁহার এক বন্ধু কবিরাজ মহেন্দ্র পাল ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত। বন্ধুর পরামর্শে শোক নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে গমন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম দর্শনে তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গোপালচন্দ্র অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় বার ঠাকুরের নিকট যান। এইবার ঠাকুর তাঁহাকে জগতের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া সান্ত্বনা দেন। ইহাতে গোপালচন্দ্রের হৃদয় হইতে শোকভার অপসৃত হয়। ইহার পর তিনি ঠাকুরের নিকট ঘন ঘন যাইতে লাগিলেন। যতই তিনি ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেন, ততই তিনি তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তিনি সম্ভবতঃ ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের মার্চ বা এপ্রিল মাসে ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। ঠাকুরের পুণ্য সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উদিত হয় এবং ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে ঠাকুরের জীবৎকালেই তিনি সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঠাকুরের সহিত প্রথম দর্শনের প্রায় দুই বৎসর পরেই তিনি সংসারত্যাগী হন। যেমন অগ্নির স্পর্শে লৌহ, আর্দ্র কাষ্ঠ এবং জলও উত্তপ্ত হয় তেমনি ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে আসিলে মানুষের ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইত। কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ঠাকুর যখন শেষ অসুখে শয্যাশায়ী তখন গোপালচন্দ্র সেখানে দিবারাত্রি থাকিয়া প্রাণপণে গুরুসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

কাশীপুর বাগানে একদিন গোপালচন্দ্র ঠাকুরকে তাঁহার তীর্থভ্রমণের বাসনা জ্ঞাপন করেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—'যার এখানে আছে, তার ওখানেও আছে।' বিশদভাবে উক্ত উপদেশের অর্থ এই যে, যিনি হৃদয়ে

ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন তিনি তীর্থস্থানেও তাঁহার অস্তিত্বানুভবে ধন্য হন। এই সম্পর্কে ঠাকুর তাঁহাকে এই গল্পটী বলেন।—একটী লোক লণ্ঠন হাতে লইয়া প্রতিবেশীর দ্বারে যাইয়া এক রাত্রিতে তামাক খাইবার জন্য একটু আগুন চায়। প্রতিবেশী যখন ঐ ব্যক্তিকে তাহার হস্তস্থিত লণ্ঠনের কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। গীতাতে আছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১

অর্থাৎ, "ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজিত। চালক যেমন গাড়ীতে বসিয়াই গাড়ী চালায় ঈশ্বর তেমনি জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে চালিত করেন।" এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর একদিন গোপালচন্দ্র ঠাকুরকে স্বীয় আন্তরিক বাসনা জানান যে, তিনি যথার্থ ত্যাগী সাধুদিগকে গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা দান করিবেন। প্রকৃত সাধুর সন্ধানে তিনি কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার মনোমত একটি সাধুরও দর্শন পাইলেন না। ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসিতেই ঠাকুর নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি তাঁহার যুবক শিষ্যগণকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'এদের চেয়ে ভাল সাধু আর কোথাও পাবে না। গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা এদের মধ্যে বিতরণ কর।' গোপালচন্দ্র তাহাতে সানন্দে সম্মত হইলেন এবং আর একদিন এক পুঁটলী গেরুয়া কাপড় এবং রুদ্রাক্ষের মালা আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর তাঁহার তরুণ শিষ্যগণকে এইগুলি স্বহস্তে দিলেন। গোপালচন্দ্রও গেরুয়া এবং মালা পাইলেন। এইরূপে ঠাকুর কাশীপুর বাগানবাড়ীতে স্বহস্তে ভাবী সন্ন্যাসী-সংঘের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একদিন নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। তখন তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা এবং দেহজ্ঞান এমন ভাবে বিলুপ্ত হয় যে, ব্যুত্থিত অবস্থাতেও তিনি দেহজ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছিলেন না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'গোপালদা, আমার শরীর কোথায়?' গোপালদা নরেন্দ্রনাথের নিকট ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার হাতপা

টিপিয়া দেখাইলেন। তাহা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের দেহজ্ঞান ফিরিল না। গোপালদা অগত্যা উদ্বিগ্ন চিত্তে ঠাকুরের কাছে যাইয়া নরেন্দ্রনাথের অবস্থা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথের পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল এবং গোপালদা নিশ্চিন্ত হইলেন।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দের আগষ্ট মাসের ১৬ই তারিখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বধামে প্রত্যাগমন করেন এবং উক্ত বৎসরের শেষভাগে বরাহনগরে প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপাল, তারক ও লাটু ইতঃপূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা তিনজন বরাহনগর মঠের প্রথম অধিবাসী হইলেন। অদ্বৈতানুভূতির দিকে গোপালচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ থাকায় সম্ভবতঃ গোপালদাকে 'অদ্বৈতানন্দ' নাম দেওয়া হয়।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভারতের অনেক দুর্গম তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে হিমালয়স্থিত কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা এবং দক্ষিণে রামেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি দর্শনের দ্বারা পূর্ব বাসনা পূর্ণ করেন। তিনি কাশীধামে গঙ্গার অদূরে বংশীদত্তের বাগানে একটী কুটীরে থাকিয়া পাঁচ বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। তখন মাধুকরী ভিক্ষায় তাঁহার উদরপূর্তি হইত। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী নিম্নোক্তরূপে অদ্বৈতানন্দজীর দৈনন্দিন জীবনের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।—'স্বামী অদ্বৈতানন্দ ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং ফিরিবার পথে নিবিষ্ট চিত্তে সংস্কৃত স্তবাদি আবৃত্তি করিতেন। পরে কয়েক ঘণ্টা জপধ্যানে কাটাইয়া নয়টার সময় মাধুকরী ভিক্ষায় যাইতেন। জীবনযাত্রার দৈনন্দিন অভ্যাসে তিনি নিয়মিত এবং কর্মে সুশৃঙ্খল ছিলেন। তিনি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন এবং স্বীয় কুটীরে সামান্য জিনিষগুলি বেশ গুছাইয়া রাখিতেন।' ঠাকুর তাঁহার এই বৃদ্ধ শিষ্যের উক্ত গুণাবলীর খুব প্রশংসা করিতেন।

সমগ্র জীবন কাশীতে তপস্যায় কাটাইবার প্রবল ইচ্ছা স্বামী অদ্বৈতানন্দের হৃদয়ে বলবতী ছিল। কিন্তু যখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে ঠাকুরের কাজে যোগ দিবার জন্য সপ্রেম আহ্বান করিলেন তিনি তখন অবিলম্বে আলমবাজার

মঠে চলিয়া আসিলেন। তখন মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছে এবং সবেমাত্র বেলুড় মঠের জমি কেনা হইয়াছে, গৃহাদি নির্মিত হয় নাই। মঠের পূর্বকালীন জমি খুব অসমতল ছিল, গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত ছিল না। জাহাজ মেরামতের জন্য একটী কারখানাও সেখানে ছিল। কুলীদের সাহায্যে অদ্বৈতানন্দজী কঠোর পরিশ্রমপূর্বক ঐ ভূমিটী সমতল করিলেন। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাড়ীতে তখন মঠ অবস্থিত ছিল। দ্বিপ্রহরে তিনি মঠে আহার বা বিশ্রামের জন্য যাইতেন না। মঠ হইতে তথায় আহার্য্য আনাইয়া খাইতেন এবং সারাদিন কর্মরত থাকিতেন। জীবনের শেষ দশ এগার বৎসর তিনি বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করেন। তখন তাঁহার বয়স সত্তরাধিক ছিল। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেন মঠের তরুণ সাধুব্রহ্মচারিগণও সেরূপ করিতে পারিতেন না। সেই জন্য তিনি তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতেন। কিছুকাল পরে আর তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—'ঠাকুর আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। সুতরাং কাকেই বা তিরস্কার করি, আর কাকেই বা প্রশংসা করি?' অদ্বৈতানন্দজী নিশ্চয়ই গুরুকৃপায় অদ্বৈতানুভূতি লাভে স্বীয় নাম সার্থক করিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে।—

> ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
> ত্বং জীর্ণ দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ৪।৩

অর্থাৎ, 'হে প্রভু, তুমি স্ত্রীরূপে, তুমি পুরুষরূপে, তুমি বালকরূপে, তুমিই বালিকারূপে বিরাজিত। তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড ধরিয়া চল এবং তুমিই এই বিশ্বে জাত হইয়া নানারূপ ধারণ কর।'

স্বামী অদ্বৈতানন্দ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি বেলুড় মঠের শাকসব্জীর বাগান, ফুলের বাগান ও গোশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তখন মঠের পূজারী ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। তিনি কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাইলে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ঠাকুরের পূজা করিতেন! বহির্দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল

ছিল না। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয় অন্তরে, বাহিরে নহে। জাগতিক বৈচিত্র্যে অদ্বৈতানন্দজী উদাসীন থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে এবং ঈশ্বরের কর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। ঠাকুরের শিষ্যগণ ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বৃদ্ধ গোপালদার সহিত রঙ্গ করিবার জন্য একটী ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। অদ্বৈতানন্দজীর হাতের লেখাও খুব সুন্দর ছিল। তিনি পাঁচ রকম গীতা একখানি বাঁধান খাতায় নকল করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুসারে তাঁহাকে অন্যান্য সাধুর সহিত বৃদ্ধ বয়সেও সংস্কৃত ব্যাকরণ 'লঘুকৌমুদী' পড়িতে হইয়াছিল। তিনি চা পান করিতেন না এবং অপরকে চা পান করিতে নিষেধ করিতেন। স্বামী সুবোধানন্দ খুব চা খাইতেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে মাঝে মাঝে বকিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে পরিহাসপূর্বকও সত্যের অপলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের এই উপদেশটী তিনি আজীবন আক্ষরিকভাবে পালন করেন। তিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং অপরকে সত্যনিষ্ঠ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন। 'সত্যকথনই কলির তপস্যা'—ঠাকুরের এই উপদেশ স্বামী অদ্বৈতানন্দের জীবনে মূর্ত হইয়াছিল।

একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠের ঠাকুর-ঘরের পূজারীকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের ভোগ ও নৈবেদ্যাদি বিশেষ সাবধানে রাখিও।' ইহা শুনিয়া স্বামী অদ্বৈতানন্দ বলিলেন, 'একদিন আমি অন্যমনস্ক হইয়া ঠাকুরের আহার্য্যের উপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ছিলাম। সেইজন্য ঠাকুর তাহা আর খাইতে পারেন নাই।'

পেটের অসুখের জন্য একবার ঠাকুরকে কোন কবিরাজ তিনটী লেবু খাইতে বলেন। ঠাকুর অদ্বৈতানন্দজীকে তিনটী লেবু আনিতে আদেশ করেন। অদ্বৈতানন্দজী কোনও এক বাগান হইতে অনেকগুলি লেবু আনেন। ঠাকুর তাহাতে বিরক্ত হইয়া তিনটী মাত্র লেবু লইয়া বাকী লেবুগুলি ফেরৎ দিয়াছিলেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের ন্যায় স্বামী অদ্বৈতানন্দেরও শ্রীসারদাদেবীর নিকট অবাধ গতি ছিল। ঠাকুরের অন্য শিষ্যগণ আসিলে শ্রীমা দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া কথা

বলিতেন। বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজনের সহিত বাড়ীর মেয়েরা যেমন নিঃসঙ্কোচে কথা বলে শ্রীসারদাদেবীও তেমনি স্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত স্বীয় সুখদুঃখের কথা বলিতেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দের নিকট ইহা পরম সৌভাগ্য ছিল। শেষ বয়সে তিনি বাতে এবং পেটের অসুখে খুব ভুগিয়াছিলেন। সেইজন্য রোজ তাঁহাকে একটু ব্যায়াম করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ বৃদ্ধ বয়সে ব্যায়ামের অভ্যাস কষ্টকর হওয়ায় তিনি একদিন ঠাকুরঘরের সম্মুখে যাইয়া প্রার্থনা করেন, 'প্রভু, আমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দাও।' অন্তিম অসুখের সময় তাঁহার একটী অলৌকিক দর্শন হয়। উক্ত দর্শনে তিনি ঠাকুরকে গদাধররূপে দেখেন। দর্শনকালে তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি স্কন্ধে গদা বহন করিতেছেন কেন?' ঠাকুর বলিলেন, 'আমি এবার গদাধররূপে আবির্ভূত।' ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম ছিল গদাধর।

একাশী বৎসর বয়সে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল এবং ঠাকুরের চিন্তায় তিনি মগ্ন ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের একটু চরণামৃত তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিবার পরই তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হয়। তাঁহার দেহ বেলুড়মঠে ভস্মীভূত হইয়াছিল। তিনি ৫৮ বৎসর বয়সে সংসার-ত্যাগ এবং ২৩ বৎসর সন্ন্যাসী জীবন যাপন করেন। আত্মজ্ঞানী বা ঈশ্বরদ্রষ্টার মতই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কঠোপনিষদে আছে—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম। ২।১।১৫

অর্থাৎ, 'শুদ্ধ জল যেমন শুদ্ধ জলে মিশ্রিত হয়, তেমনি আত্মজ্ঞ সাধকের আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়।' আত্মজ্ঞ অদ্বৈতানন্দের দেহমুক্ত আত্মা নিশ্চয়ই ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক বেলুড়মঠের এগারজন ট্রাষ্টির অন্যতমরূপে নির্বাচিত হন। তিনি জীবনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত উক্তপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দুই

স্বামী স্বরূপানন্দ *

স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে গীতার যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া দেশে বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে তাহা স্বামী স্বরূপানন্দ কর্তৃক সম্পন্ন। তিনি হিমালয়স্থ অদ্বৈতাশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আট বৎসর কাল।

পূর্বাশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের নাম ছিল অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁহার বাটি ছিল। তিনি ডন সোসাইটীর সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন। উক্ত সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত 'ডন' নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনাও তিনি কয়েক বৎসর করিয়াছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষণের প্রধান উপায় সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একজন সুপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া একটী চতুষ্পাঠী চালাইতেন। তিনি স্বয়ং সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী পাঠে অনুরক্ত ছিলেন।

১৮৯৮ সনে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের অধুনালুপ্ত পুরাতন ভগ্নবাটীর নিম্নতলস্থ গৃহে উপবিষ্ট আছেন। তখনও মঠের বর্তমান গৃহ নির্মিত হয় নাই, জমিমাত্র ক্রীত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৩০৪।৫ সালের বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ন। কলিকাতা হইতে অনেক লোক আসিয়া স্বামীজীর পদতলে বসিয়া মধুর ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতেছেন। কয়েক ঘণ্টা বাক্যালাপের পর সকলে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু ষড়্‌বিংশতিবর্ষবয়স্ক কৃশোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ব্রাহ্মণ যুবক একান্তে অবস্থিত স্বামীজীর নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প জানাইলেন। যুবকের স্থির উজ্জ্বল নয়নে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং আলাপে বিদ্যা, বিনয়,

---

* উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৫

ধৈর্য ও অমায়িকতা এবং যথার্থ ধর্মজীবন লাভের সুদৃঢ় সংকল্প প্রকটিত। স্বামীজী সানন্দে তাঁহাকে মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন। সদ্‌গুরু সৎশিষ্য লাভে উল্লসিত হইলেন। যুবক অন্য কেহ নহেন; ইনিই উপরোক্ত অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়।*

স্বামীজী যুবকটীকে বলিলেন, "অজয়হরি, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে পারিবে তো? সাপের মুখে যাইতে বলিব, বাঘের মুখে যাইতে বলিব, অগ্ন্যুদ্‌গারী তোপের মুখে যাইতে বলিব। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও বিচারমাত্র না করিয়া অবিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হইবে। সুখাভিলাষী হইলে চলিবে না। কাম-কাঞ্চনের সম্বন্ধমাত্র রাখিতে পাইবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিসর্জন দিতে হইবে। 'অভিমানং সুরাপানং, গৌরবং ঘোররৌরবং, প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা' † জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। পারিবে তো? জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হও। নতুবা এখনও নিরস্ত হইয়া সংসারে পরিবারবর্গ লইয়া যেরূপ সৎভাবে এতদিন কাটাইয়া আসিয়াছ সেইভাবে আমৃত্যু থাক।" অজয়হরি সর্বান্তঃকরণে সম্মতি জানাইলেন। তিনি ইতঃপূর্বে বিবাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক তেজ, উদ্যম ও অধ্যবসায় অদ্ভুত হইলেও শরীর বহু বর্ষ যাবৎ অজীর্ণতা ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা রোগে আক্রান্ত এবং তজ্জন্য কঠিন পরিশ্রমে অপটু ছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি গুরুর আদেশ শিরে ধারণপূর্বক কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনে অগ্রণী হইলেন। আত্মত্যাগের উন্মাদনা আসিলে মানুষের দুর্বল দেহেও অসীম তড়িৎশক্তি প্রকটিত হয়।

বেলুড় মঠে কয়েক সপ্তাহ ব্রহ্মচারীরূপে বাস করিবার পর স্বামীজী অজয়হরিকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে অমাবস্যানিশিতে বিরজা হোম সমাপ্ত হইল। গৈরিক বসনে ভূষিত, মুণ্ডিতশির, ভস্মলিপ্তললাট তরুণ শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইলেন। জগতে অজয়হরির মৃত্যু হইল এবং

---

* 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩১৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় স্বামী সারদানন্দের প্রবন্ধ দেখুন। প্রবন্ধটী উক্ত সালে এবং মাসে 'উদ্বোধন' পত্রেও পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

† অর্থাৎ অহঙ্কার সুরাপানতুল্য, গর্ব রৌরব নরকে বাসবৎ এবং যশাকাঙ্খা শূকরীবিষ্ঠার মত।

স্বামী স্বরূপানন্দ জন্মগ্রহণ করিলেন। অপরাহ্নে ধীরা মাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া স্বামীজী বলিলেন, "We have made an acquisition to-day." (আমরা অদ্য একটী রত্ন লাভ করিয়াছি)। মঠাধ্যক্ষ গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "স্বরূপের শরীর খারাপ, ডাল চচ্চড়ি সইবে না। তার জন্য দুধের বন্দোবস্ত করে দাও।" গুরু শিষ্যকে যথারীতি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচারীরূপে না রাখিয়া শীঘ্র সন্ন্যাসদান করায় প্রতীত হয়, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টিজাত ধারণা ভবিষ্যতে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

১৮৯৮ সনের এপ্রিল মাসে স্বামীজীর শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ার আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজী স্বাস্থ্যলাভার্থ তথায় ১৬ই মে যাইয়া লালা বদ্রীসাহের টমসন হাউসে উঠিলেন। জুন মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক রাজম্ আয়ার দেহত্যাগ করেন। তখন এই মাসিকের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার হইয়াছিল। স্বামীজীর নির্দেশে মান্দ্রাজ হইতে উহার কার্যালয় উঠাইয়া আলমোড়ায় আনা স্থির হইল। আলমোড়া হইতে ৪৮ মাইল দূরে মায়াবতী নামক স্থানে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের অর্থে জমি ও গৃহ ক্রীত এবং ১৮৯৯ সনের মার্চ মাসে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হয়। স্বামীজী স্বামী স্বরূপানন্দকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক এবং অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সেভিয়ার-দম্পতী অদ্বৈত আশ্রমের পার্শ্বে পৃথক্ গৃহে বাস করিয়া পত্রিকা পরিচালনায় সহায়তা করিতে লাগিলেন। একটী ছাপাখানা কেনা হইল। কোন সাহেবের চা-বাগান ও গৃহাদি ক্রীত হয় অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য। সেভিয়ার-দম্পতী স্বামী স্বরূপানন্দকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহাদের স্নেহের অবমাননা কখনও করেন নাই।

কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বামী স্বরূপানন্দ অসামান্য যোগ্যতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় প্রদান করেন। পত্রিকা-সম্পাদন এবং আশ্রম-পরিচালন ব্যতীত তিনি নানা লোকহিত কর্মেও ব্যাপৃত হইলেন। তিনি আশ্রমস্থ স্বদেশী ও বিদেশী

ব্রহ্মচারী এবং তরুণ সন্ন্যাসিগণকে শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষা দানে এবং স্বয়ং বেদান্ত-সাধনে ব্রতী হইলেন। পাশ্চাত্য দেশাগত ম্যাকোনেল সাহেবের সহায়ে হিমাচলে কৃষির উন্নতি ও তৎপ্রচারের চেষ্টা করিলেন। হিমাচলে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টাও তাঁহার আন্তরিক ছিল। পাহাড়ী বালকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য মায়াবতীতে এবং শোর নামক স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। একজন উপযুক্ত ডাক্তার আনাইয়া মায়াবতীতে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিলেন। উক্ত চিকিৎসালয় গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পার্শ্ববর্তী শত শত পাহাড়ী নরনারীকে ঔষধপথ্য দানে নিযুক্ত। আশ্রমে এবং তৎসংলগ্ন বাগানে যে-সকল ভৃত্য ও যুবক কাজ করিত তাহাদিগকে তিনি হিন্দি ও ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মাঝে মাঝে তিনি নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে যাইয়া পাহাড়ীদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ১৮৯৯ সনে রাজপুতানার অন্তর্গত কিষণগড়ে যাইয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্টগণের সেবা এবং বালক-বালিকাদিগের জন্য আশ্রম স্থাপন করেন। উক্ত বৎসর নৈনিতালে ৪ঠা মে হইতে ১৯শে জুন পর্যন্ত দেড় মাস দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহপূর্বক কনখলে সাধুবৃন্দ ও তীর্থ-যাত্রিগণের জন্য দাতব্য ঔষধালয় ও সেবাশ্রম স্থাপন করিলেন। ১৯০২ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন মাস এলাহাবাদে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি বক্তৃতাদি দানে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করেন। ঐ সকল বক্তৃতার ফলে সাধারণের চিত্ত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা স্বামী স্বরূপানন্দকে তথায় মঠ স্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানান। ১৯০৫ সনের কাংড়া জেলার ধর্মশালা নামক স্থানে ভূমিকম্প হইলে তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়া মঠ হইতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী পাঠাইয়া তথায় দুর্গতদের সেবাকার্য আরম্ভ করেন। এত সেবাকার্যের মধ্যেও স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশের সম্যক্ আয়োজন চলিতেছিল। স্বামীজীর জীবিত কালেই তাঁহার রচনা[illegible]লির সংগ্রহ ও সম্পাদন আরব্ধ হয়। কিন্তু, গ্রন্থাবলীর প্রথম [illegible] প্রকাশিত হ[illegible] ১৯০৭ সনে তাঁহার দেহত্যাগের পরে।

দেশের যুবকগণকে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ লক্ষিত হইত। কলিকাতা, এলাহাবাদ, নৈনিতাল ও আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে যখনই তিনি যাইতেন তখনই ছাত্রদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে সেবাকার্যে উৎসাহ দিতেন। স্বামী স্বরূপানন্দের জীবনে সেবা ও সাধনার সুন্দর সমন্বয় ছিল। সেবাবাহুল্যে সাধনার হ্রাস তাঁহার জীবনে কখনো দেখা যায় নাই। মায়াবতী আশ্রমের অনতিদূরে জঙ্গলে তাঁহার সাধনকুটীর অদ্যাপি বিদ্যমান। কর্মের অবসরে বা অবসানে তিনি উক্ত কুটীরে বেদান্তসাধনায় মগ্ন হইতেন। চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে নিবিড় অরণ্য যখন জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিত এবং চিরনীহারমুকুটিত উত্তুঙ্গ নন্দাদেবী ও ত্রিশূল শৃঙ্গ উমামহেশের কাঞ্চনজড়িত কর্পূর ধবলাঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইত, তখন স্বামী স্বরূপানন্দের হৃদয় ব্রহ্মভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। সেই গভীর রজনীতে যষ্টিমাত্র অবলম্বনে ব্যাঘ্রভল্লুকাদি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য মধ্যে গুরুভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তিনি বিচরণ করিতেন। এই সময় কখনও বা কয়েক ঘণ্টা ভ্রমণান্তে আশ্রমে ফিরিতেন, কখনও বা সাধনকুটীরে যাইয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন। শোনা যায়, এক গভীর নিশীথে ধ্যানান্তে আশ্রমে যাইবার জন্য কুটীরের দ্বার খুলিয়া দেখেন, সম্মুখে একটী ব্যাঘ্র মুখব্যাদন করিয়া উপবিষ্ট!

হিমালয়ের কার্যভার গ্রহণ করিবার পর স্বামী স্বরূপানন্দ মাত্র দুইবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথমবার তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার শরীর পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেখিয়া আনন্দিত হন এবং আশা করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অনেক কাজ এখনও তাঁহার দ্বারা সাধিত হইবে। শ্রীগুরুর সেবা ও সৎসঙ্গ লাভের জন্য তিনি সেবার কলিকাতায় আসেন। গুরুভক্তি ছিল তাঁহার জীবনের মূলশক্তি। কিষণগড়ে অবস্থান কালে তিনি তথাকার দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেওয়ান তাঁহার আলাপে পরিতুষ্ট হইয়া জনৈক বন্ধুকে স্বামী স্বরূপানন্দের পরিচয় প্রদানকালে ভুলক্রমে বলিলেন, "এই মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা।" স্বামী স্বরূপানন্দ তৎক্ষণাৎ দেওয়ানের ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন, "আমি

স্বামী বিবেকানন্দের অনুগত ও নগণ্য শিষ্যমাত্র।" দেওয়ান স্বরূপানন্দজীর বিদ্যা-বুদ্ধিতে যতদূর না মুগ্ধ হইয়াছিলেন এতাদৃশ বিনয় ও গুরুভক্তি দর্শনে তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হইলেন। তদবধি দেওয়ান তাঁহাকে স্বীয় বন্ধুমধ্যে পরিগণিত করিলেন। ১৯০১ সনে দিল্লী-দরবারের সময় দেওয়ান স্বামী স্বরূপানন্দকে স্বসমীপে লইয়া যান এবং ঐ উপলক্ষে সমাগত রাজপুতানা ও গুজরাটের রাজন্যবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। স্বামী স্বরূপানন্দের সদালাপে বরোদার মহারাজা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

১৯০৩ সনে জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' নামক ইংরেজি মাসিকে পুণা ডেকান কলেজের অধ্যাপক জে. নেলসন ফ্রেজার স্বামী বিবেকা-নন্দকে সমালোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখেন। স্বামী স্বরূপানন্দ সেই সালে উক্ত পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। অধ্যাপক ফ্রেজারের মতে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসংস্কার ও শিল্পসমৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দের বহু উক্তি উদ্ধৃতিপূর্ব্বক স্বরূপানন্দজী প্রতিপন্ন করেন যে, অধ্যাপক সর্বৈব ভ্রান্ত। এই প্রতিবাদে তিনি লিখিয়াছিলেন, "দরিদ্রের প্রতি ভারতমাতার কোন সন্তানের এত দরদ ছিল না।....অন্ততঃ বর্তমান ভারতের ইতিহাসে পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ স্বামীজীর প্রচারকার্য যুগান্তকারী ঘটনারূপে স্মরণীয় হইবে।" স্বামী স্বরূপানন্দের প্রতিবাদ পাঠে অধ্যাপক ফ্রেজার নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। ঐ বৎসরের মার্চ মাসে 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রিকায় অধ্যাপক ফ্রেজারের যে পত্র প্রকাশিত হয় উহাতে তিনি স্বীয় ভ্রম স্বীকার করেন। গুরুবাণীর প্রচার এবং গুরুনিন্দার প্রতিবাদ করিয়া স্বামী স্বরূপানন্দ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকা হইতে তাঁহাকে পত্র দিয়াছিলেন সানফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত প্রচারার্থ যাইবার জন্য। কিন্তু তিনি দেশের কাজ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে সম্মত হন নাই।

এত কাজের মধ্যেও স্বামী স্বরূপানন্দ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটী প্রাঞ্জল ইংরেজী অনুবাদ করেন ১৯০১ হইতে ১৯০৩ সনের মধ্যে। ইহাতে মূল সংস্কৃত শ্লোক, অন্বয়মুখে সংস্কৃত শব্দের ইংরেজি অর্থ, সরল ইংরেজি অনুবাদ ও পাদটীকা

আছে। ইহাতে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুযায়ী শব্দার্থ, অনুবাদ ও টীকাদি প্রদত্ত। বেদান্তে তাঁহার কি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি এবং ইংরেজি ভাষায় তাঁহার কি অদ্ভুত দখল ছিল তাহা এই বইখানিতে জানা যায়। তাঁহার দেহত্যাগের পর ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ সন পর্যন্ত সমগ্র বইখানি ধারাবাহিকরূপে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা পুস্তকাকারে প্রথম বাহির হয় ১৯০৯ সনে। ইতোমধ্যেই পুস্তকখানির আটটী সংস্করণ হইয়াছে। দিল্লী এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে স্বামী স্বরূপানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিতেন। উক্ত পত্রিকায় ১৯০২ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটীতে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত। ১৯১৩ সনের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত 'মায়াবাদ ও হিন্দু সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটী সারগর্ভ। ইহাতে উইলিয়াম জেম্‌স, হাক্সলি এবং ডাঃ ওয়ালেস প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের বাক্যোদ্ধৃতিপূর্বক তিনি মায়াবাদের মূলতত্ত্বটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে মায়াবাদ দুঃখবাদের চরম পরিণতি। এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শনপূর্বক স্বামী স্বরূপানন্দ দেখাইয়াছেন, বেদান্ততত্ত্ব দার্শনিক চিন্তার পরাকাষ্ঠা। তিনি এই প্রসঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্মের বৈশিষ্ট্য দেখাইতেও ভুলেন নাই। হিন্দু সংস্কৃতি তাঁহার মতে মায়াবাদের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বামী স্বরূপানন্দ গুরুকৃপায় তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বেদান্তব্যাখ্যা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত। শোনা যায়, জনৈক পাহাড়ী যুবক তাঁহার বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণে ত্যাগবৈরাগ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শিষ্যের অসাধারণ ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি তিনজন কামজয়ী দেখেছি; আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, আমার গুরুভ্রাতা যোগানন্দ * এবং আমার শিষ্য স্বরূপানন্দ।" ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠে এবং মায়াবতী আশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিখ্যাত The Master as I saw Him নামক ইংরাজী পুস্তকের

* এই পুস্তকে স্বামী যোগানন্দের জীবনী প্রদত্ত।

১০৩-১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বেলুড় মঠের ঠাকুর-ঘরে ব্রহ্মচর্যব্রতে আমার দীক্ষা গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে গৃহীত হন। অল্প কয়েক সপ্তাহ মাত্র ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকিবার পর তিনি মদীয় গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের নিকট গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীপদে উন্নীত হন। তাঁহার মানসিক বিকাশের কাহিনী আমার নিকট অতিশয় চিত্তাকর্ষক। তিনি বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব ভাবধারার পরিবেশে বর্ধিত হন। বৈষ্ণবমতে ঈশ্বর দয়ালু প্রেমিক পিতা ও পালক এবং শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধারক অবতার পুরুষ। পাশ্চাত্যের খ্রীস্টধর্মের সহিত বৈষ্ণবধর্মের সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। ভাবপরিবর্তন আমাদের সকলের নিকট পরিচিত। ইহা প্রত্যেকের জীবনে ঘটিয়া থাকে। স্বামী স্বরূপানন্দকে স্বীয় জীবনে তুমুল ভাবপরিবর্তনের সম্মুখীন হইতে হয়। যৌবনের প্রারম্ভে জীবনের কয়েকটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা তাঁহার চক্ষে পড়ে। তিনি তিক্ত প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে, জীবনসংগ্রামে কেবল বলবানেরাই জয়ী হইতে পারে। বাল্যের দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহার নিকট অলীক প্রতীত হইল। তাঁহার জীবনের দিক্-পরিবর্তনকারী একটী ঘটনা আমার মনে আছে। একদিন কলিকাতার একটি জনাকীর্ণ রাস্তায় যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, একটি দরিদ্রা রমণী হাঁটু গাড়িয়া কাতর স্বরে চীৎকার করিতে করিতে ধূলিময় রাস্তা হইতে কণা কণা চাউল কুড়াইতেছে। এইরূপে মাত্র সে একমুঠা চাউল হাতে পাইয়াছে। সারাদিনের ভিক্ষালব্ধ চাউল তাহার পাত্র হইতে জনৈক পথিকের ধাক্কায় রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে। তদ্দর্শনে যুবকের কোমল হৃদয় গভীর করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি ব্যথিত চিত্তে চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'যদি ভগবান্ সত্যই থাকেন তবে সেই শয়তান এই হৃদয়বিদারক অন্যায়ের প্রতিকার কচ্ছেন না কেন?' এইরূপ দুই তিনটী তিক্ত অভিজ্ঞতায় এমন মর্মাহত হইলেন যে, তিনি বৎসরখানিক মানসিক যন্ত্রণায় অধীর রহিলেন। যন্ত্রণা এত দুঃসহ হইল যে, তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল এবং পূর্ব স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পান নাই। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের ফলে যে শান্তি মনে আসিল তাহাতে তিনি সেই যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু এই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিতে তিনি

বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই জগৎ মিথ্যা, মায়িক। ভগবান বুদ্ধের পূর্বে এবং পরে সহস্র সহস্র ভারতীয় সাধক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব যুবক অজয়হরি মায়াবাদী হইলেন। এখন হইতে তাঁহার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব হইল যে, সিংহাসনারূঢ় কোন ঈশ্বরের সম্মুখে মানবাত্মা ভক্তিভাবে নতজানু হইলে জীবন-সমস্যার চরম সমাধান সম্ভব। বরং তিনি দেখিলেন, মানব মনের এই স্বার্থ ও অজ্ঞতাই উক্তপ্রকার সকল স্বপ্নের মূল। সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি যে সকল দ্বন্দ্বরূপ স্বপ্ন দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট এবং জীবন সীমান্বিত সেইগুলির কারণও এই অজ্ঞান। এই অজ্ঞাননাশের জন্য, এই স্বপ্নভঙ্গের নিমিত্ত তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। এই দ্বন্দ্বসমূহের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে, মুক্তি নামক অদ্বৈতানুভূতি লাভ করিতে এবং সেই অন্তর্দৃষ্টি ও চরম নিশ্চয়ে উপনীত হইতে তিনি প্রাণপণ করিলেন। এখন হইতে সেই সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষানুভবের সাধনা তাঁহাকে জ্বরের মত পাইয়া বসিল। নানাভাবে বোঝা যায়, পিতৃগৃহে তাঁহার জীবনের বাকী বৎসরগুলি অধিকাংশ মঠবাসী সন্ন্যাসিগণের জীবন অপেক্ষা সমধিক কঠোরতর হইয়াছিল। বহু বৎসর পরে আলমোড়ায় তাঁহার কাছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পড়িবার সময় বুঝিয়াছিলাম, বিবেক-বৈরাগ্য প্রাণান্তকারী পিপাসার ন্যায় তাঁহার জীবনে কত তীব্র ছিল! স্বামী স্বরূপানন্দের প্রেরণায় আমি ধ্যানাভ্যাসের আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার সৎসঙ্গ ব্যতীত আমার জীবনের এক মহত্তম মুহূর্ত আমি হারাইতাম।"

শিষ্যের জীবনে গুরু-প্রদর্শিত সমুচ্চ আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কর্মজীবনে বেদান্ত কিরূপে পরিণত হয় তাহা স্বামী স্বরূপানন্দ সুদীর্ঘ আট বৎসর দেখাইয়াছেন; মানবচরিত্রের এক সুন্দর আলেখ্য তাঁহার জীবনে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি স্বভাবতঃ সাহসী, সবল ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত সহজে চঞ্চল বা নিরাশ হইত না। তিনি সর্বদা উন্নতিকামী ও প্রগতিশীল ছিলেন। নিষ্কাম কর্মে সন্ন্যাসী কেমন উন্মত্ত হন, আহার নিদ্রা ভুলেন এবং স্বীয় সুখসুবিধা অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাকে দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা

যাইত। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য। গুরুর ন্যায় শিষ্যও নারায়ণসেবায় তিলে তিলে আত্মাহুতি দিয়া জীবন সার্থক করিলেন।*

আলমোড়ায় গুরুদেবের সঙ্গে স্বামী স্বরূপানন্দের যে সকল কথাবার্তা হইত উহার কিয়দংশ ১৮৯৮ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত। স্বরূপানন্দজী শ্রীগুরুকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার প্রচার বা বাণীর বিশেষত্ব কি?' তদুত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "হিন্দুধর্মকে খ্রীস্টান ধর্ম বা ইসলামের মত প্রগতিশীল ও সংগ্রামরত করিতে চাই। বুদ্ধদেবের সময় হইতে আমাদের ধর্মের সেই শক্তি বিলুপ্ত। তাই বিদেশাগত প্রত্যেক ধর্ম হিন্দুগণকে ধর্মান্তরিত করিয়া হিন্দু সমাজকে দুর্বল ও ধ্বংসোন্মুখ করিয়াছে। ধর্মের দ্বারা ভারতের বিজয়াভিযান আবশ্যক। পূর্বে আমাদের দেশে ষাট কোটি হিন্দু ছিল। মহাভারতীয় হিন্দু ধর্মই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। বর্তমান হিন্দুধর্মকে সেই রুদ্ররূপ দিতে হবে।"

সেভিয়ার-দম্পতী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের ভূমিগৃহাদি দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিতে চাহিলে স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহাদের সহিত দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আগমন করেন। তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বাড়িয়া যায়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাঃ আর. এল. দত্তের চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি কার্যশেষে ঔষধ লইয়া পুনরায় মায়াবতীতে প্রত্যাগমন করেন। মায়াবতী হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশের নানা অসুবিধা হইতে লাগিল। সেইজন্য প্রেস ও প্রকাশনালয় আলমোড়ায় বা নৈনিতালে উঠাইয়া লওয়া সম্ভব কি না—এই বিষয় নির্ধারণ করিবার জন্য স্বামী স্বরূপানন্দ ১৯০৬ সনের ৬ই জুন মায়াবতী ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার শরীর খুব খারাপ যাইতেছিল। নৈনিতালে বায়ুপরিবর্তন ও বিশ্রাম দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন উক্ত যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রবুদ্ধ ভারত প্রেসের জন্য একটি স্থান দেখিয়া যখন তিনি লালা অমরনাথ সাহের ভবনে ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে পথে অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছিল। আর্দ্র বস্ত্র দীর্ঘ সময় শরীরে থাকায় ঠাণ্ডা লাগিয়া পরদিন হইতে তাঁহার সর্দি ও জ্বর হইল।

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রের ১৯০৬ সনের আগষ্ট সংখ্যায় 'স্বামী স্বরূপানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও গুরুবাণী-প্রচারে ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীগুরুর ফটোর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সমাগত জনগণকে সদুপদেশ-দানে নিযুক্ত রহিলেন। লোকসমাগমের বিরাম নাই, তাঁহারও সদালাপে ক্লান্তি নাই! তিনি যখনই নৈনিতাল যাইতেন, তখনই বহু নরনারী তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে আসিতেন। দুই চারি দিনের মধ্যেই তাঁহার জ্বর বৃদ্ধি পাইল এবং নিউমোনিয়া দেখা দিল। তখনও তিনি সদালাপ চালাইতেন এবং চিঠিপত্রাদির উত্তর অপরের দ্বারা লিখাইতেন। কানপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী তখন বায়ুপরিবর্তনের জন্য নৈনিতালে গিয়াছিলেন। তিনিও স্বামী স্বরূপানন্দের সদালাপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং অসুখের সূত্রপাত হইতে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত স্থানীয় আসিষ্ট্যান্ট সার্জনও স্বামীজীকে রোজ দেখিয়া যাইতেন। ২৬শে জুন রোগ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল, ডাক্তারগণ চিন্তিত হইলেন। লালা অমরনাথপ্রমুখ বন্ধু ও ভক্তগণ দিবারাত্র সপ্রেমে স্বামী স্বরূপানন্দের সেবাশুশ্রূষা করিলেন। ২৭শে জুন বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি নিদ্রিতের ন্যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে বাহ্য বস্তু দেখিতে বা লোক চিনিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। সেই নিদ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। শিষ্য গুরুর চিরসান্নিধ্য লাভ করিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দের শবদেহ পুষ্পসজ্জিত, ভস্মলিপ্ত এবং নবীন গৈরিকাবৃত করিয়া নৈনিতালের নিকটবর্তী ভাওয়ালী নামক স্থানে অগ্নিসাৎ করা হইল।

১৯০৭ সনের ৮ই জুলাই মায়াবতী আশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে উক্ত আশ্রমে সঙ্গীত ও ভজনাদি হয়। আশ্রমের বেতনভোগী কর্মচারিগণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হয়। সমগ্র দিবস আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দের মতে ১৮৯৮ সনে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় স্বামী স্বরূপানন্দের বয়স ছিল ছাব্বিশ বৎসর। ইহা হইতে অনুমিত হয়, স্বরূপানন্দজীর জন্মদিবস ১৮৭২ সনের ৮ই জুলাই। তিনি প্রায় চৌত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সন্ন্যাসজীবন প্রায় আট বৎসর কাল ছিল। শিষ্য গুরুর ন্যায় অল্পায়ু ছিলেন।

তিন

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ *

"নাস্তি মায়াঞ্জনং যস্য রঘুবীরপরাক্রমম্।
ন্যাসিনাঞ্চ বরিষ্ঠং বৈ বন্দে ভক্ত্যা নিরঞ্জনম্॥"

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোল জন সন্ন্যাসী শিষ্যের অন্যতম ছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণের ছয়জনকে ঠাকুর ঈশ্বরকোটি বলিতেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে তিনি অন্যতম ঈশ্বরকোটিরূপে নির্দেশ করিতেন। ঈশ্বরকোটি নিত্যমুক্ত এবং অবতারতুল্য শক্তিসম্পন্ন! ঠাকুর বলিতেন, 'নিরঞ্জনের একটু অঞ্জন নেই, সে সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত।' ঠাকুর ইহাও বলিতেন, 'ভগবান রামচন্দ্রের অংশে নিরঞ্জনের জন্ম।' স্বামী প্রেমানন্দ ভাবনয়নে দর্শন করিয়াছিলেন, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তীরধনু লইয়া খেলা করিতেছেন।

পূর্বাশ্রমে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে নিরঞ্জন এই সংক্ষিপ্ত নামে ডাকিতেন। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে নিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় তাঁহার মামার বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। বাল্যকালে তিনি গরুর গাড়ীতে চড়িয়া উঠানামারূপ খেলা করিতে ভালবাসিতেন। ঐ সময় তিনি কলিকাতার একদল প্রেততত্ত্ববাদিগণের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারা নিরঞ্জনের মধ্যে প্রেত আনাইতেন। প্রেততত্ত্ববাদিগণের সাধনায় তিনি কিছু অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই শক্তির বলে তিনি আশ্চর্যরূপে দুরারোগ্য ব্যাধি সারাইতে পারিতেন। কলিকাতার জনৈক ধনী প্রায় আঠার বৎসর অনিদ্রারোগে ভুগিতেছিলেন। নিরঞ্জনের অলৌকিক শক্তিবলে তিনি

* উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৫

অচিরে রোগমুক্ত হন। এই আরোগ্যের কথাপ্রসঙ্গে নিরঞ্জনানন্দজী পরবর্তী জীবনে বলিতেন যে, তখন হইতেই তাঁহার মনে জীবনের অনিত্যত্ববোধ জাগ্রত হইল।

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একদিন বৈকালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। তাঁহার প্রেততত্ত্ববাদী বন্ধুগণও সেবার সঙ্গে ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। ঠাকুর নিরঞ্জনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পূর্বপরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। নিরঞ্জন ও তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক ঠাকুর মিডিয়াম (মাধ্যম) হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন! সরল শিশুর ন্যায় ঠাকুর তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে বসিলেন। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে উহা তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তখন তিনি উঠিয়া গেলেন। ঠাকুর একটু পরে নিরঞ্জনকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি ভূতের কথাই সদা ভাব, তুমি ভূত হয়ে যাবে। আর যদি তুমি ঈশ্বরের চিন্তা কর, দেবতুল্য মানুষ হবে। কোন্‌টা তুমি পছন্দ কর?' নিরঞ্জন উত্তর করিলেন, 'নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টা।' ঠাকুর তাঁহাকে সেই রাত্রি কালীমন্দিরে যাপন করিতে বলিলেন। কিন্তু বালক নিরঞ্জন মাতুলের ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা করিতে পারিলেন না মাতুল ছিলেন তখন তাঁহার অভিভাবক।

ঠাকুর তাঁহাকে নিরঞ্জন বলিয়া ডাকিতেন। সেইজন্য তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে নিরঞ্জন মহারাজ বা নিরঞ্জন স্বামী নামে পরিচিত। ঠাকুরের প্রথম দর্শন অল্পক্ষণের জন্য হইলেও ইহা নিরঞ্জনের তরুণ হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। মামার বাড়ী যাইবার পথে এবং অন্য সময়েও ঠাকুরের চিন্তা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। কয়েক দিন পরে আবার তিনি কালীবাড়ীতে ঠাকুরকে দর্শন করেন! দ্বিতীয় দর্শন কালে ঠাকুর উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভাবাবেগে বলিলেন, 'বাবা, জীবনের দিনগুলি যে চলে যাচ্ছে, কবে ঈশ্বর দর্শন কর্‌বে? ঈশ্বরলাভের জন্য কবে তুমি সর্বান্তঃকরণে আকুল হবে, তা' দেখবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়েছি। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত মানব জীবন নিষ্ফল ও দুঃখময়।' কেনোপনিষদে বৈদিক ঋষি সত্যই বলিয়াছেন—

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"

অর্থ—'ইহজীবনে যদি ঈশ্বর লাভ হয়, তবেই জীবন সার্থক। আর ঈশ্বরলাভ না হইলে জীবন বৃথা, সর্বনাশ, মহতী বিনষ্টি।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, 'য এতদবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।' অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি ভাগ্যহীন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় নিরঞ্জন আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যিনি অন্যের ঈশ্বরলাভের জন্য এত চিন্তিত হন তিনি নিশ্চয়ই দেবমানব। তিনি ঠাকুরের পূত সংসর্গে তিন দিন কাটাইয়া তাঁহার দিব্য জীবনের সহিত পরিচিত হইয়া ধন্য হইলেন। তিনি গৃহে ফিরিতেই মামা তাঁহাকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য তিরস্কার করিয়া নজরবন্দী রাখিলেন। এখন হইতে নিরঞ্জন প্রেততাত্ত্বিক-গণের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে প্রকৃত ধর্মজীবন গঠনে মনোযোগী হইলেন। ১৮৮২ সনের প্রথমভাগে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম দর্শন হয়। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে থাকিয়া নিরঞ্জন বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ নিরঞ্জনের গুরুভক্তি-নিদর্শক এই ঘটনাটী উল্লেখ করিয়াছেন। নিরঞ্জনের ছিল উগ্র স্বভাব, দীর্ঘ দেহ, বিশাল বক্ষ, সবল স্বাস্থ্য এবং তেজোব্যঞ্জক আকৃতি। একদা তিনি গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলেন। কয়েকজন নির্বোধ সহযাত্রী অযথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিন্দা আরম্ভ করে। নিরঞ্জনের মৃদু প্রতিবাদ তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না। গুরুনিন্দা শ্রবণে তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তিনি সন্তরণপটু ছিলেন। নিন্দুকগণকে ভয় দেখাইবার জন্য তিনি নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের সুদৃঢ় ও সবল দেহ দর্শনে কেহ প্রতিবাদ

করিতে সাহসী হইল না। অবিবেচক নির্বোধগণ শীঘ্রই ভীত হইয়া তাহাদের অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল। ইহাতে নিরঞ্জনের ক্রোধ প্রশমিত হইল। উক্ত সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, 'ক্রোধ ভীষণ রিপু। তুমি এর বশবর্তী হলে কেন? অজ্ঞ লোকে কত কি বলবে। এ সকল বাজে কথায় কান দিলে তোমার জীবন বাজে চিন্তায় ব্যয়িত হবে। সাধুর রাগ জলের দাগের মত ক্ষণিক হওয়া উচিত। কখনও ক্রোধের বশীভূত হবে না।'

বিবাহিত জীবনের প্রতি বাল্যকাল হইতেই নিরঞ্জনের ঘৃণা ছিল। তিনি চিরকুমার ছিলেন। জননীর ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। ইহা শুনিয়া ঠাকুর দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'এর মৃত্যুসংবাদ শুনলেও আমি এত দুঃখিত হতাম না।' কিন্তু ঠাকুর যখন জানিলেন যে, বৃদ্ধা গর্ভধারিণীর নিমিত্তই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বে চাকুরী লইয়াছেন তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

ঠাকুর যখন অন্তিম অসুখের সময় চিকিৎসার্থ কাশীপুর বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন নিরঞ্জন চাকুরী ছাড়িয়া ঠাকুরের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় ব্রতী হন। একদা ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্বে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার দর্শন ও কৃপা প্রার্থনা করেন। নিরঞ্জন তখন একটি লম্বা লাঠি হাতে করিয়া উক্ত বাটির দ্বাররক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নবাগতকে ঠাকুরের নিকট যাইতে দেন নাই। কিন্তু ঠাকুর ভাগ্যবান্ অভ্যাগতকে স্বসমীপে ডাকাইয়া কৃপা করেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার পূত ভস্মাস্থি একটি তাম্রপাত্রে রক্ষিত হয়। উক্ত বাটীর যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন পাত্রটি তথায় অস্থায়ী ভাবে স্থাপিত হয়। নিরঞ্জন এবং শশী উক্ত পাত্র হইতে অধিকাংশ ভস্মাস্থি লইয়া একটি পাত্রে বলরাম বসুর বাটীতে প্রেরণ করেন। উক্ত ভস্মাস্থি রামকৃষ্ণ সংঘের মূল কেন্দ্র বেলুড় মঠে প্রোথিত আছে ও নিত্য পূজিত হয়। ঠাকুর কাশীপুর বাগানে যে এগার জন শিষ্যকে সন্ন্যাস দেন নিরঞ্জন তাঁহাদের অন্যতম শশীর ন্যায় নিরঞ্জনও

ঠাকুরের ভস্মাস্থি পূজায় একনিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৮৬ সনের শেষভাগে বরাহনগরে যখন রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নিরঞ্জন সংসার ত্যাগ করিয়া সেই মঠে যোগদান করেন। 'নিরঞ্জনের অঞ্জন নাই'—ঠাকুরের এই বাক্য স্মরণে তাঁহার নাম নিরঞ্জনানন্দ রাখা হয়।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশ কাল বরাহনগর, আলমবাজার এবং বেলুড় মঠে অতিবাহিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলম্বো পর্যন্ত গমন করেন। স্বামীজীর উত্তর ভারত ভ্রমণকালে নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহার সঙ্গে বহু স্থানে যান। স্বামীজী যখন বেলুড় মঠে অসুস্থ হন তখন তিনি পাগড়ী মাথায় ও দীর্ঘ যষ্টি হস্তে দিগ্বিজয়ী গুরুভ্রাতার দ্বাররক্ষক হইতে গৌরববোধ করিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে কিছুকাল মাধুকরী করিয়া তপস্যারত ছিলেন। শেষজীবনে নিরঞ্জন স্বামী রক্তামাশয়ে অতিশয় কষ্ট ভোগ করেন। হরিদ্বারে বায়ুপরিবর্তনার্থ যাইয়া তিনি ১৯০৪ সনে মে মাসে কলেরা-রোগে দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর ন্যায় তিনিও মাত্র চল্লিশ বৎসর ইহধামে ছিলেন। রামকৃষ্ণ সংঘের জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর প্রতি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তিবিশ্বাস ছিল। শেষ সাক্ষাতের সময় নিরঞ্জন স্বামী মাতৃচরণে লুণ্ঠিত হইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে থাকেন। মাতাও পুত্রের দুঃখে অভিভূত হইয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'নিরঞ্জনের গভীর মাতৃভক্তির জন্য আমি তার হাজার দোষ ক্ষমা করতে পারি।'

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন নির্ভীক, সরল, বজ্রবৎ কঠোর এবং কুসুমবৎ কোমল। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ছিল অসামান্য। কেহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত ও বিমুখ হইতেন। কোন ভদ্রলোক কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে প্রচুর অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কোন কারণে তাঁহার উৎসাহ হ্রাস হওয়ায় তিনি প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ কমাইয়া সামান্য অর্থ দিতে চাহেন। প্রতিশ্রুতি ভগ্ন হওয়ায় দাতা সত্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। এইজন্য সত্যনিষ্ঠ নিরঞ্জনানন্দ উক্ত অর্থ লইতে অস্বীকার করেন। তখন কাশীর

সেবাশ্রম প্রাথমিক ও অসচ্ছল অবস্থায় ছিল। উক্ত দান অস্বীকার করায় সেবাশ্রমের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইল।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার অল্পপরিসর পার্থিব জীবন সত্যদ্রষ্টার ন্যায়, মুক্ত পুরুষের ন্যায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার গুরুভক্তি এত গভীর ছিল যে, সংসারের প্রশংসা বা নিন্দায় তিনি কর্ণপাত করিতেন না। তিনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচররূপে রামকৃষ্ণ সংঘে অমর। পৃথিবীর বহু দেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ চিরকাল তাঁহাকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা করিবে।

চার

স্বামী প্রকাশানন্দ *

স্বামী বিবেকানন্দের তিনজন শিষ্য—স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্তপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বামী বোধানন্দ অদ্যাপি বর্তমান এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষরূপে গুরুর আরব্ধ কার্য সাধনে নিযুক্ত। স্বামী পরমানন্দ বোষ্টনে এবং স্বামী প্রকাশানন্দ সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী প্রকাশানন্দের জেষ্ঠাগ্রজ স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে রামকৃষ্ণ সংঘে সুপরিচিত ছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ পঞ্চম সংঘাধ্যক্ষ-পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দ প্রায় বিশ বৎসর আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারান্তে তথায় গুরুপদে বিলীন হইয়াছেন। শেষ এগার বৎসর তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্কো-স্থিত হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। উক্ত মন্দিরই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত প্রথম হিন্দু মন্দির।

পূর্বাশ্রমে স্বামী প্রকাশানন্দের নাম ছিল সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ১৮৭৪ সনে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী শিক্ষিত, ধর্মনিষ্ঠ, ও দীর্ঘজীবী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কলিকাতার সার্পেণ্টাইন লেনে তাঁহার বাসস্থান অদ্যাপি বিদ্যমান এবং তৎপুত্র-পৌত্রগণ দ্বারা অধিকৃত। সুশীল বাল্যে স্বগৃহের ধর্মভাবে পরিবর্ধিত হন। মাতৃক্রোড়েই মিষ্টভাষী সুদর্শন বালক প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা লাভ করেন। স্বগৃহের বয়স্থা রমণীগণের নিকট তিনি হিন্দু শাস্ত্রের আখ্যানসমূহ শুনিতে ভালবাসিতেন। স্কুলেও তিনি সচ্চরিত্র সহপাঠিগণের সহিতই মিশিতেন। অসচ্চরিত্র বালকগণ তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করিত না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সুশীল নামটী সার্থক হইয়াছিল। কলেজে পড়িবার কালে তিনি অবসর সময়ে ধর্মভাবাপন্ন বন্ধুদের সহিত প্রাচ্য ও

* উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৫৫

পাশ্চাত্যের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যার কোন বাগানে বা নিভৃত স্থানে বসিয়া মনোনীত বন্ধুদের সঙ্গে স্বধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ করিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যাইত। *

ঐ সময় আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সুখ্যাতি ও সাফল্যের সংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয় এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সুশীল ও তাঁহার বন্ধুগণ সাগ্রহে ঐ সকল সংবাদ পাঠ ও আলোচনা করিতেন। কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে আমেরিকায় প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাবলী পাঠে তাঁহারা নবজীবন ও পরম প্রেরণা পাইতেন। স্বামীজীর যুগোপযোগী ভাবরাশি তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিল। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণপূর্বক তাঁহার ভাবে জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। সুশীল বুঝিলেন, স্বামীজীই এই পতিত ও পরাধীন জাতির উদ্ধারক ও যুগাচার্য। নিজের ও স্বদেশের মুক্তির জন্য এবং জগতের হিতার্থ আত্মদান করিতে স্বামীজী যে মর্মস্পর্শী আহ্বান করিলেন তাহা শুনিয়া সুশীল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণে এবং তৎপদাঙ্ক অনুসরণে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। ১৮৯০ সন হইতে তিনি বরাহনগর ও আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠে নিয়মিত ভাবে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সঙ্গ করিতেন। তাঁহাদের পূত সঙ্গে ঠাকুরের জীবনী ও বাণী শুনিবার এবং মঠের পূজা, ধর্মপ্রসঙ্গ ও কীর্তনাদিতে যোগ দিবার সুযোগ পাইতেন। ১৮৯৬ সনে তিনি যখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন তাঁহার মনে বৈরাগ্য প্রবল হয় এবং তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। পরবর্তী বৎসরে স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইলে সুশীল তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রকাশানন্দ নামে পরিচিত হন।

তরুণ সন্ন্যাসী এখন হইতে স্বীয় গুরুর বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহার ভাবরাশি, শিক্ষা ও সাধন দ্বারা জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি অচিরে যুগাচার্য স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ সংঘের এক

* ১৯২৭ সনের এপ্রিল সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখুন।

প্রধান কর্মী হইয়া উঠিলেন। ১৮৯৮ সনে স্বামীজী তাঁহাকে অন্য এক শিষ্যের সহিত পূর্ববঙ্গে বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তদুপলক্ষে ঢাকায় তৎপ্রদত্ত বক্তৃতাবলী শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক সমাদৃত হয়। ১৮৯৯-১৯০১ সন পর্যন্ত তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিচালনাদি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি মধ্যে মধ্যে মিশনের সেবাকার্যেও যোগ দিতেন। ১৯০০ সনের এপ্রিল মাসে স্বামী প্রকাশানন্দ গুরুভ্রাতা স্বামী বোধানন্দের সঙ্গে হিমালয়ে কেদারনাথ ও বদ্রী-নারায়ণ তীর্থ দর্শন করেন। উভয়ে ৫ই এপ্রিল হৃষীকেশে উপস্থিত হন। সুদীর্ঘ পথ কোথাও কঠিন বন্ধুর, কোথাও তুষারাবৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা নগ্নপদে তীর্থযাত্রা সমাপন করেন. ঐ তীর্থভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বামী প্রকাশানন্দ একটি প্রবন্ধে ১৯০০ সনের আগষ্ট মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯০২ সনের শেষার্ধ হইতে ১৯০৬ সনের প্রারম্ভ পর্যন্ত হিমালয়ের ক্রোড়ে মায়াবতী নামক স্থানে অবস্থিত অদ্বৈতাশ্রমের পরিচালনা এবং তথা হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদন-কার্যে তিনি সহকারী ছিলেন। মায়াবতী যাইবার পূর্বে কিছুকাল তিনি তপস্যা এবং কাশ্মীরে অমরনাথ ও ভারতের অন্যান্য প্রধান তীর্থস্থান কয়েকটী দর্শন করেন। ১৯০৬ সনের এপ্রিল মাসে তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহকারীরূপে প্রেরিত হন। ১৯০৬-১৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় নয় বৎসর তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত স্বামী ত্রিগুণাতীতকে হিন্দু মন্দিরের কার্যে সাহায্য এবং ১৯১৪ সনে ওরিগন ও ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্থানে কৃতিত্বের সহিত বেদান্তপ্রচার করেন।

১৯১৫ সনে স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগ হইলে স্বামী প্রকাশানন্দ হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। উক্ত পদে তিনি প্রায় এগার বৎসর কার্য করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই পদলাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, হিন্দু মন্দিরের নির্মাণার্থ লক্ষাধিক টাকার ঋণ হইয়াছে। তিনি বহুকষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করেন। তাঁহার পরিচালনায় হিন্দু মন্দিরের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয় এবং বেদান্ত প্রচার অভূতপূর্ব প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহার বক্তৃতা ও ধর্মপ্রসঙ্গে লোকসমাগম বাড়িতে লাগিল। তিনি সুপুরুষ,

সুবক্তা ও সুভাষী ছিলেন। অপরিচিত ব্যক্তিও তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। ক্যালিফোর্নিয়ার নানাস্থানে ভ্রমণপূর্বক তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেন। যেখানে তিনি যাইতেন ও বক্তৃতা দিতেন সেখানে বহু লোক বেদান্ত শ্রবণে ও অধ্যয়নে আগ্রহান্বিত হইত। কোন কোন স্থানে বেদান্তকেন্দ্র স্থাপনের জন্যও তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯১৫ সনের পানামা প্রদর্শনী উপলক্ষে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে একটী বিরাট সভা আহূত হয়। উহাতে তিনি কয়েকটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তথায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ মহাসভার সহকারী সভাপতিরূপেও তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। এইরূপে সানফ্রান্সিস্কো ও অন্যান্য শহরে বেদান্তপ্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করায় তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি সিঞ্চন দ্বারা তিনি সকলের চিত্ত অধিকার করিতেন। আমেরিকার নরনারিগণ তাঁহার নিকট ধর্মসাধনায় সাহায্য পাইয়া শান্তিলাভ করিত।

১৯২২ সনে হিন্দু মন্দিরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৮৭তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উৎসবে স্বামী প্রকাশানন্দ ঠাকুরের সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। মূল ভাষণটি সেই বৎসরের আগষ্ট মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলেন, "ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত অনেক দেবমানব এই মর্ত্যধামে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুরের জীবনে দিব্য ভাবরাশি যেমন প্রভূত পরিমাণে প্রকটিত হইয়াছিল এমনটি আর কোন অবতারের জীবনে দেখা যায় নাই। তাঁহার দিব্য জীবনে এত অলোকিক শক্তি প্রকটিত, এমন স্বর্গীয় সমন্বয় সংসিদ্ধ, এরূপ ভাগবত ভাবের বৈচিত্র্য বিকশিত হইয়াছিল যে, আমরা যদি উহার আন্তরিক অনুধ্যান করি তবে তাঁহাকে আরাধনা না করিয়া থাকিতে পারিব না। যদিও এই জীবন ভারতেই আবির্ভূত ও যাপিত হইয়াছিল, উহা কোন দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ্ নহে। ইহা সকল জাতীয় জীবন ও ধর্মসম্প্রদায়ের উর্ধ্বে অবস্থিত। এমন দেবমানব সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থ অবতীর্ণ হন জগতের ধর্মজীবনে নবশক্তি সঞ্চারের জন্য।"

হিন্দু মন্দিরের 'শান্তি আশ্রম' নামে যে একটি শাখা আছে ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্যেক বৎসর গ্রীষ্মকালে হিন্দু মন্দিরের ছাত্রছাত্রিগণ উক্ত আশ্রমের নিভৃত ও শান্তিপ্রদ পরিবেশে যাইয়া ধর্মসাধনায় মগ্ন হন। ১৯২২ সনের জুন মাসে বিশ জন ছাত্রছাত্রী লইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ শান্তি আশ্রমে গমন করেন। আশ্রমে প্রত্যহ তিনবার ধ্যান হইত প্রাঙ্গণস্থিত শাখা-প্রশাখাসমন্বিত ওক বৃক্ষের তলে। বৃক্ষের কাণ্ডদেশে ওঁকার এবং শিবের প্রতীক ত্রিশূল অঙ্কিত ছিল। ধ্যানকক্ষের মধ্যে সেই বৎসর শ্রীসারদা দেবীর সুন্দর বৃহৎ ফটোগ্রাফ স্থাপিত হয়। সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ধ্যান আরম্ভ হইত। ধ্যানের জন্য ঘণ্টা বাজিলে ছাত্রছাত্রীগণ স্ব স্ব কেবিন হইতে ওঁকার উচ্চারণপূর্বক ধ্যানঘরে যাইতেন। প্রাতঃকালীন ধ্যানে শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' ব্যাখ্যাত হইত। মধ্যাহ্নের ধ্যানান্তে তিনি উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন। সান্ধ্য ধ্যানে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ হইত। পূর্বাহ্নে সাড়ে আটটার সময় এবং অপরাহ্নে সাড়ে চারটার সময় আশ্রমবাসিগণ আহার করিতেন। দুইবার আহারকালে স্বামীজী ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা ছাত্রছাত্রিগণের মন সচ্চিন্তায় নিযুক্ত রাখিতেন। সানফ্রান্সিস্কো হইতে ১লা জুন যাত্রা করিয়া পরদিবস তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হন এবং ৩রা জুন হইতে আশ্রমে নিয়মিত ভাবে ধ্যানাদি আরম্ভ হয়। ১৪ই জুন বুধবার সমস্ত রাত্রি ধুনি জ্বালান ছিল। সকলেই জাগিয়া ধুনির চারিদিকে বসিয়া ধ্যান, পাঠ ও আলোচনাদিতে কাটাইলেন। সেই শুভ সময়ে নূতন ছাত্রছাত্রিগণকে সংস্কৃত নাম দেওয়া হইল। সমস্ত রাত্রি প্রকাশানন্দজীর পূত সঙ্গে ধর্মসাধনায় যাপন করিয়া সকলে ধন্য হইলেন। আশ্রমের ছাত্রিগণ রন্ধনাদি এবং ছাত্রগণ ধুনি প্রভৃতির জন্য কাঠ কাটার কার্যাদি করিতেন। কর্মোন্মত্ত ভোগ-চঞ্চল পাশ্চাত্য মনকে কর্মযোগের রহস্য শিক্ষা দিয়া তিনি তাহাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এই যুগোপযোগী ধর্মসাধন করিয়া আধুনিক মানব সহজেই কর্মময় জীবনকে ধর্মময় করিতে পারে। এইজন্য কর্মযোগের বাণী পাশ্চাত্যবাসীর নিকট এত হৃদয়গ্রাহী। জুনের শেষ রবিবারে

স্বামীজী উপত্যকাবাসী প্রতিবেশিগণকে হিন্দু আহার্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। প্রায় চল্লিশ জন নরনারী উক্ত ভোজে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী স্বয়ং তাঁহাদের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি হিন্দু প্রণালীতে প্রস্তুত করেন। ইহার কয়েক দিন পরেই তিনি ছাত্রছাত্রিগণ সহ সানফ্রান্সিস্কো হিন্দুমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। এইরূপে স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে তিলে তিলে আত্মদান করেন। *

সহকর্মিগণ ও বন্ধুগণ বুঝিলেন, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কর্মক্লান্ত স্বামীজীর বায়ুপরিবর্তন ও সমুদ্রযাত্রা অত্যাবশ্যক। তাঁহারা তাঁহাকে আবশ্যকীয় অর্থ প্রদানপূর্বক মাতৃভূমি দর্শনে যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে হিন্দুমন্দিরের কার্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ভাবিয়া তিনি প্রথমে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, হিন্দুমন্দিরের কার্য তাঁহারা সাধ্যমত চালাইবেন এবং ভারত হইতে তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলে কার্য আদৌ ব্যাহত হইবে না। তাঁহাদের কথায় স্বামীজী সম্মত হইয়া ১৯২২সনের ২১শে অক্টোবর ব্রহ্মচারী গুরুদাস ও দুই জন পাশ্চাত্য শিষ্যার সহিত ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। গুরুভ্রাতৃগণের সহিত পুনর্মিলন, এবং পুণ্যস্মৃতিময় স্থানাদি পুনর্দর্শনের আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার ভারতাগমন সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে স্বদেশবাসিগণের সাদর সম্বর্ধনা লাভ করিলেন। দীর্ঘকাল পাশ্চাত্যে প্রবাসসত্ত্বেও তাঁহার প্রীতিপূর্ণ সরল মধুর স্বভাব অপরিবর্তিত ছিল। ১৯২৩ সনের ৬ই জুলাই কলিকাতাবাসিগণ তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। সংস্কৃত ও বাংলায় বহু কবিতা তাঁহার অভিনন্দনার্থ রচিত ও সভায় পঠিত হয়। স্বাগতাভিভাষণের উত্তরে তিনি একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন। যেমন আমেরিকাতে তেমনি ভারতেও বক্তৃতা, ধর্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতি কার্যে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বাস্থ্যলাভার্থ আবশ্যকীয় বিশ্রাম লাভ সম্ভব হইল না। তিনি এত সুভদ্র ও সহৃদয় সন্ন্যাসী ছিলেন যে, কাহারও

* ১৯২২ সনের নভেম্বর সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ক্লারা এম. পেটির 'শান্তি আশ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখুন।

অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। তিন চার মাস জন্মভূমিতে কাটাইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ ১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসে নিউইয়র্ক হইয়া সানফ্রান্সিস্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন। এইবার তিনি স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী প্রভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া যান। স্বামী রাঘবানন্দ যান নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির কর্মীরূপে এবং স্বামী প্রভবানন্দ স্বামী প্রকাশানন্দের সহকর্মীরূপে। হিন্দুমন্দিরের সভ্য-সভ্যাগণ তাঁহাদের ধর্মগুরুকে এবং স্বামী প্রভবানন্দকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। সকলে ভাবিলেন, সহকারী পাইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ একটু বিশ্রামলাভে সমর্থ হইবেন। কিন্তু, তাহা সম্ভবপর হইল না। তিনি বলিতেন, "যখন আমার কাজ শেষ হইবে তখনই চিরবিশ্রাম লাভ করিব। সমগ্র ক্যালিফোর্নিয়াতে বেদান্তবাণী প্রচার না করিলে আমার বিশ্রাম হইবে না।" তিনি তাঁহার সহকর্মী স্বামী প্রভবানন্দকে নূতন নূতন শহরে বেদান্তপ্রচারের জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রেরণকালে তিনি স্বামী প্রভবানন্দকে বলিলেন, "আমাদিগকে নূতন বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে।" স্বামী প্রভবানন্দ নানাস্থানে বেদান্তপ্রচার করিয়া পোর্টল্যাণ্ডে ১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে একটী নূতন বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। স্বামী প্রকাশানন্দ উক্ত বৎসরের নভেম্বর মাসে পোর্টল্যাণ্ড যাইয়া নব সমিতির উদ্বোধনকার্যে পৌরোহিত্য করেন।

১৯২৫ সনের জুন মাসে স্বামী প্রকাশানন্দ অনেক ছাত্রছাত্রী লইয়া পুনরায় আশ্রমে গমন করেন। * সেখানে তিনি একমাস অবস্থানপূর্বক ছাত্রছাত্রিগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দেন। প্রত্যহ প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় শঙ্খধ্বনি দ্বারা আশ্রমবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ করা হইত। ছয়টার সময় সকলে স্ব স্ব কেবিন হইতে 'হরি ওঁ' ধ্বনি করিতে করিতে ধ্যানকক্ষে যাইতেন। সেখানে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলকে ধ্যান করিতে হইত। ধ্যানান্তে তিনি সকলের নিকট 'রামকৃষ্ণকথামৃত' ব্যাখ্যা করিতেন। 'কথামৃত' শুনিতে

* ১৯২৫ সনের নভেম্বর সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় 'শান্তি আশ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত বিবরণ দেখুন।

শুনিতে তাঁহাদের মন ভারতের গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইত এবং ঠাকুরের স্মৃতিপূত স্থানগুলি তাঁহারা মানস চক্ষে দেখিতে পাইতেন। মধ্যাহ্ন-কালীন ধ্যানান্তে স্বামীজী শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে 'কপিল-দেবহুতি সংবাদ' পাঠ করিতেন। ভাগবতের উপাখ্যানগুলি শুনিয়া ছাত্রছাত্রিগণ মুগ্ধ হইতেন। সান্ধ্য ধ্যান সমাপ্ত হইলে স্বামীজী তাঁহার সুললিত স্বরে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন। আহারের পূর্বে সমস্বরে গীতার 'ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মাহবিঃ....' শ্লোকটি পঠিত হইত। দুইবার আহারান্তে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সারগর্ভ উক্তিগুলি উদ্ধার করিয়া শুনাইতেন। ধুনি জালিয়া ধ্যান, ভজন, পাঠ ও আলোচনাদিতে রাত্রি কাটাইতেন। হোমাগ্নিতে প্রত্যেকে স্ব স্ব অসৎ বৃত্তিগুলি আহুতি দিতেন। পরদিবস প্রাতঃকালে সকলে নিজেদের চিত্ত অধিকতর সংযত ও সংশুদ্ধ দেখিতেন। কোন কোন ছাত্রকে তিনি কখনো কখনো সমগ্র দিবারাত্র মৌনাবলম্বনপূর্বক ঈশ্বরের নাম জপ করিতে উপদেশ দিতেন। বিদায়োৎসব দিবসে প্রতিবেশিগণকে যে হিন্দুভোজ দেওয়া হইল সেই উপলক্ষে তাঁহাদের বালক-বালিকাগণ আবৃত্তি ও সঙ্গীত করিল। স্বামী প্রকাশানন্দ এইভাবে বহুবার শিষ্যশিষ্যাগণ সমভিব্যাহারে শান্তি আশ্রমে যাইয়া গ্রীষ্মের কয়েক সপ্তাহ কাটাইতেন।

স্বামী প্রভবানন্দ পোর্টল্যাণ্ডে বেদান্ত সমিতির কার্যে সফলকাম হওয়ায় স্বামী প্রকাশানন্দ আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের প্রচারকার্য প্রসারলাভ করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দজীর অমোঘ আশীষ আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে। আমি আরও সন্ন্যাসী প্রেরণের জন্য সংঘাধ্যক্ষকে লিখিব।" তাঁহার অনুরোধে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার নূতন সহকারিরূপে ১৯২৬ সনের জুন মাসে সানফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হইলেন। নবাগত স্বামী হিন্দু মন্দিরের কার্যে যোগদান করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, ছয় সাত মাসের মধ্যেই স্বামী প্রকাশানন্দ চিরতরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন। কঠোর পরিশ্রমে প্রকাশানন্দজীর স্বাস্থ্য ইতঃপূর্বেই ভগ্ন হইয়াছিল। পূর্বে যে বহু-মূত্ররোগের কবল হইতে অতি কষ্টে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা উগ্রভাবে

পুনরায় দেখা দিল। রোগযন্ত্রণায় তিনি অধীর বা মুহ্যমান হন নাই। সৌর তাপ যেমন প্রস্ফুটিত পঙ্কজের সৌন্দর্য ম্লান করিতে অক্ষম তেমনি ব্যাধিবেদনা বা মৃত্যুভয় তাঁহার মুখের হাস্য বা প্রফুল্লতা হ্রাস করিতে পারে নাই। প্রয়াণের আসন্নতা তাঁহার মনে ছায়াপাত করে নাই। স্বামী প্রকাশানন্দ ১৯২৭ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীগুরুর চিরসান্নিধ্য লাভ করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন স্থির হইল। এই তিন দিন সানফ্রান্সিস্কো শহরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। যেন ধরিত্রী দেবী তাঁহার প্রিয় পুত্রের বিয়োগে তিন দিন শোকাভিভূতা ও রোরুদ্যমানা রহিলেন! বুধবার প্রাতে অরুণালোকের স্নিগ্ধ স্বর্ণপ্রভা প্রকাশিত হইলে শত শত ভক্ত ও বন্ধু তাঁহাদের প্রিয় ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনার্থ এবং তাঁহার ভৌতিক দেহের শেষ দর্শনমানসে হিন্দু মন্দিরে আসিলেন। টাকোমা, সাউথল্যাণ্ড প্রভৃতি দূর দূর স্থান হইতে অনাগত বন্ধুগণের পুষ্পোপহার আসিয়া শবদেহের উপর স্তূপীকৃত হইল। স্বামী বোধানন্দ তখন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় শীতকাল কাটাইতে গিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া তিনি হিন্দু মন্দিরে আসিলেন। স্বামী প্রভবানন্দ পোর্টল্যাণ্ড হইতে ছুটিয়া আসিলেন। বুধবার এগারটার সময় শবদেহকে পত্রপুষ্পবস্ত্রে শোভিত করিয়া শোকসভা হইল।* হিন্দু মন্দিরের বেদীর যে স্থানে বসিয়া স্বামী প্রকাশানন্দ ধ্যান করিতেন সেখানে পুষ্পমাল্য-শোভিত চেয়ারে তাঁহার বৃহৎ বাঁধান ছবি স্থাপিত হইল। স্বামী বোধানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ বেদীতে আসন গ্রহণ করিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত ও প্রার্থনাদির পর মিসেস্ সাইগ্রিড মিলহাউসার্ স্বরচিত সঙ্গীত গাহিলেন। স্বামী বোধানন্দ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর যাবৎ আমি স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলাম। আমরা যখন স্কুলের ছাত্র তখন হইতেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়। এই তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহাকে একটি কর্কশ বাক্য বলিতে বা একটি অপ্রীতিকর কার্য করিতে দেখি নাই! মঠে আমরা উভয়ে একত্র

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯২৭ সনের জুন সংখ্যায় শোকসভার বিস্তৃত বিবরণ দেখুন।

থাকিতাম, উভয়ে একত্র হিমালয়ে তীর্থভ্রমণ করিয়াছি। উভয়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা এবং স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করি। আমাদের বাল্যবন্ধুত্ব অচ্ছেদ্য গুরুভ্রাতৃত্বে পরিণত হইয়াছিল।"

স্বামী প্রভবানন্দ বলিলেন, "স্বামী প্রকাশানন্দের দুইটি সদ্‌গুণ আমার চিরকাল মনে থাকিবে। প্রথমটি তাঁহার প্রশান্ত স্বভাব। দুঃখে বিপদেও এই প্রশান্ত স্বভাব হইতে তিনি বিচলিত হইতেন না। প্রতিকূল অবস্থায় তাঁহাকে প্রশান্ত ও প্রফুল্ল দেখা যাইত। গভীর আধ্যাত্মিকতা হইতে এইরূপ মানসিক প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা প্রসূত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় গুণটি নির্মল, নিঃস্বার্থ প্রীতি। কেহই তাঁহার এই প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইত না।"

স্বামী দয়ানন্দ বলিলেন, "হিন্দু মন্দিরের বেদী হইতে গত বিশ বৎসর যে মধুর কণ্ঠস্বর বেদান্তবাণী প্রচার করিত তাহা চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়াছে। তুলসীদাস বলেন, 'হে তুলসী, তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে তখন জগৎ হাসিতেছিল, আর তুমি কাঁদিতেছিলে। এমন জীবন যাপন কর যে, যখন তুমি জগৎ ছাড়িয়া যাইবে তখন তুমি হাসিবে এবং জগৎ তোমার জন্য কাঁদিবে।' স্বামী প্রকাশানন্দ এমন গুরুগত জীবন যাপন করিয়াছেন যে, আমরা আজ কাঁদিতেছি, আর তিনি হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। যখন তিনি ভারতে ছিলেন তখন তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'বাবা, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি প্রাণপাত করিতেছি। তোমার জীবনও সেই কার্যে উৎসর্গ ও বিসর্জন কর। আরও অনেকে ঠাকুরের কাজে আহুতি দিবে। সকলের মিলিত আত্মোৎসর্গ হইতে এক মহৎ কার্য সম্পন্ন হইবে।' স্বামী প্রকাশানন্দ গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি খুব উদারচেতা ও উচ্চমনা ছিলেন। নীচতা বা স্বার্থপরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।" সমাগত বহু নরনারী অশ্রুবিসর্জনপূর্বক স্বামীজীর মহাপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রদ্ধানিবেদন ও সমাপ্তিসঙ্গীত হইবার পর হিন্দু মন্দিরের ছয়টি শিষ্য ও শিষ্যা শবদেহ অপেক্ষমান গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গাড়ী শ্মশানাভিমুখে

ছুটিয়া মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামী প্রকাশানন্দের মৃত দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল। সমুদ্রের জল সমুদ্রে প্রত্যাগমন করিল। যে গুরুর কার্যের জন্য তিনি ধরাধামে আসিয়াছিলেন তিনিই কর্মক্লান্ত প্রিয় শিষ্যকে বিশ্রামার্থ স্বধামে আহ্বান করিলেন।

১৯২২ সনের পূর্বে সানফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দির হইতে স্বামী প্রকাশানন্দের এই তিনটি বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।—(১) The Universality of Vedanta (বেদান্তের উদারতা) (২) Inner Consciousness (আন্তর চেতনা) এবং (৩) Mystery of Human Vibrations (মানব-কম্পনের রহস্য)। তাঁহার বহু ইংরাজি বক্তৃতা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এবং অনেক বাংলা প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

যে নবযুগপ্রবর্তক মহৎ কার্য ঠাকুরের শিষ্যগণ ভাগবত নির্দেশে আরম্ভ করেন স্বামীজীর শিষ্যগণ সেই কার্য সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। স্বামী প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের জীবনকাহিনী নবীন হিন্দু সন্ন্যাসিগণের জীবনের দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ।

পাঁচ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ *

"আজন্ম-জ্ঞানবিজ্ঞান-নিষ্ণিতায় মহাত্মনে।
বিজ্ঞানানন্দ-পাদায় ভূয়ো ভূয়ো নমোহস্তু মে॥"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ষোল জন সন্ন্যাসী শিষ্যের অন্যতম। জীবনের শেষ বৎসরে তিনি সমগ্র রামকৃষ্ণ সংঘের চতুর্থ অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে এপ্রিল সত্তর বৎসর বয়সে এলাহাবাদে মহাসমাধিমগ্ন হন। ১৯১০ খ্রীঃ তিনি এলাহাবাদে একটী রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে 'এলাহাবাদের বিশপ' (ধর্মযাজক) বলিয়া ডাকিতেন। বিজ্ঞানানন্দজীর চল্লিশ বৎসরব্যাপী সন্ন্যাস-জীবনের প্রায় ৩৭ বৎসর কাল অধ্যয়ন ও তপস্যায়, গ্রন্থরচনায় ও নিষ্কাম কর্মে এলাহাবাদে অতিবাহিত হয়। †

পূর্বাশ্রমে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। হরিপ্রসন্ন পনের বৎসর বয়সে কলিকাতার হেয়ার স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে তিনি ফার্ষ্ট আর্টস (এফ. এ.) পড়েন। উক্ত কলেজে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি

---

* 'বিশ্ববাণী' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫) মাসিকে প্রকাশিত।

† বিস্তৃত জীবনের জন্য মৎপ্রণীত ও এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' (৩০০ পৃষ্ঠা) পুস্তক দেখুন।

এফ. এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে একবিংশতিতম স্থান প্রাপ্ত হন এবং পাটনা কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। তিনি পুনা কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন এবং ১৮৯২ খ্রীঃ উক্ত কলেজ হইতে এল. সি. ই. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ভারত সরকারের অধীনে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়াররূপে প্রায় পাঁচ বৎসর গাজীপুর, এটাওয়া, মীরাট, বুলন্দশহর প্রভৃতি স্থানে কাজ করেন। স্বামী বিবেকানন্দজীর পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর হরিপ্রসন্ন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ সংঘের আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ বেলুড় মঠের জন্য জমি ক্রীত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে মঠের গৃহাদি নির্মাণের ভার প্রদান করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে শীঘ্রই মঠগৃহ নির্মিত ও বাসোপযোগী হয়। স্বামিজীর পরামর্শানুসারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের একটী নক্সা প্রস্তুত করেন। তদনুযায়ী বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হয় তাঁহারই তত্ত্বাবধানে। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে তিনি উক্ত বিশাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্যও সম্পন্ন করেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি 'বিজ্ঞান স্বামী' নামে পরিচিত। স্বামিজী তাঁহাকে আদরপূর্বক 'পেসন' বলিয়া ডাকিতেন। বিজ্ঞান মহারাজ মহাবিদ্বান ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে তিনি বাংলায় পুস্তক লিখিয়াছেন। 'দেবী ভাগবত' ও 'নারদ পঞ্চরাত্র' (ইংরাজিতে) এবং 'সূর্যসিদ্ধান্ত' (বাংলায়) নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থত্রয় তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি রামায়ণের যে ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রতীত হয়, সত্যনিষ্ঠা কিরূপে তাঁহার মনে বাল্যকালেই দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার গর্ভধারিণী কোন কারণে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন। সত্যনিষ্ঠ পুত্র বার বার উহার তীব্র প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও জননী তাহা বিশ্বাস করেন নাই। এই মিথ্যা অপবাদে মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বালক স্বীয় গলদেশস্থ উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি, তবে আমি ব্রাহ্মণ নই!' অবিবেচক পুত্রের এই অশুভ কার্যে ভীতা ও শঙ্কিতা হইয়া মাতা বলিয়া উঠিলেন, 'কি অন্যায় কাজ করলি?' দুর্ভাগ্যবশতঃ পরদিবস কোয়েটা হইতে তার আসিল যে, তাঁহার পিতা দ্বিতীয়

আফগান যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুঃসংবাদ শ্রবণে শোক-সন্তপ্তা জননী পুত্রকে বলিয়াছিলেন, 'তোরই অভিশাপে এমনটী হ'লো!'

হরিপ্রসন্ন যৌবনেও তাঁহার সত্যনিষ্ঠা সংরক্ষা করিয়াছিলেন। যখন তিনি পুণা কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন একজন খ্রীষ্টান পাদ্রী তাঁহাদের কলেজে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। একদিন পাদ্রী সাহেব তাঁদের ক্লাশে পড়াইতেছেন, এমন সময় একটী ষাঁড় ক্লাশ-সংলগ্ন মাঠে চরিতেছিল। পাদ্রী অধ্যাপক তাঁহার ক্লাশের হিন্দুছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, দেখ, তোমাদের পিতামহ চরিতেছে!" এই নির্বোধ উপহাসের দ্বারা অধ্যাপক হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদকে সমালোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। হরিপ্রসন্ন অন্যান্য হিন্দু ছাত্রের মত স্বধর্মের এই সমালোচনা সহ্য করিতে না পারিয়া শান্তভাবে অথচ সাহসভরে জবাব দিলেন, 'আপনাদের যীশুখৃষ্ট অনূঢ়া নারীর সন্তান এবং আপনারা তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে পূজা করেন। আপনারা ইহার কি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেন?' এই তীক্ষ্ণ উত্তরে অধ্যাপক নীরব হইলেন। কিন্তু হরিপ্রসন্নকে ইহার জন্য প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অধ্যাপক তাঁহার প্রতি এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পরীক্ষায় ভূতত্ত্ব-বিদ্যার প্রশ্নোত্তরে অনেক কম নম্বর দিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে নয় দশ বার দর্শন করিবার পরম সৌভাগ্য হরিপ্রসন্নের হইয়াছিল। তাঁহার বাসস্থান বেলঘোরিয়া গ্রামে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি প্রথম দর্শন করেন। তখন তাঁহার বয়স এগার বার বৎসর মাত্র, এবং তিনি স্কুলের ছাত্র। সেই দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজের ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে স্থানীয় তপোবনে গিয়াছিলেন। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' হইতে জানা যায়, হরিপ্রসন্ন ঠাকুরের দ্বিতীয় দর্শন লাভ করেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, বেলঘোরিয়ায় দেওয়ান গোবিন্দ মুখার্জির বাটীতে। সেইদিন ঠাকুর নরেন্দ্র, বাবুরাম, নিত্যগোপাল, রামচন্দ্র এবং অন্যান্য ভক্তদের

লইয়া সংকীর্তন করিয়াছিলেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে হরিপ্রসন্নও তথায় সংকীর্তন শ্রবণে আগমন করেন। কিন্তু স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতির অস্পষ্টতা হেতু প্রথম দুইটি দর্শনকে এক করিয়া বর্ণনা করিতেন। সেই বৎসরের ৮ই জুন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুরকে তিনি তৃতীয় বার দর্শন করেন। সেইদিন স্বামী শিবানন্দ তথায় উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়িবার সময় হরিপ্রসন্ন এক ছুটির দিন সহপাঠী স্বামী সারদানন্দ এবং বরদা পালকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যান। বৈকুণ্ঠ সান্যালও সেইদিন তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। সেইদিন ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্ত মণিমোহন মল্লিকের নিমন্ত্রণে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে গমন করেন। ঠাকুরের নির্দেশে হরিপ্রসন্ন সহপাঠীদের সহিত সেইদিন সন্ধ্যায় পুনরায় ঠাকুরের সহিত মণিমোহনের গৃহে মিলিত হন। 'রামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে উক্ত শুভ দর্শনের তারিখ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর। পঞ্চম দর্শন হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট। সেদিন কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী দিবস। ভক্তবীর গিরিশ ঘোষ সেইদিন ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং কালী মন্দিরে প্রথম রাত্রিযাপন করেন। সেই রাত্রে তিনি ঠাকুরের নির্দেশে মা কালীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন। বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ যুবক হরিপ্রসন্নের পক্ষে মন্দিরের সামান্য প্রসাদ নৈশ আহারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সেই জন্য ঠাকুর নহবতখানায় শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে তাঁহার জন্য ডালরুটি আনাইয়া দেন। ঠাকুর সমস্ত রাত্রি ভাবাবেশে কখনও হাততালি দিয়া, কখনও বা জগদম্বার সহিত কথা বলিয়া, কখনও বা নীরবে পাদচারণ করিয়া অতিবাহিত করেন। উক্ত বৎসরের কোন সময় ঠাকুরের সহিত হরিপ্রসন্নের সপ্তম মিলন হয়। এইবার ঠাকুর আঙ্গুল দিয়া তাঁহার জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখিয়া দেন। তারপর ঠাকুরের আদেশে তিনি পঞ্চবটীতে যাইয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। এইরূপ গভীর ধ্যান তিনি পূর্বে কখনও অনুভব করেন নাই। স্পর্শমাত্রেই ঠাকুর তাঁহার যুবক শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে হরিপ্রসন্ন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পিঠে ও মাথায়

হাত বুলাইয়া দিতেছেন। তৎপরে ঠাকুরের সহিত তিনি তাঁহার ঘরে যান। তথায় ঠাকুর তাঁহাকে মা কালীর প্রসাদ দেন এবং সঙ্গোপনে তাঁহাকে ধর্মজীবনের গূঢ় রহস্যসমূহ শিক্ষা দেন। পরবর্তী দর্শনকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন ঠাকুর ক্রীড়াচ্ছলে হরিপ্রসন্নের সাথে কুস্তি লড়েন। সবল শিষ্য তপঃশীর্ণ গুরুকে শারীরিক শক্তিতে পরাজিত করিলেও গুরুশক্তি চিরতরে তাঁহাকে অভিভূত করিল। নবম দর্শনকালে ঠাকুর তাঁহাকে ব্রজগোপীদের কথা এবং রাসলীলা সম্বন্ধে বলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পরবর্তী জীবনে এই বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেন। শেষ দর্শন হয় সম্ভবতঃ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কাশীপুর বাগান-বাটীতে। সেই বৎসর ১৬ই আগষ্ট ঠাকুর স্বধামে প্রস্থান করেন।

উক্ত দর্শনের পর হরিপ্রসন্ন বি. এ. পড়িবার জন্য বাঁকীপুরে চলিয়া যান। তথায় কিছুদিন পরে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের সংবাদ কলিকাতার কোন সংবাদ পত্রে পাঠ করেন। পূর্বরাত্রে তিনি গভীর ধ্যানে দর্শন করেন, ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। পরদিনে সংবাদপত্র না পাঠ করা পর্য্যন্ত এই দর্শনের প্রকৃত অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন নাই। বাঁকীপুরে যে ভাড়া বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন তাহাতে বর্তমানে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদে 'ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে' ছিলেন। রাত্রিতে ক্লাবের ঠাকুর-ঘরে ধ্যান করিবার সময় তিনি স্বামীজিকে দর্শন করেন। তিনি দেখিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের কোলে উপবিষ্ট। প্রথমতঃ এই দর্শনের অর্থ তাঁহার হৃদয়গত হয় নাই। পরদিবস বেলুড়মঠে স্বামীজির দেহত্যাগের সংবাদ তারে তাঁহার নিকট আসিল।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অনেক অলৌকিক অনুভূতি লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অতিশয় গম্ভীর ও অল্পভাষী ছিলেন বলিয়া কঠোর সাধনলব্ধ দর্শনাদির কথা বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ না হইলে কাহাকেও বলিতেন না। তাঁহার ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে কতকগুলি অনুভূতির বর্ণনা সংগৃহীত হইয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একবার তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের স্বামী ভূমানন্দের সঙ্গে কালীঘাটের মন্দিরে গমন করেন। কালীমন্দির মধ্যে দেবীমূর্তি দর্শনান্তে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময় তিনি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শনলাভ করেন। দেবীমূর্তি দর্শনমাত্র তাঁহার কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়া সহস্রারে উঠিয়া উহাকে দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত করিল। একবার তিনি পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরে জগন্নাথদেবের মূর্তি দর্শন ও আলিঙ্গন করিবার কালে দারুময় মূর্তিটী ননীর মত নরম অনুভূত হইয়াছিল। উক্ত অলৌকিক দর্শন বর্ণনার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি কেহ প্রকৃত ভক্তির সহিত কোন দেবস্থানে গমন করেন এবং সাংসারিক চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধভাবে মন্দিরস্থ মূর্তিকে দর্শন করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত হইবেন।' প্রয়াগধামে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ত্রিবেণী-দেবীকে পূত-সলিলোপরি দর্শন করেন। ত্রিবেণীতে স্নান করিবার সময় তিনি দেখেন, একটি সুন্দরী বালিকা জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার তিনটি বেণী মস্তক হইতে ঝুলিয়া জলের উপরে পড়িয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত দেবী ত্রিবেণী ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। এই দর্শনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'দর্শন প্রকৃত হইলে ধর্মভাব গভীরতর হয় এবং মনের আনন্দ ও শান্তি শতগুণে সমৃদ্ধ হয়। এত বৎসর পরে আমি যখন ত্রিবেণী দেবীর কুমারী মূর্তি স্মরণ করি তখনই আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হই।' স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দুদের সপ্ত মোক্ষতীর্থের অন্যতম এই কাশীধামে তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের গৃহনির্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে গিয়াছিলেন। কাশী ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে তিনি এক্কা গাড়ীতে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে যাইতেছিলেন। এক্কাটী যখন একটী মোড়ে রাস্তা পরিবর্তন করিতেছিল তখন উহা উল্টাইয়া যায় এবং স্বামিজীও গাড়ী হইতে পড়িয়া যান। তাঁহার একটী পা এক্কার চাকায় আটকাইয়া যায়। অতি কষ্টে তিনি চাকা হইতে পাটী টানিয়া বাহির

করেন এবং সেই গাড়ীতেই কোনও রকমে অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হন। ডাক্তারগণের চিকিৎসাসত্ত্বেও রাত্রিতে তাঁহার খুব জ্বর, গাত্রকম্পন এবং পায়ে ব্যথা হয়। বিনিদ্র রজনীর মধ্যভাগে অস্থিরভাবে যখন তিনি বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন তখন তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, 'বাবা বিশ্বনাথ! তোমার নিরুপদ্রব রাজ্যে ঠাকুরের কাজের জন্য এসে আমাকে এই কষ্ট পেতে হলো! আমার অসুখের জন্য আমি ভাবছি না। কিন্তু এতে প্রভুর কাজের ক্ষতি হ'বে। আমি আর কি করবো?'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নিদ্রিত হইলেন। রাত্রি একটা দুইটার সময় তিনি জটাজুটধারী সহাস্যবদন বিশ্বনাথের দর্শন পাইলেন। দেবমূর্তি স্বামিজীর দিকে করুণ নয়নে ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি কি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন! আমি এখন যেতে পারবো না। কারণ ঠাকুরের কাজের এখন অনেক বাকী আছে।' দেবমূর্তি স্বামিজীর সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। ইহাতে স্বামিজীর শরীর বরফের মত শীতল হইল এবং তিনি জ্বর ও গায়ের ব্যথা হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হইলেন। মৃদু মধুর হাস্য করিতে করিতে শিবঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। পরদিন প্রাতে স্বামিজী উঠিয়া দেখিলেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার পায়ের আহত স্থানটি পর্যন্ত সারিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি এবং অন্যান্য অনেক সাধু ও ভক্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উক্ত অলৌকিক দর্শন বর্ণনাকালে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যখন আমি এই অদ্ভুত দর্শন স্মরণ করি তখন আমি বাবা বিশ্বনাথের সৌম্য ও জটাজুটধারী দিব্য মূর্তি দেখিতে পাই। তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথা বলি এবং অসীম আনন্দ লাভ করি।'

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার কলিকাতার একটী আর্ট-ষ্টুডিও (ছবির দোকান) দেখিতে গিয়াছিলেন। দোকানে মহাদেবের দণ্ডায়মান মূর্তির একখানি ছবি টাঙ্গান ছিল। লম্বমান জটা ও দাড়িযুক্ত শিবের ছবিখানি দর্শনে স্বামিজী ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবাবেশে তিনি দেখিলেন, 'মহাদেব যেন তাঁহার

সঙ্গে কথা বলিতে চান।' স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহাদেবের উক্ত ছবিখানির কথা আজীবন মনে রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবকগণকে এইরূপ ছবি বাজার হইতে আনিবার জন্য কয়েকবার বলিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ ছবি পাওয়া যায় নাই।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ভগবান্ বুদ্ধদেবের যে দুইবার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে তিনি এইরূপে বলিয়াছিলেন। এই দর্শনদ্বয়ের একটী ঘটে সারনাথের মিউজিয়ামে; অপরটী পেগুর বৌদ্ধ মন্দিরে। ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশী গিয়াছিলেন। একদিন প্রাতে তিনি পদব্রজে সারনাথের মিউজিয়াম দেখিবার জন্য তথা হইতে গমন করেন। মিউজিয়ামের প্রদর্শক তাঁহাকে একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি দেখাইলেন। মূর্তির তলদেশে ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত সকল প্রধান ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। যখন তিনি একাগ্রমনে মূর্তিটী দর্শন করিতেছিলেন তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। তিনি মানস নেত্রে এক অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্র দেখিতে পাইলেন। একটী ক্ষুদ্র বিন্দুর মত তিনি সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে দিব্য জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলৌকিক দর্শনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া যন্ত্রবৎ তিনি প্রদর্শক কর্তৃক চালিত হইয়া মিউজিয়ামের চারিদিকে ঘুরিলেন, এবং বৈকালে ৪।৫ টার সময় পুনরায় পদব্রজেই কাশী আশ্রমে ফিরিলেন। উক্ত দর্শনের দিব্য ভাবে তিনি প্রায় তিন দিন আবিষ্ট ছিলেন। হলিউড বিবেকানন্দ হোমের স্বামী প্রভবানন্দ ও ভগ্নী ললিতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি উক্ত দর্শন এইভাবে বর্ণনা করেন।—'হঠাৎ আমার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত এবং চিত্তবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইল। একটী অসীম অপার জ্যোতিঃসমুদ্রে আমি নিমজ্জিত হইলাম। এই জ্যোতিঃ অনন্ত শান্তি, আনন্দ ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। আমার মনে হইল, আমি বুদ্ধময়; বুদ্ধ হইতে আমার পৃথক সত্তা নাই। আমি বলিতে পারি না, কত সময় আমি এইভাবে সমাহিত ছিলাম। প্রদর্শক আমাকে নিদ্রালু ভাবিয়া জাগাইবার চেষ্টা করাতে আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল।'

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েক দিনের জন্য রেঙ্গুনে গমন

করেন। রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে তিনি মোটরযোগে পেগুতে বুদ্ধদেবের বিরাট শায়িত মূর্তি দেখিতে যান। তাঁহার সঙ্গে যে সাধুগণ ছিলেন তাঁহারা প্যাগোডাস্থ বুদ্ধমূর্তি দর্শন করিয়া অবিলম্বে বাহিরে আসিলেন। কিন্তু, স্বামিজী মূর্তির সম্মুখে নির্বাক ও নিঃস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সঙ্গীগণ অনেকক্ষণ তাঁহার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি পুত্তলিকাবৎ স্থির রহিলেন, তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ভাবরাজ্য হইতে তাঁহার মন নামিয়া আসিলে তিনি প্যাগোডার বাহিরে যাইয়া মোটরে উঠিলেন। মোটর স্বামিজীকে লইয়া রেঙ্গুনের অভিমুখে ছুটিল। কিন্তু তিনি মোটরেও ভাবাবেশে নিশ্চল ও ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিলেন। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে সাধুগণ তাঁহাকে পেগু প্যাগোডাতে অলৌকিক অনুভূতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নীরব রহিলেন। পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামিজী বলিলেন, 'ভগবান্ বুদ্ধ কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের শায়িত মূর্তিতে বুদ্ধকে জ্যোতির্ময় জীবন্ত দেখিলাম। তাঁহার মনোহর দিব্য সৌন্দর্যের কী স্নিগ্ধ আভা!'

বেলুড় মঠের যে প্রকোষ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করিতেন এবং মহাসমাধিস্থ হন তথায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তদীয় জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার উপস্থিতি অনুভব করিতেন। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উক্ত ঘরে একটী অলৌকিক দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিবেকানন্দজীর ঘরের উত্তর পার্শ্বের ঘরে থাকিতেন। একরাত্রে তিনি নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বামীজির গৃহ আলোকে উদ্ভাসিত। তিনি ভাবিলেন, স্বামিজী হয়ত ছারপোকা মারিবার জন্য বা মশা তাড়াইবার জন্য আলো জ্বালিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঘরে ঢুকিবার পূর্বে স্বামিজীর ঘরে উঁকি মারিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। স্বামিজীর ঘরে তখন কোন ভৌতিক আলো ছিল না। ধ্যানমগ্ন স্বামিজীর দিব্য দেহ হইতে যে অভৌতিক, অপার্থিব আলোক বিকীর্ণ হইতেছিল তাহার আভায় গৃহটী আলোকিত হইয়াছিল!! গভীর সমাধিতে শিবোপম স্বামিজীর স্বরূপ প্রকটিত হওয়ায় তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বেলুড়ে এক বাগান-বাটীতে যখন মঠ অস্থায়ীভাবে ছিল

তখন এক বিজয়া দশমীর দিন স্বামিজীকে প্রণাম করিতে যাইয়া বিজ্ঞানানন্দজী স্বদেহে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রবেশের ন্যায় এক আঘাত অনুভব করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসীর কঠোর রুদ্রভাব স্বামী বিজ্ঞানানন্দে সর্বদাই পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার বজ্রবৎ কঠিন আবরণের মধ্যে কুসুমতুল্য কোমল অন্তঃকরণ লুক্কায়িত ছিল। সেইজন্য স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে কাবুলী আঙ্গুরের সহিত তুলনা করিতেন। কোমল কাবুলী আঙ্গুর যেমন তুলায় আবৃত হইয়া শক্ত কাঠের বাক্সে থাকে তেমনি শক্ত বহিরাবরণের মধ্যে বিজ্ঞানানন্দজীর কোমল হৃদয় বাস করিত। শাস্ত্রে আছে, সাধুগণ বজ্রাদপি কঠোর হইয়াও কুসুমাদপি কোমল হন। গুরুর ন্যায় তিনিও স্বীয় জীবনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ চিরকুমার ছিলেন এবং নারী-সংসর্গ আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাঁহার শিষ্যাগণকেও তিনি দীর্ঘ সময় স্বীয় সন্নিধানে থাকিতে দিতেন না। তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহাকে বেলুড় মঠে দেখিতে আসিলে তিনি মাতৃদর্শনে প্রথমতঃ অস্বীকৃত হন। পরে গুরুভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মঠস্থ উদ্যানের এক নিভৃত কোণে মায়ের সঙ্গে দুই চারিটী কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র জীবিতা সহোদরা এলাহাবাদ মঠে তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে মঠে রাত্রিবাস করিতে দেন নাই। এলাহাবাদ মঠের মধ্যে তিনি মেথরাণীকে পর্যন্ত যাইতে দিতেন না। মঠের জনৈক সন্ন্যাসীকে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে একবারও স্বপ্নে নারীদর্শন করেন নাই! ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে এইরূপ কামজিৎ হওয়া সম্ভব। দেহত্যাগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ সংজ্ঞা ছিল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ছিলেন এবং তাঁহার ধর্মপ্রসঙ্গগুলি অমৃতময় ও প্রাণস্পর্শী।

ছয়

সুরেশচন্দ্র দত্ত *

সুবলচন্দ্র মিত্রের 'বাঙ্গালা অভিধানে' সুরেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে আছে—"১৮৫০ খ্রীঃ কলিকাতা মহানগরীর হাটখোলা পল্লীর বিখ্যাত দত্তবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অমায়িক, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, স্বাবলম্বী ও সরল প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্যগণের মধ্যে একজন বিখ্যাত ভক্ত। 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি', 'সাধকসহচর', 'নারদসূত্র' (বা ভক্তিজিজ্ঞাসা) 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সমালোচনা', 'বেদ ও বাইবেল', 'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্ম সমাজ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত', 'কাজের লোক' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৌলিক উপদেশাবলী সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার তিনজন গৃহী শিষ্য—রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং সুরেশচন্দ্র দত্ত। মহেন্দ্র গুপ্তের 'কথামৃত' ইংরাজীতে, এবং হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। রাম দত্তের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' এখনও ভাষান্তরিত হয় নাই। সুরেশ দত্তের 'পরমহংসদেবের উপদেশ' এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক হিন্দীতে অনূদিত হইয়া বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেশ দত্তের মূল বাংলা পুস্তকের প্রথম ভাগ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের জীবিতকালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইবার পর সুরেশ দত্ত ঠাকুরের আরও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত পুস্তক ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। উক্ত সংস্করণে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও সন্নিবিষ্ট হয় এবং প্রত্যেক ভাগে একশত উপদেশ থাকে। উপদেশ-সংগ্রহে এবং পুস্তকপ্রকাশে ঠাকুরের গৃহী ভক্ত হরমোহন মিত্র তাঁহার

---

* উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫৫

বিশেষ সহায়ক ছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকটি এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উহাতে ঠাকুরের এক সহস্র উপদেশ ও আখ্যায়িকা আছে। এই পর্য্যন্ত পুস্তকখানির দশটি সংস্করণ হইয়াছে।

ঠাকুরের জীবনী ও বাণী এখন যত প্রচারিত হইয়াছে তখন তত প্রচারিত হয় নাই। এইজন্য সুরেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঠাকুরের অভূতপূর্ব জীবনী ও অমৃত বাণী প্রচারে সে যুগে অশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। সেই হেতু তাঁহার নামও বাংলার পাঠকসমাজে তখন সুপরিচিত ছিল।

সুরেশচন্দ্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাটখোলা পল্লীর বিখ্যাত দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২ বৎসর বয়সে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে গুরুপদে লীন হন।† কলিকাতার সেই অঞ্চলে তখন ঠাকুরের গৃহী ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় বাস করিতেন। সুরেশচন্দ্র এবং দুর্গাচরণ যৌবনের প্রারম্ভেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। সুরেশ দুর্গাচরণকে মামা বলিয়া ডাকিতেন। দুর্গাচরণ তখন হোমিওপ্যাথি পড়িতেন। তিনি ইংরেজী শিখিবার জন্য হিলে (Hiley) সাহেবের গ্রামার পড়িতেন। কিন্তু তিনি ইংরাজী শব্দগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। দুর্গাচরণ সুরেশের নিকট কিছুদিন ইংরেজী পড়িয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষার উপর সুরেশের বিশেষ দখল ছিল। প্রত্যেক সন্ধ্যায় সুরেশ দুর্গাচরণের বাসায় যাইয়া ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। সুরেশ ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এবং দুর্গাচরণ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। প্রত্যহ উভয়ে উত্তেজিত ভাবে ধর্মালোচনা করিতেন; কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না। সুরেশ শেষে বলিতেন, "মামা, রাখ তোমার শাস্ত্রমাস্ত্র, আমি ওসব মানি না।" তিনি দুর্গাচরণকে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও উপাসনাদিতে লইয়া যাইতেন। তিনি বলেন, 'বাল্যকাল হইতে দুর্গাচরণের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ ছিল।' ধর্মালোচনায় তৃপ্ত না হইয়া উভয়ে ধর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধর্মজীবনের প্রারম্ভেই গুরুগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন। সুরেশ ইতঃপূর্বেই কেশবের ব্রাহ্ম সমাজে পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছিলেন। এই

† ১৩১৯ সালের পৌষ-সংখ্যা 'উদ্বোধন' দ্রষ্টব্য।

সংবাদ পাইবার তুইমাস পরেই সুরেশচন্দ্র একদিন দুর্গাচরণকে বলিলেন, "দেখ মামা, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, চল দেখে আসি।" দুর্গাচরণ আর দেরী সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন, "চল, আজই যাই।" সেইদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বন্ধুদ্বয় দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহারা পূর্বে কখনও যান নাই। তখন চৈত্রমাস, প্রখর রৌদ্র। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরের পথও জানিতেন না। সেই জন্য গন্তব্য স্থল অতিক্রম করিয়া অনেক দূর চলিয়া যান, এবং পরে যথাস্থানে ফিরিয়া আসেন। প্রায় তুইটার সময় তাঁহারা কালীমন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরোদ্যানের সুন্দর দৃশ্য ও প্রশান্ত ভাব তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিল। তাঁহাদের মনে হইল, যেন তাঁহারা স্বর্গে আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠের পূর্ব বারান্দায় পৌঁছিলেন। তথায় উভয়ে প্রতাপচন্দ্র হাজরা নামক এক শ্মশ্রুবিশিষ্ট ভদ্রলোককে ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু প্রতাপ হাজরা বলিলেন যে, ঠাকুর সেদিন অন্যত্র গিয়াছেন। উক্ত মিথ্যা সংবাদ শ্রবণে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য হতাশ হইলেন। এমন সময়ে গৃহমধ্য হইতে একজন অঙ্গুলি নির্দেশে তাঁহাদিগকে ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। উভয়ে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার ছোট খাটটির উপরে সহাস্য বদনে উত্তর দিকে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। মেঝের উপর একটি মাতুর পাতা ছিল। সুরেশ ঠাকুরকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া উক্ত মাতুরে বসিলেন। ঠাকুর উভয়ের পরিচয় লইয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "পাঁকাল মাছের মত সংসারে থাক। পাঁকাল মাছ কাদার মধ্যে থাকিলেও তাহার গায়ে যেমন কাদা লাগে না তেমনি তোমরা সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে থাক।" সুরেশ ও দুর্গাচরণ ঠাকুরের এই উপদেশটি আক্ষরিক ভাবে সমগ্র জীবন পালন করিয়াছিলেন। কথাবার্তার পর ঠাকুর উভয়কে পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। তাঁহারা তদনুযায়ী পঞ্চবটীতে যাইয়া আধ ঘণ্টা ধ্যান করিবার পর ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাদিগকে মন্দির দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। ঠাকুর অগ্রে

চলিলেন এবং তাঁহারা পশ্চাতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে তাঁহারা ঠাকুরের গৃহসংলগ্ন দ্বাদশটি শিবমন্দির একটির পর একটি দেখিলেন। ঠাকুর প্রত্যেক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। ঠাকুর যেমনটি করিলেন, দুর্গাচরণ ঠিক তেমনটি করিলেন। কিন্তু সুরেশ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতেন না। সেইজন্য তিনি তদনুরূপ করিলেন না। এইরূপে তাঁহারা সকল শিবমন্দির দর্শনান্তে বিষ্ণুমন্দির ও সর্বশেষে কালীমন্দির দর্শন করিলেন। সুরেশ ও দুর্গাচরণ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, ঠাকুর কালীমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্রই ভাবাবিষ্ট হইলেন। অস্থির শিশু যেমন মায়ের আঁচল ধরিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে সেইরূপ ঠাকুর কালী ও শিবমন্দিরের বিগ্রহ প্রণামান্তে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিলেন। কালীমন্দির হইতে তাঁহারা প্রায় ৫ টার সময় ঠাকুরের ঘরে ফিরিলেন। সুরেশ ও দুর্গাচরণ গৃহে ফিরিবার জন্য বিদায় লইলেন। ঠাকুর তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আবার এসো। যদি কিছুদিন নিয়মিতভাবে যাতায়াত কর তাহা হইলে আমাদের পরিচয় গভীর হইবে।" সুরেশ পরবর্তী কালে বলিয়াছিলেন, প্রথম দর্শনে তিনি ঠাকুরের যে ভক্তি ও অসাধারণ ভাব দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে চিরতরে অঙ্কিত ছিল। সম্ভবতঃ ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে সুরেশ ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। কারণ, তৎসংগৃহীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ"এর প্রথম খণ্ড ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

এক সপ্তাহ পরে সুরেশ ও দুর্গাচরণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় বার দর্শন করেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে পুনরায় দেখিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন ও বলিলেন, "তোমরা আবার এসে খুব ভাল করেছ। আমি তোমাদের জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা কর্‌ছি।" সেদিনও ঠাকুর উভয়কে পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যানের পর ঠাকুর দুর্গাচরণকে তামাক সাজিতে আদেশ দিলেন; দুর্গাচরণ তামাক সাজিতে গেলে ঠাকুর সুরেশকে বলিলেন, "দেখ, লোকটী যেন জ্বলন্ত অগ্নি!" এইরূপে সুরেশ দুর্গাচরণের সঙ্গে ৮।৯ বার ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিনি অন্য কাহারও সঙ্গে বা একাকী নিশ্চয়ই ঠাকুরকে আরও

বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ ঠাকুরের সহস্র উপদেশ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তৎপরে তিনি সরকারী চাকুরী লইয়া কোয়েটাতে চলিয়া যান। এই দূরবর্তী স্থানে যাইবার পূর্বে দুর্গাচরণ ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে সুরেশকে অনুরোধ করেন। কিন্তু, সুরেশ তখন মন্ত্রে বা সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। সেইজন্য দুর্গাচরণের সহিত তাঁহার ঘোর তর্কবিতর্ক হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, সুরেশ ঠাকুরের উপদেশানুসারেই চলিবেন। পরদিন উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুরেশ স্বীয় দীক্ষার বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "দুর্গাচরণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে তাহা খুবই সত্য। যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণান্তর ধর্মসাধন করা উচিত। দুর্গাচরণ যেমন বলেছে তেমনি কর।" সুরেশ বলিলেন, "কিন্তু আমার ত মন্ত্রে বা ঈশ্বরীয় রূপে বিশ্বাস নাই।" তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা হ'লে তোমার এখন দীক্ষার দরকার নাই। পরে তুমি উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিবে এবং সময়ে দীক্ষালাভ করিবে।"

অদূর ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। কোয়েটায় কিছুকাল থাকিবার পর সুরেশ দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর বাগানবাটীতে গলরোগে শয্যাশায়ী। সুরেশ তথায় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতেই ঠারকু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ডাক্তার বন্ধু কোথায়? সেত ভাল চিকিৎসক শুনেছি। তাকে শীঘ্র এখানে একবার আস্‌তে বল্‌বে।" সুরেশ ঠাকুরের নির্দেশ মত দুর্গাচরণকে খবর দিলেন। বন্ধুর পরামর্শানুসারে পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ না করার জন্য সুরেশ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার অনুতাপানল আরও তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হইল। ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করিতে না পারিয়া তিনি মর্মাহত হইলেন। প্রত্যেক নিশীথে তিনি নির্জন গঙ্গাতীরে যাইয়া ঈশ্বরকে তাঁহার আকুল প্রার্থনা জানাইতেন। এক

রাত্রিতে দৃঢ় সংকল্প লইয়া তিনি গঙ্গাতীরে কয়েক ঘণ্টা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন। ভোর রাত্রে তিনি দেখিলেন, ঠাকুর গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। সুরেশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সুরেশ যেমন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে গেলেন, অমনি ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন।

এই ঘটনায় সুরেশ অন্তরে অনুভব করিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ঈশ্বরাবতার। তিনি ঠাকুরকে অবতারজ্ঞানেই পূজা ও ধ্যানাদি করিতেন। তিনি তাঁহার 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের উপদেশ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়াবস্থায় লোকে সকল সময়েই তাঁহার ভিতর অলৌকিক ঐশী শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছে। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া দূরদূরান্তরের ঘটনা দেখিতেন ও যথাযথ বলিতেন, এবং মানুষের মনের কথা ও ভাব বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার দিব্য স্পর্শের অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে ভক্তগণের ভ্রূযুগলের মধ্যে দ্বিদলপদ্ম প্রস্ফুটিত হইত এবং তন্মধ্যে কালী, রাধা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দিব্য জ্যোতির্ময় দেবমূর্তির দর্শন ও এক নব শক্তির সঞ্চার ও হৃদয়ে ভগবৎ-নামের স্ফুরণ হইত।" নিশ্চয়ই সুরেশ ইহা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি হইতে লিখিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, বর্দ্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিত সুধীবর পদ্মলোচন, ইদেশবাসী ভক্তপ্রবর মহাপ্রাজ্ঞ গৌরীপণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত সাধু-পুরুষ আসিয়া সেই সময় তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্তব করেন। পরমহংসদেব নিজমুখেও আপন অবতারত্ব সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'যেমন রাজারা সময় সময় স্বীয় রাজ্যমধ্যে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করেন অথচ কেহ তাঁহাদের চিনিতে পারে না, এবারে আমিও সেইরূপ ছদ্মবেশে আসিয়াছি ; এবারে আমায় সকলে চিনিতে পারিবে না।' তিনি বলিতেন, 'অবতার তাঁর কর্মচারী ; কিন্তু এবারে তিনি খোদ এসেছেন।' তিনি আরও বলিতেন, 'আমাকে বকলমা দাও!' ভগবান ভিন্ন একথা কোন্ মনুষ্য বলিতে পারে? তিনি কাহাকেও বলিয়াছিলেন, 'প্রাতঃকালে আমার মন জগৎ ব্যাপিয়া থাকে। অতএব সে সময় আমাকে স্মরণ করিও।'" তিনি তাঁহার

ভক্তদের বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের কোন সাধন-ভজন করিতে হইবে না। আমাতে যদি তোমাদের ষোল আনা বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সব হইবে।' দিবারাত্র অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার সমাধি হইত। তদবস্থায় তাহার নয়ন পলকশূন্য, উভয় নেত্র প্রেমধারাপূর্ণ, মুখ সুমধুরহাসিময়, সর্বাঙ্গ প্রস্তরের ন্যায় স্পন্দহীন ও বাহ্যচৈতন্যশূন্য হইয়া যাইত। কাণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ওঁকার শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইত।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ করিবার পূর্বে সুরেশ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং উহার সাধন-প্রণালী অনুসরণ করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, অমায়িকতা, বন্ধুপ্রীতি ও নিঃস্বার্থ সেবার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার আবাল্য সখা ও ঘনিষ্ঠ সহচর সাধু দুর্গাচরণ নাগ তাঁহার এক বন্ধুকে একবার বলিয়াছিলেন যে, সুরেশের চরিত্রের মত নির্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তিনি খুব অল্প লোকেরই দেখিয়াছেন। এমন কি, অসহায় অবস্থায়ও সুরেশকে আত্মসম্মান ও বংশমর্যাদা রক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে! কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ যদি সন্ন্যাসের আদর্শ হয় তাহা হইলে সুরেশ নিশ্চয়ই প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন। ঠাকুরের পূত সংস্পর্শ তাঁহাকে ঈশ্বরলাভের জন্য এত পাগল করিয়াছিল যে, মাঝে মাঝে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া নির্জনে যাইয়া তিনি সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করিতেন। কর্মহীন অবস্থায় তিনি যখন পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে অক্ষম হইতেন এবং আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতেন তখনও তাঁহাকে প্রশান্ত ও প্রফুল্ল দেখা যাইত। তিনি এত ঈশ্বরবিশ্বাসী, অনাসক্ত ও নিরভিমান ছিলেন যে, কাহারও সমালোচনায় বা কটাক্ষে বিচলিত হইতেন না।

একটি ঘটনা হইতে বুঝা যায়, সুরেশ কতদূর ন্যায়বান ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ কাবুল যুদ্ধের সময় তিনি মিলিটারী বিভাগে দুইশত টাকা মাসিক বেতনে চাকরী লইয়া কোয়েটাতে যান। তখন ভারত সরকার যুদ্ধের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বিভাগীয় কোন অফিসার কোন বিল উপরওয়ালার কাছে পাঠাইলেই তাহা মঞ্জুর হইত। ব্যয় অসত্য, কি অধিক, কি অতিরিক্ত—ইহা

দেখিবার বা ভাবিবার অবসর বা ইচ্ছা অধিকাংশ অফিসারেরই ছিল না। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুরেশের উর্ধতন কর্মচারী একটী মিথ্যা বিল পাশ করাইয়া প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভাবী বিপদের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সুরেশকে উক্ত অর্থের এক তৃতীয়াংশ ঘুষ দিবার প্রস্তাব করেন। সত্যনিষ্ঠ সুরেশ এই অর্থ গ্রহণ করিতে শুধু যে অস্বীকার করিলেন তাহা নহে, ভবিষ্যৎ প্রলোভন এড়াইবার জন্য চাকুরীও ত্যাগ করিলেন। তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারী এই পরোক্ষ অপমানে লজ্জিত হইয়া সুরেশকে যুদ্ধবিভাগের কঠোর নিয়মানুসারে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেন। তিনি সুরেশকে আটক রাখিয়া পূর্ববৎ নিজের অধীনে জোর করিয়া কাজ করাইলেন। এই কষ্টকর ও অসহায় অবস্থায় সুরেশের কিছুকাল কাটিল। উক্ত বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন জনৈক সদয় ইংরেজ। সুরেশ তাঁহাকে ভালরূপে জানিতেন। তিনি মেডিক্যাল অফিসারকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং পদত্যাগের জন্য সার্টিফিকেট দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার সুরেশের ন্যায়পরায়ণতা ও লোভহীনতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধবিভাগের চাকুরীর অনুপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট দিলেন। এই সার্টিফিকেট দ্বারা সুরেশ পদত্যাগের অনুমতি পাইলেন। কিন্তু তাঁহার স্থানে আর একজন না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে উক্তপদে কার্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্থানে অন্য লোক আসিতেই সুরেশ কোয়েটা ত্যাগ করিয়া কাশী অভিমুখে রওনা হইলেন।

সুরেশ যখন চাকুরী ছাড়িলেন তখন তাঁহার হাতে মাত্র বিশ টাকা ছিল। কাশী আসিবার কয়েক দিনের মধ্যেই এই সামান্য অর্থ নিঃশেষিত হইল। রিক্ত হস্তে সুরেশ পদব্রজে কলিকাতার দিকে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘ পথ চলার অভ্যাস না থাকায় চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইলেই তিনি তাঁহার নিত্যসঙ্গী 'গীতা' খানি পাঠ করিতেন। পথে ক্ষুধিত হইয়াও তিনি আহার ভিক্ষা করিতেন না। অযাচিতভাবে গ্রামবাসীরা যাহা দিত তাহাই সানন্দে গ্রহণ করিয়া উদরপূর্তি করিতেন। এইরূপে তিনি ভাগলপুর পর্যন্ত আসিলেন। তথায় কোন দয়ালু ভদ্রলোক তাঁহাকে কলিকাতা পর্যন্ত ট্রেণে আসিবার জন্য একখানি

টিকিট কিনিয়া দিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি সংসার-প্রতিপালনের ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহার নিজের চাকুরী নাই; ভ্রাতা মাত্র ২৫ৎ টাকা বেতনে চাকুরী করেন। তাঁহার উপর স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভারই বা কিরূপে দেন? সুরেশের স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যা ছিল। তিনি উক্ত সমস্যা সমাধানের এই উপায় অবলম্বন করিলেন। সুরেশ কয়েকটী টাকা সংগ্রহপূর্বক পরিহিত বস্ত্রের খুঁটে বাঁধিয়া কলিকাতায় বড়বাজারের আলুপোস্তায় গেলেন। তিনি আধ মণ আলু কিনিয়া একটী কুলির মাথার চাপাইয়া উল্টাডিঙ্গি পুল পর্যন্ত চলিলেন ও তথায় কুলিটীকে বিদায় দিয়া নিজের পরিহিত কাপড় ও কোট পুঁটলি বাঁধিয়া বস্তার মধ্যে লুকাইয়া আলুর বস্তাটী মাথায় করিয়া রাস্তায় আলু ফেরি করিতে লাগিলেন। শাকসবজি-বিক্রেতার ন্যায় দ্বারে দ্বারে আলু বিক্রয় করিয়া তিনি রোজ সাত আট আনা মাত্র উপার্জন করিতেন। তদ্দারা তাঁহার ও পরিবারবর্গের অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ হইত। এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিল. তিনি সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। সামান্য চেষ্টার ফলে বাট টাকা বেতনে একটী চাকুরী পাইলেন। তিনি ধর্ম-সাধনার জন্য কয়েকবার চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু সংসার প্রতিপালনের জন্য আবার তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকুরী লইতে হইল। তিনি মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং ঐহিক অভ্যুদয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। লোকলোচনের অন্তরালে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনপূর্বক তিনি আদর্শ গৃহস্থের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল সুরেশ দত্তের অনাড়ম্বর অনাবিল জীবন। তাঁহার বন্ধু ও গুরুভ্রাতা দুর্গাচরণের ন্যায় তিনি সংসারের মধ্যে বাস করিলেও সংসার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এরূপ গুরুগতপ্রাণ সাধনাপ্রিয় জীবন জগতে দুর্লভ। স্পর্শমণি যাহা স্পর্শ করে তাহাই সোনা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারাই দেবতুল্য হইয়াছেন।

সাত
স্বামী প্রেমানন্দ

"রাধাভাবপ্রমত্তায় প্রেমোজ্জলমনস্বিনে।
ভক্তানাঞ্চ বরিষ্ঠায় প্রেমানন্দায় তে নমঃ ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার যে ছয়জন শিষ্যকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিতেন স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ঈশ্বরকোটীগণ অবতারতুল্য শক্তিশালী ও নিত্যমুক্ত। অবতারের পার্ষদরূপেই জগদ্ধিতায় তাঁহাদের দেহধারণ। ঠাকুর বলিতেন, 'শ্রীমতীর অংশে বাবুরামেরর জন্ম।' তিনি তাঁহার এই ঈশ্বরকোটী শিষ্যকে তাঁহার 'দরদী' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। স্বামী প্রেমানন্দের নাম সার্থক হইয়াছিল। তিনি প্রেমের প্রাণবন্ত প্রতিমা ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে ও কার্য্যে প্রেম প্রকাশিত হইত। যে তাঁহাকে একবার দেখিত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। যে তাঁহার সঙ্গে একবার মিশিত সেই মুগ্ধ ও ধন্য হইত।

হুগলী জেলার অন্তর্গত আঁটপুর একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। প্রাচীন কাল হইতেই ইহা শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধ ছিল। উক্তগ্রামে ঘোষবংশজ ও মিত্রবংশজ কায়স্থগণের সমধিক প্রতিপত্তি ছিল। পূর্বোক্ত বংশের তারাপ্রসাদ ঘোষ শেষোক্ত বংশের অভয়চন্দ্র মিত্রের কন্যা দিব্যগুণশালিনী মাতঙ্গিনী দেবীর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইঁহাদের কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী কন্যা এবং তুলসীরাম, বাবুরাম ও শান্তিরাম নামক তিনটী পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যম পুত্র বাবুরামই উত্তর কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী প্রেমানন্দ নামে সুপ্রসিদ্ধ হন, এবং অসামান্য রূপগুণশালিনী একমাত্র কন্যা কৃষ্ণভাবিনী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় পার্ষদ বলরাম বসুর সহিত পরিণীতা হন। বাবুরামের মাতাপিতা ধনী হইয়াও ধার্মিক ছিলেন এবং গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণজীর নিত্য সেবাপূজা লইয়া পরম শান্তিতে

কালাতিপাত করিতেন। বাবুরামের মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং ভগ্নীপতি বলরাম ঠাকুরের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। বলরামের বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুর ভক্তদের সহিত মিলিতেন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বলরামকে স্বীয় অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে বুঝিয়াছিলেন। বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বলরাম ভদ্রকের নিকটবর্তী কোঠার গ্রামে স্বীয় জমিদারীতে থাকিয়া শ্যামচাঁদ বিগ্রহের পূজা সেবায় ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠে দীর্ঘকাল নিরত ছিলেন।

বাবুরাম ১৮৬১ খ্রীঃ অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী তিথিতে আঁটপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মের সংসারে জন্মিয়া বাবুরাম শৈশব হইতেই ধর্মভাবপ্রবণ ছিলেন। যখন তিনি কয়েক বৎসরের শিশু তখন যদি কেহ তাঁহাকে বিয়ের কথা বলিতেন তিনি বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করিতেন, 'ওগো, আমার বিয়ে দিও না, দিওনা। তাহলে আমি মরে যাবো, মরে যাবো।' আট বৎসর বয়সে শিশু বাবুরাম ভাবিতেন, ভবিষ্যতে তিনি একটী সাধুর কাছে ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরে বাস করিবেন, এবং সেই কুটীরের চারিদিকে সারি সারি গাছ থাকিবে। তাঁহার শৈশবের স্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে সফল হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে সাধু দেখিলেই বালক বাবুরাম আন্তরিক টানে ছুটিয়া যাইতেন। সুদর্শন ও গৌরাঙ্গ বালককে পাইলে সাধুগণও সস্নেহে তাঁহার সহিত আলাপাদি করিতেন। গ্রামের পাঠশালায় পড়া শেষ হইলে বাবুরামকে স্কুলে পড়াইবার জন্য কলিকাতায় আনা হইল। কলিকাতার কম্বুলিয়াটোলা নামক পল্লীতে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহারা থাকিতেন। কিছুকাল আর্য্য স্কুলে পড়িবার পর তিনি শ্যামপুকুরস্থিত মেট্রো-পলিটান স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র অমর লেখক ও পরম ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম। শ্রীম ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন। রাখালচন্দ্র ঘোষ উক্ত বিদ্যালয়ে বাবুরামের সহপাঠী ছিলেন। ইনিই পরে রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে সুপরিচিত হন। স্কুলে রাখালের সহিত বাবুরামের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। উভয়ের সৌহার্দ্য শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে এবং সন্ন্যাসীজীবনে আরও গভীর ও গাঢ় হইয়া আমরণ স্থায়ী হইয়াছিল। রাখাল ইতোমধ্যেই ঠাকুরের সংস্পর্শে

আসিয়াছিলেন। শ্রীম এবং রাখালের নিকট হইতে ঠাকুরের দিব্য ভাবাবেশের কথা শুনিয়া বাবুরাম তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন।

একদা জোড়াসাঁকো হরিসভায় ঠাকুর ভাগবত পাঠ শুনিতে গিয়াছিলেন। বাবুরাম সম্ভবতঃ মাতাপিতার সঙ্গে তথায় যাইয়া ঠাকুরকে একবার দেখিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত দর্শনের স্মৃতি তাঁহার মনে স্পষ্ট ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুলশীরামের কাছে বাবুরাম ঠাকুরের কথা শুনিয়াছিলেন। তুলশীরাম বাবুরামকে বলিয়াছিলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে একটী সাধু আছেন। ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে তাঁহার প্রেমাশ্রু ঝরে এবং বাহ্য জ্ঞান লোপ পায়। তুমি তাঁহাকে দেখিতে যাইবে কি?' বাবুরাম আন্তরিক সম্মতি জানাইলেন। পর দিবস বাবুরাম রাখালের নিকট দক্ষিণেশ্বরের সাধুর খবর লইলেন। পরামর্শান্তে স্থির হইল, পরবর্তী শনিবারে উভয়ে স্কুলের ছুটীর পর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাইবেন। নির্দিষ্ট দিবসে বাবুরাম ও রাখাল আহিরীটোলা হইতে একটী নৌকায় উঠিলেন। পথে রামদয়াল চক্রবর্তী তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। রামদয়াল বাবু পূর্ব হইতেই ঠাকুরের নিকট যাইতেন। রাখাল পথে বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাধুর নিকট তোমার রাত্রিবাসের ইচ্ছা আছে কি?' কুটীরবাসী সাধুর নিকট যাইতেছেন ভাবিয়া বাবুরাম বলিলেন, 'থাকিবার সুবিধা হইবে কি?' রাখাল উত্তর দিলেন, 'হইতে পারে।' তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাত্রে আমরা খাবো কি?' রাখাল জবাব দিলেন, 'একটা ব্যবস্থা করা যাবে।' শনিবার সন্ধ্যায় তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন। ঠাকুরের ঘরে গিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তথায় নাই। রাখাল ঠাকুরকে কালীমন্দির হইতে ডাকিয়া আনিলেন। রামদয়াল বাবু ঠাকুরকে বাবুরামের পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা! তুমি বলরামের আত্মীয়!! তবে তুমি আমাদের আত্মীয় গো!!! তোমার জন্মস্থান কোথায়?' বাবুরাম—আজ্ঞে, আঁটপুর। ঠাকুর—আচ্ছা, তাহলে আমি ওখানে গেছি। ঝামাপুকুরের কালী ও ভুলুর বাড়ীও আঁটপুরে। তাই না? বাবুরাম—হাঁ, আপনি তাঁদের কিরূপে জানিলেন? ঠাকুর—কেন, তারা রামপ্রসাদ মিত্রের ছেলে। আমি যখন ঝামাপুকুরে ছিলাম

তখন প্রায়ই তাদের বাড়ীতে এবং দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে যেতাম।” ঠাকুরকে প্রথম দর্শনের কথা স্বামী প্রেমানন্দ স্বামী সারদানন্দকে * নিম্নোক্ত ভাবে বলিয়াছিলেন।—

“স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত হাটখোলার ঘাটে নৌকায় উঠিতে যাইয়া ঐদিন রামদয়াল বাবুকে তথায় দেখিতে পাইলাম। তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন জানিয়া আমরা একত্রেই এক নৌকায় উঠিলাম এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় রাণী রাসমণির কালীবাটীতে পৌছিলাম। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি মন্দিরে ৺জগদম্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধরিয়া ‘এখানটায় সিঁড়ি উঠিতে হইবে,’ ‘এখানটায় নামিতে হইবে’ ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতোপূর্বেই তাঁহার ভাববিভোর হইয়া বাহ্যসংজ্ঞা হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এজন্য ঠাকুরকে এখন ঐরূপে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তাপোষ-খানির উপর উপবেশন করিলেম এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসাপূর্বক আমার মুখ ও হস্তপদাদির লক্ষণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আমার হাতখানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুক্ষণ নিজ হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, “বেশ।” ঐরূপে কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। উহার পরে রামদয়াল বাবুকে নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, ‘সে অনেকদিন এখানে আসে নাই। তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, একবার আসিতে বলিও।’

“ধর্মবিষয় নানা কথাবার্তায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে

* তাঁহার ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’ (ঠাকুরের দিব্য ভাব ও নরেন্দ্রনাথ) ১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকে, উঠানের উত্তরে যে বারান্দা আছে তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য ঘরের ভিতরেই শয্যা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টা কাল অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের ন্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়াল বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো ঘুমুলে?' আমরা উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'আজ্ঞে, না।' উহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা নিংড়াইবার মত জোরে মোচড় দিচ্চে; তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো। সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাক্‌তে পারি না।' রামদয়াল বাবু কিছুকাল পূর্ব হইতেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেছিলেন। সেজন্য ঠাকুরের বালক স্বভাবের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ঠাকুরের ঐরূপ বালকবৎ আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন এবং রাত্রি পোহাইলেই নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিবেন, ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র প্রশমন হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অসুবিধা হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও, পরক্ষণেই ঐকথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকটে পুনরায় আগমনপূর্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাঁহাকে না দেখিয়া তাহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহার কি অদ্ভুত ভালবাসা এবং যাহার জন্য ইনি এরূপ করিতেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর! সেই রাত্রি ঐরূপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল। পরে রজনী প্রভাত হইলে মন্দিরে যাইয়া ৺জগদম্বাকে দর্শন করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্বক আমরা কলিকাতায় ফিরিয়াছিলাম।" রবিবার প্রাতে গৃহে ফিরিবার পূর্বে ঠাকুরের নির্দেশে বাবুরাম পঞ্চবটী দেখিতে গেলেন। উক্ত সিদ্ধপীঠের দিকে

অগ্রসর হইবার কালে তাঁহার মনে এই অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল যে, স্থানটী পরিচিত ও পূর্বদৃষ্ট। শৈশবে ত তিনি এইরূপ একটী স্থানের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তবে কি তিনি ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস শৈশবেই পাইয়াছিলেন? ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সত্যই বলিয়াছেন, শৈশবে ভবিষ্যৎ জীবন প্রতিবিম্বিত হয়। মনোভাব গোপন করিয়া বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ফিরিলেন। 'পঞ্চবটী কেমন লাগিল?' ঠাকুরের এই প্রশ্নের উত্তরে বাবুরাম কেবল বলিলেন, 'ভালই'। ঠাকুর তখন তাঁহাকে বলিলেন কালীমাতাকে দর্শন করিতে। কালী-মন্দির দর্শনান্তে বাবুরাম বিদায় লইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পুনরায় আসিবার জন্য সস্নেহে বলিলেন।

ঠাকুরকে দর্শন করিয়া বাবুরামের মনে গভীর পরিবর্তন আসিল; তিনি ভাবিলেন, ঠাকুর অসাধারণ ব্যক্তি এবং নরেনকে অতিশয় ভালবাসেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, নরেন তাঁহার কাছে যায় না। পরবর্তী রবিবার সকাল আটটার সময় বাবুরাম দ্বিতীয় বার দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তিনি যাইয়া দেখেন, ঠাকুরের কাছে কয়েকটী ভক্ত উপবিষ্ট। ঠাকুর তাঁহাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ। পঞ্চবটীতে যাও, ওখানে ছেলেরা 'চড়ুইভাতি' করছে। নরেন এসেছে, তার সঙ্গে কথা বল।' বাবুরাম পঞ্চ-বটীতে যাইয়া দেখেন, রাখাল তন্মধ্যে উপবিষ্ট। রাখাল বাবুরামকে নরেন্দ্র প্রমুখ তরুণ ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রকে প্রথমে দেখিয়াই বাবুরাম তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। নরেন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলিতে ছিলেন। কথাবার্তা শেষ হইলে নরেন একটী গান ধরিলেন। তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে বাবুরাম মুগ্ধ হইলেন। রুদ্ধ শ্বাসে তিনি গানটী শুনিতে শুনিতে ভাবিলেন, নরেনের কি বহুমুখী প্রতিভা! এইরূপে বাবুরাম অন্যান্য গুরুভ্রাতাদিগের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইলেন। তিনি তখন হইতে ঠাকুরের নিকট ঘন ঘন যাইতে লাগিলেন। অধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ কমিল এবং ধর্মজীবনের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা বাড়িল। ঠাকুরের পূত সঙ্গে কিছুকাল থকিয়াই বাবুরাম বুঝিলেন, ঠাকুর কে এবং ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধই বা কি? তিনি জানিলেন

যে, ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ শুধু এই জীবনের নহে ; পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতেই ঠাকুরের সহিত তাঁহার গভীর সম্পর্ক। তিনি ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন।

বাবুরামের বয়স যখন বিশ বৎসর তখন তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেন। সুতরাং প্রথম দর্শন হয় সম্ভবতঃ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁহার বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর অল্পবয়স্ক দেখাইত। তাঁহার মত সুন্দর সৌম্য মূর্তি বিরল। পৃথিবীর ধূলি তাঁহার মনকে মলিন করিতে পারে নাই। রিপুর তাড়নায় মানুষ যে সকল অসৎ কর্ম করে, সেই সকল বিষয়ে তিনি শিশুর মত আজীবন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এমন সরলতা, এমন সৌন্দর্য্য, এমন পবিত্রতা জগতে দুর্লভ। ঠাকুর তাঁহার ভাব-সংশুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি একদিন বাবুরামকে ধ্যানে দেখিলেন গলে হার শোভিতা দেবী রূপে। ঠাকুর বলিতেন, 'এ নূতন পাত্র। ইহাতে দুধ রাখিলে দই হইবার আশঙ্কা নাই।' তিনি আরও বলিতেন, 'বাবুরামের হাড় পর্য্যন্ত শুদ্ধ। একটী অসৎ চিন্তাও তাঁহার নিত্যশুদ্ধ মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।' কখনও কখনও তিনি বাবুরামকে রত্নপেটির সহিত তুলনা করিতেন। তাঁহার দিব্য পবিত্রতার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে কাছে রাখিতে ইচ্ছা করেন। রাখাল এবং লাটু দীর্ঘকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও ঠাকুরের কাছে সর্বদা থাকিতে পারিতেন না। আবার ভাবাবেশ কালে সকলের স্পর্শও ঠাকুরের সহ্য হইত না। সেইজন্য তিনি একদিন বাবুরামকে বলিলেন, 'এই অবস্থায় আমি সকলের স্পর্শ সহ্য করিতে পারি না তুই এখানে থাক্‌লে ভাল হয়।' তখন হইতে বাবুরাম মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে থাকিতেন। কিন্তু বাড়ীর ভয়ে তিনি স্থায়ী ভাবে থাকিতে সাহস করেন নাই।

ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বাবুরামের মন অন্তর্মুখী হইল। তিনি আর লেখাপড়ায় পূর্ববৎ মনোযোগ দিতে পারিলেন না। ১৮৮৩ বা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। এই সংবাদ পাইয়া ঠাকুর বলিলেন, 'ভালই হ'ল। তার বন্ধন ছিন্ন হ'ল।

পাশ ত' নয়, পাশ (বন্ধন) !' ঠাকুরের মন্তব্য শুনিয়া বাবুরাম নিশ্চিন্ত হইলেন। অধ্যয়নে বাবুরামের অমনোযোগিতা ঠাকুর পূর্ব হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একদিন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সমক্ষে ঠাকুর বাবুরামের মন পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন, 'তোর বইটই কোথায়? তোর কি আর পড়াশোনা করবার ইচ্ছা নেই?' শ্রীম'র দিকে তাকাইয়া ঠাকুর আবার বলিলেন, 'ও দুই দিক রাখতে চায়। তা' বড় শক্ত। এই সামান্য বিদ্যায় কি হয়। দেখ, এত বড় জ্ঞানী বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অধীর। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রামকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম উত্তর দিলেন, 'ভাই এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে। তুমি উভয়ের পারে যাও।' ঠাকুরের কথা শুনিয়া বাবুরাম সহাস্যে বলিলেন, 'আমি ইহাই চাই।' ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, 'বেশ। কিন্তু দুদিক রাখলে তা কি সম্ভব? যদি তুমি তা' চাও তবে এখানে চলে এস।' বাবুরাম তখন হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'আপনি টেনে আনুন।' তখন ঠাকুর বলিলেন, 'তোর মনটা দুর্বল। তোর সাহস নেই। দেখ তো, ছোট নরেন কেমন বলে, আমি এখানে থাকব, আর বাড়ী যাব না।' বাবুরামকে স্থায়ীভাবে কাছে রাখিবার ইচ্ছা ঠাকুরের অনতিবিলম্বে পূর্ণ হইল। শুদ্ধচিত্ত পুরুষের শুভেচ্ছা দীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকে না। ইতঃমধ্যে বাবুরামের মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী ঠাকুরের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একদিন আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার এই ছেলেটী আমাকে দাও।' হেমাঙ্গিনী বলিলেন, 'বাবা, বাবুরাম আপনার কাছে থাকবে সে ত সৌভাগ্যের কথা। আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন আমার ভক্তি লাভ হয় এবং সন্তান-শোক সহিতে না হয়।' তাঁহার সদিচ্ছা ঠাকুরের কৃপায় পূর্ণ হইয়াছিল। এখন হইতে বাবুরাম সর্বদা ঠাকুরের কাছে থাকিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের দিব্য জীবনের স্পর্শে বাবুরামের জীবনও আধ্যাত্মিকতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অগ্নির সান্নিধ্যে কেহই অনুত্তপ্ত থাকিতে পারে না। এক রাত্রিতে বাবুরাম ঠাকুরের ঘরে শুইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ঠাকুরের পদশব্দে জাগ্রত হইলেন। চোখ মেলিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভাবাবেশে বগলে

স্বীয় পরিহিত কাপড়টি গুঁজিয়া পায়চারী করিতেছেন। গভীর ঘৃণার ভাব তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বারবার বলিতেছিলেন, 'মা, আমায় নাম-যশ দিও না। মা, আমায় নাম-যশ দিও না। আমি ওসব চাই না।' বাবুরামের মনে হইল, জগন্মাতা যেন নাম-যশের থলি হাতে করিয়া ঠাকুরকে দিতে চাইতেছিলেন, আর ঠাকুর তাহা লইতে অস্বীকার করিতেছিলেন। এই ঘটনাটী বাবুরামের মনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি নাম-যশকে আজীবন ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের অসীম স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া বেলুড় মঠের তরুণ সাধুদিগকে বলিতেন, 'আমি তোদের ভালবাসি কই? যদি তোদের প্রাণভরে ভালবাসতাম, তোরা চিরতরে আমার স্নেহে আবদ্ধ হতিস্। আহা! আমাদের প্রতি ঠাকুরের কি গভীর ভালবাসা ছিল। সেই ভালবাসার এক শতাংশও তোদের প্রতি আমাদের নেই। রাত্রে ঠাকুরকে হাওয়া করতে করতে যখন ঘুমিয়ে পড়তাম, তখন তিনি তাঁর মশারীর ভিতর আমাকে টেনে নিতেন এবং নিজের মশারীর ভিতর শোয়াতেন। 'আপনার বিছানায় আমার শোয়া উচিত নয়'—এই বলে আপত্তি করলে তিনি উত্তর দিতেন, 'ওরে বাইরে মশা কামড়াবে যে! দরকার হলে আমি তোকে জাগাব।' ঠাকুর কলিকাতায় আসিলে বাবুরামের সহিত দেখা করিতেন এবং কালীবাড়ী হইতে আনীত মিষ্টি নিজহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইতেন। দক্ষিণেশ্বরে বাবুরাম কয়েকদিন না আসিলে জননীর ন্যায় স্নেহের আতিশয্যে ঠাকুর কাঁদিতেন। ঠাকুরের পূত সঙ্গে এবং পরম স্নেহে বাবুরামের ধর্মজীবন দ্রুতগতিতে উন্নত হইতে লাগিল। আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। ভক্তিমূলক সঙ্গীত শুনিলে তাঁহার কোন কোন গুরুভ্রাতার ভাবসমাধি হইত। ইহা দেখিয়া বাবুরাম উক্তপ্রকার অনুভূতি লাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং ঠাকুরকে অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহার অনুরোধে ঠাকুর জগন্মাতাকে বাবুরামের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু জগন্মাতা বলিলেন, 'বাবুরামের জ্ঞান হবে, ভাব হবে না।' ইহাতে ঠাকুর আনন্দিত হইলেন।

প্রতাপচন্দ্র হাজরা নামক এক ব্যক্তি কালীবাড়ীতে থাকিতেন। তিনি বাবুরামপ্রমুখ যুবক শিষ্যদের একদিন পরামর্শ দিলেন, 'তোরা ঠাকুরের কাছে কোন বিশেষ শক্তির জন্য প্রার্থনা কর'। কথাগুলি অদূরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণ-গোচর হইল। তিনি এই কুপরামর্শে হাজরার দুরভিসন্ধি বুঝিলেন এবং বাবুরামকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আমার কাছে কি চাইতে পারিস্? আমার যা কিছু আছে তা কি তোদের নয়? হাঁ, আমি যে সব আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করেছি, সে সব তোদেরই জন্য। সুতরাং চাওয়ার ভাব ছেড়ে দে। চাওয়ার ভাব থাকলে আমার ও তোদের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হবে। বরং আমার সঙ্গে তোদের আত্মীয়তা অনুভব করে সেই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হও।' এইরূপে শত প্রকারে ঠাকুর তাঁহার শিষ্যদিগের জীবন নির্মল ও নিঃস্বার্থ করিয়া তোলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ১৮৮৬ খ্রীঃ বড়দিনের সময় নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ গুরুভ্রাতাগণ বাবুরামের জন্মস্থান আঁটপুরে যাইয়া কয়েকদিন অবস্থান ও সাধনভজন করেন। তথায় বড়দিনের পূর্ব সন্ধ্যায় সকলে ধুনী জ্বালিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ এবং সংঘবদ্ধভাবে ঠাকুরের বাণী প্রচারের সংকল্প করেন। বরাহনগর মঠে ফিরিয়া তাঁহারা বিরজা হোম সমাপনান্তে বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ঠাকুর বলিতেন, 'শ্রীরাধার অংশে বাবুরামের জন্ম।' ইহা স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'প্রেমানন্দ' নাম প্রদান করেন। সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের সহিত স্বামী প্রেমানন্দ বরাহনগর, আলমবাজার ও বেলুড় মঠে প্রায়ই বাস করিতেন। আলমবাজার মঠে অবস্থান কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে যাইবার পর তিনি মঠে ঠাকুরপূজার ভার গ্রহণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড় মঠে বাস করিতে লাগিলেন। নূতন মঠে স্বামিজী এই নিয়ম করিলেন যে, কেহ দিবানিদ্রা যাইতে পারিবে না। একদিন বাবুরাম মহারাজ মঠের কাজকর্মে ক্লান্ত হইয়া দুপুরে পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বামিজীর এক শিষ্য আসিয়া গুরুকে জানাইলেন যে, বাবুরাম মহারাজ ঘুমাইতেছেন। স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, 'যাও, তার পা ধরে তাকে

বিছানা থেকে টেনে ফেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিষ্য গুরুর আদেশ অনুসারে অপ্রিয় কার্য করিলেন। বাবুরাম মহারাজ টানার চোটে জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, যুবকটি তাঁহাকে বিছানা হইতে পা ধরিয়া টানিতেছেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'থাম, থাম। কি করছিস্?' কিন্তু যুবকটি থামিলেন না। তিনি বাবুরাম মহারাজকে মাটীতে টানিয়া ফেলিয়া পলাইলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তৎক্ষণাৎ ঘটনাটির অর্থ বুঝিতে পারিলেন। সান্ধ্য আরত্রিক সমাপনান্তে তিনি মঠবাড়ীর দোতালায় স্বামিজীর ঘরের সম্মুখে আসিলেন। স্বামিজী তখন বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন। তিনি প্রিয় গুরুভ্রাতাকে দেখিয়াই তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সজল নয়নে বলিলেন, 'ভাই, ঠাকুর তোমাকে কি স্নেহ-যত্ন করতেন। তিনি তোমাকে বুকে করে রাখতেন। আর আমি নির্মমভাবে তোমার প্রতি কি অত্যাচার দুর্ব্যবহার করছি। এইজন্যই কি ঠাকুর তোমাদের ভার আমার উপর দিয়ে ছিলেন?' এই বলিয়া স্বামিজী বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে অতিকষ্টে শান্ত করিলেন। ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে এইরূপ গভীর প্রীতির বন্ধন ছিল।*

স্বামী প্রেমানন্দ মঠের সাধুব্রহ্মচারীগণকে সন্তানবৎ স্নেহ করিলেও কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। স্বামিজী একদিন তাঁহাকে বলেছিলেন, 'দেখ বাবুরাম, তুমি শিষ্য কোরো না। তাহা হইলে তোমার ও রাখালের শিষ্যরা ভবিষ্যতে ঝগড়া করিবে।' বাবুরাম মহারাজ স্বামিজীর আদেশ শেষ পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শিষ্য না করিলেও অসংখ্য সাধুভক্তের কল্যাণ-চিন্তা সদা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত। বহু সাধুভক্ত তাঁহাকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। বেলুড় মঠের ঠাকুর-ঘরে একদিন কোন ধ্যানজপমগ্ন সাধুকে তিনি হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯২৭ অক্টোবর সংখ্যায় স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দের প্রবন্ধে এই ঘটনাটী উল্লিখিত।

করিলে তিনি বলেছিলেন, 'সাধু সংসার ভুলে ঈশ্বর-চিন্তা করছে—এ দিব্য দৃশ্য জগতে দুর্লভ।'

একদিন বাবুরাম মহারাজ মঠ-প্রাঙ্গণে পায়চারী করিতেছিলেন। হঠাৎ ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া সস্নেহে তাঁহার দাড়ি ধরিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, 'চাঁদ, কোথায় যাবে ?' তোমার নাকে দড়ি বেঁধে দড়িটি হাতে ধরেছি।' ঠাকুর তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তাঁহার কাজ না শেষ হইলে শিষ্য দেহরক্ষা করিতে পারিবেন না।

স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা কাহাকেও বলিতেন না। গভীর প্রীতি ও প্রেমের আবরণে তাঁহার ঈশ্বরকোটীত্ব তিনি সুগুপ্ত রাখিতেন। কিন্তু কখনও কখনও কোন কোন ঘটনায় তাহা হঠাৎ প্রকাশিত হইত। একদিন আরাত্রিকের পর বেলুড় মঠের পুরাতন ঠাকুরঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় তিনি ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানাদির সাধারণ সময় অতীত হইল, কিন্তু তিনি উঠিলেন না। পূজারী ঠাকুরের ভোগ দিতে আসিয়া দেখিলেন, ধ্যানমগ্ন স্বামী প্রেমানন্দের উন্নত দেহ কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ এবং পশ্চাৎদিকে কিঞ্চিৎ বক্র। তিনি ভাবিলেন, শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বাবুরাম মহারাজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও সাড়া পাইলেন না। ভোগ নিবেদনান্তে তিনি পুনরায় বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ব্ববৎ ধ্যানমগ্ন। তিনি বারবার ডাকিয়া কোন সাড়া না পাইয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহার চোখের সম্মুখে হারিকেনের আলোকটি ধরিলেন। তখন প্রেমানন্দজী ধীরে ধীরে চোখ খুলিলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?' তদুত্তরে প্রেমানন্দজী মধুর কণ্ঠে এই গানটি গাহিলেন।—

'ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥'

তারপর তিনি ব্রহ্মচারীকে বলিল, 'যখন আমাকে এই অবস্থায় দেখবে তখন আমায় ডাকবে না বা চীৎকার করবে না। কিন্তু ঠাকুরের নাম আমার কাণে

উচ্চারণ করবে।' স্বামী প্রেমানন্দ ভাবসমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নিত্যধ্যানে নিত্যসিদ্ধের নিশ্চয়ই ভাবসমাধি হইত।

বেলুড় মঠে অবস্থান কালে তাঁহার উপর নবাগত ব্রহ্মচারী ও সাধুদের শিক্ষার ভার পড়ে। ঠাকুরের পূজাদি, নবীন সাধুদের জীবন গঠন, ভক্তদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ এবং মঠ-পরিচালনাদি কার্যে তিনি সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। ঠাকুরের প্রেম-ভাবটি তাঁহার জীবনে মূর্ত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যবহার ও বাক্য এত মধুর ছিল যে, তাঁহার তিরস্কারেও কেহ ব্যথিত হইতেন না। সাধুভক্তদের শত দোষ ক্ষমা করিয়া তিনি তাহাদের কল্যাণ সাধনে তৎপর থাকিতেন। তাঁহার প্রেমস্পর্শে আসিয়া বহু যুবক সন্ন্যাসী এবং বহু পাপী ধার্মিক হইয়াছে। কলিকাতার কোন যুবক অসৎসঙ্গের প্রভাবে মাদকদ্রব্যসমূহে আসক্ত এবং ধ্বংসের পথে চালিত হন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে সৎপথে আনিবার শত চেষ্টা করিয়াও নিরাশ হইলেন। পরে স্বামী প্রেমানন্দের কৃপায় যুবকের জীবন পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইয়া যান। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা যেরূপ সোনা হয়, প্রেমানন্দের স্পর্শে তদ্রূপ কত পাপীতাপী ঈশ্বর-ভক্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্নেহময় স্বভাবের জন্য বেলুড় মঠের সাধুভক্তগণ তাঁহাকে 'মা' বলিতেন। ভক্তগণকে তিনি নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা ও সৎকার করিতেন। মঠে আহারাদি সমাপ্ত হইবার পর হয়ত দূরস্থান হইতে একদল ভক্ত আসিলেন। সাধুব্রহ্মচারীগণ ক্লান্ত হইয়া দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদিগকে বিরক্ত না করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ স্বয়ং নীরবে রান্নাঘরে যাইতেন ভক্তগণের জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিতে। যে সকল সাধুব্রহ্মচারী ভক্তসেবায় তৎপর হইতেন তাঁহাদের উৎসাহ দিয়া তিনি বলিতেন, 'ভক্তসেবা একপ্রকার ঈশ্বরোপাসনা।' দেহত্যাগের দুইদিন পূর্বে তিনি কোন সন্ন্যাসীকে কাছে ডাকিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, 'একটী কাজ করতে পারবে?' সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'আদেশ করুন, নিশ্চয়ই পারব।' স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'প্রাণপণে ভক্তসেবা করবে।' সন্ন্যাসী তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করায় তিনি অনুনয়ের সুরে বলিলেন, 'দেখো, যেন ভুলো না।' প্রসাদে তাঁহার এত

বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেন, মঠের প্রসাদ যিনি গ্রহণ করিবেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধ ও ধর্মলাভ হইবে। মঠের গো-সেবা, বাগানের কাজ এবং ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতিকে তিনি সাধনভজনতুল্য চিত্তশুদ্ধিকর জ্ঞান করিতেন। তিনি একাধিকবার দর্শন করিয়াছিলেন, ঠাকুর বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'যে হয় শিরদার সে হয় সরদার।' যে কাজটী তিনি অপরকে করিতে বলিতেন সে কাজটি তিনি সর্বাগ্রে নিজে করিয়া দেখাইতেন। 'ভক্ত ভগবান অভেদ'—এই অনুভূতি তাঁহার মনে উজ্জল ছিল বলিয়াই তিনি ভক্তসেবায় এত অগ্রণী হইতেন। ডায়মণ্ডহারবার হইতে এক মুসলমান ভদ্রলোক কয়েকজন হিন্দু বন্ধুর সহিত একবার বেলুড় মঠে আসেন। মন্দিরাদি দর্শনান্তে তাঁহাকে পাতায় প্রসাদ খাইতে দেওয়া হইল। আহারান্তে তাহার পাতাটি তুলিয়া স্থানটি পরিষ্কার করিতে কেহই অগ্রসর হইতেছিলেন না, সকলেই ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তৎক্ষণাৎ অগ্রবর্তী হইয়া পাতাটি তুলিয়া লইলেন এবং স্থানটি পরিষ্কার করিলেন।

নিত্য কর্মে তিনি কি ভাবে নিযুক্ত হইতেন তাহা বুঝাইবার জন্য একদিন তিনি কোন সাধুকে বলিয়াছিলেন, 'প্রাতে জপ-ধ্যান শেষ করিয়া ঠাকুর-ঘর হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুরের এই উপদেশটি মন্ত্রবৎ উচ্চারণ করি—'শ, ষ, স। যে সয়, সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়।' অন্তিম অসুখের সময় দেওঘরে অবস্থান কালে কোন সাধু সেবককে তিনি অপরিমিত ভোজনের জন্য তিরস্কার করেন। সাধুটি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করেন। দ্বিপ্রহরে আহার কালে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া তিনি এই বিষয়ে অবগত হইলেন। সন্ধ্যায় সাধুটি ফিরিয়া আসিলে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে বলিলেন, 'বাবা, আমি বৃদ্ধ ও রুগ্ন। আমার মেজাজ ঠিক নেই। এই অবস্থায় যদি কিছু বলে ফেলি, তোর কি রাগ করা উচিত?' এইরূপ গভীর ছিল স্বামী প্রেমানন্দের প্রেম! বাক্য ও ব্যবহারে ভদ্রতা রক্ষা করার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'সাধু হবে ত ভদ্র হও। বড় দুঃখের বিষয়, আধুনিক সমাজে শিষ্টা-

চার ও ভদ্র ব্যবহার অল্পই অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর এই বিষয়টি আমাদের ভালভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন।' বেলুড় মঠে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের জন্য একটী চতুষ্পাঠী স্থাপিত ও একটী পণ্ডিত নিযুক্ত হয় তাঁহারই চেষ্টায়। অদ্যাপিও তৎপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী বেলুড় মঠে চলিয়া আসিতেছে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী প্রেমানন্দ স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কাশ্মীরে অমরনাথ তীর্থ দর্শন করেন। তীর্থ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া তিনি ঠাকুরের ভাব প্রচারে মনোযোগ দিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে কয়েকবার পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই শত শত নরনারী ঠাকুরের ভাব পাইয়া ধন্য হইত। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ববঙ্গে শেষ ভ্রমণ করেন। ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার ঘারিন্দা গ্রামে ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও দেবোপম মূর্তি দর্শনে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি তথায় প্রেমোদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রচার করেন যে, হিন্দু-মুসলমান সকলের হৃদয়ে এক ঈশ্বর বিরজমান। এই উদার বাণী শুনিয়া জনৈক গোঁড়া মুসলমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি তাহাই হয়, আপনি আমার সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন কি ?' অবিলম্বে উত্তর আসিল, 'হাঁ পারি।' তৎক্ষণাৎ একটি পাত্রে কিছু আহার্য আনীত হইল। তিনি নিঃসঙ্কোচে মুসলমানের হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিলেন।

ঘারিন্দা হইতে স্বামী প্রেমানন্দ নেত্রকোণায় গমন করেন। তথা হইতে ময়মনসিং যাইবার পথে একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটে। তিনি পাল্কীতে যাইতেছিলেন এবং তাঁহার দল অগ্রবর্তী হইতেছিল। নেত্রকোণা হইতে তিনি অধিক দুর অগ্রসর হন নাই এমন সময়ে কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁহাকে দেখিয়া পাল্কী থামাইল। তাঁহারা গ্রামের অন্যান্য নরনারীকে সাধুদর্শনার্থ ডাকিয়া আনিল এবং তাঁহাকে কয়েকটি ডাব উপহার দিয়া ভক্তিনতদেহে তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল। ময়মনসিং হইতে তিনি ঢাকায় গমন করেন। ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে তিনি যে কয়দিন ছিলেন, তথায় নিত্য উৎসব হইতে লাগিল। তাঁহাকে দর্শন

করিতে এবং তাঁহার বাণী শুনিতে মঠে শত শত নরনারীর সমাগম হইল। ঢাকার নবাববাড়ীর পর্দাযুক্তা মেয়েরাও তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিতেন। ঢাকা হইতে তিনি নারায়ণগঞ্জ এবং তথা হইতে হাঁসাড়া এবং সোণারগাঁ প্রভৃতি গ্রামে যান। এই সকল স্থানেই তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য রোজ ভিড় হইত। হাঁসাড়া গ্রামে তিনি একদিন দেখিলেন যে, কচুরীপানায় একটি পুষ্করিণী পরিপূর্ণ এবং উহার জল অপরিষ্কার। তিনি সমবেত যুবকগণকে কচুরীপানা তুলিয়া পল্লী-সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করেন এবং স্বয়ং দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত কার্যে অগ্রণী হন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রামের যুবকগণ তখনই পুকুরে নামিয়া কচুরীপানা তুলিয়া দেন। তৎপরে তাঁহারা উক্ত সেবাকার্য্য পরিচালনার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। উক্ত সমিতি বিক্রমপুরের বহু গ্রামের পুষ্করিণী হইতে বিস্তর কচুরীপানা তুলিয়া দিয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ কচুরীপানার উৎপাতে বিক্রমপুরে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাব এবং তজ্জনিত গ্রামবাসীদের নানা অসুখ হইতেছিল।

পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামী প্রেমানন্দ কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। বায়ুপরিবর্তনের জন্য তিনি বৈদ্যনাথধামে প্রেরিত হইলেন। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার ফলে তিনি একটু সুস্থ বোধ করিলেন। কিন্তু পুনরায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে শীঘ্র কলিকাতায় আনা হইল। সুচিকিৎসা সত্ত্বেও কোন সুফল ফলিল না। প্রায় দেড় বৎসর রোগে ভুগিয়া ১৯১৮ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার বৈকালে তিনি বলরাম মন্দিরে দেহরক্ষা করেন এবং গুরুপদে মিলিত হন। রোগশয্যায় তাঁহার জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার মুখে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠাকুরের শুভ নাম শুনা যাইত।

স্বামী প্রেমানন্দ স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিতে পারিতেন। ধনীপুত্র হইলেও সন্ন্যাসজীবনে ত্যাগই ছিল তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। তিনি আবশ্যকীয় জামা-কাপড় বা জিনিষপত্র ব্যতীত অধিক কিছু সঙ্গে রাখিতেন না। দেহত্যাগের পর দেখা গেল, তাঁহার শূন্য ক্যাম্বিস ব্যাগটি এবং কয়েকখানি

বই ব্যতীত অন্য কিছু ঐহিক সম্পদ ছিল না। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তিনি আদৌ দৃষ্টিপাত করিতেন না। খাইতে বসিয়া তিনি ভাল ভাল খাবারগুলি কনিষ্ঠ সাধুদের পাতে তুলিয়া দিতেন। দেওঘরে শেষ অসুখের সময় কোন ভক্ত তাঁহার সেবককে তাঁহার ব্যবহারের জন্য চারিটী শার্ট দিয়া যান। তাহা জানিতে পারিয়া তিনি সেবককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'কতকগুলি জামা ব্যবহারে আমি অভ্যস্ত নই। তাহা ছাড়া এতগুলি জামা কাপড় রাখা সাধুর উচিত নয়।' ত্যাগ ব্যতীত প্রেম পুষ্ট হয় না।

স্বামী প্রেমানন্দ প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। নিম্নোক্ত গানটী গাহিয়া বা লিখিয়া তিনি সকলকে নিঃস্বার্থ প্রেম সাধন করিতে উপদেশ দিতেন। এই গানটী ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কর্তৃক রচিত।—

বাউল—একতালা

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেমিক এম্নি রত্নধন কিছু নাইক তার মতন
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন।
ও সে হাস্য মুখে সদাই থাকে হৃদয় জুড়ে সুধাকর॥
প্রেমিক চায় নাক জাতি চায় না সুখ্যাতি
(ভাবে) হৃদয় পূর্ণ হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি।
ও তার হস্তগত সুখের চাবি থাকবে কেন অন্য ডর॥
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া কিছু বেদবিধি ছাড়া
আঁধার-কোলে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া।
(আবার) চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর॥

তিনি পত্রে একটি ভক্তকে লিখিয়াছিলেন—'প্রেমিক মানুষের দোষগুণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাল বেসে বেসে মরে। মরেই বা কেন? ভালবাসায়

অনন্ত জীবন, অমরত্ব লাভ করে। একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা—এই নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ভালবাসা অমূল্য ধন, পরম নিধি। এস, এই রত্ন লুটে আণ্ডিল হয়ে যাই।" আর একটি পত্রে লিখেছিলেন, "জগতের সকল স্বার্থপরতা সহ্য করে আমাদিগকে স্বার্থগন্ধমাত্রহীন হ'তে হবে। এই হচ্ছে আদর্শ।"

আট

স্বামী অখণ্ডানন্দ

"অখণ্ডানন্দসিন্ধৌ যঃ সততং বৈ মীনায়তে।
কর্মযোগাতিনিষ্ঠায়াখণ্ডানন্দায় তে নমঃ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব তপস্যার হোমানলে যে কয়টী সন্ন্যাসী স্বীয় জীবন আহুতি দিয়াছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। ইনিই প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তে সর্বপ্রথম হিমালয় অতিক্রমপূর্বক তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'তাহাদের (শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের) একজন নগ্নপদে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের বিশ হাজার ফুট গিরিপথ লংঘন করিয়া গিয়াছে। দুঃখকষ্ট তাঁহাকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছে। পুলিস তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়াছে, জেলে আটক করিয়াছে, নির্দোষ জানিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছে।' স্বামী অখণ্ডানন্দই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য আরম্ভ করেন। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের তৃতীয় অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্বনাম গঙ্গাধর ঘটক। যে পরিবারে গঙ্গাধর আবির্ভূত উহার আদি নিবাস ছিল যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে গঙ্গাধরের পূর্বপুরুষগণ কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীমন্ত গাঙ্গুলি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। তিনি কুলাচার্যের কার্য করিতেন। সেইজন্য লোকে তাঁহাকে 'ঘটক ঠাকুর' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি খুব নিষ্ঠাবান্ সাধক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি স্বপুত্রকে ত্যাগবৈরাগ্য বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। গঙ্গাধর যেদিন সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান সেদিন তিনি তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে তুলিয়া দেন এবং আশীর্বাদ করেন।

কোনও এক সময়ে আলবাজার মঠে পুত্রের সংবাদ লইতে আসিয়া শুনিলেন, 'সন্ন্যাসীপুত্র খেতড়ির রাজপ্রাসাদে অতিথি'। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'শুনিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী রাজার অতিথি?' উক্ত মন্তব্য শ্রবণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'দেখেছিস, ব্রাহ্মণের কি ত্যাগের ভাব! গঙ্গাধর ঋষিপুত্র।' ১৮৯৭ খ্রীঃ এই ধর্মনিষ্ঠ বৃদ্ধের দেহাবসান এক অলৌকিক ব্যাপার। ইহার মৃতদেহ যখন অর্ধদগ্ধ হইয়াছে তখন এক রুদ্রাক্ষশোভিত যোগী আসিয়া বলেন, ইহার দেহ এইভাবে সৎকার করা উচিত হয় নাই। তিনি খানিকক্ষণ চিতার পাশে বসিয়া জপ করিলেন। তার পর সকলকে আদেশ করিলেন, চল এই অর্দ্ধদগ্ধ দেহ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। শ্মশানে সমাগত সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাই করিলেন। পরে সেই যোগীকে দেখিতে পাওয়া গেল না। গঙ্গাধরের মাতা বামাসুন্দরী দেবী অতি স্নেহশীলা ছিলেন। গঙ্গাধর বাল্যকালে একবার গৃহত্যাগ করিলে ইনি 'গঙ্গা,' 'গঙ্গা' করিয়া পাগলিনীপ্রায় হন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের দৃষ্টি অর্দ্ধেক হারাইয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণী গঙ্গাধরকে খুঁজিবার জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। কাশীতে এক কিশোর ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া 'এই আমার গঙ্গা' বলিয়া জড়াইয়া ধরেন এবং বাড়ীতে লইয়া আসেন। ভুল ভাঙ্গিবার পরও তিনি বহুদিন ব্রহ্মচারীকে সন্তান-জ্ঞানে ভালবাসিতেন।

এইরূপ জনক-জননীর কোলে ১২৭১ সালে মহালয়া দিবসে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন আহিরীটোলার মাণিকতলা ঘাট স্ট্রীটে বামাসুন্দরীর পিত্রালয়ে কি এক উৎসব উপলক্ষে সকলে ব্যস্ত। এমন সময় হঠাৎ বামাসুন্দরীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একটি ঘরে একাকিনী যাইয়া বসিলেন। অল্প কাল পরে কুশাসনের উপর এক অপূর্ব সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ইহা যেন শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাষ।

গঙ্গাধর শৈশব অতিক্রম করিয়া যতই বাল্যে ও কৈশোরে পদার্পণ করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধনার দিকে ঝোঁক আসিতে লাগিল। উপনয়নের পর হইতে উহা এক নির্দিষ্ট ধারা গ্রহণ করিল। ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান, গায়ত্রীজপ, প্রাণায়াম অভ্যাস, গীতাপাঠ, স্বপাক আহার, কম্বলে শয়ন, হরিতকী

ভক্ষণাদি নিত্য কর্মের অঙ্গ হইল। এই সব বিষয়ে পাড়ার প্রিয় বন্ধু হরিনাথ (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ) তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন বলিয়া মনে হয়। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গ তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা থিয়েটার দেখাদি সব তিনি করিতেন, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। তাঁহার শারীরিক শক্তি অধিক না থাকিলেও তাঁহার মানসিক শক্তির নিকট বাল্যবন্ধুগণ মাথা নত করিত এবং ঝগড়াবিবাদের সময় তাঁহার মধ্যস্থতা মানিয়া লইত।

বাল্যাবধি সাধুদের প্রতি গঙ্গাধরের একটা স্বাভাবিক টান ছিল। কাছাকাছি কোথাও সাধু আসিলে অজ্ঞাত আকর্ষণে দেখিতে যাইতেন, এবং খোঁজ করিতেন, তাঁহারা কোথা হইতে আসিতেছেন। এইরূপে হিমালয়স্থ তীর্থরাজির দর্শন-বাসনা তখন হইতেই তাঁহার মনে জাগিতে থাকে। বাল্যে একবার এক সাধুর সহিত বর্ধমান পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন, মাসখানিক পরে ফিরিয়া আসেন একটু বড় হইলে দুই তিন জন বন্ধু মিলিয়া আরো দূরে দূরে সাধু দেখিতে যাইতেন। এইরূপে বাগবাজারে একবার দীননাথ বসুর বাড়ীতে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান। সেদিন লোকের খুব ভিড় ছিল বলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা হয় নাই।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান। তাঁহার সহিত ঠাকুর পূর্বপরিচিতের মত ব্যবহার করেন, মাদুর পাতিয়া কাছে শোয়ান এবং মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে আসিয়া রাত্রিবাস করিতে বলেন। সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে শনিবারে আসিবার কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত গঙ্গাধরের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণও গঙ্গাধরের জীবন স্বহস্তে গড়িতে লাগিলেন। তিনি তরুণ শিষ্যকে কৃচ্ছ্রসাধন করিতে নিষেধ করিলেন, এবং কলিকাতার সিমলাপল্লীতে নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। পরদিন গঙ্গাধর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া মুগ্ধ হইলেন। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইলে নরেন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী চক্ষু এবং বাহ্য বিষয়ে উদাসীন ভাবের কথা ঠাকুরকে জানাইলেন। তৎশ্রবণে ঠাকুর প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, 'ওর সঙ্গে খুব মিশবি।' এইরূপে ধীরে

ধীরে গঙ্গাধরের মনে নরেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর প্রীতি জন্মিল। এই প্রীতি পরবর্তী জীবনে স্বামীজির প্রতি ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

এদিকে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ও রাত্রিবাস করিতে করিতে গঙ্গাধরের মনে ধীরে ধীরে ইষ্টদর্শনের বাসনা বলবতী হইল। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে পাঠাইতেন। একদিন নিজে গঙ্গাধরকে লইয়া কালী-মন্দিরের ভিতরে গেলেন, এবং বলিলেন, 'দেখ, দেখ, চৈতন্যময় শিব কেমন শুয়ে রয়েছেন!' তারপর মা কালীর অলঙ্কারসমূহ ঠিক করিয়া দিলেন, এবং গদগদভাবে কত গান গাহিলেন। সেদিন তাঁহার ভাবের ঘোর কাটিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ দর্শনে গঙ্গাধরও ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর সেদিন কি আনন্দই প্রাণে ঢেলে দিলেন! তিনি বলেছেন, দেখ্ দেখ্; আর আমরা তাই দেখেছি!' কখনও কখনও গঙ্গাধর বালকের মত খেলার ছলে দ্বাদশ শিব মন্দির প্রদক্ষিণপূর্বক একা 'নমঃ শিবায়ঃ শান্তায়....' এই মন্ত্রে প্রত্যেক শিবকে প্রণাম করিতেন। এই ভাবে বাল্যকালেই খেলাচ্ছলেই ঠাকুর তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই স্বর্গীয় সঙ্গসুখ বেশি দিন স্থায়ী হইল না। হঠাৎ ঠাকুরের গলরোগ দেখা দিল। সকলের মত গঙ্গাধরের মনেও ইহা একটা আসন্ন বিয়োগের চিন্তার ছায়াপাত করিল। তিনি যথাসাধ্য যখন পারেন তখন আসিয়া মাঝে মাঝে শ্রীগুরুর সেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরও তাঁহার তিরোধান কাল সমাগত বুঝিয়া শিষ্যদিগকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য শেষ উপদেশ দিতে থাকেন। বুড়ো গোপালদা কর্তৃক প্রদত্ত বারখানি গেরুয়া কাপড়ের এগারখানি এগার জনকে ঠাকুর স্বহস্তে দিলেন এবং একখানি গিরিশ ঘোষের জন্য রাখিলেন। অন্য একদিন ঠাকুর গঙ্গাধরকে একখানি গেরুয়া কাপড় দিয়া বলেন, 'তুই পারবি।' এইরূপে আরো নানা উপায়ে ঠাকুর গঙ্গাধরের মনে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পর প্রথমে অনেকের মনে হইল, ঠাকুর যে সংঘের বীজরোপণ করিলেন তাহা নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু ধীরে ধীরে বরাহ-

নগর মঠে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা গেল। গঙ্গাধর মাঝে মাঝে বরাহনগর মঠে আসিতেন। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কখনও মঠে, কখনও কাশীপুরের শ্মশানে ধ্যান ভজন করিয়া কাটাইতেন। তাঁহার মনে তখন বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিতেছিল, সর্বদা তাঁহার মনে হইত, 'কোথায় গেলে আবার ঠাকুরের দেখা পাব!' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল—হিমালয় দেবতাদের আবাসভূমি, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। এই ভাবিয়া ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েকমাস পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে বিদায় ও আশীর্বাদ দানে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গয়া, বৈদ্যনাথ, কাশী ও অযোধ্যা হইয়া গঙ্গাধর হিমালয়ের পাদদেশে আসিয়া পৌছিলেন। হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থে কিছুদিন থাকিয়া হিমালয়ের রাস্তাঘাটের সন্ধান লইয়া মুসৌরি হইতে একদিন গঙ্গোত্তরী এবং যমুনোত্তরীর পথে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে ৺কেদার নাথ এবং বদরীনাথ দর্শনান্তে চন্দ্রবদনী, তুঙ্গনাথ, ত্রিযুগীনারায়ণ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থে গমন করেন। সেই সকল তীর্থ ভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী তাঁহার 'তিব্বতের পথে হিমালয়' পুস্তক পড়িলে পাওয়া যায়। ইহা পড়িলে বুঝা যায়, তিনি কি দৃষ্টিতে হিমালয়কে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার চোখে হিমালয় চিন্ময়, অনন্ত অনাদি বিরাট শিবলিঙ্গ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সত্যই বলিয়াছেন, তিনি 'পর্বতানাং হিমালয়'।

এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে উচ্চ পর্বত-শিখরে তিনি ধ্যানমগ্ন। এমন সময় অনুভব করিলেন, ঠাকুর আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন এবং পরে গান গাহিতেছেন—

নেবে নাচ খ্যাপা মাগী
বাজবে যে মহেশের বুকে।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে।....ইত্যাদি।

গঙ্গাধরের অনুভূতি হইল—এই হিমালয়ের, এই বিশ্বজগতের, সৃষ্টিস্থিতিলয় সকলই শিবশক্তির নিত্যলীলা। ঠাকুরের ভাবময় সঙ্গীত-বিহ্বল মূর্তি দেখিয়া

সন্ন্যাসীর মনপ্রাণ শীতল হইয়া গেল। উক্ত ঘটনার পর হইতে তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন, ঠাকুর তাঁহাকে সর্বদা দেখিতেছেন এবং রক্ষা করিতেছেন। ভ্রমণকালে অনেক সময় তিনি খুব বিপদসঙ্কুল পথে গিয়াছেন, বনের কাঠুরিয়া তাঁহাকে সেইপথে যাইতে মানা করিয়াছে। তথাপি তিনি সেইপথে চলিয়াছেন, পথিমধ্যে সদ্যঃপতিত রক্তাক্ত বস্ত্রও পড়িয়া আছে। তবু ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই পথ নির্ভয়ে, বিনা বিপদে অতিক্রম করিয়াছেন। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া তিনি জীবন-সায়াহ্নে বলিতেন, "ঠাকুর আমায় দেখছেন কিনা পরীক্ষা করবার ইচ্ছে ক'রে বিপদের পথে যেতাম। প্রতিবারই তিনি হাসতে হাসতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।"

তীর্থভ্রমণকালে তাঁহার যে সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তন্মধ্যে ইহা একটী। কোন স্থানে রাত্রিযাপনার্থ তাঁহাকে একটী ঘর দেওয়া হইল। ঘরটী লোকালয় হইতে দূরে বাগানের মধ্যে অবস্থিত। রাত্রে মশারি খাটাইয়া তিনি বিছানার মধ্যে শুইয়া আছেন। এমন সময়ে তিনি দেখেন, একটী কাটা মুণ্ড তাঁহার মশারির চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং তাঁহার দিকে ক্রোধভরে আরক্ত লোচনে তাকাইতেছে! তিনি আর ঘুমাইতে পারিলেন না, সারারাত্রি রাম নাম উচ্চৈঃস্বরে জপ করিয়া কাটাইলেন। ভোরে গৃহকর্তা খবর লইতে আসিলে তিনি তাঁহাকে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন। গৃহকর্তার নিকট জানা গেল, উক্ত ঘরে কিছুদিন পূর্বে কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে এবং তাহারই প্রেতাত্মা কাহাকেও ঐ ঘরে রাত্রিবাস করিতে দেয় না!

এইরূপে ভ্রমণকালে তিনি তিন বার তিব্বতে গমন করেন, কিন্তু লাসা পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই। তিব্বতে অবস্থানকালে তিব্বতী ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। শেষবার তিব্বত হইতে কাশ্মীরের পথে ফিরিতেছিলেন। পুলিশ সন্দেহক্রমে তাঁহাকে জেলে আটক করে। জেলে তিনি অনশনে কাটান। পরিশেষে পুলিশ সঙ্গে করিয়া বরাহনগর মঠে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসর পরে মঠে এই প্রত্যাবর্তন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ মনে করিয়াছিলেন, গঙ্গাধরের

দেহান্ত হইয়াছে। কারণ, এই তিন বৎসর মঠে তিনি কোন পত্র দেন নাই। হঠাৎ তাঁহাকে এইভাবে ফিরিয়া পাইয়া সকলের বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। কয়েকদিন সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া হিমালয়ের ও তিব্বতের ভ্রমণ-কাহিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিলেন। ইহার ফলে ধীরে ধীরে স্বামী বিবেকানন্দের মনে হিমালয়-ভ্রমণের বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। স্থির হইল যে, গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া তিনি হিমালয়ের পথে যাত্রা করিবেন।

একদিন তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলিলেন, 'দ্যাখ, আমরা ত বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিয়েছি। তুই ছিলি না, আয় এবার তোর বিরজাহোম হয়ে যাক!' অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের জীবন লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি তাঁহার নাম রাখেন, 'অখণ্ডানন্দ'। সন্ন্যাসের পর তাঁহারা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে হিমালয় ও তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। দেওঘর, ভাগলপুর, কাশী, অযোধ্যা হইয়া তাঁহারা হৃষীকেশে উপস্থিত হইলেন ও কিছুদিন তথায় তপস্যায় কাটাইলেন। গাড়োয়ালের অন্তর্গত টিহরীতেও তাঁহারা অল্প কাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানে স্বামী অখণ্ডানন্দ বুকের অসুখে পড়িলেন। ডাক্তাররা তাঁহাকে বলিলেন, আপনার আর পাহাড়ে ঘোরা চলিবে না, সমতলে যাইয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।' পাহাড় হইতে নামিয়া হৃষীকেশে জ্বরে ভুগিয়া স্বামীজিরও শরীর দুর্বল হইল। অবশেষে মীরাটে পাঁচ ছয় জন গুরুভ্রাতা আবার মিলিত হইলেন। তথায় শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যাতে মহানন্দে তাঁহাদের দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন স্বামীজি বলিলেন, 'আমি একা ভ্রমণ করিব, কেহ আমার সঙ্গে আসিও না।' স্বামী অখণ্ডানন্দ অল্প কয়েক দিন পরে স্বামীজির অনুসরণ করিলেন। মীরাট হইতে তিনি কাথিয়াবাড়ে কচ্ছে পৌঁছলেন এবং নারায়ণ সরোবরে ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া মাণ্ডবীতে স্বামীজির দর্শন পাইলেন। স্বামীজি তথায় তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি একা ভ্রমণ করিতে চাই। একা ভ্রমণ করিয়া আমি দেশের দুরবস্থা বুঝিয়াছি। প্রতিকারের উপায়ও চিন্তা করিতেছি, হয় ত আমাকে বিদেশে যাইতে হইবে। দেশের কাজের জন্য তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর সেই হইবে যথার্থ ভালবাসা।' স্বামী

অখণ্ডানন্দ গুরুভ্রাতার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমাকে দেখবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। তাই তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি। এখন তুমি একা ভ্রমণ করিতে পার।'

স্বামীজিকে বিদায় দিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জামনগরে প্রায় এক বছর ছিলেন। জামনগরে প্রথমে শেঠজীর বাড়ীতে, পরে ঝণ্ডুভট-জীর আয়ুর্বেদ ভবনে তিনি থাকিতেন। শেঠজী ও ভটজী তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন, এবং তথায় আশ্রম করিয়া থাকিতে অনুরোধ জানান।

ঝণ্ডুভটজী একজন অতি উদারহৃদয় লোক ছিলেন। বলিতে গেলে, তাহার নিকটই স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রত্যক্ষভাবে সেবাধর্ম শিক্ষা করেন। তাঁহার 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে এই বিষয়ে দুই তিনটি গল্প বিবৃত আছে। স্বামী অখণ্ডানন্দ দেহত্যাগের তিনচার মাস পূর্বে বোম্বাই হইতে ঝণ্ডুভটজীর একটি ছবি আনাইয়া বাঁধাইয়া শয়নকক্ষে রাখিয়াছিলেন! জামনগরে প্রায় এক বৎসর থাকিয়া উদরাময়েয় চিকিৎসাদি করিয়া তিনি স্বামীজির শিষ্য খেতড়িরাজার অতিথি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দই এই যোগাযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। খেতড়ী রাজ্যের প্রজাদের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশা দর্শনে অখণ্ডানন্দজীর মনে সেবাধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি আমেরিকায় স্বামীজিকে এই মর্মে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন—'আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের এইরূপ জনসেবা করা উচিত, না পরিব্রাজকের মত জীবন কাটাইয়া দেওয়াই কর্তব্য?' যথা সময়ে স্বামীজির এই উত্তর আসিল—'বর্তমান যুগে মূর্খ, দরিদ্র, পীড়িত ও দুঃখী জনগণের সেবার জন্য সন্ন্যাসীদের নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে।'

এই পত্র পাইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ বুঝিলেন, ওখানে যে তুফান উঠেছে এখানে তারই খানিকটা আঘাত দিয়াছে। পত্রপাঠ তিনি সেবাকার্যে লাগিয়া গেলেন। প্রথমে রাজবাড়ীর সংলগ্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে তিনি কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন' মহারাজার নিকট হইতে শিক্ষাবিস্তার কল্পে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা হইল।

আর যে একটি বড় কাজ করিলেন তাহা রাজদরবারে প্রজাসাধারণের প্রবেশাধিকার। এইরূপে খেতড়িতে নানা ভাবে জনহিতকর কার্যের গোড়া-পত্তন করিয়া স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির আহ্বানে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মঠে ফিরিলেন। মঠ তখন আলমবাজারে অবস্থিত।

বহুদিন পরে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে আসিয়া এবং মঠের অবস্থার অনেক উন্নতি দেখিয়া অখণ্ডানন্দজীর মনে খুব আনন্দ হইল। এই সময় স্বামী অভেদানন্দ হৃষীকেশ হইতে বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন। মঠে প্রত্যহ বৈকালে তিনি বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেন এবং গুরুভ্রাতাগণ তাহা শুনিতেন। ইহারই কিছু দিন পর তাঁহাকে স্বামীজি সমুদ্রপার হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচারের জন্য।

আলমবাজার মঠে স্বামী অখণ্ডানন্দের এই দুইটি অনুভূতি উল্লেখযোগ্য। একদিন মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি বেদান্তের সাধনানুযায়ী এইরূপে বিচার করিতে বসিলেন—'আমি শরীর নই,' 'আমি মন নই,' 'আমি আত্মা'। কিন্তু ক্ষণকাল পরে দেখিলেন—নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল গোপাল-মূর্তি হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং জননী যশোদা আলুলায়িত কেশবাসে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, হাতে ননী লইয়া। তাঁহার পিছনে স্বামী অখণ্ডানন্দ দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে! স্বামী অখণ্ডানন্দের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক যশোদা ও গোপালের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'দেখ দেখি কি সুন্দর ভাব!' তখন স্বামী অখণ্ডানন্দ গোপাল-ভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'চাই না নির্বাণ, চাই না মুক্তি! এই গোপালভাব আস্বাদন করবার জন্য বার বার জন্মালেও দুঃখ নেই!' তিনি যেমনি গোপাল, যশোদা ও শ্রীরামকৃষ্ণকে আঁকড়িয়া ধরিতে যাইবেন তখনই তাঁহার এই অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গ হইল।

আর একদিন আলমবাজার মঠের বড় ঘরে সকলে মাদুরে শুইয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অত্যধিক গরমের জন্য কাহারো নিদ্রা হইতেছে না। স্বামী অখণ্ডানন্দও বহুক্ষণ নিদ্রার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং

বড় পাখা একখানা লইয়া জোরে জোরে সকলকে বাতাস করিতে লাগিলেন। সকলে আরাম অনুভব করিয়া পাশ ফিরিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের অনুভব হইল, যেন তাঁহারও সকল ক্লান্তি দূর হইয়া গিয়াছে। 'দশের সুখে আমার সুখ'—এই ভাবটী তখন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন।

কাছাকাছি কোথাও কলেরারোগীর সন্ধান পাইলে তিনি সেবা করিতে ছুটিয়া যাইতেন। এই স্বভাব তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। যেখানে ডাক্তার পর্য্যন্ত যাইতে সাহস পান না সেখানে তিনি একলা সারারাত্রি সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সকালে স্নান সারিয়া মঠে ফিরিয়াছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। স্বামী বিবেকানন্দ ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া বিজয় গৌরবে দেশে ফিরিয়াছেন। চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া অভিনন্দনোৎসব চলিতেছে। গুরুভ্রাতাগণের প্রাণে উল্লাসের সীমা নাই। আলমবাজার হইতে মঠ তখন বেলুড়ে এক বাগানবাড়ীতে গিয়াছে। স্বামীজির কাছে নূতন যুবকবৃন্দ শিষ্য হইতে আসিতেছে। তাহাদের প্রাণে একটা নতুন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

কলিকাতা অভিনন্দনের পর স্বামীজির বহুমূত্ররোগ ধরা পড়িল। তিনি দার্জিলিং গেলেন আরোগ্যের আশায়। যাত্রার পূর্বে স্বামীজি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মঠ স্থাপনার্থ মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ তাঁহার সহকর্মীরূপে মান্দ্রাজে চলিলেন। যাইবার দিনে তাঁহাকে কুকুরে কামড়াইল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার জন্য ঔষধ আনিতে চন্দননগরে গেলেন। ঔষধ পাঠাইয়া দিয়া তিনি গঙ্গাতীর ধরিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও পলাশী হইয়া যখন তিনি বেলডাঙ্গা পৌছিলেন তখন এক সন্ধ্যায় দেখিলেন, একটি মুসলমান বালিকা গঙ্গার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। তিনি ক্রন্দনরতা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, কাঁদছ মা?' সে দুঃখভরে বলিল, 'আমাদের একটি মাত্র মাটীর কলসী ছিল পানীয় জল রাখিবার। সেটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি করিয়া আমি বাড়ী ফিরিব?' স্বামী অখণ্ডানন্দ তখনি তাহাকে একটি নূতন কলসী এবং সেইসঙ্গে দুই পয়সার

খইমুড়িও কিনিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া তের চৌদ্দটী শীর্ণ ছেলেমেয়ে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল 'বাবা, আমাদিগকে খেতে দাও। বাবা, খাবার দাও।' তাঁহার কাছে যে সামান্য অর্থ ছিল তাহা খরচ করিয়া তিনি খই মুড়ি কিনিয়া তাঁহাদের দিয়া কপর্দকশূন্য হইয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিলেন।

ভাবতা ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া ভোরবেলা ট্রেণে উঠিতে যাইবেন এমন সময় তাঁহার অন্নপূর্ণা-মূর্তি দর্শন হইল। শুনিলেন, সেই দিন দেবী অন্নপূর্ণার পূজা। মহালয়ায় যাহাদের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা হয় তাহারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। সেখানে তিনি স্নানের পর পূজামণ্ডপে বসিয়া মধুর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিলেন এবং দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রার্থনা জানাইলেন, 'দেবী, তুমি যদি আমাদের অন্নপূর্ণা মা তবে আমাদের কেন এত অন্নকষ্ট ?' পরদিন যখন অন্যত্র যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন তখন কে যেন তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল। তখন তিনি ঠাকুরের এই নির্দেশ শুনিলেন—'এখানে এই গঙ্গাতীরে তোর অনেক কাজ আছে।'

এইখানেই স্বামী অখণ্ডানন্দ ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের করালমূর্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। মঠে গুরুভ্রাতাদের কাছে চিঠি লিখিলেন। স্বামীজি, স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে উৎসাহ, অর্থ ও কর্মী দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষ-মোচন কার্য। ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট লেভিঞ্জ সাহেব তাঁহার সেবাকার্য্য দেখিয়া শুনিয়া খুব বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অখণ্ডানন্দজীকে পরে বলিয়া ছিলেন, 'যখন প্রেমানন্দ স্বামী তোমার পত্রগুলি আমাকে দিল তখন দেখিলাম, ঠাকুর মহুলাতে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাই তোমার সেবাকার্য্য এত সফল।'

দুর্ভিক্ষের সময় বহু বালকের পিতামাতা হয় মরিয়া গিয়াছিল, নয় সঙ্গচ্যুত হইয়াছিল। এইভাবে বহু গৃহহীন বালক অনাথের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ইহা দেখিয়া লেভিঞ্জ সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, 'স্বামীজী, আমি এই প্রথম দেখিতেছি যে, হিন্দু সন্ন্যাসীরা সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। দুর্ভিক্ষ ত এখন গিয়াছে। এখন এই অনাথ বালকগুলিকে লইয়া যদি আপনি একটি

আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তবে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। আমিও আপনাকে এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। স্বামী বিবেকানন্দের আন্তরিক সমর্থন পাইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামীজি এই আশ্রমের নাম দিতে বলিয়াছিলেন 'লেভিঞ্জ ইনষ্টিটিউট।'

ম্যাজিষ্ট্রেটের সার্কুলার অনুযায়ী ধীরে ধীরে অনাথ বালকগণ নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে আসিতে লাগিল। আশ্রম প্রথমে মহুলায়, পরে শিবনগর গ্রামে বড় রাস্তার উপর একখানি দ্বিতল পুরাতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল।

সেইখানে অনাথ বালকদের খাওয়ান-পরান, লেখাপড়া শেখান, অসুখ করিলে সেবাশুশ্রূষা করা প্রভৃতি সব কার্য অখণ্ডানন্দ স্বামীকে একহাতে করিতে হইত। এইখানে গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে 'দণ্ডী ঠাকুর' বলিত। কারণ, স্বামী অখণ্ডানন্দ যাইবার পূর্বে এই গ্রামে গঙ্গার ধারে এক সাধু বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল দণ্ডী ঠাকুর।

একবার যখন স্বামী অখণ্ডানন্দ দার্জিলিং হইতে ফিরিতেছিলেন তখন দুই তিনটি অনাথ বালক তাঁহার চলন্ত কাম্‌রাতে লাফাইয়া উঠে। তিনি তাহাদিগকে অনাথ জানিয়া লইয়া আসিতেছিলেন। পরে তাহারা অনাথ নয় জানিয়া শিলিগুড়িতে তাহাদিগকে রাখিয়া আসেন। এই সময় তাঁহার সহিত আরো কয়েকটি নেপালী অনাথ বালক আসে। তাহাদের নাম বাহাদুর, রণবীর, যশোবীর ইত্যাদি। দুই তিনটি মুসলমান অনাথ বালকও বহুদিন যাবৎ আশ্রমে ছিল। তাহারা তাহাদের ধর্মসংস্কার অনুযায়ী চলিত। ইহাদের লইয়া আশ্রমের কাজ খুব ভাল ভাবেই চলিতে লাগিল।

অনাথ আশ্রমের বালকগণ যাহাতে সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে এই আশ্রমে চরকা ও তাঁত চলিয়াছে। রেশমপলুর চাষ, এবং কাঠের কাজও কতদিন হইয়াছিল। এইসব জনহিককর কার্য্য পরিচালনার্থ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অনেক সময় অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে আশ্রমজাত শিল্পদ্রব্যসমূহ বহু বার প্রথম পুরস্কার

পাইয়াছে। এইখানে সামান্য দুই বিঘা জমি স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজে চাষ করিয়াছিলেন।

হাফ্‌প্যাণ্ট পরিয়া মাথায় রুমাল বাঁধিয়া সকাল হইতে বেলা দুই তিনটা পর্যন্ত রোদে কাজ করিয়া লেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইয়া তিনি থাকিতেন।

সুদীর্ঘ বার বছর নিরলস পরিশ্রমের পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় এক মাইল উত্তরে আশ্রম নিজস্ব জমিতে উঠিয়া আসিল। বেলডাঙ্গার জমিদার হাজি মহরম আলি এই ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেন।

স্বামিজীর স্বপ্নাদেশে পঞ্চাশ বিঘা জমি লওয়া হইল। উক্ত স্বপ্নাদেশের উপর ভিত্তি করিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রায়ই বলিতেন, এইখানে কৃষিশিক্ষালয় এবং শিল্পবিদ্যালয় হইতে পারে।

আশ্রমে ধীরে ধীরে দুই একটি কুটির গড়িয়া উঠিল। তারপর মাঝের দুইটি ঘরযুক্ত দালানটি এবং উহার দুইধারে বারান্দা। উহার একটি ঘরে স্বামী অখণ্ডানন্দ থাকিতেন এবং পাশের ঘরটিতে লাইব্রেরী, ও ঠাকুরঘর। আশ্রমের বালকগণ রাত্রে ঘরের মধ্যে ও বারান্দায় শুইত। রান্নাঘরটি একটু দূরে ছিল। পরে ক্রমশঃ একতলার ভাণ্ডার-ঘর ও খাবার-ঘর. এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অভাবনীয় উপায়ে দ্বিতলে সুন্দর ঠাকুর-ঘর নির্মিত হইল। অতি আশ্চর্যের বিষয়, অন্নপূর্ণার পূজার দিন উক্ত মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইল।

আশ্রমে কোনরূপ মন্দির করিবার ইচ্ছা প্রথমে স্বামী অখণ্ডানন্দের ছিল না। আশ্রমের ছেলেরা খেলার ঠাকুর-ঘর করিয়া ঠাকুরের ছবি ফুল দিয়া সাজাইত। পরে পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় মন্দির স্থাপনের কথা উঠিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ মানুষের মধ্যে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিতেন, নারায়ণজ্ঞানে মানুষের সেবা করিয়া অধিকতর আনন্দ পাইতেন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তাঁহার সারা জীবন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সত্যই তিনি একদিন এক ক্ষতদুষ্ট অনাথ বালককে ঋগ্বেদোক্ত পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্নান করাইয়া উপাসনার ভাবে বসাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সারগাছি আশ্রম বা তত্রত্য অনাথ আশ্রম একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান না হইলেও ভাবের দিক দিয়া ইহা ছিল সেবাব্রতের ঘনীভূত মূর্তি!

সকল অনাথ বালককে না দিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামী কখনও একটি লবঙ্গ পর্যন্ত মুখে দিতেন না। একদিন এক অনাথ বালকের হাতে লণ্ঠন দিয়া তাঁহার সঙ্গে আসিতে বলিয়াছেন। নরে নারায়ণ-জ্ঞান তাঁহার এত প্রবল ছিল যে, পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইয়াছে, 'ও ত আমার সেব্য, আমি ওর সেবক।' এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে লণ্ঠনটি লইয়া তাহাকে পথ দেখাইতে দেখাইতে চলিতে লাগিলেন। সাধারণ লোকে এইরূপ ঘটনাকে যাহা খুসি মনে করিতে পারে, কিন্তু মহাপুরুষের জীবনে এইরূপই স্বাভাবিক।

ক্রমে গোয়াল, বাগান, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি লইয়া আশ্রম গড়িয়া উঠিল। শিল্প শিক্ষালয়টি বন্ধ হইয়া যায় অর্থাভাবে। সর্বশেষে 'বিনোদ কুটির' নামক গৃহ নির্মিত হয়। এই বাড়ীতে তিনটি ঘর ছিল। উহারই পূর্বদিকের ঘরে তিনি জীবনের শেষ তিন বৎসর কাটাইয়াছিলেন। শরীরে শক্তি সামর্থ্য যতদিন ছিল ততদিন তিনি যখন যেখানে যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে তখন সেখানে সেইরূপ সেবাকার্য্য করিয়াছেন—কোথাও দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য, কোথাও বন্যাপীড়িতদের সেবা, কোথাও বা কলেরারোগীর শুশ্রূষা।

একবার পূর্ববঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ ও কর্মশক্তিহীন। তিনি আর কিছু করিতে না পারিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের মত গাছের পাতা, শাক ও পটল প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া খাইয়া প্রায় পাঁচ ছয় মাস কাটাইলেন। তখন বলিতেন, আমার অন্নগ্রহণ করিবার অধিকার নাই। অনেকে তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিছুই ফল হইল না। শেষে তাঁহার নিকট দেবেন্দ্রনাথ বসু একটি কবিরাজ পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত কবিরাজ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন, 'এইরূপ অনাহারে থাকিয়া আপনার সব শিরা বাহির হইয়া যাইবে, গা দিয়া পূঁজ পড়িবে, দুর্গন্ধ বাহির হইবে। তখন এই সব ছেলেরা আপনার সেবা করিতে খুব কষ্ট পাইবে।' অপরে তাঁহার সেবা করিবে—এই চিন্তা মনে হওয়া মাত্র তিনি পন্থা পরিবর্তনপূর্বক পাঁচ মাস পরে অন্ন গ্রহণ করিলেন। ততদিনে দুর্ভিক্ষও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, এবং নূতন ধান উঠিয়াছে। এই সুদীর্ঘ অনশনের জন্য তাঁহার পরিপাকশক্তি চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে ভূমিকম্পের সময় তিনি আর একবার অতি মাত্রায় বিচলিত হন, এবং ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি নিজে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত সেবাকার্য দেখিতে যান, এবং সেবকগণকে খুব উৎসাহিত করেন।

ইটালীয় দেশভক্ত ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্‌ডির দেশপ্রেম তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিত। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও বুকারটি ওয়াশিংটনের সেবাব্রত তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিত। বাল গঙ্গাধর তিলক ও চিত্তরঞ্জন দাসের ত্যাগ ও দেশ-সেবায় তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। এই দুইজনের মৃত্যুতে তিনি খুব মর্মাহত হন। তিলকের মৃত্যুদিন তিনি উপবাস দ্বারা পালন করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসকে একবার ১৮ পাতা ব্যাপী এক চিঠি এই মর্মে লিখেন :—(১) কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন গ্রামে হওয়া উচিত। (২) কংগ্রেসের সভাপতি মোটরে না গিয়া গরু-গাড়ীতে যাইবেন। (৩) কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিগণ গ্রামবাসীদের খাদ্য খাইবেন।

দেশে খদ্দর প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব হইতে অখণ্ডানন্দ স্বামী তাঁতে বোনা মোটা কাপড় পরিতেন—হয় খদ্দর, না হয় মুর্শিদাবাদের রেশমী কাপড়। তাঁহার আশ্রমে কাপাস গাছ ছিল ও গ্রামে তূলা বিতরণ করা হইত। সূতা কাটা হইয়া আসিলে আশ্রমের তাঁতে কাপড় বোনা হইত। প্রথমে সামান্য একটু কাপড় বুনিয়া তিনি নিজে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'আমি একজন সামান্য সন্ন্যাসী। এই নগণ্য পল্লীতে এই চার আঙ্গুল কাপড় বুনেছি। এর দ্বারা তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর নগ্নতা কিঞ্চিৎ ঢাকতে পেরেছি।'

জীবনসায়াহ্নেও স্বামী অখণ্ডানন্দ গ্রামবাসীদের সেবার জন্য এত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ হইয়াও তিনি দীর্ঘ কাল বেলুড় মঠে থাকিতে পারেন নাই। তিনি সারগাছি গ্রামেই থাকিতেন।

সারগাছিতে সরল গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁহাকে আনন্দের প্রতিমূর্তি মনে হইত। তাই তিনি কার্য্যানুরোধে বাহিরে আসিলে তথায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন।

একদিন এক মুসলমান রমণী আশ্রমের নলকূপ হইতে জল লইয়া কাপড়

ঢাকা দিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়াই তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঢাকা দিতে শিখলি কোথা থেকে ?' রমণী কৃতজ্ঞতার সহিত উত্তর দিল, 'কেন বাবা, তুমিই শিখিয়েছ।'

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'সন্ন্যাসী হয়ে ধর্মের বুলি বলে না বেড়িয়ে বলেছি—"জল ঢেকে রাখবে, মড়কের সময় জল ফুটিয়ে খাবে, নতুন জিনিষ চাষ করবে, প্রতিদিনের আয় থেকে কিছু কিছু জমাবে। যে দিন কাজ করতে পারবে না সেই দিন ঐ পয়সা খরচ করবে। আমার কাছেই ওদের পয়সা জমা থাকত।"

রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সহজে ও ব্যাপকভাবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়—ইহা অনুভব করিয়া দেহত্যাগের পূর্ব বৎসর স্বামী অখণ্ডানন্দ আশ্রমে রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন। তারপর দুইজন ব্রহ্মচারীকে ম্যাজিক লণ্ঠন কাঁধে করিয়া গ্রামে গ্রামে ঠাকুর-স্বামীজির ভাব, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার কথা, দেশবিদেশের সংবাদ প্রভৃতি প্রচার করিতে পাঠাইয়া পরে তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন।

নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা স্বামী অখণ্ডানন্দের চিত্তশুদ্ধি ও দেবত্ব লাভ হইয়াছিল। জীবনের শেষ বৎসরে তাঁহার যে সকল অলৌকিক অনুভূতি হইয়াছিল তন্মধ্যে দুইটী নিম্নে বিবৃত হইল। এক সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারী-কর্মিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মাত্র একটী সেবক তাঁহার ঘরে নীরবে দণ্ডায়মান। এমন সময় লাল-পেড়ে সাড়ী পরা অবগুণ্ঠিতা এক নারীমূর্তি তাঁহার ঘরের দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া অদৃশ্য হইলেন। আশ্রমের সাধুগণ তাঁহার ঘরের বারান্দায় ও পাশের রাস্তায় ছিলেন। তাঁহারা কেহই উক্ত নারী-মূর্তিকে দেখিতে পাইলেন না। ইহা শুনিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিলেন, 'এরা আমাকে প্রণাম করতে এসেছে অন্য লোক থেকে। এই দেখ না, ঘরের কোণে আরও দুটী দাঁড়িয়ে আছে। তোরা দেখতে পাচ্ছিস না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। ওরা আমাকে ডাকতে এসেছে। বেশী দিন আর আমার শরীর থাক্‌বে না।' গরমের

রাত্রে সেবকগণ পালা করিয়া তাঁহাকে সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্য্যন্ত বড় পাখার হাওয়া করিতেন। মধ্য রাত্রে হাওয়া করিতে করিতে এক সেবক দেখিলেন, 'জানালার মধ্য দিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দের ঘরে ও বিছানায় জোৎস্না পড়িয়াছে। দুটী সুকুমার শিশু আলোক-স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গায়ে হাসিতে হাসিতে লুটোপুটি খাইতেছে ও আনন্দ করিতেছে। তাহাদের মাথায় দেবশিশুর মত সোনালী চুল। সেবক ভয়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সব শুনিয়া বলিলেন, 'এরা বালভৈরব। এরা আমার সঙ্গে খেলা করতে আসে। তোরা ভয় করিস কেন? এরা তোদের কোন অনিষ্ট করবে না।' গঙ্গাধর অখণ্ডানন্দের সম্ভবতঃ শিবাংশে জন্ম।)

জীবনের সন্ধ্যায় তাঁহার আর একটি বড় কাজ 'স্মৃতিকথা' রচনা এবং 'উদ্বোধন' ও 'বসুমতী'তে প্রকাশ। কিছু দিন যাবৎ নানা লোককে নানাভাবে রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাস লিখিতে ব্যাপৃত দেখিয়া তিনি নিজেই নিজের জ্ঞাত ও কৃত কর্মের একটি ধারাবাহিক প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন' যদিও গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ তথাপি তাহা হইতে আমরা তাঁহার জীবনের একটা বৃহৎ অংশ দেখিতে পাই।

তাঁহার লেখার ভঙ্গী যেমন জীবন্ত ছিল বলার ভঙ্গীও ছিল তদনুরূপ। আর বিস্ময়কর ছিল তাঁহার স্মৃতিশক্তি। একই ঘটনা গল্পচ্ছলে বহুবার বলিয়াছেন, কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গী হুবহু একরকম। নফর কুণ্ডুর স্মৃতি-সভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া স্বামী সারদানন্দ বলেন, 'ভাই তোমাকে আর সারগাছি যেতে দেবো না। তোমাকে দিয়ে আমাদের অন্য অনেক কাজ হবে।'

উক্ত সভায় স্বামী অখণ্ডানন্দ দধীচির ত্যাগের কথা বলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—'এই শরীর শৃগাল-শকুনির খাদ্য। যদি ইহা দ্বারা কাহারও কোন সেবা হয়ত ভালই।' ভাগবতে উক্ত রন্তিদেবের এই শ্লোকটি তাঁহার খুব প্রিয় ছিল—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাৎ
অষ্টর্দ্ধিযুক্তাম্ অপুনর্ভবং বা।

আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥৯।২১।১২

অনুবাদ—আমি পরমেশ্বরের নিকট অষ্টসিদ্ধিযুক্তা গতি বা মুক্তি কামনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যেন সকল দেহধারীর অন্তরে অবস্থিত হইয়া তাহাদের সমুদায় দুঃখ ভোগ করি এবং যেন আমার দ্বারা সকল দেহীর দুঃখ মোচন হয়।

দেহত্যাগের একমাস পূর্বে স্বামী অখণ্ডানন্দ মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে নিম্নোক্ত শ্লোকের শুদ্ধ পাঠটী আনাইয়াছিলেন। শ্লোকটী ১৯২৭ খ্রীঃ এপ্রিল সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ইহা পরম বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কর্তৃক উক্ত।—

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনাম্ আর্তিনাশনং॥

অনুবাদ—প্রহ্লাদ বলিলেন, 'হে ভগবান্, আমি তোমার নিকট রাজ্য, স্বর্গ বা মুক্তি কামনা করি না। তুমি দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের দুঃখনাশ কর। ইহাই তোমার চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা।'

সকল প্রাণীর দুঃখরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দের হৃদয়ে বজ্রাঘাত করিত। সেইজন্য রন্তিদেব ও প্রহ্লাদের উক্তিদ্বয় তাঁহার এত ভাল লাগিত। উক্ত শ্লোকদ্বয়ে তাঁহার অন্তরের আকুতি প্রকাশিত। ১৮৯৭-১৯২৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি সুদূর পল্লীগ্রামে সেবাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি ১৯২৫ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ সংঘের সহকারী অধ্যক্ষ এবং ১৯৩৪ খ্রীঃ উক্ত সংঘের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও স্বীয় সেবাসদন ত্যাগ করেন নাই। শেষ জীবনে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৩৭ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী একাত্তর বৎসর বয়সে স্বামী অখণ্ডানন্দ বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে ভস্মীভূত হয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দ একাধারে বেদজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ ও সেবাব্রতী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি স্নেহপ্রবণ ও অমায়িক ছিল। আশ্রমের বালকগণ ও সাধুব্রহ্মচারিগণ

তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রীতিভরে তাঁহাকে 'গঙ্গা' নামে সম্বোধন করিতেন। তিনি স্বামীজিকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহার কথায় মাতিয়া যাইতেন। বর্তমান লেখককে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, 'কাল রাত্রে স্বামিজীকে স্বপ্নে দেখলুম। তিনি বল্লেন, 'গঙ্গা ! মুড়ি খেতে দে এবং তোর আশ্রমের বাগানে যে কাঁচা লঙ্কা হয়েছে তা নিয়ে আয়। লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খাবো !' আমি লঙ্কা মুড়ি এনে দিতেই তিনি খেলেন এবং মুড়ি খেতে খেতে বল্লেন, 'দেখ, আফগানিস্থানে ও চীনে আমাদের সংঘের কেন্দ্র খুলতে হবে।' এই বলেই তিনি চলে গেলেন। আমার ইচ্ছা হয়, আফগানিস্থানে যেতে। তুই যাবি আমার সঙ্গে ?' স্বামী ব্রহ্মানন্দও গুরুভ্রাতা গঙ্গাধরের সঙ্গে খুব রঙ্গকৌতুক করিতেন। কোন আশ্রমে দুই গুরুভ্রাতা কিছুদিবস মহানন্দে আছেন। গঙ্গাধর মহারাজকে সারগাছি আশ্রমে যাইতে হইবে। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে বিদায় দিতে চাহেন না। অথচ আশ্রমে প্রত্যাগমনার্থ তিনি রাত্রির গাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটী পাল্কীতে তাঁহাকে ষ্টেশনে পাঠান হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাহকদের কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। ঘণ্টা দুই পরে ট্রেণের সময় অতিক্রান্ত হইলে পাল্কী ষ্টেশনে না যাইয়া অন্য স্থানে ঘুরিয়া আশ্রমে ফিরিল। তখন দুই গুরুভ্রাতা খুব হাস্য ও আনন্দ করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতাগণের এই সম্প্রীতি ধর্মসংঘে অতুলনীয় ও অনুকরণীয়। এই প্রীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রামকৃষ্ণ সংঘ স্থাপিত ও সমৃদ্ধ। স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান স্তম্ভ।

নয়

স্বামী যোগানন্দ

"মুক্তাত্মানমতিস্থিরং ধ্যাননিষ্ঠমহর্নিশম্।
নমামি শ্রীযোগানন্দমানন্দকন্দমন্দরম্॥"

ক্ষুদ্র গ্রাম দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থানরূপে সভ্য জগতে সুবিদিত। ইহা ব্রাহ্মণ বসতিপ্রধান, গঙ্গাতীরবর্তী এবং কলিকাতার অদূরে অবস্থিত। উত্তরে শিবতলা হইতে দক্ষিণে কালীঘাট পর্য্যন্ত ভূমি 'কালিকাক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণেশ্বর এই কালিকাক্ষেত্রের অন্তর্গত এবং প্রাচীন। তথায় এখনও বাণরাজার দেউল ও দীঘির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ঠাকুরের সুপ্রকট অবস্থায় কলিকাতা এবং সন্নিকট ও সুদূর স্থান হইতে বহু নরনারী তাঁহার কাছে আসিলেও দক্ষিণেশ্বরের ব্রাহ্মণগণ ও ভদ্রমণ্ডলী তাঁহার নিকট তেমন যাইতেন না। প্রদীপের তলে অন্ধকার থাকাই স্বাভাবিক।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সুবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী বংশে নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে এক অতি নির্বিরোধী সদ্ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি এককালে ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই বাস করিতেন। তাঁহার বাসভবন ভারত-ভাগবতাদি গ্রন্থপাঠে এবং পূজা ও কীর্তনাদিতে সর্বদা মুখরিত থাকিত। ঠাকুর সাধনকালে বহুবার উক্ত ভবনে হরিকথা শুনিতে গিয়াছিলেন এবং এই সূত্রে কর্তাদের কাহারো কাহারো সহিত পরিচিত হন। নবীনচন্দ্রের মত মিষ্টভাষী সদাশয় লোক কদাচ দেখা যায়। তাঁহার পুত্র যোগীন্দ্রনাথই স্বামী যোগানন্দ নামে রামকৃষ্ণ সংঘে পরিচিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শ সন্ন্যাসী শিষ্যের অন্যতম। ঠাকুর তাঁহার যে ছয়টী শিষ্যকে ঈশ্বরকোটীরূপে নির্দেশ করিতেন স্বামী যোগানন্দ ছিলেন তাঁহাদের একজন। ১৮৬১ খ্রীঃ তাঁহার জন্ম হয়। আজন্ম অসাধারণ শুভ সংস্কার লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসেন। উপনয়নের পর তিনি গায়ত্রীজপ ও

পূজাদি আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত করিতেন। গৃহদেবতার পূজাকালে তিনি কখনো কখনো গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মন ধ্যানপ্রবণ ও অন্তর্মুখী ছিল। বালক যোগীন্দ্র সঙ্গীদের সহিত খেলা করিতে করিতে গম্ভীর হইয়া যাইতেন এবং একদৃষ্টে নীলাকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেন, "আমি এই পৃথিবীর লোক নহি। অতি দূরে কোন এক নক্ষত্রপুঞ্জে আমার আবাস, এবং সেখানেই পূর্বপরিচিত সঙ্গীসকল এখনও রহিয়াছে।"

যোগীন্দ্রনাথের সহপাঠী ও গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় * লিখিয়াছেন, "জমিদার বংশসম্ভূত হইলেও বিলাসিতা কোনদিন যোগীনের প্রকৃতিতে লক্ষ্য করি নাই। এমন কি, জামা ও বুট জুতা পরা যোগীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিতেই পারি না। মনে পড়ে, স্কুলে যাইতে অতিরিক্তের মধ্যে চটী ও চাদর (উত্তরীয়) দেখিয়াছি। তরুণ বয়সে স্বধর্মমত প্রচার, বন্ধু-বহুলতা, চাপল্য, উচ্চ হাস্য বা মাতামাতি ছিল না। বরং আপন মনে একটু তফাতে তফাতে থাকাই তাঁহার স্বভাব ছিল। সমবয়স্কদের সহিত কখনো বিরোধ বিতর্কও লক্ষ্য করি নাই, স্বল্পভাষী নিরীহ ধীরই ছিলেন। এরূপ প্রকৃতির ছেলেরা বন্ধুদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত না হইলেও তাহাদের শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হয় না। যোগীন্দ্রনাথকেও সকলেই ভালবাসিত। কিন্তু রাসমণির বাগানে গিয়া পরমহংসদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইবার পর হইতে তাঁহার অধিকাংশ সময় সেইখানেই কাটিতে থাকে। তাহাতে বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টাবিদ্রূপ তাহাকে যথেষ্টই সহিতে হইত। তিনি মৃদু হাস্যে গ্রহণ করিতেন, স্বপক্ষে কোনদিন কিছু বলিতে শুনি নাই।" স্বামী সারদানন্দ বলেন, 'যোগীন্দ্র বাল্যকাল হইতে ধীর, বিনয়ী ও মধুর প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। আমরা তাঁহাকে কখন ক্রোধ করিতে দেখি নাই।' স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'আমাদিগের ভিতর যদি কেহ সর্বতোভাবে কামজিৎ থাকে ত সে যোগীন।' সাধারণতঃ লোকের চোখ দিয়ে অশ্রু পড়ে নাকে দিকের যে কোণদ্বয় আছে সেই দিকে, কিন্তু যোগীন্দ্রের পড়িত কাণের দিকে চোখের যে কোণদ্বয় সেই দিক দিয়া। যোগীন্দ্রনাথের

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪৩ আশ্বিন সংখ্যায় তাঁহার 'স্বামী যোগানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে।

বয়স যখন ষোল সতের বৎসর এবং তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পড়িতেছিলেন তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করেন। উপনয়নের পর পুষ্পচয়নের উদ্দেশ্যে কালীবাড়ীতে যাইয়া তিনি প্রতিবেশী পরমহংসের দর্শন পাইলেন। সম্ভবতঃ ইহা ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরও পরিচিত নবীনচন্দ্রের পুত্র বলিয়া যোগীন্দ্রকে সহজেই আপনার করিয়া লইলেন। তিনি প্রথম দর্শনেই বালকের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বুঝিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে আসিতে বলেন। বালকও ঠাকুরের সস্নেহ ব্যবহার ও সুমিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার কাছে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। পাছে পিতামাতার আপত্তি হয় এই ভয়ে তিনি গোপনে ঠাকুরের কাছে আসিতেন। কিন্তু প্রেমও পাপের মত গুপ্ত থাকে না। অনতিবিলম্বে পিতামাতা ও বন্ধুগণ জানিতে পারিলেন যে, যোগীন্দ্র পরমহংসদেবের পরম ভক্ত হইয়াছেন।

যোগীন্দ্রনাথের কোন ঐহিক আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁহার পিতা গৃহ-বিবাদাদি নানা কারণে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। সেই জন্য তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ অসম্ভব মনে করিয়া কানপুরে কাকার কাছে যাইয়া চাকুরীর সন্ধানে রহিলেন। কিন্তু কয়েকমাস চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না। এই সময় তিনি ধর্মসাধনায় ডুবিয়া গেলেন। নির্জনবাস, বাক্‌সংযম এবং উদাসীন ভাব তাঁহাকে অভিভূত করিল। তিনি এত ধ্যান করিতেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় সর্বদা লাল হইয়া থাকিত। ধ্যান এত গভীর হইত যে, কাকা চীৎকারপূর্বক ডাকিয়াও তাঁহার সাড়া পান নাই। তাঁহার কাকা ভাবিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ত পাগল হইয়া যাইবে। তিনি ভ্রাতা নবীনচন্দ্রকে লিখিয়া শীঘ্র যোগীন্দ্রনাথের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। সকল ব্যবস্থা যোগীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারে হইল। পাছে পুত্র বিবাহে অসম্মত হন, এইজন্য পিতা উক্ত কৌশল অবলম্বন করিলেন। বাড়ী হইতে অসুখের সংবাদ আসিল। মাতার প্রতি যোগীন্দ্রনাথ অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। মাতার অসুখ ভাবিয়া তিনি অবিলম্বে গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু তিনি গৃহে আসিয়া দেখিলেন, অসুখের সংবাদ মিথ্যা, তাঁহার বিবাহের আয়োজন সব প্রস্তুত! তাঁহার কোমল হৃদয় এইবার তাঁহাকে বিপন্ন করিল। পিতা কন্যাপক্ষকে

কথা দিয়াছিলেন। পিতার বাক্যদান ও মাতার অশ্রু ঠাকুরের নিকট প্রদত্ত চিরকৌমার্য্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাইল। মাতাপিতার নিকট যোগীন্দ্রনাথের কাতর অনুনয়-বিনয় নিষ্ফল হইল। মধুসূদন রায়ের পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়া গেল। তাঁহার প্রাণশূন্য দেহেরই সঙ্গে যেন এই বিবাহ সম্পন্ন হইল! পিতার সত্য ও মাতার আজ্ঞারক্ষার্থ বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও তিনি সংসারে বদ্ধ হইলেন না।

বিবাহ করিয়া তিনি এত অনুতপ্ত হইলেন যে, ঠাকুরের নিকট যাওয়া বন্ধ করিলেন। ঠাকুর বারবার সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু যোগীন লজ্জায় আসিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে আনাইবার জন্য এক কৌশল করিলেন। তিনি যোগীনের এক বন্ধুকে বলিলেন, 'যোগীন আমার কাছে কিছু টাকা নিয়েছিল। কি আশ্চর্য! সে পয়সা ফেরৎ দিলে না, বা তার কোন হিসাবও দিলে না।' বন্ধুর নিকট এই কথা শুনিয়া যোগীন দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, কানপুর যাইবার পূর্বে কোন দ্রব্য কিনিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে কয়েকটী টাকা দিয়াছিলেন এবং উহার উদ্বৃত্ত দুই চারি আনা মাত্র তাঁহার নিকট ছিল। ক্রীত দ্রব্যটী লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শীঘ্র কানপুর যাইতে হওয়ায় তিনি বাকী পয়সা ফেরৎ দিতে সময় পান নাই। কানপুর হইতে আসার পর বিবাহের জন্য লজ্জাহেতু ঠাকুরের নিকট যাইয়া সেই পয়সা ফেরৎ দিতে পারেন নাই। বন্ধুর নিকট ঠাকুরের কথা শুনিয়া তিনি মর্মাহত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাকী পয়সা লইয়া ঠাকুরের কাছে গেলেন। ঠাকুর তখন স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র কোলে রাখিয়া নিজের খাটটীতে ভাবাবেশে বসিয়াছিলেন। যোগীন তাঁহার ঘরে ঢুকিতেই তিনি যোগীনকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শিশুর মত কাপড়টী বগলে করিয়া ছুটিয়া গেলেন। ঠাকুর অনেকদিন পর যোগীনকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, 'বিবাহ করিয়াছিস্ তাতে ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকিলে লাখটা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। একদিন তাকে (স্ত্রীকে) এখানে আনিস্। আমি তাহার মন এমন পরিবর্তিত করে দেব যে, সে তোর ধর্মজীবনের বাধাস্বরূপ না হইয়া সহায়ক হইবে।' ঠাকুরের আশ্বাস বাক্যে

যোগীনের হতাশ ভাব ও মনস্তাপ কাটিয়া গেল। তিনি জীবনপথে অরুণ আলোক দেখিতে পাইলেন। নূতন আশা উৎসাহে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইল। বিদায় লইবার কালে তিনি ঠাকুরকে বাকী পয়সা ফেরৎ দিবার কথা বলিতে যাইলে তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি এই ঘটনার পর শতগুণে বাড়িয়া গেল। তিনি পুনরায় ঠাকুরের নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। বিবাহ দ্বারা যোগীন্দ্রের মন সংসারে আকৃষ্ট হইল না। পুত্রকে বিষয়কর্মে ও অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া মাতা একদিন তাঁহাকে তিরস্কারের সুরে বলিলেন, 'যদি উপার্জনে মন দিবি না তবে বিবাহ করিলি কেন ?' পুত্র বলিলেন, 'আমি ঐ সময় তোমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলাম, 'বিবাহ করিব না। তোমার ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়াই ত পরিশেষে সম্মত হইলাম।' মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া বসিলেন, 'ওটা কি আবার একটা কথা! ভিতরে ইচ্ছা না হইলে তুই আমার কথায় বিয়ে করছিস্, ইহা কি সম্ভবে ?' মাতার তিরস্কারে যোগীন্দ্র নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হা ভগবান! যাঁহার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তোমাকে ছাড়িতে উদ্যত হইলাম তিনিই এই কথা বলিলেন! দূর হক, এই সংসারে মন ও মুখ মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কাহারো নাই।' সেইদিন হইতে তিনি সংসারে একেবারে বীতরাগ হইলেন এবং বুঝিলেন, ঠাকুরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁহাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসেন। তিনি এখন হইতে ঠাকুরের নিকট দিনের অধিকাংশ সময় এবং কখনো বা রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন! ঠাকুরও এই সুযোগে তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যের ধর্মজীবন গঠনে মনোযোগ দিলেন।

একদিন ঠাকুর যোগীনের সহিত সকালে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যোগীন তখন আহারাদিতে বিশেষ আচারী, কাহারও বাটীতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন না। কাজেই নিজ বাটীতে সামান্য জলযোগ করিয়াই ঠাকুরের সহিত আসিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে কোথায়ও খাইতে অনুরোধ করেন নাই। কারণ, যোগীনের নিষ্ঠাচারিতার বিষয় তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কেবল বলরাম বসুর শ্রদ্ধাভক্তি এবং ঠাকুরের উপর বিশ্বাস দেখিয়া

তাঁহার বাটীতে ফলমূল, দুগ্ধ, মিষ্টান্নাদি পূর্বাবধি গ্রহণ করিতেন। সেইজন্য পৌঁছিবার কিছু পরেই ঠাকুর যোগীনকে দেখাইয়া বলরামকে বলিলেন, 'ওগো, আজ এর খাওয়া হয়নি ; একে কিছু খেতে দাও।' বলরামও যোগীনকে সাদরে অন্দরে লইয়া যাইয়া জলযোগ করাইলেন। ঠাকুরের সব বিষয়ে দৃষ্টি থাকিত। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরাম বসুর বাটীতে যাইতেছেন। সঙ্গে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ও শিষ্য যোগীন্দ্র ছিলেন। সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী বাগানের ফটক পর্যন্ত আসিবামাত্র ঠাকুর যোগীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, নাইবার কাপড় ও গামছা এনেছিস ত ? যোগীন—'না মশাই, গামছা এনেছি, কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে। তারা আপনার জন্য একখানা নূতন কাপড় দেখে শুনে দেবে এখন।' ঠাকুর—'ওকি তোর কথা ? লোকে বলবে, কোথা থেকে একটা হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে। যা গাড়ী থামিয়ে নেমে গিয়ে কাপড় নিয়ে আয়।' কাজেই যোগীন তদ্রূপ করিলেন। বাটীতে একটী কড়ার আবশ্যক হওয়ায় যোগীন একদিন বড়বাজারে একটী কড়া কিনিতে গেলেন। দোকানদারকে ধর্মভয় দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখো বাপু, ঠিক ঠিক দাম নিয়ে ভাল জিনিষ দিও, ফাটাফুটো না হয়।' দোকানদারও 'আজ্ঞা মশায়, তা দিব বই কি,' ইত্যাদি বলিয়া বাছিয়া একটী কড়া তাঁহাকে দিল। যোগীনও দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া কড়াটি না পরীক্ষা করিয়াই লইয়া আসিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াই দেখিলেন, কড়াখানি ফাটা। ঠাকুর ইহা শুনিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'সে কিরে, জিনিষটা আনলি, দেখে আনলি নি ? দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে, সেত আর ধর্ম করতে বসে নি ! তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি ? ভক্ত হবি ; তা বলে বোকা হবি কেন ? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে ? ঠিক ঠিক জিনিষ দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। ওজনে কম দিল কিনা তা দেখে নিবি। আবার যে সব জিনিষের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনিষ কিন্‌তে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত নিয়ে আসবি।'

যোগীন্দ্রের প্রকৃতি অতিশয় কোমল ছিল। প্রাণীহত্যা দূরের কথা, একটী পতঙ্গবধ করিতেও তিনি পারিতেন না। কিন্তু কোমলতার আধিক্য অনেক সময়

কষ্টের কারণ এবং ধর্ম সাধনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ঠাকুর শিষ্যের অতিশয় কোমলতা দূর করিবার জন্য এইরূপে শিক্ষা দিলেন। তাঁহার কাপড়ের পুঁটলিতে অনেক আরসুলা বাসা বাঁধিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তিনি যোগীনকে বলিলেন, 'পুঁটলিটা রোদে দে এবং আরসুলাগুলো মেরে ফেল।' যোগীন পুঁটলিটা বাহিরে লইয়া রোদে রাখিলেন; কিন্তু কোমল স্বভাববশতঃ আরসুলাগুলি না মারিয়া দূরে ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিলেন, ঠাকুর এই বিষয় হয়ত আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু তিনি আসামাত্র ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে আরসুলা গুলো মেরে ফেলেছিস্ ত?' যোগীন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'না মহাশয়, ছাড়িয়া দিয়াছি।' ঠাকুর ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, 'আমি তোকে মারিয়া ফেলিতে বলিলাম, তুই কিনা সে গুলোকে ছাড়িয়া দিলি! যেমনটী করিতে বলিব ঠিক সেইরূপ করিবি, নতুবা ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয় সকলেও নিজের মতে চলিয়া পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হইবে।'

যোগীন্দ্র একদিন কলিকাতা হইতে নৌকায় দক্ষিণেশ্বর ফিরিতেছিলেন। নৌকার এক আরোহীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তিনি রাসমণির কালীবাড়ীতে ঠাকুরের কাছে যাইতেছেন।' এই কথা শুনিয়াই অজ্ঞ আরোহী অকারণে ঠাকুরের নিন্দা করিতে লাগিলেন। গুরুনিন্দা শ্রবণে শিষ্য মর্মাহত হইলেন, কিন্তু প্রশান্ত প্রকৃতির বশে কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া মৌন রহিলেন। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি উক্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। ঠাকুর ঘটনাটী পৃথক দৃষ্টিতে দেখিয়া শিষ্যের আচরণ সম্বন্ধে বলিয়া বসিলেন, 'আমার অযথা নিন্দা করিল, আর তুই কিনা তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া আসিলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস্? গুরুনিন্দাকারীর মাথা কাটিয়া ফেলিবে, অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করিলি না?'

ঠাকুরের নিকট আসিবার অল্প দিন পরেই কালীবাড়ীতে যোগীন্দ্র একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, 'মহাশয়, কাম কি করে যায়?' ঠাকুর উত্তরে বলিলেন, 'খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।' কথাটা যোগীনের একটুও মনঃপূত হইল

না। তিনি ভাবিলেন, 'উনি কোন ক্রিয়াট্রিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে যদি কাম যায় তবে এত লোক ত হরিনাম কচ্ছে ; তাদের কাম যাচ্ছে না কেন ?' তখন নারায়ণ নামে এক হঠযোগী পঞ্চবটী-তলে কুটীরে থাকিয়া নেতি ধৌতি আদি যৌগিক ক্রিয়া দেখাইয়া যোগীনপ্রমুখ যুবকদের কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছিলেন। যোগীন ঐ সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, 'এই সব না করিলে বোধ হয় কাম যায় না, বা ভগবান দর্শন হয় না।' ঠাকুরকে উপরোক্ত প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে একটা আসন বা মুদ্রা বলিয়া দিবেন, বা হরীতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন বা প্রাণায়ামের কোন প্রক্রিয়া শিখাইবেন। কিন্তু ঠাকুর সে সব না করিয়া উপরোক্ত সরল উত্তর দিলেন। একদিন যোগীন কালীবাটীর বাগানে আসিয়া ঠাকুরের কাছে না যাইয়া হঠযোগীর কাছে গেলেন এবং মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে ছিলেন, এমন সময় ঠাকুর সেখানে যাইয়া উপস্থিত! শিষ্যকে তথায় দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তিনি স্বীয় ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, 'তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস্ নি। ওসব হঠযোগের ক্রিয়া শিখলে ও করলে শরীরের উপর মন পড়ে থাকবে, ভগবানের দিকে যাবে না।' ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়া যোগীন ভাবিলেন, 'পাছে আমি ওঁর কাছে না আসি তাই বোধ হয় ইনি এসব বলছেন। তারপর মনে হলো, উনি যা বলেছেন তা করেই দেখি না কেন কি হয়?' এইরূপ স্থির করিয়া তখন হইতে এক মনে খুব হরিনাম করিতে লাগিলেন। আর বাস্তবিকই অল্প দিনের মধ্যে, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পাইতে লাগিলেন।

একবার কালীবাড়ীতে সারাদিন ঠাকুরের নিকট কাটাইয়া যোগীন্দ্র দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহে ফিরিলেন। কোনরূপ প্রয়োজন হইলে রাত্রে লোকাভাবে ঠাকুরের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া তিনি সে রাত্রি ঠাকুরের কাছে কাটাইতে সংকল্প করিলেন। ঠাকুরও শিষ্যের সংকল্প জানিয়া অতীব প্রসন্ন হইলেন এবং রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিলেন। অনন্তর ঠাকুরের জলযোগ এবং যোগীনের ভোজন হইল। ঠাকুর যোগীনকে স্বীয়

গৃহ মধ্যে শুইতে বলিয়া নিজে শয্যাগ্রহণ করিলেন। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর গত হইলে ঠাকুরের বহির্গমনের ইচ্ছা হয়। ঠাকুর যোগীনের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তিনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইলে কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহাকে না ডাকিয়া ঠাকুর একাকী পঞ্চবটী পার হইয়া ঝাউতলার দিকে গেলেন। যোগীন্দ্র চিরকাল স্বল্পনিদ্র ছিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহের দ্বার খোলা দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং শয্যায় ঠাকুরকে না দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'তিনি এত রাত্রে গেলেন কোথায় ?' গাড়ু প্রভৃতি জলপাত্র সকল যথাস্থানে আছে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, ঠাকুর বোধ হয় বাহিরে পাদচারণ করিতেছেন। তিনি বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নালোকের সাহায্যে চারিদিকে তাকাইয়া ঠাকুরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে এই দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল—তবে কি ঠাকুর নহবতে নিজ পত্নীর নিকট শয়ন করিতে গিয়াছেন ? তবে কি তিনি যাহা বলেন কার্য্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করেন ?

এই চিন্তা মনে হইবামাত্র সন্দেহ, ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে তিনি অভিভূত হইলেন! কিন্তু নিতান্ত কঠোর ও রুচিবিরুদ্ধ হইলেও যাহা সত্য তাহা জানিতে হইবে। অনন্তর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দাঁড়াইয়া নহবত খানার দ্বারদেশ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। একটু পরেই পঞ্চবটীর দিক হইতে চটী জুতার চট্‌চট্ শব্দ শোনা গেল এবং অবিলম্বে ঠাকুর আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যোগীনকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'কিরে তুই এখানে দাঁড়াইয়া আছিস্ যে ?' গুরুর উপরে মিথ্যা সন্দেহজনিত লজ্জায় এবং ভয়ে জড়সড় হইয়া শিষ্য অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন ও ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অন্তর্দর্শী ঠাকুর শিষ্যের মুখ দেখিয়াই সকল কথা বুঝিতে পারিলেন এবং অপরাধ না লইয়া আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, 'বেশ, বেশ। সাধুকে দিনে দেখিবি, রাত্রে দেখিবি, তবে বিশ্বাস করিবি।' সন্দিগ্ধ স্বভাবের প্রেরণায় ভয়ানক অপরাধ করিয়াছেন ভাবিয়া সে রাত্রে যোগীন্দ্রের আর ঘুম হইল না। গুরুপদে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রথমে গুরুর এবং তাঁহার

অন্তর্ধানে গুরুপত্নীর সেবায় প্রাণপাত করিয়া শিষ্য পর জীবনে এই অপরাধের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

একদিন পূর্বাহ্নে আট নয়টার সময় ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফলমূলাদি আসিবার বন্দোবস্ত আছে তাহা তখনও আসে নাই। কালীমন্দিরের পূজারী ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। পূজারীর কথা শুনিয়াই তিনি ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন, প্রসাদ আসিল না তখন চটীজুতা পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট যাইয়া বলিলেন, 'হ্যাগা, ও ঘরে বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন? ভুল হলো নাকি? চিরকেলে মামুলী বন্দোবস্ত এখন ভুলে বন্ধ হবে, বড় অন্যায় কথা!' খাজাঞ্চী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'এখনও আপনার ওখানে প্রসাদ যায় নি! বড় অন্যায় কথা। আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি।' প্রসাদের জন্য ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া বালক যোগীন ঠাকুরকে বলিয়া ফেলিলেন, 'তা নাই বা এল মশায়, ভারী তো জিনিষ! আপনার ত ওসব পেটে সয় না, ওর কিছুই ত খান না। তখন নাই বা দিলে?' যোগীনের এই কথায় কর্ণপাত না করিয়াই ঠাকুর খাজাঞ্চীর কাছে গিয়াছিলেন। তখন যোগীন ভাবিতে লাগিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! ইনি আজ সামান্য ফলমূল ও মিষ্টান্নের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? যাঁকে কিছুতে বিচলিত হতে দেখি নি, তাঁর আজ এ ভাব কেন?' ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোন কারণ না পাইয়া শেষে এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, 'বুঝিয়াছি, ঠাকুরই হন আর যত বড় লোকই হন আকরে টানে আর কি? বংশানুক্রমে চালকলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন। সে বংশের গুণ একটু না একটু থাক্‌বে ত? তাই আর কি! বড় বড় বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হন না। কিন্তু এই সামান্য বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নইলে নিজে ওসব খাবেন না, নিজের কোন দরকারেই লাগবে না। তবু তার জন্য এত ভাবনা কেন? বংশানুগত অভ্যাস!' এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যের মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কি

জানিস্, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধুসন্ত ভক্ত লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে। এখানে যা প্রসাদী জিনিষ আসে তা ভক্তেরাই খায়। ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে তারাই পায়। এতে রাসমণির যে জন্য দেওয়া তা সার্থক হয়। আর ঠাকুরবাড়ীর বামুনেরা যা নিয়ে যায় তার কি ঐরূপ সদ্ব্যবহার হয়? তারা চাল বেচে পয়সা করে। কারো কারো আবার বেশ্যা আছে। ঐসব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়, রাসমণির যে জন্য দান, তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।' ঠাকুরের সামান্য কাজেরও এত গূঢ় অর্থ জানিয়া যোগীন অবাক্ হইলেন।

ঠাকুর যখন শেষ অসুখের সময় শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ছিলেন তখন যোগীন প্রাণপণে শ্রীগুরুর সেবা করেন। মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বে ঠাকুর যোগীনকে ডাকিয়া পঞ্জিকা দেখিতে বলিলেন। যোগীন পঞ্জিকা দেখিয়া একটী শুভ দিনের বিষয় পড়িতেছিলেন। তখন ঠাকুর তাঁহাকে থামিতে বলেন। উক্ত দিনেই ঠাকুরের মহাসমাধি হয়। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে যাইয়া প্রায় এক বৎসর অবস্থান করেন। তখন যোগীন ও লাটু মায়ের সেবক ছিলেন। যোগীন ঐ সময় বৃন্দাবনে কঠোর তপস্যা করেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা বেলুড় গ্রামে বর্তমান মঠের অদূরে একটী ভাড়া-বাড়ীতে ছিলেন। তখনও যোগীন মায়ের সেবক। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীন গৃহত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নাম হয় স্বামী যোগানন্দ। তখন যোগীনের মাতা, পিতা ও শ্বশুরের ভুল ভাঙ্গিল এবং তাঁহারা আন্তরিক অনুতপ্ত হইলেন। শ্বশুরের বাটী পিতৃগৃহের আধ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। কিছুদিন পরে শ্বশুর মধুসূদন রায় গঙ্গাতীরে একটি ঘাট নির্মাণ করাইয়া তাহার উপরে নির্মিত কুটীরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কন্যাটিকে লইয়া সেইখানেই জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটাইয়া গিয়াছেন। কন্যাও বিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় পতিবিরহে বৈরাগ্যবতী হইয়া কালীমাতার সেবা ও ধ্যান ধারণায় নিজেকে একাগ্রমনে নিযুক্ত রাখিয়া অতি সহজেই জগদম্বার পাদপদ্মে দেহ মন অর্পণ করিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে বেলুড় মঠে আসিতে দেখিয়াছি।

যোগীন্দ্রের ভ্রাতা রামও উপরোক্ত গঙ্গাতীরস্থ ঘাটটিতে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। নবীনচন্দ্র পুত্রের পূর্ব হইতেই পরমহংসদেবের সহিত পরিচিত ছিলেন। পুত্রের সংসারত্যাগে তিনি ব্যথিত হইলেও বিদ্রোহী হন নাই। শেষ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ সংঘে ও বেলুড় মঠে তাঁহার যাতায়াত ছিল।

১৮৯১ খ্রীঃ স্বামী যোগানন্দ কাশীতে কঠোর তপস্যা করেন। তথায় কোন বাগানবাটীর একটী নির্জন কুটীরে থাকিতেন এবং ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। ভিক্ষার জন্য যেটুকু সময় লাগিত তাহা ব্যয় করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইত না। একদিন রুটী ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং ঐ রুটী জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তিন চার দিন ধরিয়া খাইতেন। তখন কাশীতে মহা দাঙ্গা চলিতেছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী স্থানে দাঙ্গার উভয় পক্ষের লোকেরা তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। কঠোর তপস্যায় তাঁহার স্বাস্থ্য চিরতরে ভগ্ন হইল। তিনি আর পূর্ণ স্বাস্থ্য কখনও ফিরিয়া পান নাই। কাশী হইতে তিনি অসুস্থ হইয়া বরাহনগর মঠে ফিরিলেন। অসুস্থতা সত্বেও তাঁর মুখ সদা আনন্দোজ্জ্বল থাকিত এবং তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সহিত কৌতুকাদিতে যোগ দিতেন। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিলে স্বামী যোগানন্দ পুনরায় প্রায় এক বৎসর মাতৃসেবায় নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি প্রধানতঃ বলরাম বসুর বাটীতে থাকিতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত পেটের অসুখে ভুগিয়াছিলেন।

বিরাটভাবে ঠাকুরের জন্মোৎসবের প্রথম আয়োজন স্বামী যোগানন্দ করেন দক্ষিণেশ্বরে। নানা বাধাবিপত্তি সত্বেও তিনি অনুগত যুবকগণের সাহায্যে উক্ত উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে যখন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন তখন স্বামী যোগানন্দের নেতৃত্বে বিপুল সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়। স্বামিজী যখন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গুরুভ্রাতাগণের নিকট করেন তখন স্বামী যোগানন্দ প্রতিবাদ-পূর্বক বলেন, 'ঠাকুর আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরলাভের জন্য আকুল হইতে বলিয়াছেন, কর্ম করিতে বলেন নাই।' রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইলে স্বামী যোগানন্দ উহার অন্যতম অধিনায়ক ও পরিচালক নিযুক্ত হন। শুনা যায়,

বলরাম মন্দিরে স্বামী যোগানন্দ গুরুভ্রাতাদের পক্ষ হইতে স্বামিজীর সহিত মিশন স্থাপনের বিরুদ্ধে ঘোর তর্ক করেন। শেষ জীবনে তিনি পুনরায় শ্রীশ্রীমার সেবায় ব্রতী হন। তখন তাঁহার শরীর দুর্বল হওয়ায় তিনি এক যুবক ব্রহ্মচারীকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করেন। শ্রীশ্রীমার নিকট বহু স্ত্রীভক্ত আসিতেন। সেইজন্য স্বামীজী যোগানন্দজীকে যুবক ব্রহ্মচারীকে সহকারীরূপে রাখিবার জন্য তিরস্কার করেন এবং বলেন, 'ব্রহ্মচারীর মন নিম্নমুখী হইলে কে তাহার জন্য দায়ী হইবে?' স্বামী যোগানন্দ বলিলেন, 'আমিই দায়ী হইব। আমি তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।'

১৮৯৮ খ্রীঃ স্বামী যোগানন্দ বেলুড়ের পার্শ্ববর্তী স্থানে ঠাকুরের জন্মোৎসব বিরাটভাবে সম্পন্ন করেন। শেষ জীবনে তিনি অতিশয় রক্তামাশয়ে ও জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। তাঁহার অসুখ বাড়িতে দেখিলে শ্রীশ্রীমা বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেন। আবার তিনি একটু ভাল আছেন দেখিলে মা নিজেও ভাল বোধ করিতেন। তাঁহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মার শরীর শুকাইয়া গিয়াছিল। স্বামী যোগানন্দ আটত্রিশ বৎসর বয়সে ১৮৯৯ খ্রীঃ ২৮শে মার্চ (১৩০৫ সালের ১৫ই মাঘ) অকালে মহাসমাধিমগ্ন হন। তাঁহার দেহরক্ষার কথা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, 'বাড়ীর একখানা ইট খস্‌ল, এবার সব যাবে।' ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী যোগানন্দই প্রথম দেহরক্ষা করেন। তাঁহার দেহরক্ষা অতি অদ্ভুত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার জ্ঞান ও ভক্তি এত বেড়েছে যে, আমি তা' প্রকাশ করতে পারি না।' যে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা তাঁর মহাসমাধির কালে শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, তিনি বলেন, 'আমরা সহসা অনুভব করিলাম, আমাদের মন উচ্চ ভূমিতে উঠিতেছে এবং বুঝিলাম যোগানন্দের মন ঊর্ধ্বতম লোকে গমন করিতেছে।' স্বামী যোগানন্দের মৃত্যুতে স্বামিজী মর্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাদের যাওয়ার পালা সুরু হল।' স্বামী সারদানন্দ বলেন, 'স্বামী যোগানন্দের ন্যায় তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন, জ্ঞান ও ভক্তির সমভাবে অধিকারী, সমাধিবান্ যোগীপুরুষ রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীসংঘে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।'

স্বামী যোগানন্দ দ্বাদশ বৎসর কাল যাঁহার সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, সেই সারদা দেবী বিভিন্ন সময়ে স্বামী যোগানন্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া ছিলেন।—'যোগীনের মত আমায় কেউ ভালবাসত না। আমার যোগীনকে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত সে রেখে দিত এবং বল্‌ত, মা তীর্থে টীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন। সর্বক্ষণ আমার কাছে বসে থাকত।' 'যোগীন আমাকে বল্‌ত, মা, তুমি আমাকে 'যোগা' 'যোগা' বলে ডাকবে।' 'যোগীন দু'আনা, চার আনা, আট আনা করে ছয় শত টাকা আমার জন্য জমিয়েছিল।' 'যোগীন যখন দেহ রাখলে, নির্বাণ চাইলে। গিরিশ বাবু বললেন, 'দ্যাখ যোগীন, নির্বাণ নিস্‌নি। ঠাকুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন, চন্দ্রসূর্য তাঁর চক্ষু, অত বড় ভাবিস্ নি। যেমন ঠাকুরটি ছিলেন, তেমনটি ভেবে ভেবে চলে যা।' যোগীন যখন দেহ রাখলে সে বল্‌লে, 'মা, আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ঠাকুর।' *

শ্রীশ্রীমা নিজমুখে বলিয়াছিলেন যে, স্বামী যোগানন্দ জন্মান্তরে অর্জুন ছিলেন। কৃষ্ণসখা গাণ্ডিবী ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে শ্রীভগবানের রামকৃষ্ণ-লীলার পার্ষদ। স্বামী যোগানন্দ শ্রীশ্রীমাকে একখানা লেপ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক বৎসর পরে তাহা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়। উহার তুলাটা পিঁজাইয়া লইয়া একটা নূতন খোল দিয়া লেপখানির সংস্কার করিয়া আনিবার জন্য মা কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কার করিলে তাঁহার যোগীনের দেওয়া জিনিষ আর তেমনটি থাকিবে না, অন্যরূপ ধারণ করিবে; ইহা ভাবিতেই যেন মার প্রাণে ব্যথা লাগিল। তিনি উহার সংস্কারেচ্ছা ত্যাগ করিয়া পুনরায় ভক্তটীর সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন, 'না বাবা, লেপটা নিয়ে যেয়ে কাজ নেই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল! এটী দেখিলেই যোগীনকে মনে পড়ে।'

দুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা বেলুড়মঠে আসিয়াছেন। তখন ঠাকুরঘরের সম্মুখের দেওয়ালে স্বামী যোগানন্দের একখানি তৈলচিত্র লম্বিত ছিল। মা

---

* ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' পুস্তকে ৯০—৯২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

ঠাকুরঘরে উঠিয়া চিত্রখানির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ঠাকুরঘরে যাইয়া ঠাকুরকে দর্শনমাত্র করিয়াই চলিয়া আসিলেন। স্বর্গগত সেবক সন্তানের মধুর স্মৃতি মাতৃহৃদয়কে আলোড়িত করিল। স্বামী যোগানন্দের পরে স্বামী সারদানন্দ একুশ বৎসর মায়ের সেবাধিকার লাভ করেন। মা বলিতেন, 'শরৎ আর যোগীন, এদুটি আমার অন্তরঙ্গ।'

দশ

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

"পূর্ণচন্দ্রসমোল্লাসঃ প্রফুল্লকমলোপমঃ।
ভক্তাঃ যস্যাগমে পূর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার যে ছয়জন শিষ্যকে জগদম্বার কৃপায় ঈশ্বরকোটীরূপে অবগত হন তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অন্যতম। উক্ত ছয় জনের মধ্যে পাঁচজন সন্ন্যাসী এবং একমাত্র পূর্ণচন্দ্রই গৃহী শিষ্য। অবতারের ন্যায় ঈশ্বরকোটীর আবির্ভাব জগদ্ধিতায়, নিজ মুক্তির জন্য নহে। কারণ তাঁহারা নিত্যমুক্ত, মুক্তি তাঁহাদের করতলগত। পূর্ণচন্দ্র নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। দুঃখের বিষয়, তাঁহার বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায় না। *

উত্তর কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৭১-৭২ খ্রীঃ পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ স্বনামধন্য কাশী ঘোষের বংশধর এবং ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পূর্ণের মাতা কৃষ্ণমানিনী দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর বিখ্যাত বৈষ্ণব বংশের কন্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট গৃহী ভক্ত বলরাম বসু উক্ত বংশের সন্তান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের শ্যামবাজারস্থিত শাখা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন পূর্ণচন্দ্র। শ্রীম নামে সুপরিচিত 'রামকৃষ্ণকথামৃত'কার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন উক্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পূর্ণচন্দ্রের বিশাল চক্ষু, উজ্জল শ্যামবর্ণ, সুপুষ্ট দেহ এবং সুন্দর মুখশ্রী ছিল। শ্রীম ছাত্রের ধর্মপ্রবণ প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে স্বীয় কক্ষে ডাকাইয়া ধর্মোপদেশ দিতেন। একবার তিনি পূর্ণকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়িতে দেন। পরম আগ্রহ সহকারে পূর্ণ বাংলার এই অমর ধর্মগ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনী ও বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হন।

* মান্দ্রাজের 'বেদান্তকেশরী' নামক ইংরাজি মাসিকের ১৯৪৭ জুন সংখ্যায় মল্লিখিত প্রবন্ধ দেখুন।

একদিন শ্রীম পূর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রীচৈতন্যের মত কোন সাধু তুমি দেখিতে চাও?' বালক তখন মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া অষ্টম শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং শ্রীম'র সহিত দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। অভিভাবকের কঠোরতা হেতু তাঁহাকে গোপনে মহেন্দ্রনাথের সহিত স্কুলের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গাড়ী ভাড়া করিয়া যাইতে হয়। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বালককে তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য বলিয়া বুঝিলেন এবং পূর্ব পরিচিতের ন্যায় সপ্রেম ব্যবহার করিলেন। জননীর ন্যায় তিনি পূর্ণকে সস্নেহে সহস্তে খাওয়াইলেন এবং ধর্মোপদেশ দিলেন। সেদিন বালকও ঠাকুরের সহিত তাঁহার পূর্ব সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল। ঠাকুর বালকের গাড়ীভাড়া দিলেন এবং তাহাকে আবার আসিতে বলিলেন। ছুটী হইবার পূর্বেই পূর্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে স্কুলে প্রত্যাগমনপূর্বক অন্য দিনের মত বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। অভিভাবকগণ এই বিষয় জানিতে পারিলেন না। অন্যান্য ভক্তের নিকট ঠাকুর পূর্ণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "নারায়ণের অংশে পূর্ণের জন্ম। সে সত্ত্বগুণী আধার এবং এই বিষয়ে নরেন্দ্রনাথের পরেই তাহার স্থান। এখানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম পূর্ণের আগমনে সেই থাকের (শ্রেণীর) ভক্ত সকলের আগমন পূর্ণ হইল। অতঃপর ঐরূপ আর কেহ এখানে আসিবে না।" অভিভাবকদিগের ভয়ে পূর্ণ সেদিন স্বীয় ভাবান্তর এবং আনন্দিত ভাব সামলাইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। তদবধি পূর্ণকে দেখিবার ও খাওয়াইবার জন্য ঠাকুরের প্রাণে বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। সুবিধা হইলেই তিনি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে পাঠাইতেন। যে ব্যক্তি উহা লইয়া যাইত তাঁহাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিতেন, সে যেন গোপনে ঐসকল দ্রব্য পূর্ণের হাতে দিয়া আসে। কারণ, অভিভাবকগণ ইহা জানিলে তাঁহার উপর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা। একদিন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার আসিয়া দেখেন, ঠাকুর কতকগুলি সুপক্ব ও সুরসাল আম্র কাছে রাখিয়া সজল নয়নে বলিতেছেন, 'আহা, এগুলি কিরূপে পূর্ণকে খাওয়াই?' ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমি আমগুলি লইয়া পূর্ণকে দিতে পারি। আমি

তাদের প্রতিবাসী।' ইহা শুনিয়া ঠাকুর পরমানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি যদি তা করতে পার তাহলে তোমার লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের পুণ্য হবে।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে আমগুলি লইয়া পূর্ণের হাতে দিয়া সেই পুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ বলেন, * "পূর্ণের সহিত দেখা করিবার আগ্রহে আমরা ঠাকুরকে সময় সময় দরদরিতধারে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। তাঁহার ঐরূপ আচরণে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'পূর্ণের উপরে এই টান (আকর্ষণ) দেখিয়াই তোরা অবাক্ হয়েছিস্। নরেন্দ্রের (বিবেকানন্দের) জন্য প্রথম প্রথম প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইত ও যেরূপ ছট্‌ফট্ করিতাম, তাহা দেখিলে না জানি কি হইতিস্!' পূর্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলে ঠাকুর মধ্যাহ্নে কলিকাতায় আসিতেন এবং বাগবাজারে বলরাম বসু বা অন্য কোন ভক্তের বাটিতে বসিয়া সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে বিদ্যালয় হইতে ডাকাইয়া আনিতেন। এইরূপ কোন স্থানে পূর্ণ ঠাকুরের পুণ্য দর্শন দ্বিতীয় বার লাভ করেন এবং সেদিন আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। ঠাকুর সেদিনও স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোর কি মনে হয় বল দেখি?' ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের অপূর্ব প্রেরণায় অবশ হইয়া পূর্ণচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আপনি ভগবান্, সাক্ষাৎ ঈশ্বর!'

বালক পূর্ণ এত শীঘ্র তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, ইহা জানিয়া ঠাকুরের সেদিন বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদপূর্বক শক্তিপূত মন্ত্রসহিত সাধনরহস্য এবং উপদেশ দান করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া শরৎপ্রমুখ ভক্তগণকে বারবার বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণ ছেলে মানুষ, তার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। সে কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিল বল দেখি? আরও কেহ কেহ দিব্য সংস্কারের প্রেরণায় পূর্ণের মত উক্ত প্রশ্নের ঐরূপ উত্তর দিয়াছে। ইহা নিশ্চয় পূর্বজন্মকৃত

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' (দিব্যভাব, ১৯৮—২০২ পৃষ্ঠা) দেখুন।

সংস্কার! ইহাদিগের শুদ্ধসাত্ত্বিক অন্তরে সত্যের ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।" পূর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুর কোন ভক্তের প্রশ্নে অন্য সময় বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ ঈশ্বরকোটী। সামান্য চেষ্টায় তাহাদের সুপ্ত আধ্যাত্মিকতা বিকশিত হয়। লাউকুমড়ার মত এই শ্রেণীর ভক্তদের আগে ফল হয়, পরে ফুল ফোটে। তাহারা প্রথমে ঈশ্বর দর্শন করে, সিদ্ধ হয়, পরে তাহাদের সাধনা চলে।"

১৮৮৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে পূর্ণ ঠাকুরকে পুনরায় দর্শন করেন। পূর্ণ চলিয়া গেলে ঠাকুর শ্রীমকে সহাস্যে বলিলেন, 'পূর্ণ আজ সকালে এসেছিল। তার স্বভাবটি কি সুন্দর।' অভিভাবকগণ কড়া মেজাজের লোক ছিলেন বলিয়া পূর্ণ দক্ষিণেশ্বরে বেশি যাইতে পারিতেন না। শেষ অসুখের এক রাত্রি পূর্বে ঠাকুর পূর্ণকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে হঠাৎ কলিকাতায় মহেন্দ্র গুপ্তের বাটীতে আসিলেন। শ্রীম পূর্ণকে তাঁহার গৃহে ডাকিয়া আনিলেন। ঠাকুর তথায় পূর্ণকে সাধনভজন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিবার পর পূর্ণ ধর্মজীবনে দ্রুত উন্নতি এবং অলৌকিক দর্শনাদি করিতে লাগিলেন। ধ্যানও প্রার্থনাদির সময় আনন্দাশ্রুতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় প্লাবিত এবং গাত্র রোমাঞ্চিত হইত। তিনি ঠাকুরকে একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'প্রায়ই রাত্রিতে আনন্দে আমার ঘুম হয় না।' ঠাকুর সেই পত্রখানি হাতে করিয়া বলিলেন, 'এটি ভাল চিঠি, তাই আমি এটা ছুঁতে পারি। কিন্তু আমি অন্যের চিঠি হাতে নিতে পারি না।' গুরু এবং শিষ্যের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ অদূর ভবিষ্যতে অদ্ভুত ফল প্রসব করিল।

১৮৮৫ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে পূর্ণ বলরাম বসুর বাটীতে ঠাকুরকে আবার দর্শন করেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ ইহাতে ঘোর আপত্তি করেন। সেইজন্য অতিকষ্টে ও সঙ্গোপনে ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে আসিতে হয়। পূর্ণ ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে কাছে বসাইয়া অনুচ্চ স্বরে উচ্ছ্বসিত স্নেহে তাঁহার সহিত কথা বলিলেন। ঠাকুর পূর্ণকে বলিলেন, 'তুই আরো কাছে আয়।' পূর্ণ ঠাকুরের খুব কাছে যাইয়া বসিতে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোকে যেমন বলেছিলাম তুই তেমন করিস্ ত?' পূর্ণ সহাস্যে উত্তর

দিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' ঠাকুর—'শ্মশান বা জ্বলন্ত মশাল বা দীপশিখা স্বপ্নে দেখিস্? এগুলি স্বপ্নে দেখা ভাল।' পূর্ণ—'না। কিন্তু আপনাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি।' ঠাকুর—'কি? কিছু উপদেশ পাও? পাও ত বল।' পূর্ণ—'আমার মনে নেই।' ঠাকুর—'তাতে যায় আসে না। এ খুব ভাল। আধ্যাত্মিক জীবনে তোর খুব উন্নতি হবে। আমার সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করিস্?' কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পূর্ণকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিলেন। তাহাতে পূর্ণ উত্তর দিলেন যে, অভিভাবকের ভয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না! ঠাকুর—কেন? দক্ষিণেশ্বরে তোর এক আত্মীয় থাকেন না? পূর্ণ—হাঁ। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁর বাড়ী যাওয়াও খুব অসুবিধা। পূর্ণ যখন মহেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে পড়িতেন তখন মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ধর্মবিষয়ে নানা উপদেশ দিতেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'তা বেশ।' একদিন ঠাকুর শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পূর্ণকে কেমন দেখছ? তার ভাবটাব হয় কি?' শ্রীম বলিলেন, 'তার ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করি নাই।' ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'পূর্ণের ভাবের বাহ্য প্রকাশ হবে না। সে ভিন্ন প্রকৃতির ভক্ত। কিন্তু তার অনেকগুলি সুলক্ষণ আছে।' ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্বাণী কালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। পরবর্তী জীবনে পূর্ণ কখনও আধ্যাত্মিক ভাবের বাহ্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি কখনও ঠাকুরের কথা বলিতেন না, বা ঠাকুরের কোন ছবি রাখিতেন না। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তির গভীরতা সাধারণের পক্ষে বোঝা বা জানা খুবই শক্ত ছিল। কিন্তু বাল্যকালে পূর্ণ ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় ঠাকুরের সম্পর্কীয় যদি কেহ সেই পথ দিয়া যাইতেন, বালক ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেন। পূর্ণের সরল এবং প্রীতিময় স্বভাবের কথা মহেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়া ঠাকুর পরম প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আহা! আহা!'

পিতা দীননাথ পুত্র পূর্ণকে ঠাকুরের নিকট যাইতে নিষেধাজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহাকে অন্য স্কুলে ভর্তি করাইলেন, যাহাতে শ্রীম পূর্ণকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া না যাইতে পারেন। এত বাধা সত্ত্বেও পূর্ণচন্দ্র ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে যাইতেন।

একদিন ঠাকুর পূর্ণকে কালীবাড়ীতে আহার করিতে বলেন। তিনি ইতোপূর্বে সারদা দেবীকে পূর্ণের জন্য বিশেষ আহার্য প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি নহবতে পূর্ণকে লইয়া যাইয়া সারদা দেবীকে দেখাইয়া স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, 'এই পূর্ণ।' সারদা দেবী ইহার পূর্বে পূর্ণকে দেখেন নাই, বা জানিতেন না। তিনি সস্নেহে পূর্ণকে মাদুরের উপর বসাইয়া নিজ সন্তানের ন্যায় আহার করাইলেন। ঠাকুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীমাকে বলিতেছিলেন, 'এটা একটু দাও, ওটা আর একটু দাও।' শ্রীশ্রীমা পূর্ণের পাশে বসিয়া জননীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন, 'বাবা এটা খাও, ওটা খাও।' আহারের পর শ্রীমা পূর্ণের হাতে একটী টাকা গুঁজিয়া দিলেন ঠাকুরের নির্দেশে। পূর্ণ প্রথমে টাকাটি লইতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু উভয়ের অনুরোধে গ্রহণ করেন। ইহাতে ঠাকুরের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আর একদিন ঠাকুর শ্রীমকে বলিলেন, "নরেন্দ্র এবং ছোট নরেন্দ্রের মত পূর্ণের পুরুষ প্রকৃতি। তাহার অবস্থা এত উন্নত যে, হয় সে ঈশ্বর দর্শনান্তে শীঘ্র দেহত্যাগ করিবে, নচেৎ তাহার অন্তর্প্রকৃতি অচিরে প্রকাশিত হইবে। তার দেবপ্রকৃতি এবং অবতারতুল্য শক্তি আছে এরূপ ব্যক্তিরা কাহাকে কখন ভয় করে না। যদি তুমি তাহার গলায় ফুলের মালা দাও, বা তাহার দেহ চন্দনলিপ্ত কর, বা তাহার সম্মুখে ধূপ জ্বালাও সে সমাধিমগ্ন হইবে। তখন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবে, সে সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাহার দেহে নারায়ণ বিরাজমান, নারায়ণই স্বয়ং এই দেহ ধারণ করিয়াছেন। আমি পূর্ণকে আর একবার দেখিতে চাই। কিরূপে তা সম্ভব হবে? মনে হয়, সে ঈশ্বরের অংশ; কণা নয়, কলা। কি আশ্চর্য! সে আবার খুব বুদ্ধিমান এবং লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী। বিষ্ণুর অংশে তার জন্ম। আমি মনে মনে বেলপাতা দিয়া তার পূজা দিয়াছিলাম, কিন্তু সে পূজা নেয় নাই। কিন্তু আমি যখন সচন্দন তুলসীপত্র দিয়া পূজা করিলাম, সে গ্রহণ করিল।" ঠাকুর আর একবার ভক্তদের বলেছিলেন, 'রামলালার জন্য যেমন টান হয়েছিল, এখন পূর্ণপ্রমুখ ছেলেদের জন্য তেমন টান অনুভব করছি।' আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর

ভক্তদের বলেন, "তোমাদের একটি গোপনীয় কথা বলছি। আমি পূর্ণ, নরেন্দ্র প্রভৃতি বালকদের এত ভালবাসি কেন জান? জগন্নাথদেবকে মধুরভাবে ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া পড়িয়া আমার হাতটি ভাঙ্গিয়া ফেলি। তখন জগদম্বা আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, 'এখন তুমি মানব দেহ ধারণ করেছ, সখা বা সন্তানাদির দিব্য সম্বন্ধ শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ভক্তদের সহিত স্থাপন করিয়া তাহাদের সহিত লীলা কর।' পূর্ণের মন ঊর্ধ সাকার লোকে বিচরণ করে। আমার প্রতি তার কি গভীর ভালবাসা!"

স্বামী সারদানন্দ বলেন, 'ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দার পরিগ্রহ করিয়া সাধারণ সংসারীর ন্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যাঁহারা সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা, নিরভিমানিতা ও সর্বকার্যে আত্মত্যাগ সম্বন্ধে একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন।' পাছে পূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয় এই ভয়ে মাতাপিতা পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার বিবাহ দেন এবং ভারত সরকারের রাজস্ববিভাগে এক উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। উক্ত পদে পূর্ণচন্দ্র দীর্ঘকাল বিশেষ সম্মান ও কৃতিত্বের সহিত কার্য করেন। ষোল বৎসর বয়সে পূর্ণের বিবাহ হয়। ঠাকুরের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে যখন স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন তখন তাঁহাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে অভিনন্দন দেওয়া হয়। পূর্ণ বিশাল জনতার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিশ্ববিজয়ী গুরুভ্রাতার পুণ্য দর্শনান্তে নীরবে গৃহে ফিরিয়া যান। স্বামিজীর সুসজ্জিত ফিটন গাড়ী শ্যামবাজার ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিল। ইহার অদূরে পূর্ণের পৈত্রিক নিবাস বিদ্যমান। স্বামিজী পূর্ণকে ডাকিয়া আনিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে পাঠাইলেন। পূর্ণ তখন স্নান করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্নান ছাড়িয়া আর্দ্র বস্ত্রে ও সিক্ত দেহে স্বামিজীর নিকট ছুটিয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্বক বলিলেন, 'আপনাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে দূর হইতে দেখিয়া বাড়ীতে আসিয়া স্নান

করিতেছিলাম আফিসে যাইবার জন্য।' স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই তুমি কেমন আছ?' পূর্ণ উত্তর দিলেন, 'ঠাকুরের কৃপায় ভালই আছি।' স্বামিজী তখন তাঁহাকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, 'আর বেশিক্ষণ ভিজা কাপড়ে থেকো না। বাড়ী যাও এবং আমার সঙ্গে অবসর মত মঠে দেখা করো।' পূর্ণ পুনরায় স্বামিজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্বক বিদায় লইলেন। যতদিন স্বামিজী কলিকাতায় ছিলেন ততদিন পূর্ণ তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাইতেন এবং জনতার সহিত নীরবে তাঁহার পুণ্য সঙ্গ লাভ করিতেন।

১৯০৭ খ্রীঃ পূর্ণচন্দ্র কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। সভ্যগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি এই উচ্চ পদ গ্রহণ করেন। তিনি নিয়মিতভাবে সোসাইটিতে যাইতেন এবং তত্রস্থ ঠাকুরঘরে অনেকক্ষণ ধ্যান করিতেন। সোসাইটির সভ্যগণকে তিনি নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিবার জন্য উৎসাহ দিতেন। সোসাইটির পরিচালনকার্য্যে তিনি বন্ধুবৎ সহায়তা ও সহযোগিতা করিতেন। যখন ফ্রান্সের বিখ্যাত গায়িকা এবং স্বামিজীর অনুরক্তা শিষ্যা মাদাম কাল্‌ভে কলিকাতায় আসেন তখন বিবেকানন্দ সোসাইটির সভ্যগণ পূর্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে ঠাকুর-স্বামিজীর ফটো উপহার দেন। প্রায় এক বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ণচন্দ্র দিল্লীতে বদলী হইয়া যান। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বরাহনগর, আলমবাজার বা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে নিয়মিত ভাবে যাইতেন। মঠে তাঁহাকে খুব ধীর স্থির দেখা যাইত। তিনি মঠের একস্থানে বসিয়া চুরুট খাইতেন এবং নির্বাক হইয়া বসিয়া থাকিতেন। সম্ভবতঃ গুরুভ্রাতাদের দেখিয়া ঠাকুরের মধুর স্মৃতি জাগ্রত হইত। তিনি খুব সৎসাহসী স্পষ্টবাদী ন্যায়বান্ এবং নিরভিমান ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন অন্যায় আচরণ হইলে তিনি উহার প্রতিবাদ বা প্রতীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইজন্য তাঁহাকে শিমলা পাহাড়ে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের সহিত দুই একবার মারামারি করিতে হয়। দিল্লীতে বা শিমলায় চাকুরী করিবার সময় তাঁহার মধ্যে অসাধারণ ভাবতন্ময়তা পরিলক্ষিত হইত। পূর্ণচন্দ্র অল্পায়ু হইলেও স্বাস্থ্যবান ছিলেন এবং নিত্য

ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। তিনি আজীবন অধ্যয়নাভ্যাসে অনুরক্ত ছিলেন এবং ইংরাজীতে ভাল প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। মাদ্রাজের অধুনালুপ্ত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় 'ভক্তি' প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তাঁহার হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। যখনই সুযোগ পাইতেন তখনই সমাজের বা স্বদেশের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। যাঁহারা দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন্ তাঁহাদিগকে গোপনে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিতে বলিতে তঁাহার মুখমণ্ডল আনন্দে লাল হইয়া উঠিত। একবার তিনি স্বামিজীকে পাদস্পর্শ-পূর্বক প্রণাম করিতে যাইয়া বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ অধ্যাত্ম শক্তি অনুভব করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন বৃন্দাবনে কঠোর তপস্যান্তে মঠে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়া পূর্ণচন্দ্র পূর্ববৎ শক্তিপ্রবাহ অনুভব করেন। ঠাকুরের পূত স্পর্শে তাঁহার জীবন এত পরিবর্তিত হইয়াছিল যে, তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসারী হন নাই। সংসারসমুদ্রে তিনি পদ্মপত্রের মত ভাসিয়া থাকিতেন।

পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বৎসর বয়সে পূর্ণ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ আরোগ্যের সকল আশা ত্যাগ করেন। সেই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হন। ঠাকুরের কৃপায় রোগীর অবস্থা আরোগ্যের দিকে ফিরিল। পূর্ণ কিছুকালের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। নাট্যাচার্য্য গিরিশ ঘোষ পূর্ণকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। গিরিশের শেষ অসুখের সময় পূর্ণ তাঁহাকে দেখিতে যান। পূর্ণকে দেখিয়া গিরিশচন্দ্রের মলিন মুখ মধুর হাস্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই পরম ভক্তদ্বয় ঠাকুরের কথায় কিছুক্ষণ মহানন্দে কাটাইলেন। বিদায় লইবার সময় গিরিশ পূর্ণকে করজোড়ে বলিলেন, 'প্রাণের ভাই, আশীর্বাদ কর যেন ঠাকুরকে প্রত্যেক নিশ্বাসে স্মরণ করতে পারি। জয় রামকৃষ্ণ।' পূর্ণ কোমলভাবে উত্তর দিলেন, 'ঠাকুর সর্বদা আপনাকে দেখছেন। আমাকে আশীর্বাদ করুন।' পরদিন পূর্ণ কোন ভক্তের নিকট এই মন্তব্য করিলেন, 'গিরিশের অতিশয় বিনয় ও ভক্তি দেখিয়া মনে হয় তাঁহার দেহ আর বেশী দিন থাকিবে না। ঠাকুর তাঁহাকে শীঘ্র স্বীয় সকাশে ডাকিয়া লইবেন।' পূর্ণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল।

ঘটনাচক্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংসারী সাজিলেন। ঈশ্বরচিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকিতে না পারায় তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখা যাইত এবং ঠাকুর তাঁহাকে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যে উচ্চ স্থান নির্দেশ করিতেন তাহা কাহারো নিকট ব্যক্ত করিতেন না। শান্ত ও সরল স্বভাবের আবরণে তিনি তাঁহার মহত্ত্ব ঢাকিয়া রাখিতেন এবং নিজেকে দীন হীন সাধারণ সংসারী জ্ঞান করিতেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, পূর্ণ সন্ন্যাসী হইবে বা সংসারী হইলে অল্পায়ু হইবে। ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। দিল্লীতে অবস্থান কালে তাঁহার জ্বর হয়। সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষায় কোন ফল হইল না। বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি শিমলা পাহাড়ে যান, কিন্তু সেখানেও জ্বর কমিল না। তিনি অন্তরে বুঝিলেন, তাঁহার অসুখ সারিবে না। পতির অবর্তমানে পত্নীর দুরবস্থা ঘটিতে পারে, এইজন্য চিন্তিতা পত্নীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'আমরা কি সাধারণ মানুষ? আমরা চিরকাল সর্বপ্রকারে ঠাকুরের সন্তান। আমার জন্মের পূর্বে যিনি তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমার মৃত্যুর পরেও তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।'

সুচিকিৎসার জন্য পূর্ণকে শিমলা হইতে কলিকাতায় আনা হইল। কলিকাতায় ছয় মাস রোগশয্যায় শুইয়া তিনি মহাসমাধিমগ্ন হন। শয্যাশায়ী হইলেও রোগযন্ত্রণায় তাঁহার মন দুঃখিত বা মুখ মলিন হয় নাই। ঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি প্রশান্ত চিত্তে ও প্রফুল্ল বদনে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করেন। রোগ-শয্যায় তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সদা আমার শয্যাপার্শ্বে সমাসীন।' অধিক দৈহিক দুর্বলতার জন্য তাঁহাকে শয্যা ছাড়িতে দেওয়া হইত না। তখন একরাত্রে স্বজন ও সেবকগণকে সুষুপ্ত দেখিয়া একাকী উঠিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সশব্দে পড়িয়া যান। পতনের শব্দে সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং বিছানায় বসাইলেন। সেবকগণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কোথাও লেগেছে কি? ইহার উত্তরে পরম ভক্ত উত্তর দিলেন, 'কিরূপে আমার লাগবে? করুণাময় ঠাকুরের কোমল ক্রোড়ে পড়িয়া গিয়াছিলাম।'*

*'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩২০ পৌষ সংখ্যায় ঘটনাটি বিবৃত।

অন্তিমকালেও তিনি কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই, ইহা নিঃসংশয়ে জানা যায়। প্রায় দশটার সময় চিকিৎসক তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া আত্মীয়গণকে বলিলেন যে, রোগীর শেষ সময় উপস্থিত। চিকিৎসক চলিয়া যাইবার পর আত্মীয়গণ ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, তিনি সুনিদ্রিত। নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে তাঁহারা অল্পদূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে পুনরায় চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু শরীর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র বিয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে ১৩২৮ সালে কার্তিক সংক্রান্তি দিবসে (১৯১৩ খ্রীঃ ১৬ই নভেম্বর) বেলা দশটার সময় মহাসমাধিমগ্ন হন। পরমভক্ত পূর্ণচন্দ্রের পত্নী, ভ্রাতা ও পুত্র শোকাভিভূত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, ধর্মজীবন যত হয় গুপ্ত তত হয় পোক্ত! ঈশ্বরকোটী পূর্ণচন্দ্রের জীবনে পরমহংসদেবের এই উপদেশটী মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা এত গুপ্ত রাখিতেন যে, কেহ তাঁহার ঈশ্বরকোটীত্ব বুঝিতে পারিতেন না। বহিঃপ্রকাশ না থাকিলে ধর্মজীবনের অঙ্গহানি হয় না।

এগার

স্বামী পরমানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের দুই সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে প্রাণদান করেন। ১৯০৬ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চৌত্রিশ বৎসর স্বামী পরমানন্দ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বেদান্ত প্রচারে ব্রতী ছিলেন। তিনি বোষ্টন সহরে বেদান্ত সমিতি, এবং কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লা ক্রেসেণ্টাতে আনন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ইংরাজি গদ্যে ও পদ্যে ছোট বড় প্রায় ত্রিশখানি পুস্তকের প্রণেতা ছিলেন। গীতা ও উপনিষদাবলীর তৎকৃত ইংরাজি অনুবাদ আমেরিকায় এখনও প্রচলিত। 'প্রাচ্যবাণী' নামক ইংরাজি পত্রিকা ১৯২১ খ্রীঃ হইতে তৎকর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি যুক্তরাজ্যের বড় বড় সকল গ্রন্থাগারে সম্মানের সহিত গৃহীত ও ব্যাপকভাবে পঠিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে স্বামী পরমানন্দ ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির সুদক্ষ প্রচারকরূপে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।*

পূর্বাশ্রমে স্বামী পরমানন্দের নাম ছিল সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা। তাঁহার পিতা আনন্দ গুহঠাকুরতা বরিশাল জেলার বানারিপাড়া নামক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে বাস করিতেন। তিনি সদাশয় ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। স্বগ্রামের বালিকা বিদ্যালয় ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানের তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার বিভু, হেমনলিনী ও লাবণ্য প্রভৃতি পুত্রকন্যাদের মধ্যে সুরেশ সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ এবং তজ্জন্য সকলের স্নেহভাজন ছিলেন। পিতৃগৃহে একটী দেবমন্দির ছিল। বার বৎসর বয়সে

---

* লা ক্রেসেণ্টা আনন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত এবং ভগ্নী দেবমাতা প্রণীত 'স্বামী পরমানন্দের জীবনী এবং 'অমৃত' পত্রিকায় (১৩৪০ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যাদ্বয়ে) মল্লিখিত প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

কিছুকাল কলিকাতায় তিনি ভাড়াবাড়ীতে বাস করেন পিতার সহিত, পরে ঢাকায় স্থায়ী গৃহ হয়। নয় বৎসর বয়সে সুরেশের মাতৃবিয়োগ ঘটে। কঠিন বিছানায় শয়ন ও সামান্য আহার ভক্ষণ দ্বারা তিনি মাতৃশোক স্মরণ করেন। এই শোকে বাল্যেই তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে জীবনের অনিত্যত্ব দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত হয়। তিনি শিশুকাল হইতে সুদর্শন, সুশান্ত, ও সাহসী ছিলেন। তিনি কখনো কাহাকেও কড়া কথা বলিতেন না। কেহ তাঁহাকে কখনো ঝগড়া বা মারামারি করিতে দেখে নাই। ফুটবল খেলায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। সমবয়স্কদের মধ্যে তিনি ছিলেন দলপতি এবং সকলের সঙ্গে তাঁহার ছিল প্রীতির সম্বন্ধ।

তাঁহাদের উদ্যানস্থ পুকুরের পাড়ে উচ্চ আমগাছ অনেক ছিল। একদিন তিনি বালকসঙ্গীদের সহিত পুকুরের পাড়ে বেড়াইতে গিয়াছেন। এমন সময় এক সঙ্গী বলিয়া উঠিল, কে গাছে উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিতে পারে? বলামাত্র সুরেশ গাছে উঠিয়া এক লাফে জলের মধ্যে পড়িলেন এবং অতিকষ্টে পাড়ে উঠিলেন। ছয় বৎসর বয়সে তিনি একবার খেজুর পাড়িতে খেজুর গাছে উঠিয়া একটী কর্দমময় গর্তে পড়িয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ডাক্তার আসিয়া যখন হাতটি ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিলেন তখন সেই বেদনা বালক অম্লান বদনে সহ্য করিলেন। সন্ধ্যায় খেলার মাঠে ফিরিবার পথে একদিন একটা সাপ দেখিতে পাইলেন। অমনি তার লেজ ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাস্তা পার হইয়া বাড়ীর বাগানে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং মালীর চীৎকারে ব্যস্ত হইয়া মৃতপ্রায় সাপটীকে ছুঁড়িয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ নির্ভীকতার সহিত সলজ্জ বিনয়ের মধুর সমাবেশ ছিল তাঁহার চরিত্রে।

বৃদ্ধ পিতার দৃষ্টি ক্ষীণ হইলে সুরেশ তাঁহাকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন ও সন্ধ্যায় তাঁহার কাছে গান গাহিতেন। পিতা 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' শুনিতে ভালবাসিতেন। সেইজন্য পুত্রও যত্নসহকারে তাহাই পড়িতেন। 'সূর্যোদয়ের পূর্বে তোলা মাখনই ভাল। সূর্য্যোদয়ের পরে তোলা মাখন ভাল হয় না।' ঠাকুরের এই উপদেশটী বালকের হৃদয়ে এক গভীর দাগ কাটিল। এই সময়ে তিনি

স্বামীজির অন্যতম শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দের সংস্পর্শে আসেন। সাধুসঙ্গে বালকের সুপ্ত সুসংস্কার জাগ্রত হইল। তিনি সংসার ছাড়িয়া রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হইবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে একরাত্রে তাঁহার এক স্বপ্নানুভূতি হয়। উক্ত অনুভূতির ফলে দশ বার দিন তিনি নেশার ঘোরে রহিলেন এবং এই জগৎ অলীক ও মিথ্যা প্রতীয়মান হইল। সন্ন্যাসের ডাক আসিল এবং তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিলেন। বৃদ্ধ পিতা ও জ্যেষ্ঠ তাতের পরামর্শ চাহিলে তাঁহারা বালককে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু ইচ্ছা আন্তরিক হইলে পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তি অপসৃত হইয়া জীবনের আলোকময় পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এক গভীর নিশীথে সামান্যমাত্র পাথেয় লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া সুরেশ বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। এত অল্পবয়স্ক বালককে মঠে রাখা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। পরে স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে তাঁহাকে বেলুড় মঠে স্থান দেওয়া হয়।

সুরেশচন্দ্র বসন্তকালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং সুকুমার ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ন্যায় তাঁহার শরীর ও স্বভাব সুন্দর ছিল বলিয়া মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নাম রাখেন 'বসন্ত'। এই নামেই তিনি রামকৃষ্ণ সংঘে পরিচিত। তাঁহার অঙ্গকান্তি এত সুন্দর ছিল যে, একখানা সাধারণ কাপড় পরিলেও মনে হইত, যেন রেশমী কাপড় পরিয়াছেন! আমেরিকাতে একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'You glorify your clothes'। বসন্ত তেইশ বৎসর বয়সে বেদান্ত প্রচারার্থ আমেরিকায় প্রেরিত হন এবং তথায় তিনি প্রায় চৌত্রিশ বৎসর সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহাকে তরুণের মত দেখাইত। জনৈক ভদ্রলোক বোষ্টনে একদিন তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার পিতাকে বার বৎসর পূর্বে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি। তিনি ঠিক আপনার মত দেখতে।' বসন্ত মহারাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'আমি তাহ'লে আমার পিতা হব।' বেলুড় মঠে স্বামীজি তাঁহাকে রাখিতে কেন সম্মত হন, সে বিষয়ে একটি ঘটনা আছে। তাঁহাকে মঠে রাখিতে কাহারও কাহারও আপত্তি হওয়ায় দুঃখিত মনে নিরাশ

হৃদয়ে বালক অনিদ্রায় রাত কাটাইলেন। প্রভাতে স্বামিজী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা! তুই গান গাইতে জানিস? একটা গান গা ত'। গুরু শিষ্যের মনোভাব জানিতে ইচ্ছুক। বসন্ত চিরদিনই সুকণ্ঠ ছিলেন। স্বামীজির আদেশে তিনি প্রাণ ঢালিয়া নিম্নোক্ত গানটি গাহিলেন।—

"চিনিনা জানিনা বুঝিনা তাহারে তথাপি তাহারে চাই।
(আমি) সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে তাঁর পানে ছুটে যাই॥
দিগন্তপ্রসার অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই।
(আমি) তাঁহার ভিতরে মৃদু মধু স্বরে কে ডাকে শুনিতে পাই॥
আঁধারে নামিয়া আঁধার ঠেলিয়া না বুঝিয়া চলি তাই।
আছেন জননী, এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই॥
কিবা তাঁর নাম, কোথা তার ধাম কে জানে কারে শুধাই।
না জানি সন্ধান যোগ ধ্যান জ্ঞান ঘ্রাণে মত্ত হয়ে ধাই॥"

গানটির মধ্য দিয়া শিষ্যের তখনকার মনোভাব গুরু বুঝিতে পারিলেন। তখন স্বামিজী বলিলেন, 'এ মঠে থাকবে।' বেলুড় মঠে যোগদানের অল্পকাল পরেই বসন্ত মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট প্রেরিত হইলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কঠোর শাসন ও নিয়মনিষ্ঠায় মঠের সাধুব্রহ্মচারিগণ খুব ভয় পাইতেন। কিন্তু বসন্তের বেলায় তিনি স্নেহময়ী জননীতুল্য হইলেন। বসন্ত বৈরাগ্যের প্রেরণায় কঠোরতা অভ্যাস করিতে অগ্রসর হইলে শশী মহারাজ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিতেন, 'ওসবে তোর দরকার নেই।' মাদ্রাজের অসহ্য গরমে তাঁহার ক্ষুধামান্দ্য হইল। শশী মহারাজ নিজে বাজারে যাইয়া এটা সেটা কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিতেন। ইহার কয়েক মাস পরেই তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে নাবালক বলিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে দাবী করেন। সংঘাধ্যক্ষের আদেশে তাঁহাকে স্বগৃহে পাঠান হয়।

কিন্তু বৈরাগ্যের প্রেরণায় কিছুদিন পরে তিনি বাড়ী হইতে বেলুড় মঠ হইয়া পুনরায় মাদ্রাজে উপস্থিত হন। ১৯০১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে তিনি বেলুড় মঠে আসেন এবং ১৯০২খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে পূর্ণিমা রাত্রে

স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক স্বামী পরমানন্দ নামে অভিহিত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার সন্ন্যাসের সময় বিরজাহোমে আচার্যের কার্য করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকেই শেষ সন্ন্যাস দেন এবং কয়েক মাস পরে দেহরক্ষা করেন। অতঃপর তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে পুনরায় মাদ্রাজে চলিয়া যান। এইবার মাদ্রাজের অত্যধিক গরমে স্বামী পরমানন্দের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তখন জনৈক ভক্ত তাঁহাকে তাঞ্জোরে বায়ুপরিবর্তনে লইয়া যান। পূতসলিলা কাবেরী নদী উক্ত প্রাচীন নগরীর পার্শ্বে প্রবাহিতা এবং উহার তীরদেশে অগস্ত্য মুনির তপস্যাস্থান। তাঞ্জোর-বাসীদের বিশ্বাস, অগস্ত্য ঋষি এখনও সূক্ষ্ম শরীরে উক্ত প্রদেশে বিরাজিত থাকিয়া তাঁহাদের কল্যাণ সাধনে নিরত। এই প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি যে তিন সপ্তাহ তাঞ্জোরে ছিলেন, নিশীথে উঠিয়া নদীতীরে ধ্যানে বসিতেন। একরাত্রে ধ্যানকালে তাঁহার এক অলৌকিক অনুভূতি হয়। তাহাতে তিনি বিশ্বাস করেন যে, অগস্ত্য ঋষি তাঞ্জোরে সূক্ষ্ম দেহে বিরাজমান।

মাদ্রাজে চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে লইয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে আসেন। এইবার তিনি বেলুড় মঠে এক বৎসর থাকিয়া মাদ্রাজ মঠে ফিরিয়া যান। ১৯০৬ খ্রীঃ স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে কলম্বো আসিলে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পরমানন্দজীকে লইয়া কলম্বো যান। পরে তাঁহারা উভয়ে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণান্তে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসেন। জার্মাণ মনীষী গ্যেটে বলিয়াছিলেন, 'কর্ম-জীবনেই প্রকৃত চরিত্র গঠিত হয়। স্বাস্থ্যের জন্য যেমন উন্মুক্ত বাতাস চাই, ধর্ম সাধনের জন্য তেমনি স্বাধীন জীবন চাই।' মাদ্রাজ মঠে স্বামী পরমানন্দ প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ ও স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। সেইজন্য অল্পসময়ে তাঁহার ধর্ম-জীবনের দ্রুত বিকাশ হইতে লাগিল, হৃদয়ও উদার হইল। একবার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শীতকালে তাঁহাকে একখানি ভাল চাদর দেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস হইতে একটি দরিদ্র ছাত্র একপ্রাতে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মঠে আসে। ইহা দেখিয়া স্বামী পরমানন্দের

কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হয় এবং তিনি স্বীয় চাদরখানি তৎক্ষণাৎ বালককে দান করেন। ইহা শুনিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রেমানন্দকে লিখিয়া কলিকাতা হইতে একখানি দামী চাদর আনিয়া স্বামী পরমানন্দকে দেন। স্বামী পরমানন্দ সেই চাদরখানি আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিলেন। আমেরিকা যাইবার পথে স্বামী ত্রিগুণাতীত মাদ্রাজ মঠে পক্ষাধিক কাল বিশ্রাম করেন। তাঁহার নিজের বিছানা ছিল না। স্বামী পরমানন্দ স্বীয় বিছানাটি তাঁহাকে দিয়া নিজে মেজেতে শয়ন করিতেন। একরাত্রে স্বামী ত্রিগুণাতীত ইহা জানিতে পারিয়া অন্য খালি খাটে শুইয়া পড়িলেন। তখন তরুণ স্বামী নিজের পাতলা শরীর দ্বারা বড় স্বামীকে তুলিয়া বিছানায় শয়ন করাইবেন বলাতে কেহ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রায় আড়াই মণ ভারী বড় স্বামিজীকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইলেন। স্বামী পরমানন্দের চরিত্রে নারীসুলভ কোমলতার সহিত পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও সামর্থ্যের অসাধারণ সামঞ্জস্য ছিল।

মাদ্রাজ হইতে স্বামী পরমানন্দ স্বামী অভেদানন্দের সহিত বাঙ্গালোর, পুরী, কাশী, আগ্রা, এলাহাবাদ, রাজপুতানা, আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিলেন। পরে তিনি স্বামী অভেদানন্দের সহিত ১৯০৬ খ্রীঃ ১০ই নভেম্বর ২৩।২৪ বৎসর বয়সে একটী ইংলিশ জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন। লণ্ডনে দুই সপ্তাহ থাকিয়া আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ১৯০৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বড় দিনের পূর্বে উভয়ে নিউইয়র্কে পৌছিলেন। এত অল্প বয়সে বিদেশে যাইয়া বেশ সরল ইংরাজি বলিতে পারিতেন এবং নিঃসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিতেন এবং সদা হাস্যমুখ ও প্রফুল্ল থাকিয়া নিজের পরমানন্দ নাম সার্থক করিয়া-ছিলেন। প্রথমে তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে কাজ আরম্ভ করিলেন। রবিবাসরীয় সভায় তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হইল। তাঁহার প্রথম বক্তৃতা এত প্রাঞ্জল ও সুন্দর হইয়াছিল যে, তাঁহার ইংরাজি ভাষার বিশেষত্ব সকলে লক্ষ্য করিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির একটী আশ্রম ছিল সহরের বাহিরে পর্বতোপরি। তিনি তথায় কয়েকজন ভক্তের সহিত ষোল দিন মৌনাবলম্বন, ধ্যানভজন ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি দ্বারা তাহাদের জীবন খুব উন্নত করিয়া দিলেন।

এইরূপে কিছুদিন তাঁহার নির্জনবাস ও ধ্যানধারণাদি হইল। সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্ক সমিতির ভার গ্রহণপূর্বক তখন হইতে প্রায় পনের মাস বেদান্ত ক্লাশে বক্তৃতাদি দিতেন। বহু নরনারী তাঁহার আনন্দময় চরিত্রে আকৃষ্ট হইল। জনৈক ফুলওয়ালা আবশ্যকীয় অধিকাংশ ফুল বিনামূল্যে সমিতির উপাসনামন্দিরের জন্য দিয়া যাইত।

স্বামী পরমানন্দ কয়েকজন ভক্তের আহ্বানে এক বৎসরের মধ্যেই একবার বোষ্টনে আসেন এবং মিসেস্ ওলি বুলের বাড়ীতে থাকেন। তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ ওলি বুলের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের মতে উক্ত মার্কিন মহিলাই ঠাকুরের অন্যতম রসদ্দার। কারণ, তাঁহার অর্থানুকূল্যেই প্রধানতঃ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসেস্ ওলি বুল স্বামী পরমানন্দের এত গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, শুকদেবের সহিত তাঁহার তুলনা দিয়া নিউইয়র্কে পত্র দিয়াছিলেন। গুণগ্রাহিগণের আগ্রহে বোষ্টনে বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপিত হইল। গ্রীসের যেমন এথেন্স, ভারতের যেমন কাশী, আমেরিকায় তেমনি বোষ্টন। বোষ্টন সহর মার্কিণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল, এখানে বেদান্ত আশ্রম হয়। তাঁহার শুভ সংকল্প তাঁহার শিষ্যা ওলি বুলের অর্থ-সাহায্যে এবং শিষ্য স্বামী পরমানন্দের নেতৃত্বে সিদ্ধ হইল। এই কেন্দ্র তেত্রিশ বৎসর বহু তপ্ত প্রাণে এবং অসংখ্য অন্ধকার জীবনে আলোক দান করিয়াছে। এই আশ্রমের জন্য স্বামী পরমানন্দকে বহু দুঃখ-কষ্ট, অনশন, ও অর্ধাশন সহ্য করিতে হইয়াছে। শীতকালে আগুনের অভাবে জলপাত্রে বরফ ভাঙ্গিয়া হাত পা ধুইতে হইয়াছে। গুরুকৃপায় সকল দুঃখকষ্ট তুচ্ছ হইল। গুরুশক্তিই শিষ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। বোষ্টন সমিতিই বহু বৎসর স্বামী পরমানন্দের প্রধান কর্ম-কেন্দ্র ছিল। *

স্বামী পরমানন্দ ভগ্নী দেবমাতাকে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি একটি খাতায় নকল করিয়া রাখিতেন। সেগুলি তাঁহার আমেরিকা-বাসের এক বৎসরের মধ্যে, ১৯০৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে Path

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪৭ কার্তিক সংখ্যায় শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর প্রবন্ধে উল্লিখিত।

of Devotion নামক পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম পুস্তক এবং ইহার বহু সংস্করণ হইয়াছে। ফরাসী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় ইহা অনূদিত এবং উত্তর ভারতের একটি বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকরূপে পঠিত হয়। এই পুস্তক হইতেই তাঁহার প্রকৃত কর্ম আরম্ভ হইল। তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল, ঈশ্বরের করুণায় পূর্ণ বিশ্বাস, নির্ভরতা ও অভিমান-রাহিত্য। এই সকলের সাহায্যে তিনি জীবনে এত কৃতকার্য হন। প্রথম বৎসর নিউইয়র্কে যেসব বক্তৃতা দেন উহাদের সারাংশ ভগ্নী দেবমাতা কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া Vedanta in Practice নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালে যখন তিনি স্বদেশে আসেন তখন ভারত হইতে ভগ্নী দেবমাতাকে যে সব পত্র লেখেন উহাদের সারাংশ Way of Peace and Blessedness নামক পুস্তকে বিবৃত। বোষ্টনের অন্ধদের জন্য ইহা ক্লোভারনুক ইন্ষ্টিটিউট হইতে ব্রেইল (কালিবিহীন) অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত অন্ধ বিদুষী মহিলা হেলেন কেলার উহা পাঠে অতিশয় আনন্দিতা হইয়াছেন। এই অন্ধ বিদ্যালয় স্বামী পরমানন্দের কবিতা-পুস্তকও ব্রেইলে ছাপাইতেছে। আমেরিকায় যাইয়া স্বামী পরমানন্দ প্রথম দুই বৎসর বড়দিনের উৎসব নিউইয়র্ক সমিতিতে সম্পন্ন করেন। তৃতীয়টি কেম্ব্রিজে মিসেস্ ওলি বুলের বাড়ীতে হয়। সেবার আচার্য জগদীশ বসু ও ভগ্নী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতা বাংলা দেশ হইতে গঙ্গাজল লইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত পূত বারি একটি পোরশেলেন পাত্রে এক প্রস্তর-মূর্তি দেবদূতের হস্তে দেওয়া হয়। বেদান্তের ভাবে এই বড়দিনের উৎসব সম্পন্ন হইল।

ঐসময়ে ভগ্নী দেবমাতা ভারতে আসেন। আমেরিকায় থাকিলেও স্বামী পরমানন্দ ভারতের দীনদুঃখীর কথা ভুলেন নাই। একদিন ভারতের দরিদ্রদের জন্য ভিক্ষাপাত্র বেদান্ত সমিতির গৃহে টাঙ্গাইলেন। কিছুদিনের মধ্যে উহাতে পঞ্চাশ ডলার সংগৃহীত হয়। উহা তিনি রুমালে বাঁধিয়া ভারতযাত্রী দেবমাতার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অর্থকষ্টের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সামান্য সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের গৃহনির্মাণের জন্য পাঠাইতেন। ১৯১১ খ্রীঃ তাঁহার গুরুতুল্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অসুস্থ হওয়ায় কয়েক মাসের জন্য তিনি

স্বদেশে আসিতে মনস্থ করিলেন। উক্ত সালের ২রা জুলাই প্রিন্সেস আইরিন নামক জাহাজে চড়িয়া নিউইয়র্ক হইতে ভারতাভিমুখে রওনা হন। জাহাজে যাত্রিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি 'চিন্তাজগতে ভারতের দান' শীর্ষক একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি যাত্রীদের উপাসনাতেও যোগ দিতে নিমন্ত্রিত হইতেন। নেপলসে আসিয়া দেখিলেন, কলেরা সংক্রমিত হওয়াতে কোন যাত্রী তথা হইতে ভারতে লওয়া হইল না। তিনি ইত্যবসরে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ও জার্মানীর প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিয়া লইলেন। ইউরোপে বহু পণ্ডিত বন্ধু লাভ করিয়া তিনি তথায় বেদান্ত প্রচার করিতে উৎসুক হইলেও পারিলেন না। তিনি ১৫ই আগষ্ট জেনোয়া হইতে জাহাজে উঠিলেন। কিন্তু এডেন ছাড়িয়া কিছুদূর আসিতেই খবর পাইলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বর্গগত হইয়াছেন। কলম্বো কাষ্টমস্ হাউসে আসিয়া তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন এবং গভীর শোকে অধীর ও মুহ্যমান হইয়া ষ্টেশনের এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। এইরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। হঠাৎ তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হাস্যময় জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিলেন। উক্ত দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে শান্তি আসিল এবং তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অভাবে মাদ্রাজ মঠ তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইল।

মাদ্রাজ হইতে বেলুড়মঠে আসিয়া তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। ভারতে আসিয়া পুনরায় তিনি সন্ন্যাসীর মত মুণ্ডিত-মস্তক, গেরুয়া-পরিহিত ও নগ্নপদ হইয়া থাকিতেন। নভেম্বর মাসে পুনরায় তিনি কলম্বো হইতে ইউরোপ হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। বোষ্টনে যাইয়া তিনি এবার নূতন উদ্যমে কার্য আরম্ভ করিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রাচ্য বাণী' পত্রিকা প্রকাশিত এবং বোষ্টন বেদান্ত কেন্দ্রের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মিত হইল। গৃহপ্রতিষ্ঠা উৎসবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক লানমান প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা দেন। সমিতির বেদীতে কেবল ওঁকার অঙ্কিত ছিল। উক্ত বেদান্ত আশ্রমে ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথি অভ্যর্থিত হইয়াছেন। ১৯১১ খ্রীঃ জুন মাসে স্বামী পরমানন্দ তৃতীয় বার ইউরোপ

গমন করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার অনেক পুস্তক ইটালী, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইটালীতে গীতার ক্লাস করিতে করিতে তিনি সমগ্র গীতা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু বোষ্টন কেন্দ্রের কার্যের অসুবিধা হওয়ায় তাঁহাকে শীঘ্র আমেরিকায় ফিরিয়া যাইতে হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ বার ইউরোপে যান। তখন জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অলট্রামোর এবং অধ্যাপক ফ্লোরনয় প্রভৃতি তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া উঠেন। তিনি ইউরোপের প্রসিদ্ধ শহর ও শিক্ষাকেন্দ্রে বেদান্ত প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু ইউরোপীয় মহাসমরের আয়োজন সুরু হওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আমেরিকায় ফিরিতে হয়।

প্রাচীন যুগ হইতে ভারতে প্রব্রজ্যার প্রথা আছে হিন্দু সন্ন্যাসীদের। হিন্দু সন্ন্যাসীগণ পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতে ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রাচীন প্রথা যুগোপযোগী করিয়া বেদান্তী সন্ন্যাসীগণকে সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার ফলে সর্ব সম্প্রদায়ের হিন্দু সন্ন্যাসীগণের পরিব্রাজক বেশে পৃথিবী পর্যটন একটি আধুনিক কর্তব্য। ইহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয় এবং আধ্যাত্মিক উদারতা, বিশ্বজনীনতা ও সমন্বয়-ভাব সমৃদ্ধ হয়। সর্বোপরি হিন্দু ধর্ম সঞ্জীবিত, সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হয়! বিভিন্ন তীর্থদর্শন, বিভিন্ন সাধুসঙ্গ ও বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ দ্বারা ধর্মজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায় এবং মন উদার হয়। ঠাকুরের এবং স্বামিজীর কয়েকজন শিষ্য জঙ্গম তীর্থরূপে পাশ্চাত্যে ভ্রমণ ও বেদান্ত-প্রচার দ্বারা আমাদের ধর্মের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই। স্বামী বিবেকানন্দের পরে তাঁহারই শক্তি পরমানন্দপ্রমুখ শিষ্যগণের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে সক্রিয় হয়। নচেৎ এক এক ব্যক্তির পক্ষে এত কাজ করা কিরূপে সম্ভব? স্বামী পরমানন্দ একা এক শতের ন্যায় কাজ করিয়াছেন।

স্বামী পরমানন্দ ১৯১৫ খ্রীঃ হইতে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধারাবাহিক বক্তৃতাদি দিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্বেও ১৯০৮ এবং ১৯১০ খ্রীঃ তিনি গ্রীনেকার ধর্মমহাসভাতে দুই সিরিজ সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

তাঁহার বক্তৃতায় বহু লোক সমাগত হইত। ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্যও অসংখ্য লোক তাঁহার কাছে আসিত। ১৯২১ খ্রীঃ ক্লীভল্যাণ্ডের ফলকরী মনোবিজ্ঞান কংগ্রেসে বক্তৃতা দানে তিনি আহুত হন। তথায় তাঁহাকে সকলে মহাযোগী বলিয়া ডাকিতেন। ১৯১৫ খ্রীঃ হইতে তিনি ট্রেণে দেড় লক্ষ মাইল এবং মোটরে প্রায় এক লক্ষ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। গড়ে পঁচিশ হাজার মাইল তিনি প্রত্যেক বৎসর ভ্রমণ করিতেন।

আমেরিকায় প্রায় বাইশ বৎসর বেদান্ত প্রচারের পর ১৯২৬ খ্রীঃ দক্ষিণ কালিফোর্নিয়াতে স্বামী পরমানন্দ কর্তৃক আনন্দ আশ্রম স্থাপিত হয়। এই আশ্রম সিয়েরা মাদ্রা বা মাতৃপর্বতের সানুদেশে গ্লেনডেইল সহর হইতে বহু শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখান হইতে লর্স এঞ্জেলস ও পাসেডিনা নগরী যথাক্রমে দশ ও বার মাইল দূরে। সন্ধ্যায় আশ্রমের ছাদ হইতে উপরোক্ত তিনটী নগরীর আলোকমালা একসঙ্গে চোখে পড়ে। ডেভিড সালিভান সাহেব বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঐ দেশে ছিলেন তিনি কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে উক্ত পাহাড়ে বনভোজন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উন্মুক্ত আকাশ পানে তাকাইয়া এই আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, কালে ঐ স্থানে একটী বিশাল বেদান্ত আশ্রম স্থাপিত হইবে। শিষ্যের চেষ্টায় গুরুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। সিয়েরা মাদ্রা পর্বত আমেরিকার অন্যতম স্বাস্থ্যকর, সুন্দর ও সর্বোত্তম স্থান এবং প্রকৃতির লীলাভূমি। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উচ্চ, এখান হইতে সমুদ্রও দেখা যায়।

আনন্দ আশ্রম স্বামী পরমানন্দের জীবনের এক মহৎ কীর্তি। আশ্রমটী গৃহ, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র ও মন্দিরের এক অপূর্ব সমাবেশ। আশ্রমে ফলের বাগান, মৌমাছির চাষ, শিল্পবিভাগ, পুস্তক প্রকাশ বিভাগ, প্রাচ্য বাণী কার্য্যালয় এবং বিশ্বধর্ম মন্দির প্রভৃতি দর্শনযোগ্য। ১৯২৮ খ্রীঃ উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠা দিবসে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ, জোরোয়াষ্ট্রিয়ান, তাওবাদী, সিণ্টো, কনফুসিয়ান ও রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সর্বধর্মাবলম্বী একত্রে উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। সে দিব্য দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে আর জীবনে

ভুলিবে না। ঠাকুরের সমন্বয়বাণী এই মন্দিরে মূর্ত হইয়াছে। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, জোরোয়াস্তার, বুদ্ধ, শঙ্কর, কৃষ্ণ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মগুরুগণের প্রতিকৃতি এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মবাচক সমন্বয়-প্রতীক ওঙ্কার আছে। সর্বধর্মাবলম্বী নরনারীগণ এখানে আসেন ও থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাভা, কলম্বিয়া, বোর্নিয়ো, কানাডা, ইংলণ্ড, জার্মেনী এবং ভারত হইতে পরিদর্শক ও অতিথি আনন্দ আশ্রমে আসিয়া ধর্মশিক্ষার্থী রূপে অবস্থান করেন।

স্বামী পরমানন্দের জীবন বেশীর ভাগ পাশ্চাত্যে অতিবাহিত হইয়াছে। চৌত্রিশ বৎসর পাশ্চাত্য প্রবাসের মধ্যে ১৯১১, ১৯২৬, ১৯৩৩, ১৯৩৫, এবং ১৯৩৭ খ্রীঃ পাঁচ বার ভারতে আসেন। ১৯২৮ খ্রীঃ আমেরিকায় ফিরিয়া যাইবার সময় জাহাজের যাত্রীতালিকায় তাঁহার নাম দেখিয়া সিঙ্গাপুর, সাংহাই, হংকং, কোবে প্রভৃতি বন্দরে অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই তাঁহার বই পড়িয়া তাঁহাকে জানিতেন। তাঁহার 'প্রাচ্যবাণী' পত্রিকা আমেরিকার ৩৪০টী প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে গৃহীত ও পঠিত হয়। গীতা, উপনিষদাদি শাস্ত্রের এবং গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি ধর্মমূলক নাটক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া উক্ত পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করেন। ১৯২৬ খ্রীঃ বেলুড় মঠ ও মিশনের কনভেনসনে এবং ১৯৩৭ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের এক অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। *

১৯২৯ খ্রীঃ বোষ্টন হইতে ২৬ মাইল দূরে কোহাসেট নামক স্থানে স্বামী পরমানন্দ আর একটী আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি ইহাকে 'বেবী আশ্রম' বলিতেন। আশ্রমের জমি বিশ একর। প্রথমে জমিটী পাইন, ওক প্রভৃতি ছোট বড় গাছে পূর্ণ ছিল। তন্মধ্যে সুউচ্চ বিশাল প্রস্তরখণ্ডের উপর একটী ছোট কুটীর। কুটীরটী ঠিক কুটীরও নয়, আবার ঘরও নয়। কয়েক মাস পরে ইহার

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪৭ শ্রাবণ সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উল্লিখিত।

কিছু দূরে আর একটী বড় কুটীর হয়। আশ্রমটী আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এবং ধর্মসাধনের অনুকূল নিভৃত স্থান। তথায় সর্বদা থাকার সুব্যবস্থা ছিল না ; অল্প সময়ের জন্য কেহ কেহ আসিয়া থাকিতেন। প্রতি বৎসর ৪ঠা জুলাই স্বামী পরমানন্দ তথায় সারাদিন মৌনাবলম্বন করিতেন। ৪ঠা জুলাই তাঁহার গুরুর তিরোভাবের দিন এবং যুক্তরাষ্ট্রেরও স্বাধীনতা দিবস। তাঁহার সঙ্গে বহু ভক্ত এই বিশেষ দিনটী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গাছের তলায় সৎচিন্তায় কাটাইয়া দিতেন। সন্ধ্যা সমাগমে মলয় পবনে সুবৃহৎ পাইন গাছের তলায় সমবেত উপাসনা হইত। তখন স্ত্রীপুরুষ সকলে পাইন পাতা বিছানো জমির উপর আসন করিয়া বসিতেন। স্বামী পরমানন্দ উপাসনা ও উপদেশ করিতেন। তখন সত্যই মনে হইত, ইহা যেন ভারতের একটী তপোবন।

১৯৪০ খ্রীঃ ২১ শে শুক্রবার উক্ত আশ্রমের একাদশ বার্ষিক উৎসবের পূর্ব দিন অপরাহ্নে তিনি বোষ্টন হইতে ২৬ মাইল মোটর গাড়ী চালাইয়া কোহাসেট আশ্রমে পৌঁছিয়া উপরের কুটীরে চলিয়া গেলেন। নীচের কুটীরে সকলে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গেই আবার বোষ্টন ফিরিবেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নীচে আসিয়া বলিলেন, 'আমি অন্য লোকে চলিয়া গিয়াছিলাম।' ইহা বলিবার পরই ভূমিস্পর্শ করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং মাটীতে পড়িয়া গেলেন। মূৰ্চ্ছিত হইয়াছেন ভাবিয়া একজন তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি বলিলেন, 'আমায় এখন নাড়িও না।' ইহার পরই সব শেষ! তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫৮ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। দশ দিন পূর্বে ডাক্তার তাঁহার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া বলিয়া ছিলেন, 'ভাল আছে।' উন্মুক্ত আকাশতলে সন্ন্যাসীর বাঞ্ছিত তৃণ-শয্যায় ধরিত্রী মাতার কোলে স্বামী পরমানন্দ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহ বোষ্টনে আনিয়া তথা হইতে লা ক্রেসেণ্টা আনন্দ আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ধূপদীপকীর্তনাদি সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরাঙ্গণে উপাসনান্তে উহা হোমাগ্নিতে অর্পিত হইল। বহু দূর হইতে অনুরাগী ভক্তগণ উক্ত উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সারা রাত্রি গাড়ী চালাইয়া এক পরিবার আট শত মাইল দূর হইতে আসিয়াছিলেন। সে দেশে তাঁহার গুণমুগ্ধগণ তাঁহাকে কী চোখে দেখিতেন তাহা কল্পনা করাও শক্ত।

স্বামী পরমানন্দ বিদেশে দীর্ঘ কাল থাকিলেও বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্য মুড়ি, নারিকেল, কুমড়ার ডগার তরকারী, খই, দুধ প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় আহার্য্য ছিল। বৈজ্ঞানিক এডিসন বলিতেন, 'জীবনের প্রধান আনন্দ হাসি। ইহা ত্যাগ করিয়া কাহারো গম্ভীর হওয়া উচিত নয়।' স্বামী পরমানন্দ সদা পরমানন্দে হাস্যমুখে থাকিতেন। দুঃখকষ্ট রোগেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত। তিনি শিশুর মত রসিকতা, নির্দোষ আমোদপ্রমোদ ও সরলতার উৎস ছিলেন। তিনি খুব কর্মঠ ছিলেন এবং আশ্রমের সামান্য কাজও করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নিজের মোটর ধোয়া মোছা, মোটরে গ্রীজ লাগান, এবং আশ্রমোদ্যানের কাজও তিনি করিতেন নিজের মোটর সর্বদা নিজেই চালাইতেন। তাঁহার আশ্রমের কোন সভ্য বা চাঁদার তালিকা ছিল না ; কিংবা তিনি বক্তৃতা দিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতেন না। বন্ধুগণ সাধ্যমত সানন্দে যাহাই দিতেন তাহাতেই আশ্রম চলিত। তিনি বলিতেন, 'কেবল কর্মের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকলে সকলেই মহৎ কার্য অনায়াসে করতে পারেন, লোকবল অর্থবল ঈশ্বরই পাঠাবেন।' তিনি খেলাধূলা অতিশয় ভালবাসিতেন এবং নিজে ঘুড়ি তৈয়ার করিয়া উড়াইতেন। তিনি শিশু ও বালকদের সহিত খুব মিশিতেন এবং তাহারাও তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। উচ্চাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীতে খেলাধুলা, পড়াশুনা, কাজকর্ম যাহাই করা যায় তাহাই ধর্ম। আদর্শ ব্যতীত পূজাপাঠও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। স্বামী পরমানন্দের জীবন ছিল ব্যবহারিক বেদান্তের জ্বলন্ত উদাহরণ। একজন বাঙ্গালী যুবক অল্পবয়স হইতে কিরূপে তপস্যা, সাধন ও বেদান্তের আদর্শে জীবন গড়িয়া উন্নত হইতে পারেন, এবং কিরূপে নিজের ও অপরের বিপুল কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন, স্বামী পরমানন্দ তাহারই অনুকরণীয় আদর্শ।

ভিক্টর হুগো সত্যই বলিয়াছেন যে, 'ঈশ্বরাদেশ-প্রাপ্ত আচার্য নির্ভীক হন, কিন্তু প্রচারক হন ভীরু।' ধর্মাচার্যরূপে স্বামী পরমানন্দের নির্ভীকতা ছিল তাঁহার

গুরুর মতই অসাধারণ। শত সমালোচনা তাঁহাকে টলাইতে পারিত না, শত সংগ্রামেও তিনি ভীত হইতেন না। নিঃস্বার্থ হইলেই মানুষ এরূপ নির্ভীক হইতে পারে। স্বামী পরমানন্দ বলিতেন, "আমি বিচারকের আসনে বসিয়া নীচতম ব্যক্তিকেও নিন্দা করিতে পারি না। আমার কাজ তাহাকে ভালবাসা ও সেবা করা। সমালোচনা ও নিন্দার স্থান ধর্মজীবনে নাই। বিচার করিয়া কখনও ভালবাসা হয় না। অপরের কল্যাণ চিন্তা করা এবং সেবা করাই আমার জীবনের প্রধান সাধনা।" স্বামী পরমানন্দ যাহা নিজে করিতেন, তাহাই উক্ত উপদেশে ব্যক্ত।

বার

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ *

"রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণং হনুমদ্‌ভাবভাবিতং।
নমামি স্বামিনং রামকৃষ্ণানন্দেতি সংজ্ঞিতং॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলজন সন্ন্যাসী শিষ্যের অন্যতম ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। শ্রীগুরু এবং তৎনামাঙ্কিত সংঘের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। মান্দ্রাজে ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। সংঘের আদি দশকে বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে দেবদূতবৎ তিনি শ্রীগুরুর ভস্মাস্থির সেবা ও পূজায় ব্রতী ছিলেন। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান স্তম্ভ বলিতেন। সংঘ-স্থাপয়িতা কর্তৃক ১৮৯৭ খ্রীঃ তিনি বেলুড় মঠের প্রথম এগারজন ট্রাস্টির অন্যতম রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনপূর্বক ১৯১১ খ্রীঃ মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ বৎসর তিনি ইহার পরিচালনা করেন।

পূর্বাশ্রমে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নাম ছিল শশীভূষণ চক্রবর্তী। শশীভূষণ ১৮৬৩ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত সালে স্বামী বিবেকানন্দও ভূমিষ্ঠ হন। শশীভূষণের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও তান্ত্রিক ছিলেন। বিখ্যাত তন্ত্রাচার্য্য জগমোহন তর্কালঙ্কার (ওরফে স্বামী পূর্ণানন্দ অবধূত) ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের গুরু। স্বামী বিবেকানন্দের আগ্রহে বেলুড় মঠে ১৯০১ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম প্রতিমায় দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজায় তন্ত্রধারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। শশীভূষণের মাতা ভবসুন্দরী দেবী ধর্মপ্রাণা, লজ্জাশীলা, সরলা ও গৌরবর্ণা নারী

---

* মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত মৎপ্রণীত 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' নামক বৃহৎ পুস্তকে বিস্তৃত জীবনী বিবৃত।

ছিলেন। পুত্র শশীও মাতার ন্যায় গৌরবর্ণ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ১৯০২ খ্রীঃ দেহরক্ষা করেন, এবং ভবসুন্দরী পুত্রের মৃত্যুর পরেও জীবিতা ছিলেন।

বালক শশী অতিশয় বুদ্ধিমান ও মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতার এক হাই স্কুলে পড়িয়া স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তিলাভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ খুল্লতাত ভ্রাতা শরচ্চন্দ্রের কলিকাতাস্থ ভবনে থাকিয়াই পড়িতেন স্কুলে ও কলেজে। বিশ বৎসর বয়সে শশী যখন এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করেন। প্রথম সন্দর্শন হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। তখন শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর শশী ও শরৎকে দেখিয়া এবং তাঁহারা এক পরিবারভুক্ত এবং কেশব সেনের ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন জানিয়া আনন্দিত হন। শশী কেশব সেনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন এবং তাঁহার পুত্রগণের গৃহ শিক্ষকরূপে কিছু কাল কার্য্য করেন। তাঁহার হৃদয় যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য লালায়িত ছিল তাহা তিনি কেশবের নিকট পান নাই। তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কেশব তাঁহার ধর্মাকাঙ্ক্ষা শাণিত করিলেও পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার আধ্যাত্মিক পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত করেন। তাঁহার পদপ্রান্তে প্রায় তিন বৎসর কাল বসিয়াই শশী সাধন-রহস্য অবগত এবং ধর্মজীবনে সমধিক উন্নত হন। শ্রীগুরুর কৃপায় শিষ্যের বিবেক বৈরাগ্য বর্ধিত এবং ঈশ্বর লাভের আগ্রহ জাগ্রত হয়। উত্তম শিষ্য উত্তম গুরুর সঙ্গলাভে ধন্য হইলেন।

ঠাকুর প্রথম দর্শনে শশীকে কিছু ধর্মোপদেশ দেন এবং তাঁহার মনে এই ভাব মুদ্রিত করেন যে, ঈশ্বর লাভের জন্য অবিবাহিত জীবন আবশ্যক। তিনি শশীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস, না নিরাকারে?' শশী উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমি নিশ্চিত নয়, তখন ইহার কোনটাই বলিতে পারি না।' শশীর এই সরল উত্তরে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইলেন। প্রথম দর্শন শশীর মনে এক গভীর রেখাপাত করিল এবং তাঁহার জীবনে মহা পরিবর্তন আনিল। ঠাকুরের দিব্য জীবন দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন। এখন হইতে তিনি

ঘন ঘন ঠাকুরের নিকট আসিতেন এবং একাগ্র মনে ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেন। অধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ ক্রমে হ্রাস পাইল। কালীবাড়ীতে একদিন তিনি ফার্সী ভাষা শিখিতে ছিলেন স্থফী কবিদের মূল রচনাবলী পড়িবার উদ্দেশ্যে। অধ্যয়নে তিনি এত মগ্ন ছিলেন যে, ঠাকুর তিন বার ডাকা সত্বেও তিনি সাড়া দেন নাই। ঠাকুরের কাছে যাইতেই তিনি শশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কি করছিলি?' পাঠে শশীর তন্ময়তার কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'অপরা বিদ্যা লাভের জন্য যদি তুই ধর্মবিষয়ক কর্তব্য অবহেলা করিস, তোর ভক্তিলাভ হইবে না।' শশী ঠাকুরের উপদেশের গূঢ়ার্থ হৃদ্‌গত করিয়া ফার্সী গ্রন্থগুলি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিলেন। তখন হইতে গ্রন্থপাঠের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কমিয়া গেল এবং তিনি গুরুসেবায় এবং ধর্মসাধনায় অধিকতর মনোযোগ দিতে লাগিলেন।

একদিন ঠাকুর তাঁহার ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। এমন সময় শশী কোন জরুরী কাজে সেই ঘরের ভিতর দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বাধা দিয়া নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বলিলেন, 'দেখ, তুই যাকে খুঁজছিস্ সে এই, সে এই, সে এই।' এই বাক্যের গভীর অর্থ অদূর ভবিষ্যতে শশীর হৃদয়ঙ্গম হইল। শশী অনতিবিলম্বে বুঝিলেন, ঠাকুর ঈশ্বরাবতার। তখন হইতে অবতাররূপী গুরুর সেবা এবং ঈশ্বরলাভই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। বালকের ন্যায় ঠাকুর বরফ খাইতে ভালবাসিতেন। এক দারুণ গরমের দিনে শশী উত্তর কলিকাতা হইতে এক টুকরা বরফ কাগজে জড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে পদব্রজে লইয়া যান। আশ্চর্যের বিষয়, ছয় মাইল পথ বহন করা সত্বেও বরফটি গলিয়া যায় নাই! দ্বিপ্রহরে শশী বরফ লইয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বরফটুকরা পাইয়া ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না। রৌদ্রের উত্তাপে শশীর মুখ ও দেহ লাল হইয়া গিয়াছিল এবং উত্তপ্ত রাস্তার উপর দিয়া অনেকক্ষণ হাঁটার জন্য তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল! শশীকে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার কষ্ট স্বীয় দেহে অনুভব করিয়া বলিলেন, 'আহা! আহা!' শশী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তোর রৌদ্রতপ্ত শরীরের দিকে তাকাইতেই আমার নিজের শরীরে সেই জ্বালা বোধ করিলাম।'

ঠাকুর শেষ অসুখে প্রায় এক বৎসর শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন শশী কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় ব্রতী। শ্রীগুরুর সপ্রেম সেবায় তিনি আহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও অন্যান্য প্রিয় কর্ম ভুলিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে রহিলেন। গুরু মহাসমাধিমগ্ন হইলে শশী অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় শোকে অভিভূত হইলেন। মৃত গুরুদেহের পদপ্রান্তে তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। অসহ্য শোকে তাঁহার দেহমন জড়বৎ অসাড় হইয়া গিয়াছিল। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে চোখের জলে তিনি বুক ভাসাইলেন। কাশীপুর শ্মশানে যখন শ্রীগুরুর ভৌতিক দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছিল তখন শশী গুরুদেবের মধুর নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতেছিলেন। শবদাহ সমাপ্ত হইলে তিনি শ্রীগুরুর ভস্মাস্থি একটী তাম্র পাত্রে করিয়া কাশীপুর বাগানবাটীতে লইয়া গেলেন। ঠাকুরের গৃহী শিষ্যগণ শ্রীগুরুর ভস্মাস্থি কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্তের যোগোদ্যানে প্রোথিত করিবার সঙ্কল্প করেন।

তখন শশী ভস্মাস্থির অধিকাংশ গোপনে অন্য পাত্রে রাখিয়া বলরাম বসুর বাটীতে নিত্য পূজার্থ পাঠাইয়া দেন। ১২৯৩ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে (১৮৮৬ খ্রীঃ ২৩ শে অক্টোবর) শশী প্রথম পাত্রটী মাথায় করিয়া যোগোদ্যানে লইয়া যান। তথায় যথাবিধি উহা সমাহিত করা হয়। একটী গভীর গর্ত খনন করিয়া পাত্রটী তন্মধ্যে প্রোথিত করা হইল। যখন গর্তস্থিত পাত্রটীর উপর মাটি ঢালিয়া লৌহ মুষল দ্বারা মাটি পেটা হইতেছিল তখন শশী হৃদয়-বিদারক বেদনা অনুভব করিলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রুপাত হইল, তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। গর্তে মাটি পেটা শেষ হইলে শশী ধীরে ধীরে বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে শশী বি. এ. পরীক্ষা না দিয়াই সংসার ছাড়িয়া মঠে যোগ দিলেন। জনৈক বৃদ্ধ শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিবাসী তাঁহাকে বলেছিলেন, 'বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়াই মঠে যোগ দিলে দোষ কি?' সংসারবিরাগী বিবেকী তরুণ উত্তর দিলেন, 'আপনি কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, মৃত্যু ইতোমধ্যে আমাকে

আক্রমণ করিবে না ?' এই জন্য শাস্ত্রে আছে, 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ', অর্থাৎ মৃত্যু যেন চুল ধরে আছে, এই ভেবে ধর্মাচরণ করিবে। জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া শশী ঈশ্বরলাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। বলরাম বসুর গৃহ হইতে ঠাকুরের ভস্মাস্থি বরাহনগর মঠে আনীত এবং শশীর দ্বারা নিত্য পূজিত হইতে লাগিল। বরাহনগর মঠে তিনিই ঠাকুর-ঘর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাতে নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ গুরুভ্রাতাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু শশী এই বিষয়ে কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। ১৮৮৭ খ্রীঃ প্রথম ভাগে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শশী 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামে অভিহিত হইলেন। স্বয়ং নরেন্দ্র নাথের উক্ত নাম গ্রহণের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শশীর অসীম গুরুভক্তি দর্শনে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে উক্ত নাম দেওয়া হয়। শশীর 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম সার্থক হইয়াছিল। কারণ, তিনি সত্যই রামকৃষ্ণে পরম আনন্দ পাইতেন, তিনি রামকৃষ্ণময় ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয় আলমবাজার মঠেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূর্ববৎ ঠাকুর-পূজা করিতে থাকেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ তীর্থদর্শন বা তপস্যার্থ অন্য স্থানে যাইলেও শশী সৈনিকবৎ কর্তব্যস্থলে অচল অটল রহিলেন। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দশবৎসর তিনি মঠত্যাগ করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'শশী মঠের প্রধান স্তম্ভ। সে ছাড়া তখন মঠে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।' প্রায়ই সন্ন্যাসিগণ আহারাদির চিন্তা ভুলিয়া ধ্যান ভজনে মাতিয়া থাকিতেন। কিন্তু শশী আহার প্রস্তুত ও ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া গুরুভ্রাতাদের জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং অধিক দেরী হইলে তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। তিনি যেন মঠের মা ছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারীর শেষার্ধে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিবার পথে মাদ্রাজে ভক্তগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, 'আমি আপনাদের নিকট এমন এক গোঁড়া গুরুভাইকে পাঠাইব যিনি দাক্ষিণাত্যের সর্বাপেক্ষা গোঁড়া বামুনের চেয়েও গোঁড়া, অথচ যিনি পূজা, শাস্ত্রজ্ঞান, ধ্যানধারণাদিতেও অসাধারণ ও

অনতিক্রম্য।' স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মধ্যে পাঁচ ছয় বৎসর সাক্ষাৎ হয় নাই। তথাপি স্বামিজী যখন একথা বলিয়াছিলেন, তখন রামকৃষ্ণানন্দজীর কথাই তাঁহার মনে ছিল। শশী মহারাজ স্বামিজীর বাক্যকে গুরুবাক্যতুল্য জ্ঞান করিতেন। প্রিয় গুরুভ্রাতার আদেশে তিনি মঠ স্থাপনের জন্য মাদ্রাজে চলিলেন। ঠাকুরের পূজা লইয়াই তিনি সারা জীবন কাটাইবেন, এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গুরুভ্রাতার নির্দেশে উক্ত সঙ্কল্প ছাড়িতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তখন কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত রেলপথ হয় নাই, জাহাজে করিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ মার্চ মাসের শেষে তিনি মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। আইস হাউস রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সাময়িক ভাবে তিনি রহিলেন। এই দ্বিতল বাড়িটির নাম ছিল 'ফ্লোরা কটেজ'। ইহা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আলমবাজার মঠ হইতে তিনি ঠাকুরের একটি বাঁধান ফটো সঙ্গে লইয়া যান। ফ্লোরা কটেজে সেই ফটোটি প্রতিষ্ঠা করিয়া আলমবাজার ও বরাহনগর মঠের মত সেখানেও প্রত্যহ তিনি ঠাকুর-পূজা করিতে লাগিলেন। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের ইহাই আদি সূত্রপাত। উক্ত মঠ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৭ খ্রীঃ জুন মাসে আইস হাউসের নিম্ন তলে মঠ উঠিয়া যায়। উক্ত গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ অবস্থান করিয়াছিলেন। গৃহটি মাদ্রাজের বিখ্যাত সমুদ্রোপকূলের সন্নিকটে হওয়ায় মঠের বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। এই সুবৃহৎ ত্রিতল গৃহটি এস. বিলাগিরি আয়েঙ্গার নামক এক এটর্নীর সম্পত্তি ছিল। বিলাগিরি স্বামিজীর অন্যতম প্রিয় পাত্র ছিলেন। মঠের জন্য তিনি এই বাড়ীর একতলা বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করিতে দেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ মঠ আইস হাউসে অবস্থিত ছিল। উক্ত সালে মঠ বর্তমান স্থায়ী জমিতে মাইলাপুর অঞ্চলে স্থাপিত হয়। এই স্থানে থাকিয়া তিনি আরও পাঁচ ছয় বৎসর ঠাকুরের ভাব প্রচার করেন। ১৮৯৭ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রায় চৌদ্দ বৎসর প্রধানতঃ মাদ্রাজে এবং সাধারণতঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে প্রচার কার্য্য করেন। সহরের পল্লীতে পল্লীতে তিনি সাপ্তাহিক ধর্মব্যাখ্যা করিতেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিতেন

এবং বাংলা ও ইংরেজীতে বই লিখিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর মঠে পাচক বা ভৃত্য ছিল না। তিনি নিজেই ঠাকুরের ভোগ রান্না ও পূজাদি করিতেন এবং মঠের অন্যান্য কাজও দেখিতেন। কোন কোন মাসে তাঁহাকে সপ্তাহে বার তেরটি স্থানে বিভিন্ন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে হইত। ঠাকুরের কাজের জন্য মাদ্রাজে কি অদ্ভুত ধৈর্য ও নিষ্ঠা তিনি দেখাইয়াছেন! এক বৈকালে আকাশ মেঘাবৃত ও সামান্য বৃষ্টিপাত হইতেছিল। তিনি একটি জাট্‌কা গাড়ীতে জর্জ টাউনে গেলেন একটি সাপ্তাহিক ক্লাস করিবার জন্য। তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেদিন কেহই আসিতে পারিলেন না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উপনিষদখানি খুলিয়া শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সম্মুখে বহু শ্রোতা উপস্থিত! পুরা একটি ঘণ্টা তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা চলিল। যে ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাঁহাকে ক্লাসের পরে তিনি বলিলেন, 'চল, এখন মঠে যাই।' মঠে ফিরিবার পথে গাড়ীতে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, ক্লাসে কেহই উপস্থিত ছিল না, অথচ আপনি একটি ঘণ্টা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিলেন কেন?' তদুত্তরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, 'আমি কাউকে শেখাতে আসিনি! আমি যে ব্রত নিয়েছি, সেইটি উদ্‌যাপন করছি মাত্র।' কি ভাব লইয়া শশী মহারাজ ঠাকুরের কাজ করিতেন তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়!

মাদ্রাজ সহরের এক ধনী ব্যক্তি মঠে কিছু অর্থ দানের প্রতিশ্রুতি দেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কোন ভক্তের সহিত উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রতিশ্রুত অর্থ আদায়ের জন্য বহুবার গিয়াছিলেন। শেষবার ভদ্রলোকটি শশী মহারাজকে অভদ্রভাবে বলিলেন, 'স্বামিজী, আপনি আর আসবেন না। সম্ভব হলে আমি কিছু পাঠিয়ে দেব।' ভক্তটি ইহাতে দৃশ্যভাবে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং উক্ত বাক্য শশী মহারাজের প্রতি অপমানসূচক মনে করিলেন। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রীতিভরে তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া শান্তভাবে বলিলেন, 'সে কিছু দিলে না বলে তার সম্বন্ধে আমাদের খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। যদি মনে মনেও আমরা তাহার প্রতি মন্দভাব পোষণ করি, ইহার দ্বারা তাহার অনিষ্ট হবে।'

[illegible] স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার গভীর প্রীতি জন্মে। উভয়ে সমবয়সী ছিলেন। তথাপি স্বামীজীর আদেশকে তিনি গুরুবাক্যতুল্য গণ্য করিতেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যে যাইবার পথে স্বামী তুরীয়ানন্দ সমভিব্যাহারে স্বামী বিবেকানন্দ মান্দ্রাজ বন্দরে উপস্থিত হন। কলিকাতায় তখন প্লেগ-মহামারী চলিতেছিল। সেইজন্য মান্দ্রাজ বন্দরে প্রবেশ করিলে পর সংক্রামক রোগ বিস্তার নিরোধ আইনানুসারে দর্শকবৃন্দ বা যাত্রিগণের কাহাকেও জাহাজে উঠিতে বা নামিতে দেওয়া হয় নাই। জেটী হইতে বহুদূরে জাহাজ নঙ্গর ফেলিয়াছিল। স্বামীদ্বয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বহু বন্ধু ও ভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় জাহাজের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য কতিপয় মিষ্টান্ন ও রুচিকর আহার্য্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐগুলি লইয়া কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে তিনি নৌকাযোগে জাহাজের সমীপবর্তী হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ডেকের প্রাচীরে হেলান দিয়া নৌকায় অবস্থিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত কথাবার্তা বলিলেন। তীরে প্রত্যাবর্তন কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জাহাজটীকে দক্ষিণ দিক দিয়া নৌকায় প্রদক্ষিণপূর্বক বলিলেন, 'আজ যে মহাপুরুষ-যুগলের পাদস্পর্শ করার সৌভাগ্য হইল না তাঁহাদিগকে অন্ততঃ প্রদক্ষিণ করিয়া ধন্য হই।'

একদা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মান্দ্রাজ হইতে এর্ণাকুলম গমন করেন। তথায় তুরেইস্বামী আয়ার নামক এক আইনজীবির গৃহে তিনি অতিথি হইলেন। পরিব্রাজক জীবনে মালাবার ভ্রমণ কালে স্বামী বিবেকানন্দ এই গৃহে বাস করিয়াছিলেন। উক্ত গৃহে প্রবেশমাত্রই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জানিতে চাহিলেন; ঠিক কোন স্থানে তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতা শয়নোপবেশনাদি করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আয়ার উত্তর দিলেন, 'আমরা এখন যে স্থলে দণ্ডায়মান ঠিক এই স্থানেই তিনি বসিয়াছিলেন!' 'ইহা পবিত্র স্থান,' 'ইহা তীর্থক্ষেত্র' বলিতে বলিতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তথায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজে বা অন্যত্র যে যে স্থানে স্বামীজী গিয়াছিলেন তাহা শুনিলে শশী মহারাজ তথায় যাইয়া উক্ত স্থানের ধূলিস্পর্শ করিতেন।

মান্দ্রাজে একদা স্বামী বিশুদ্ধানন্দ দেখিলেন, নানা স্থানে বক্তৃতা প্রদানান্তে মঠে ফিরিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর তৈলচিত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। তাঁহার নিম্নোক্ত প্রার্থনা বিশুদ্ধানন্দজী আড়াল হইতে শুনিয়াছিলেন—'হে আমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা, তুমিই প্রভুর প্রকৃত প্রতিনিধি! তুমিই তাঁহার বাণী প্রচারার্থ আমাকে এখানে পাঠাইয়াছ। আমি কেবল তোমারই আদেশ পালন করিয়া চলিতেছি। দেখিও, যেন আমার অন্তরে কোন অহংকার বা আত্মাভিমান প্রবেশ না করে; বা নাম যশের কোন স্পৃহা যেন আমার মনে স্থান না পায়। আমার এই প্রার্থনা তুমি শোন!....আশীর্বাদ কর, যেন প্রভুর হস্তে যন্ত্রবৎ চালিত হইয়া তাঁহার কাজ করিতে এবং সমস্ত কর্মফল তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতে পারি। সর্বদা আমাকে সৎপথে চালিত কর।' শশী মহারাজ জানিতেন, রামকৃষ্ণ-শক্তি বিবেকানন্দে ক্রিয়াশীল ছিল।

শ্রীসারদাদেবী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আগ্রহাতিশয্যে রামেশ্বর তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলেন। শশী মহারাজের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা ১০৮টী সোনার বেলপাতা দিয়া ৺রামেশ্বরের পূজা করেন। তীর্থ দর্শনান্তে শ্রীমা বাঙ্গালোরে যাইয়া নবনির্মিত মঠগৃহেই বাস করিলেন। যখন তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়া সুশ্রী শহরের রাস্তাগুলির উপর দিয়া মোটর গাড়ীতে মঠাভিমুখে যাইতেছিলেন তখন তাঁহার উপরে সহরের ভক্তগণ কর্তৃক পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বয়ং বাঙ্গালোরে শ্রীমার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। যতদিন শ্রীমা বাঙ্গালোর মঠে ছিলেন ততদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রত্যহ প্রাতে উদ্যান হইতে কতকগুলি সদ্য-প্রস্ফুটিত সুগন্ধি ফুল চয়ন করিয়া তাঁহার চরণে অঞ্জলি দিতেন। প্রত্যহ তিনি শ্রীমায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক কাতর ভাবে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতেন। একদিন সূর্য্যাস্তের সময় শ্রীমা মঠের ঠিক পশ্চাতে একটী অনুচ্চ পাহাড়ের উপরে স্বামী বিশুদ্ধানন্দপ্রমুখ কতকগুলি সন্ন্যাসী শিষ্য সহ যাইয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রঙ্গীন সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ উপবিষ্ট হইলেন। আকাশে ভ্রাম্যমাণ অভ্রখণ্ডসমূহের মধ্য দিয়া সৌর করের যে বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হইতেছিল তাহার দিব্য শোভা দেখিতে দেখিতে শ্রীমা গভীর

এইভাবে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভক্ত ও অভক্ত সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও প্রীতির ভাব পোষণ করিতেন।

মঠের অর্থাভাব হইলে তিনি ভক্তের নিকট কিছু চাহিতেন না। এই বিষয়ে তিনি ঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। মঠের ব্যয়নির্বাহ কিরূপে হয়, এই প্রশ্ন করিলে তিনি মহাতৃপ্তির সহিত উত্তর দিতেন, 'ঠাকুরই সব অভাব পূর্ণ করেন।' অভাবনীয় উপায়ে তাঁহার অভাব সত্যই পূর্ণ হইত। একদিন ঠাকুরের লুচি ভাজিবার জন্য মঠ-ভাণ্ডারে একটুকুও ঘৃত ছিল না। অথচ ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিবার সময় সমাগত। তিনি নিরুপায় হইয়া বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার এক ছাত্র আসিয়া তৎক্ষণাৎ আবশ্যকীয় ঘৃত বাজার হইতে কিনিয়া আনিলেন।

গুরুভক্তিই ছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার গুরুভক্তি এত সুগভীর ও অতুলনীয় ছিল যে, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। গ্যালেটিয়ানদিগকে একটী পত্রে সেণ্ট পল লিখিয়া ছিলেন, 'তথাপি আমি নাই, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টই আমার অন্তরে বিরাজিত।' এই উক্তি দ্বারা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মনোভাব যথাযথ প্রকাশিত হয়। ভগ্নী দেবমাতা যথার্থই বলিয়াছেন, 'তাঁহার সত্তাটি একেবারে বিসৃত ছিল, তিনি গুরুর সত্তাতেই জীবিত ছিলেন। গুরু ভিন্ন অন্য কিছুর চেতনাই তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। চলায় ফেরায়, আহারে শয়নে, শিক্ষাদান বা অন্য সব কার্যে তাঁহার সমগ্র জীবন গুরুর ইচ্ছায় পরিচালিত হইত।' সেণ্ট পল বলিয়াছেন, 'এই রক্ত-মাংসের শরীরে আমি যে জীবন ধারণ করিতেছি তাহা ঈশ্বরসন্তান যীশু খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের বলে।' স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও ঠিক এই কথাই বলিতে পারিতেন। মঠের ঠাকুরঘরে প্রভু সর্বদা বিরাজমান, ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। গৃহের বাহিরে যাইবার কালে পুত্র যেমন পিতামাতার অনুমতি লইয়া যায় সেরূপ শশী মহারাজও মঠের বাইরে যাইবার কালে ঠাকুরকে বলিয়া যাইতেন। ঠাকুরকে যাহা নিবেদিত হইত না, তাহা তিনি কখনও আহার করিতেন না। বহুমূত্রের নিমিত্ত ডাক্তার তাঁহাকে আটার রুটী

খাইতে বলেন। কিন্তু ঠাকুরকে রুটী ভোগ দেওয়া হয় না বলিয়া স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও তিনি রুটী খাইলেন না।

মাদ্রাজ মঠের আদি গৃহ নির্মিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যেই ইহা নানা স্থানে ফাটিয়া যায়। বৃষ্টির সময় ছাদ হইতে জল পড়িত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সেই সময় ঠাকুরঘরে যাইয়া দেখিতেন, ছাদ হইতে জল পড়িতেছে কিনা। এক বৃষ্টির রাত্রে ঠাকুর-ঘরেও জল পড়িতেছিল। ঠাকুরের ছবিটি যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই জল পড়িতে লাগিল। রামকৃষ্ণানন্দজী একটি ছাতা লইয়া ঠাকুরের ছবির উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে বৃষ্টি থামিল। তখন তিনিও ছাতা বন্ধ করিলেন। ঠাকুরের ছবিটি নিরাপদ স্থানে সরাইয়া রাখিলেন না। সরাইতে গেলেই ঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে যে! ঠাকুর যে তাঁহার নিকট জীবন্ত জাগ্রত দেবতা! একবার জুন মাসের এক গরমের দিনে দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। অস্থির হইয়া হঠাৎ তিনি উঠিয়া পড়িলেন। এই অসহ্য গরমে ঠাকুরের খুব কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলেন। বাতাস করিতে করিতে এবং 'হে প্রভু, হে প্রাণবল্লভ প্রভু আমার,' ইত্যাদি মধুর বাক্য বলিতে বলিতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইলেন। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলেন, 'ঠাকুরকে সপ্রেমে সেবা করিতে করিতে শশী মহারাজ স্বীয় পারিপার্শ্বিক, স্বীয় দেহজ্ঞান এবং গ্রীষ্মজনিত কষ্ট বিস্মৃত হইলেন! তদবস্থায় সম্মুখে একমাত্র ঠাকুরের জীবন্ত উপস্থিতিই তাঁহার হৃদয়-মন অধিকার করিল।' *

গুরুভ্রাতৃগণকে গুরুতুল্য ভক্তি করাই শাস্ত্রবিধি। গুরুভ্রাতৃভক্তি ব্যতীত, গুরুভক্তি কখনো পূর্ণাঙ্গ হয় না। দুঃখের বিষয়, অকপট গুরুভ্রাতৃভক্তি অধুনা দুর্লভ। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবন উহার প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে, বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দকে তিনি যে প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন তাহা পূজার তুল্য ছিল। দক্ষিণেশ্বরে

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরাজি মাসিকের ১৯৪৭ জুলাই সংখ্যায় মল্লিখিত প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

ধ্যানে মগ্ন হইলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংঘজননীর পাদপদ্মে নতজানু হইয়া করযোড়ে সজল নয়নে ভক্তিভরে প্রার্থনা করিলেন, 'হে মাতঃ! তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা। তুমি সর্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজিতা। তুমিই ভক্তজনে মুক্তিদান কর। আমাকে এবং তোমার চরণাশ্রিত অন্যান্য সকলকে আশীর্বাদ কর, যেন আমরা সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তি পাই।' শ্রীমা চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া করুণ কটাক্ষে প্রণত সন্তানের মস্তকে শ্রীহস্ত স্থাপনপূর্বক আশিস বর্ষণ করিলেন। ইহাতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পরমানন্দিত হইলেন। *

সংঘজননী কলিকাতা ফিরিবার পরই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, 'আমার কাজ শেষ।' ইহার অল্পকাল পরেই তিনি মান্দ্রাজে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। শ্রীগুরুর ভাব প্রচারে এবং হিন্দু ধর্মের নব জাগরণের জন্য প্রায় চৌদ্দ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ইতঃপূর্বেই ভগ্ন এবং তাঁহার রোজ অল্প অল্প জ্বর হইত, কাশিও আরম্ভ হইল। ভক্তগণের পরামর্শে তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে বাঙ্গালোর আশ্রমে বায়ু পরিবর্তনে গমন করেন। তথায় তাঁহার অসুখ কমিল না, বা স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হইল না। ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ইহা দুরারোগ্য যক্ষ্মা! স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বুঝিলেন, তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত এবং প্রয়াণকাল সমাগত। তিনি অন্তরে শ্রীগুরুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া মহামিলনের অপেক্ষায় উৎফুল্ল হইলেন। সংঘের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে চিকিৎসার্থ অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। তিনি ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সালে (১০ই জুন, ১৯১১ খ্রীঃ) কলিকাতায় আগমন করেন। বাগবাজার উদ্বোধন মঠে তাঁহাকে চিকিৎসার্থ রাখা হয়। তিনি কলিকাতায় মাত্র দুই মাস এগার দিন জীবিত থাকিয়া ১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র (২১শে আগষ্ট, ১৯১১ খ্রীঃ) মহাপ্রয়াণ করেন।

গুরু ভ্রাতাগণ তাঁহার চিকিৎসার এবং সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিলেন

* মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত ও মৎপ্রণীত The Story of a Dedicated Life নামক ইংরাজি পুস্তকে বিশদ বর্ণনা প্রদত্ত।

স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন মঠে থাকিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ বেলুড় মঠ হইতে নিয়মিত ভাবে যাইয়া শশী মহারাজের অন্তিম শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সংবাদ লইতেন। ডাক্তার বিপিন ঘোষ রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ইহা galloping pthisis (দ্রুত ধাবমান যক্ষ্মা), শরীর তিন মাসের বেশী টিকিবে না।' ডাঃ ঘোষের কথা সত্য হইল। প্রসিদ্ধ কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেনও তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ঠাকুর যখন গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট চিকিৎসার্থ গিয়াছিলেন তখন বালক দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদের ছাত্র ছিলেন এবং ঠাকুরকে পরীক্ষাপূর্বক গুরুকে বলিলেন, 'এ যোগজ ব্যাধি!' দুর্গাপ্রসাদ শশী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি স্বপ্নে শ্মশান, তুলসী-কানন প্রভৃতি দেখেন কি?' তদুত্তরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, 'ওসব দেখি না। তবে ঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজি, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্বপ্নে দেখি।' কোন চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। তাঁহার শরীর ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল এবং দুরারোগ্য ব্যাধি বাড়িয়া চলিল। তাঁহার আহারও একেবারে কমিয়া গেল।

দেহত্যাগের দুই তিন দিন পূর্বে সকাল আটটা নয়টার সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। সেবক নিঃশব্দে অদূরে উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে তিনি সহসা উঠিয়া ব্যস্ত ভাবে সেবককে বলিলেন, 'ঠাকুর, মা ও স্বামিজী এসেছেন। তাঁদের আসন দে।' সেবক এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তখন শশী মহারাজ সেবককে বিরক্তভাবে বলিলেন, 'দেখতে পাচ্ছ না? ঠাকুর এসেছেন, মাদুর পেতে দে, আর তিনটা তাকিয়া দে।' সেবক বিস্মিত হইয়া আদেশ পালন করিলেন। তখন শশী মহারাজ হাত জোড় করিয়া তিনবার প্রণামান্তে নির্নিমেষ নয়নে সেই অদৃশ্য ব্যক্তিগণকে দেখিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, 'তাঁরা চলে গেছেন। এখন মাদুর ও তাকিয়া তুলে নে।' একদিন সুগায়ক পুলিনবিহারী মিত্র তাঁহাকে দেখিতে আসেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে স্বামিজীর 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর—' এই গানটি গাইতে অনুরোধ করিলেন। যখন পুলিন

বাবু উক্ত গান গাইতেছিলেন তখন শশী মহারাজ উহা তন্ময় হইয়া শ্রবণ করেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হন।

অন্তিমকাল সন্নিকট বুঝিতে পারিয়া রামকৃষ্ণানন্দজী দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীসারদা দেবীকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। বেলুড় মঠ হইতে এক সন্ন্যাসী প্রেরিত হইলেন তাঁহাকে আনিবার জন্য। কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই এবং বলিয়াছিলেন, 'শশীর শরীর যাবে, তা আমি দেখতে পারব না।' তিনি স্থূল শরীরে আসিতে না পারিলেও সন্তানকে দিব্য দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। শশী মহারাজের এই অলৌকিক দর্শন দেহত্যাগের পূর্বরাত্রে ঘটিয়াছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে পুলিন বাবুর নিকট দর্শনের ভাবটি ব্যক্ত করিয়া গানের প্রথম পদটি 'পোহাল দুঃখ-রজনী' ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন। মহাকবি পূর্ণ গানটি অচিরে এই ভাবে রচনা করিয়া দেন।—

ভৈরবী—একতালা

পোহাল দুঃখ-রজনী।
গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ
হের, জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী॥
বরাভয়-করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয় মার নামে পূর্ণ অবনী॥
কহিছে জননী, 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণপদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা॥
(হের) মম পাশে করুণায় দুটি আঁখি ভাসে।
ভুবন-তারণ গুণমণি॥'

গানটি পুলিন বাবু বহুবার গাহিলেন এবং শশী মহারাজ মুদ্রিত নয়নে আবিষ্টভাবে শুনিলেন। গানটি তাঁহার এত মনোমত হইয়াছিল যে, ইহা শ্রবণে তিনি পরম প্রশান্তি পাইলেন। সেদিন সকাল হইতেই তিনি ঘন ঘন

সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং শেষ তিন ঘণ্টা সমাধিমগ্ন ছিলেন। মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত পান করিলেন। বেলা একটার সময় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীরে এক অপূর্ব ভাবের সমাবেশ হইতে লাগিল, সর্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুখ এত লাল হইল, যেন শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়াছে! শরীরে একটু ঘামও দেখা দিল। মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল! ১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র সোমবার বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শিবনেত্র হইয়া মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন। মহাসমাধির পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার মৃত শরীরে রোমাঞ্চের লক্ষণ বর্তমান ছিল। স্বামী সারদানন্দ ১৩১৮ সালের উদ্বোধন পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, 'সমাধিতেই যে তিনি দেহরক্ষা করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার ঐকালে সর্বাঙ্গে অসাধারণ দীর্ঘকাল-ব্যাপী পুলক দেখিয়া তদীয় গুরুভ্রাতাগণ অনুমান করিয়াছিলেন।'

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নশ্বর দেহ পত্রপুষ্পে সুশোভিত ও চন্দন-চর্চিত করিয়া বেলুড় মঠে আনীত হইল। সন্ধ্যা সমাগমে স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরের দক্ষিণে গঙ্গার ধারে চন্দনকাষ্ঠের চিতায় শশী মহারাজের পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত করা হইল। তাঁহার প্রাণমন যেমন গুরুপাদপদ্মে বিলীন হইয়াছিল তাঁহার স্থূল দেহও তেমনি রামকৃষ্ণাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। শ্রীগুরুর পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত তাঁহার দেহ ও জীবন ইহধামে মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর হোমশিখার ন্যায় জ্বলিয়াছিল। তাঁহার শ্মশানে কোন স্মৃতিফলক আজও নির্মিত হয় নাই যাহার দ্বারা দর্শক পূত স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার অমর স্মৃতি রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার জীবৎকালে লোকে যেমন তাঁহার পূতস্পর্শে আসিয়া নবজীবন লাভ করিত, তেমনি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তাঁহার লোকোত্তর জীবন ও দেববাণী অনুধ্যানে অনেকে ধর্মজীবন লাভ করিবে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধির সংবাদে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, 'একটি দিকপাল চলে গেল! দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল!'

মাদ্রাজের অধুনালুপ্ত ইংরাজী মাসিক 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৯১১ খ্রীঃ অক্টোবর সংখ্যায় এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল।—"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মৃত্যুতে মাদ্রাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। বেদান্তের বাণী প্রচারের নিমিত্ত এবং উহার সনাতন তত্ত্ব জনসাধারণকে অবগত করাইবার জন্য মন্দ স্বাস্থ্য লইয়া তিনি প্রায় চৌদ্দ বৎসর প্রধানতঃ মাদ্রাজে এবং সাধারণতঃ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁহার প্রাণপাতী প্রচেষ্টা ও আদর্শ জীবন যাপনের অমৃতময় ফল। আধুনিক কোন কোন ধর্মান্দোলনে যে রহস্য-বিদ্যার প্রভাব দেখা যায় তাহা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ধর্মব্যাখ্যানে বা বক্তৃতায় লক্ষিত হইত না। উক্তভাব মানব মনকে নিম্নগামী, সঙ্কীর্ণ ও দুর্বল করে বলিয়া তিনি ধর্ম ও সত্যের এইরূপ রুগ্নভাবপ্রদ ব্যাখ্যা পছন্দ করিতেন না। অভয়লোকগত স্বামিজীর আশীর্বাদ আমরা সদাই ভিক্ষা করিতাম। জীবিতাবস্থায় আমরা তাঁহাকে অশেষ ভক্তি করিতাম। তাঁহার পুণ্য স্মৃতিও এখন আমরা গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিব।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃতে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাংলায় প্রায় বারখানি পুস্তক তৎপ্রণীত। তাঁহার 'রামানুজ-চরিত' নামক সুন্দর বাংলা গ্রন্থখানি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আচার্য্য রামানুজ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এমন সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থ আর নাই। ইহা বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার সংস্কৃত রচনাগুলিও অতি সুন্দর ও ভাবোদ্দীপক। রামকৃষ্ণ সংঘের প্রসারণে ও পুষ্টিসাধনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অবদান অতুলনীয়। শ্রীগুরুর নামাঙ্কিত বিশাল সংঘের তিনি অন্যতম আচার্য্য ও স্রষ্টা। তিনি যে কেবল দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু এক অর্থে সমগ্র সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। কারণ, তিনি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় শিশু সংঘকে প্রায় এক দশকাধিক কাল লালনপালন করেন। সংঘে রামকৃষ্ণ-পূজার তিনিই প্রথম প্রবর্তক। যতদিন রামকৃষ্ণ সংঘ থাকিবে ততদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নাম কীর্তিত হইবে।

তের

স্বামী আত্মানন্দ

ত্যাগী তপস্বী আত্মানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একটী প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বশিষ্য স্বামী করুণানন্দকে* পুরীধামে বলিয়াছিলেন, 'আত্মানন্দের মত মহাপুরুষের সেবা ও সঙ্গলাভ করা মহাসৌভাগ্য।' স্বামী আত্মানন্দের নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ জীবন, ঐকান্তিক ধ্যাননিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় ও ইষ্টনিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়। তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল ছিল না, কিন্তু বিবেকবৈরাগ্য ও ত্যাগতপস্থার আলোকে উহা সদা সমুজ্জল থাকিত। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তাঁহার মন ধ্যাননিষ্ঠ ও অন্তর্মুখী। ধর্মজীবন যতই গভীর হয় ততই উহার বহিঃপ্রকাশ কমিয়া যায়।

পূর্বাশ্রমে স্বামী আত্মানন্দের নাম ছিল গোবিন্দচন্দ্র শুকুল। মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বংশে সম্ভবতঃ ১৯২৮ খ্রীঃ তাঁহার জন্ম হয়। বিহারে বা যুক্তপ্রদেশে তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল। তিনি বা তাঁহার পিতা বাংলায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা রিপণ কলেজে তিনি বি. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে খগেন মহারাজের (স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিমলানন্দের) সহিত তিনি পরিচিত হন। উভয়ে একই কলেজে পড়িতেন এবং বোধ হয় সহপাঠী ছিলেন। খগেনের দ্বারাই রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। কলিকাতায় প্রথমে তিনি অন্য কাহারো বাড়ীতে থকিতেন, পরে খগেনের বাড়ীতেই অবস্থান করেন। এই সময় স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ মিত্রতা হয়।

বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দ শান্তস্বভাব ছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দ, শুদ্ধানন্দ,

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধে উল্লিখিত।

বিমলানন্দ ও আত্মানন্দ যৌবনে পরস্পর পরিচিত ছিলেন এবং কলিকাতার একই পল্লীতে থাকিতেন। রবিবার চারি বন্ধুতে মিলিয়া আলমবাজার বা বরাহনগর মঠে যাইতেন। মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া তাঁহারা ধর্মপ্রসঙ্গ ও দার্শনিক বিচারাদি করিতেন। কিন্তু স্বামী আত্মানন্দ ঐ সকল যুক্তিতর্কে বিশেষ যোগ দিতেন না, তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস আজন্ম সুদৃঢ় ছিল। তখন সন্ন্যাসীর জীবন যাপনের জন্য তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ লক্ষিত হইত। পাশ্চাত্য হইতে কলিকাতায় স্বামিজীর প্রত্যাগমনের কিছু পূর্বে ১৮৯৬ খ্রীঃ গোবিন্দচন্দ্র সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।

তৎকালীন বাল্যবিবাহপ্রথা অনুসারে অল্পবয়সে গোবিন্দচন্দ্র বিবাহিত হন। পতির সন্ন্যাসগ্রহণের পর পত্নী বহু বৎসর জীবিতা ছিলেন। গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীপ্রসাদ শুকুল দীর্ঘজীবী ছিলেন। গোবিন্দ সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে পার্শ্ববর্তী চাঁচল গ্রামের কোন জমিদারের উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। পত্নী সংসারত্যাগী পতিকে দর্শনমানসে উক্ত জমিদারকে মিনতি জানান। জমিদার তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি তাঁকে চিঠি লিখে আনবার চেষ্টা করছি।' জমিদার এই মর্মে গোবিন্দকে রামকৃষ্ণ মঠের ঠিকানায় পত্র দিলেন, কোন জরুরী বিষয়কর্মে আপনার পরামর্শ আবশ্যক। আপনি অনুগ্রহপূর্বক একবার শীঘ্র আসবেন।' পত্র পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র অবিলম্বে জমিদারের বাড়ী গেলেন। কিন্তু জমিদার আর বিষয়-সম্পর্কিত ব্যাপারের কথাই উল্লেখ করিলেন না। তিনি যে ঘরে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন সেই ঘরে ব্রাহ্মণী আসিয়া পতিকে দর্শন ও প্রণাম করিবামাত্র ঊর্দ্ধ শ্বাসে সাধু দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন, আর জমিদারবাড়ী ফিরিলেন না। সাধুর নিকট পত্নী ও সংসার অন্ধকার অতল কূপতুল্য বোধ হইল।

ধ্যানাভ্যাসে গোবিন্দ পরমানন্দ পাইতেন। গীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের তত্ত্বপূর্ণ শাঙ্কর ভাষ্য পাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীগণকে তিনি ঐসকল বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করিতেন। তিনি বেলুড় মঠে

স্বামিজীর নিকট ১৮৯৮।৯৯ খ্রীঃ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক 'আত্মানন্দ' নামে অভিহিত হন। প্রথমে তাঁহাকে মঠে 'শুকুল মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করা হইত। তৎপরে 'শুকুল মহারাজ' নামেই তিনি পরিচিত হন। তাঁহার গুরুভক্তি এত গভীর ছিল যে, তিনি গুরুর আদেশে জন্মগত অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই নিরামিষাশী ছিলেন। একদিন গুরু শিষ্যের নিরামিষ আহারে দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পাতে একটু মাছের তরকারী তুলিয়া দেন। গুরুভক্তির প্রগাঢ়তা হেতু শিষ্য গুরুদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় গুরু তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। স্বামী আত্মানন্দ নিপুণ তবলাবাদক ছিলেন। শ্রীগুরুর নিকট তিনি উক্ত বাদ্য শিক্ষার প্রেরণা লাভ করেন। একদিন স্বামীজী মঠে গান করিতে করিতে শিষ্যকে বলিলেন, 'শুকুল তবলা বাজাও ত!' শিষ্য বলিলেন, 'জানি না।' গুরু শিষ্যকে ধমক দিয়া বলিলেন, 'জানিস্ না কি? শিখে নে।' তখন হইতে স্বামী আত্মানন্দের তবলা শিক্ষার আগ্রহ হইল এবং তিনি অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত বাদ্য আয়ত্ত করেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার তবলাবাদ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া ভাল তবলা উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। রামকৃষ্ণ মিশন শহরের আক্রান্ত পল্লীসমূহে সেবাকার্য আরম্ভ করেন। স্বামিজীর শিষ্য সদানন্দজীর উপর এই কার্যের গুরুভার অর্পিত হয়। স্বামী আত্মানন্দ উক্ত সেবাকার্যের অন্যতম প্রধান সেবক ও কর্মী ছিলেন। তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান থাকায় স্বামীজি তাঁহার দ্বারা বেলুড় মঠে শাস্ত্র-ক্লাশ করাইতেন। এই ক্লাসে আত্মানন্দজীর গুরুভ্রাতাগণও উপস্থিত থাকিতেন।

আত্মানন্দজী কিছুকাল 'উদ্বোধন' পত্রিকা পরিচালনে স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহকারী ছিলেন। শ্রীগুরুর মহাসমাধির পর সংঘের আর এক সন্ন্যাসীর সহিত তিনি গায়ে ছাই মাখিয়া দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় ধ্যানজপে ও শাস্ত্রপাঠে কাটাইতেন। বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ মন্দির যে স্থানে অবস্থিত, উহার অদূরে একটী পর্ণকুটীর বাঁধিয়া তথায় উভয়ে থাকিতেন। তিনি তথায় রাত্রিবাসও

করিতেন এবং মধ্যাহ্নভোজনের জন্য মঠে আসিতেন। রাত্রিতে তাঁহার জন্য কয়েকখানি চাপাটী উক্ত কুটীরে প্রেরিত হইত। স্বামী সারদানন্দ তখন বেলুড় মঠে বেদান্তগ্রন্থ অধ্যাপনা করিতেন। স্বামী আত্মানন্দ নিয়মিত ভাবে উক্ত ক্লাসে যোগ দিতেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী আত্মানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আহ্বানে মাদ্রাজ মঠে গমন করেন। তথায় কিছুকাল কার্য্য করিবার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে বাঙ্গালোরে নবপ্রতিষ্ঠিত মঠের কার্যভার অর্পণ করেন। বাঙ্গালোর শহরের চামরাজপেট পল্লীতে একটী ভাড়াটে বাড়ীতে তখন আশ্রম অবস্থিত ছিল। তিনি তথায় ভক্তদের লইয়া শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন এবং ধ্যান-ধারণা শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রায় ছয় বৎসর বাঙ্গালোর মঠে থাকিয়া ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব প্রচার করেন এবং নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আশ্রমটিকে স্থায়ী করেন। আশ্রমের বর্তমান নিজস্ব জমি ও বাড়ী তাঁহারই সময়ে পাওয়া যায়। আশ্রমগৃহ নির্মাণের জন্য তাঁহাকে অর্থসংগ্রহও করিতে হইয়াছিল। তথায় গুরুভ্রাতাদ্বয় স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ কিছুকাল তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। বক্তৃতাদি বেশী দিতেন না। কিন্তু একনিষ্ঠ ধর্মজীবন যাপনের দ্বারা তিনি ভক্তমণ্ডলীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেন। তাঁহার কয়েকটি ইংরাজী বক্তৃতা 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার শিশুসুলভ সারল্য, আন্তরিক সহানুভূতি, কঠোর বৈরাগ্য এবং ধনী-নির্ধনের প্রতি সমান প্রীতির জন্য তাঁহাকে এখনও তথাকার অনেকে স্মরণ করেন। তিনি যখন বাঙ্গালোরে ছিলেন তখন সংঘের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের তার পাইলেন, আমেরিকায় প্রচারার্থ যাইবার জন্য। তিনি সংঘনায়কের আদেশ পাইয়া বেলুড় মঠে আসিলেন, কিন্তু আমেরিকা যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, যদিও উক্ত কার্য্যের যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁহার ছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে বাঙ্গালোর ত্যাগ করিতে হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী আত্মানন্দ শ্রীসারদা দেবীর সহিত রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। তীর্থ দর্শনান্তে শ্রীমার সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি বায়ু পরিবর্তনার্থ সম্বলপুরে যান। তথায় কোন বন্ধুর কাছে প্রায় আড়াই বৎসর থাকিয়া নষ্ট

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা শিক্ষার বিষয়। ঠাকুরের শিষ্যগণের কথা তিনি বেদবাক্যতুল্য অভ্রান্ত জ্ঞান করিতেন। কোন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের রচনার সমালোচনা করিলে তিনি কটূক্তি দ্বারা তাঁহার মুখ বন্ধ করেন। যে ব্রহ্মচারী বা সাধু মঠে ঠাকুরের পূজার কাজ করিতেন তাঁহাকে তিনি তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, 'তোমরা কত সৌভাগ্যবান্ যে, ঠাকুরসেবার পুণ্য অধিকার পেয়েছ। যে হাতে তোমরা ঠাকুরের সেবা করিতেছ সে হাত কি আমাদের পায়ে লাগাতে আছে ? ইহা কখন হইতে পারে না।'

একবার ভুবনেশ্বরে তিনি চাতুর্মাস্য করিয়া ছিলেন। স্বামী করুণানন্দ তখন তাঁহার সেবক। তখনও সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভক্ত প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে বাহিরের একটী ঘরে শাস্ত্রপাঠাদিতে তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তখন তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ কাল গভীর ধ্যানে নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করিতেন। ধ্যানকালে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইত। একদিন তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। এমন সময় একটী বৃহদাকার সর্প গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্বামী করুণানন্দের দৃষ্টি সর্পের উপর পড়িল। তিনি অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, সাপ এসেছে! এই বাক্যে ধ্যানীর মন বাহ্য জগতে ফিরিল না। পুনরায় সতর্ক বাণী উচ্চারিত হইলে তিনি মাত্র নেত্রোন্মীলন করিলেন, কিন্তু গাত্রোত্থান করিলেন না। সাপটী এদিক ওদিক ঘুরিয়া জানালার মধ্য দিয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। যোগীর ধ্যানপ্রভাবে ঘরের মধ্যে নির্বৈর ভাব এমন জমাট বাঁধিয়াছিল যে, হিংস্র জন্তুটীর স্বাভাবিক হিংসা কার্য্যে আর প্রবৃত্তি হইল না। মহাযোগী আবার ধ্যানস্থ হইলেন। ঐ সময় তাঁহার মনে অহর্নিশি ধ্যান-প্রবাহ চলিত এবং তিনি এমন একটী আনন্দরাজ্যে সদা বিচরণ করিতেন যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি সর্বপ্রকার এষণা-বর্জিত হইয়া পরমানন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার চোখে, মুখে ও কথায় ব্রহ্মানন্দের বিকাশ হইত। মহাষ্টমীর রাত্রিতে

শ্রীশ্রীমাকে পায়েস নিবেদন করিতে যাইয়া বালকের ন্যায় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, 'মা করেছ সন্ন্যাসী। আর কি দিয়ে তোমার পূজা করিব?' কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং প্রত্যহ একটু জ্বর হইতে লাগিল। এইজন্য তাঁহাকে ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইল।

স্বামী আত্মানন্দ নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র', বিল্বমঙ্গল', 'কালা-পাহাড়', 'নসীরাম', 'রূপসনাতন', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'পাণ্ডব গৌরব', 'শঙ্করাচার্য্য', 'চৈতন্যলীলা' প্রভৃতি নাটকসমূহ অন্যকে পড়িতে বলিতেন এবং নিজেও পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার মতে ধর্মজীবনের এরূপ উচ্চ আদর্শ খুব কম পুস্তকেই পাওয়া যায়। মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের লইয়া তিনি ঐ সকল নাটকের ক্লাশ করিতেন। শেষ বয়সে কাশীধামে অবস্থান কালে দুই একটী যুবক তাঁহাকে ঐ সকল নাটক পড়িয়া শুনাইতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিতেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের নিম্নোক্ত গানটী তিনি নিভৃতে বিভোর হইয়া গাহিতেন।—

জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা, জয় গোবর্ধন চেতনশীলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ॥
চেতন যমুনা চেতন রেণু, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ॥
খেলা খেলা খেলা মেলা, নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ॥

স্বামী আত্মানন্দ গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে পূর্বদৃষ্ট এই স্বপ্নটী বলিয়াছিলেন।—সারদা দেবীর ক্রোড়ে বসিয়া তিনি অতল অপার সাগরে ভাসিতেছেন। শেষে তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন, যেন আনন্দের উৎস সর্বত্র উন্মুক্ত ও প্রবহমান। তিনি বাহ্য সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে হারাইলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন, তখন মহানন্দে মাতৃক্রোড়ে নৃত্যরত শিশু! তিনি বলিতেন, 'সমাধি যদি ঐরূপ আনন্দের অবস্থা হয় তবে স্বপ্নে মাত্র ইহা অনুভব করেছি, জাগ্রতে কখনো করি নাই।' উক্ত স্বপ্ন

দর্শনের পর তিনি বহু বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি নিশ্চয়ই সমাধিবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইত।*

স্বামী আত্মানন্দ ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন ১৯২০ হইতে ১৯২৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিন বৎসর। তিনি ঢাকা মঠের কাজকর্ম বিশেষ কিছু করিতেন না, ধ্যানভজন ও শাস্ত্রাধ্যাপনা লইয়া থাকিতেন। ঢাকা মঠ হইতে বেলুড় মঠে এক সাধু আসিলে তাঁহাকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, শুকুল কেমন আছে ও কি করে?' সাধুটী উত্তর দিলেন, 'তিনি ভাল আছেন, তবে কিছু করেন না।' তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, 'ও বসে থাক্‌লেই কাজ হবে।' উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, সাধু কোন সেবাদি কর্ম না করিলেও তিনি যে ভাগবত জীবন যাপন করেন তাহাতেই আশ্রমের ও সমাজের পরম কল্যাণ সাধিত হয়। সাধুর জামা কাপড় ও জিনিষপত্র বেশী থাকা অনুচিত। এই বিষয়ে স্বামী আত্মানন্দ আদর্শস্থল ছিলেন। তিনি স্বীয় বিছানাদি বাঁধিয়া লাঠিতে ঝুলাইয়া কখনো কখনো দেখিতেন, আবশ্যক হইলে একা তাহা বহন করিতে পারেন কিনা। তিনি যখন যে আশ্রমে থাকিতেন তথায় খুব অনাসক্ত রহিতেন এবং সংঘাধ্যক্ষের আদেশমত চলিয়া যাইবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিতেন। সংঘাধ্যক্ষের আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেন। তিনি যখন রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন তখন মঠস্থ প্রায় সকল সাধুই তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সকলের আদেশ পালন করিতেন। এমন বিশেষ কেহ কনিষ্ঠ ছিল না যাহাকে তিনি কোন কার্য্যের জন্য আদেশ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তিনি নিজে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিলেন, নিজের সব কাজ নিজেই করিতেন। সমগ্র জীবনে, এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও, স্বাবলম্বন তাঁহার স্বভাবগত ছিল। কোন যুবক সাধু জড়সড় হইয়া বসিলে বা অলস ভাবে চলিলে তিনি বিরক্তির সুরে

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৩ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ঘটনাটী উল্লিখিত।

বলিতেন, 'এ কি রে? সৈনিকের মত চলবি ও কাজ করবি। রজোগুণের আশ্রয় না করিলে তমোগুণে ডুবে যাবি।'

ঢাকা মঠে স্বামী আত্মানন্দ স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ দ্বারা সমগ্র গীতা মুখস্থ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার শাস্ত্রাদির পাঠ লইতেন। তিনি ব্রহ্মেশ্বরানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, 'আমি অন্যত্র চলে গেলে তুমি যথাসময়ে এসে ঠাকুরের সম্মুখে পড়া দিয়ে যাবে। তা হলেই হবে।' তাঁহার মতে গীতাদি শাস্ত্র সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্থ করা উচিত। স্বামী আত্মানন্দ স্বামীজির গ্রন্থাবলী চব্বিশ বার আদ্যোপান্ত পাঠ করেছিলেন। শুধু পাঠমাত্র নহে, স্বামীজীর সারগর্ভ বাক্যগুলির উপর তিনি ধ্যান করিতেন। মঠের নবীন সন্ন্যাসীদের তিনি বলিতেন, "পূর্বের জীবন ভুলে যাও। মনে কর, নতুন জন্ম হয়েছে। সন্ন্যাসের মন্ত্রগুলি বারে বারে পড়বে এবং মন্ত্রার্থ মনে জাগিয়ে রাখবে। সন্ন্যাসী দেশে যাবে কেন? বার বৎসর পরে দেশে একবার যাওয়ার প্রথা থাকিলেও ইহা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। সংযত সাধুর শরীর ভাংগে, কিন্তু মন ভাঙে না। হরি মহারাজকে দেখ। সংযমের অভাব হলে চোখ বসে যায়, মুখ ভেঙ্গে যায়!" স্বামীজী আত্মানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যদের একদিন বলেছিলেন, "ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীভক্তের হাতের রান্না খেও না। এইরূপ করলে শরীর নষ্ট ও মন নিম্নমুখী হয়।" আমি খেলেও তাই হবে। তবে আমার মনের কিছু করতে পারবে না। কারণ আমার মন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত। কিন্তু শরীরে ব্যাধি আসবে।" একবার স্বামীজী কোন গৃহী গুরুভ্রাতাদ্বয়ের বাড়ীতে আহারের আমন্ত্রণ পান। কার্য্যব্যপদেশে তাঁহার যাইতে একটু বিলম্ব হয়। তিনি যাইয়া দেখেন বয়স্থ গুরুভ্রাতাদ্বয় ইতঃপূর্বেই আহার শেষ করেছেন। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে আহার সমাপনান্তে মঠে ফিরিয়া আত্মানন্দপ্রমুখ শিষ্যদের এই শ্লোকটী বলিলেন—

সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ মেরুসর্ষপয়োরিব।
সূর্য্যখদ্যোতয়োর্যদ্বৎ তথাভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

অনুবাদ—সাগর ও নদী, মেরু ও সরিষা, সূর্য্য ও জোনাকীর মধ্যে যে বিশাল

পার্থক্য, সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য বিদ্যমান। স্বামী আত্মানন্দ সংঘের সাধুগণের ত্যাগভাবে উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেন, 'বাড়ীতে চিঠি লিখবে না। বাড়ীর চিঠি এলে না পড়ে ছিড়ে ফেলবে। তবে যদি মা থাকেন তাঁকে চিঠি লিখবে এবং তাঁর চিঠির জবাব দিবে।'

একবার ঢাকা মঠে স্থানীয় ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ শিক্ষয়িত্রীগণ সহ বেড়াইতে আসে। স্বামী আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, 'এদের প্রসাদ দাও।' এত ছাত্রীকে প্রসাদ বিতরণ করিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় তিনি অতিশয় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি ব্রহ্মচারীদের বলিলেন, 'অনূঢ়া মেয়েদের হাওয়ায় বেশীক্ষণ থাক্‌বে না।' সাধুদিগকে সাবধান করিবার জন্য তিনি বলিতেন, "সন্ধ্যার পর সহরে থেকো না। রাত্রিকালে সহরের মনোহর চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য দেখলে সংসারে মন আট্‌কে থাক্‌বে. সন্ধ্যার পূর্বেই কাজকর্ম সেরে নিয়ে আশ্রমে ফিরবে। আসন সাধুকে বাঁচায়। রাস্তায় চলবার সময় ডাঁয়ে বাঁয়ে তাকাবে না। তাকালে সুদৃশ্য কুদৃশ্য উভয়ই চোখে পড়তে পারে। হয়ত পশুমৈথুন দেখতে হলো। এই কুদৃশ্য দেখা সাধুর পক্ষে মহাপাপ। সামনে দৃষ্টি রেখে চলবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্যত্র যেতে ready (প্রস্তুত) হতে পার? যমের ডাক এলেও যেন তৎক্ষণাৎ যেতে পার। সাধু সর্বদা এইরূপে প্রস্তুত থাক্‌বে। বীরের মত চলাফেরা করবে। সাহেবদের দেখ না? মনে বীরভাব জাগ্রত থাকলে অসৎভাব আসতে পারে না। কীর্তনে কাঁদা ও ভূত দেখা প্রভৃতি মেয়েলী ভাবের লক্ষণ।....অবতার, অবতার করিস্! অবতার কি জানিস্? যাঁর ইঙ্গিতে সৌর জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হচ্ছে তিনি এই সাড়ে তিন হাত রক্তমাংসের শরীর ধরে এসেছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশ ঘোষের সম্বন্ধে স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "অত বড় আচার্য্য, অত বড় কবি আর আসেন নি। গিরিশ বাবুর অধিকাংশ নাটক 'ভাবমুখে' লেখা। ভাবের তোড় এলে তিনি বলে যেতেন, আর দুই তিনটী লেখক তা লিখতেন। তিনি নিজে লিখতে পারতেন না। সেক্ষপিয়রের

'ম্যাকবেথ' নাটকে একটু দার্শনিক ভাব দেখা যায়, আর গিরিশ বাবুর নাটকের ছত্রে ছত্রে গভীর দার্শনিক ভাব।' 'সংঘের সাধুদের জীবনে অন্ততঃ কি কি গ্রন্থ পড়া উচিত' এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী আত্মানন্দ বলেছিলেন, 'খুব কমপক্ষে মঠের নিয়মাবলী, আরাত্রিক স্তোত্রদ্বয়, স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং গীতা।' স্বামী আত্মানন্দের নিকট অনেকে শুনিয়াছেন, শ্রীশ্রীমার প্রিয় সেবক হইলেও স্বামী যোগানন্দ শ্রীমার পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতেন না, দূর হইতে প্রণাম করতেন। জগদম্বাকে স্পর্শকালে পাছে মনে কোন কুভাব আসে এই ভয়ে স্বামী যোগানন্দ রামকৃষ্ণার্চিত চরণযুগল স্পর্শ করিতেন না! কি সুগভীর মাতৃভক্তি!

স্বামী আত্মানন্দের বিছানা সামান্য হইলেও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তিনি সব সময় বিছানাটী পাতিয়া রাখিতেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেছিলেন, "বেলুড় মঠে স্বামিজী মাঝে মাঝে এসে আমার বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন। তাঁহার দেহান্তে একরাত্রে স্বপ্ন দেখি যে, তিনি আমার বিছানায় শুয়েছেন আমার বুকে মাথা রেখে এবং তাঁর মুখটী আমার বগলে লেগেছে। আমি বললাম, আমার বগলে গন্ধ আছে। তিনি উত্তর দিলেন. তোর বগলে গন্ধ নেই, অমুকের (অন্য এক শিষ্যের) বগলে আছে।" গুরু-বেদান্তবাক্যে স্বামী আত্মানন্দের অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, 'গুরুবাক্যে ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস সাধুজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। এই উভয়ের মধ্যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস অধিক চাই।' স্বামিজী একবার তাঁর তরুণ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, 'ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও যোগের কোনটায় কে অনার্স নেবে?' কেহ বল্লেন ভক্তিতে, কেহ বল্লেন ভক্তি ও জ্ঞানে ডাবল অনার্স, কেহ বল্লেন, ভক্তি জ্ঞান ও কর্মে ত্রিপল অনার্স নেবো। শুকুল মহারাজ চিরকালই গম্ভীর ও অল্পভাষী ছিলেন। তিনি নীরব রহিলেন। অন্য এক গুরুভ্রাতা বল্লেন, শুকুল মহারাজ কিসে অনার্স নেবে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বল্লেন, ও সবটাতেই আছে। স্বামীজী সত্যই বলেছিলেন; কারণ স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী, কর্মী ও যোগী, শ্রীগুরুর সুন্দর প্রতিবিম্ব। *

* এই প্রবন্ধোক্ত অনেক কথা বেলুড় মঠের স্বামী যোগীশ্বরানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ কথিত।

স্বামী আত্মানন্দ একটী পয়সাও সম্বল রাখিতেন না। এমন নিঃসম্বল সাধু বিরল দেখা যায়। একটী জামা, তুখানি কাপড়, একটী গেঞ্জি ব্যতীত অধিক পরিধেয় বস্ত্র রাখিতেন না। তাঁহার মতে সাধুর আসবাবপত্র যত কম হয়, ততই ভাল। একবার ঢাকা থেকে কাশী যাবার সময় সামান্য চেষ্টায় তাঁহার পাথেয় সংগৃহীত হয়। তুর্গম বদ্রীনারায়ণ স্বীর্থযাত্রাও তিনি অল্প সম্বলে সারিয়া আসেন। তিনি বলিতেন, ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাস থাকলে সাধুর অর্থাভাবাদি অনায়াসে বিদূরিত হয়। একবার একটী হিন্দুস্থানী ঢাকা মঠে তাঁহার পায়ের কাছে একটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল। শুকুল মহারাজ জনৈক সাধুকে বলিলেন, টাকাটা ঠাকুরঘরে দাও। উক্ত সাধু তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ, টাকাটি ত আপনাকেই দিয়াছে, ঠাকুরকে নয়। এটি আপনি রাখুন। কাজে লাগবে।' স্বামী আত্মানন্দ টাকাটি কোথায় রাখিবেন এবং কিভাবে খরচ করিবেন এই ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শাঙ্কর ভাষ্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বলিতেন, অধিকাংশ সাধু শাস্ত্রজ্ঞানে 'অলক টপ্পা' অর্থাৎ পল্লবগ্রাহী। তিনি এক সাধুর কথা বলিতেন, যিনি ত্রিশ বৎসর শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন। ভিক্ষাটন ও নিদ্রাদিতে যে সময় ব্যয়িত হইত তদ্ব্যতিরিক্ত সব সময় উক্ত সাধু শাস্ত্রপাঠে কাটাইতেন।

সাধুজীবনের প্রথম ভাগে স্বামী আত্মানন্দ যখন বেলুড় মঠে ছিলেন তখন তাঁহাকে মঠের নানাকাজ করিতে হইত—কখনো শাস্ত্রাধ্যাপনা, কখনো ঠাকুর পূজা, কখনো বা অন্যান্য শ্রমসাধ্য কর্ম। রাত্রে তিনি কয়েক সের আটা মাখিতেন ও ডলিতেন এবং রুটী বেলিতেন। আটার মাত্রা অধিক হওয়াতে ভৃত্য নিযুক্ত হয়। স্নানান্তে রোজ এক অধ্যায় চণ্ডী তিনি পাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'শুদ্ধাচারে পৃথকাসনে একান্ত মনে শাস্ত্রপাঠ করলে মনে অধিক ছাপ পড়ে। স্নান না করে, মলমূত্র ত্যাগান্তে কাপড় না ছেড়ে বা বিছানায় বসে অশুদ্ধভাবে শাস্ত্র পড়লে পূর্ণ ফল হয় না।' তিনি নিজেই স্বীয় ব্যবহৃত বস্ত্রাদির গেরুয়া রঙটী নিজেই করিতেন। ভক্তদের সহিত অবাধ মেলামেশা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, 'ওতে সাধুভাব কমে যায়। ভক্তরাই

সাধুদের দফা রফা করে দেয়।' ঢাকায় ঝুলনের সময় স্থানীয় ব্যবসায়িগণ মেয়ে ঢপালী কলিকাতা থেকে বায়না করে নিয়ে যেতেন এবং নিজ নিজ বাড়ীতে গান করাতেন। ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। সুতরাং ঢপালীদের কৃষ্ণকীর্তন শুনিতে ভালবাসে। ঢাকা মঠের কোন কোন সাধু মঠে ভক্তদের জন্য মেয়ে ঢপালীদের গান করাতে চাইলেন। কিন্তু স্বামী আত্মানন্দ মঠে তাহা হইতে দিলেন না।

স্বামী প্রেমানন্দ কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাওয়ায় বেলুড় মঠের ভার কিছুদিন শুকুল মহারাজের উপর পড়ে। একবার কোন সাধু মঠের একটী ঘরে (যেখানে সাধুরা থাকেন) স্ত্রীভক্তদের লইয়া বসান ও আলাপ করেন। শুকুল মহারাজ তাহাতে অত্যন্ত চটিয়া যান এবং সাধুটিকে বলেন, 'তুমি আজ একটি গর্হিত কাজ করলে, মঠের একটী নিয়ম ভাঙ্গলে।' গুরুভ্রাতাদের কোন অন্যায় দেখিলে তিনি সত্যের অনুরোধে বলিয়া ফেলিতেন। পরোপকার সম্পর্কে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, 'কারো ভাল করতে পার আর নাই পার, কারো মন্দ করো না। অপরের ভাল করবার শক্তি বা সুযোগ সকলের থাকে না কিন্তু অনিষ্ট করার শক্তি বা সুযোগ অনেকেই পায়।' তিনি সাধুদের মেয়েলীভাব আদৌ পছন্দ করিতেন না, manly (পুরুষ) ভাব খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন পুরুষভাবের, বীরভাবের ঘনীভূত মূর্তি। তিনি যখন স্বামীজীর ইংরাজি বক্তৃতাবলী পড়িতেন বা পড়াইতেন তাহা শ্রবণযোগ্য ছিল। তাঁহার ইংরাজি উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ছিল। তিনি মঠের কোন কোন সাধুকে স্বামীজীর ইংরাজি বইগুলি ভাল করিয়া পড়িতে শিখাইতেন। তিনি নানা পূজায় অভিজ্ঞ ছিলেন। মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসবে বা বিশেষ উপলক্ষে তিনি পূজক ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তন্ত্রধারক হইতেন। বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল তিনি ঠাকুরের নিত্য পূজা করেছিলেন। সম্ভবতঃ স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাই তিনি বলিতেন, 'আমি কি আর ঠাকুরের পূজা করতে পারি? ঠাকুরের এক পার্ষদ আমার হাত ধরে পূজায় বসিয়ে দেন তাই

কোন কথা বলা তিনি মহাপাপ জ্ঞান করিতেন। তিনি সংঘের সাধুদের বলিতেন, "ঠাকুরের পার্ষদদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কখনো কোন কুৎসা রটিও না। তাঁরা ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ, তাঁদের নিন্দা করলে ঠাকুরকেই নিন্দা করা হয়। তাঁদের চরিত্রে দোষারোপ করলে ঘটনাচক্রে সংঘবহির্ভূত হয়ে যাবে, ঠাকুরের সংঘে থাকতে পারবে না।"

স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, 'স্বামীজীর শিবাংশে, মহারাজের কৃষ্ণাংশে এবং নিরঞ্জন স্বামীর রামাংশে জন্ম। নিরঞ্জন স্বামীর পূর্ব স্মৃতি ছিল, তিনি শৈশবে তীরধনু লইয়া খেলা করিতেন।' ঠাকুর যখন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ তখন নিরঞ্জনানন্দজী গুরুর সেবা করিতেন এবং তাঁহার আরোগ্যের জন্য চিন্তিত হইতেন। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি সেরে গেলে তুই কি করবি নিরঞ্জন?' শিষ্য আনন্দে উত্তর দিলেন, 'বাগানে এই যে খেজুর গাছটা আছে সেটা উপ্‌ড়ে ফেলবো।' ঠাকুর বললেন, 'তা তুই পারবি।' স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, যাদের ভক্তিভাব বেশী তারা উপনিষদাদি বেদান্ত-গ্রন্থ পড়লে অনিষ্ট হয়, ভক্তিভাব কমে যায়। ঢাকা সহরের যে অংশে রামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত উহা শিক্ষিত ভদ্রপল্লী। সন্ধ্যাকালে বহু শিক্ষিত ভদ্রমহিলা মঠে বেড়াইতে আসিতেন। স্বামী আত্মানন্দ মহিলাদের সহিত কথা বলিতেন না। মঠের জনৈক সাধু তাঁহাকে এই প্রার্থনা জানাইলেন, 'যে সব মহিলারা আসেন তাঁদের অনেকেই মঠে অর্থ সাহায্য করেন। আপনি তাঁদের সঙ্গে অন্ততঃ দুই একটী কথা বলিবেন।' তৎপরে শুকুল মহারাজ কর্তব্যানুরোধে দুই একটি কথা বলিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসিত হইলে। যতিবিধি তিনি জীবনে কখনো লঙ্ঘন করেন নাই।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে স্বামী আত্মানন্দ ঢাকা মঠের অধ্যক্ষতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বেলুড় মঠে আসেন। তখন বেলুড় মঠে তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শেষ জীবন কাশীতে অতিবাহিত করিবার জন্য তিনি বেলুড় মঠ হইতে তত্রস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গমন করেন। শ্রাবণ মাসে স্বামী করুণানন্দকে তিনি বলেছিলেন, 'খেলাধূলা ঢের হলো; চল আবার একান্ত স্থানে গঙ্গাতীরে বসে যাই। গোলমাল লোকালয় ভাল লাগে না।' সেই সময়

তিনি স্বামীজীর 'দেববাণী' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীদের পড়াইতেন। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত হইতেন। ভাদ্রের শেষে স্বামী শুদ্ধানন্দ কাশীধামে যান। তখন স্বামী আত্মানন্দ বেশ সুস্থ ছিলেন। উভয় গুরুভ্রাতা একদিন পদব্রজে স্বামী অখণ্ডানন্দকে সহরের অপরাংশে দেখিয়া আসেন। স্বামী আত্মানন্দকে তখন অত্যন্ত নির্লিপ্ত ও নির্জনতাপ্রিয় দেখা যাইত। তিনি ইহধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট তিনি প্রায়ই বলিতেন, "মিশনের কর্মকেন্দ্রে থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এখানে মন চঞ্চল হয়, কেবল সংঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষজীর আদেশে আছি। যদি তিনি অনুমতি করেন তবে হরিদ্বার বা ঐরূপ কোন নিভৃত স্থানে গিয়া গঙ্গাতীরে পড়িয়া থাকি। তবে এখন একলা থাকিবার ক্ষমতা নাই। কেহ সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হয়। কারণ, জল তোলা প্রভৃতি কাজ এখন আমার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বসিয়া বসিয়া রান্নাবান্না একরূপ করিয়া লইতে পারি।"

স্বামী শুদ্ধানন্দ কাশীতে যাইবার পরই স্বামী আত্মানন্দ স্বীয় পুরাতন টাঙ্কটির চাবিসহ গুরুভ্রাতাকে দিয়া বলিলেন, 'এর ভিতর দুখানি গরম চাদর আছে। আমি ইহা আর রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি না। তুমি ইহা লইয়া মঠাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া দাও। তিনি এইগুলি যাহাকে ইচ্ছা হয় দিবেন। আমি একটা সস্তা বালাপোষ যোগাড় করিয়া আগামী শীতে ব্যবহার করিব। স্বামীজী কি এই নিয়ম করিয়া যান নাই যে, সংঘের প্রত্যেক সাধু অধ্যক্ষকে তাঁহার সর্বস্ব দিয়া যাইবেন?' ট্রাঙ্কটী খুলিয়া দেখা গেল, উহার মধ্যে দুখানি গরম কাপড় এবং একটী ফ্লানেলের জামা আছে। গরম কাপড় দুখানি শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি এই অতিরিক্ত কাপড় দুখানি সযত্নে রাখিয়াছিলেন। কাশীতে প্রথমে স্বামী আত্মানন্দের জ্বর হয় এবং জ্বর কয়েক দিন চলে। তখন তাঁহাকে ভবানী বাবু চিকিৎসা করেন। ক্রমে ১৫।২০ বার করিয়া দাস্ত হইতে থাকে। জ্বরের বিরাম একদম না হওয়ায় এবং জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাঃ অমর বাবুকে দেখান হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া রেমিটেণ্ট (পালা) জ্বর

বলেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা হইতে থাকে। রবিবার হইতে একটু নিউমোনিয়ার ভাব দেখা দেয়। অমর বাবুকে ডাকা হইল। ইনজেকসন দিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি রোগীকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বলেন, 'ইহা সামান্য ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, ঔষধেই সারিবে।' ব্যস্ততা সত্ত্বেও ডাক্তার বাবু নিয়মিত ভাবে আসিয়া সযত্নে চিকিৎসা করেন। ক্রমে স্বামী আত্মানন্দ কাণে কম শুনিতে থাকেন, অনেক চীৎকার করিয়া বলিয়া তাঁহাকে ঔষধপথ্যাদি খাওয়ান হইত। স্বামী অনন্তানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ সর্বদা কাছে থাকিয়া রাত্রি জাগিয়া প্রাণপণে রোগীর সেবা করিলেন। শেষে দাস্ত বন্ধ হয় এবং ছানার জল, বেদানার রস, হর্লিক দুধ প্রভৃতি পথ্য চলে। বৃহস্পতিবার হইতে অতিরিক্ত prostration (দুর্বলতা) হয়। শুক্রবার প্রাতে অমর বাবু দেখিয়া বলেন, অন্য সব লক্ষণ ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত prostration (দৌর্বল্য)। তিনি stimulant mixture (উত্তেজক ঔষধ) এর ব্যবস্থা দেন। উহা ২।৩ দাগ খাওয়ান হইয়াছিল। বেলা দুইটা আড়াইটা হইতে আত্মানন্দজীর বাক্য বন্ধ হয়। আন্দাজ চারিটা হইতে ঘাম হইতে থাকে। ডাঃ ভবানী বাবু ও ডাঃ চৌধুরী আসিয়া শেষাবস্থা বলিয়া গেলেন। অমর বাবু যখন আসিলেন তখন সকলে স্বামী অখণ্ডানন্দের আদেশে মুমূর্ষু রোগীকে উচ্চ স্বরে রামকৃষ্ণ নাম শুনাইতেছেন। ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার (১৯২৩ খ্রীঃ ১২ই অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটের সময় মাত্র দুই সপ্তাহ ভুগিয়া স্বামী আত্মানন্দ প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগপূর্বক সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। শনিবার প্রাতে তাঁহার দেহ পুষ্পমাল্যাদিতে বিভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে গঙ্গায় জলসমাধি দেওয়া হয়। পরবর্তী কোজাগরী পূর্ণিমার দিন কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে ভাণ্ডারা হয়। *

স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন কঠোর সন্ন্যাসী, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হাতে-গড়া সাধু। তাই তাঁহার জীবনে ত্যাগ তপস্যার হোমানল সদা প্রদীপ্ত ছিল। শশী মহারাজের সঙ্গে সর্বদা কত সতর্ক থাকিতে হইত সেই সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, :

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত।

'তোমরা যেরূপ কাপড় পর আলগা করে সেরূপ আমরা পরতুম না। সকাল থেকে বারটা পর্য্যন্ত মালকোচা মেরে থাকতে হতো। কখন কি আদেশ আসে? যখন যেটা বলতেন সেটা অবিলম্বে করতে হতো। একটু দেরী বা এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা ছিল না।' সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নিষিদ্ধ। শেষ অসুখের সময় দেখা গেল, আত্মানন্দজীর কাছে একটীও পয়সা নাই। একখানা অতিরিক্ত কাপড়ও তিনি রাখিতেন না। কিন্তু তিনি কঠোর হইলেও শুষ্ক ছিলেন না। বিশুদ্ধ রসিকতা তিনি ভালবাসিতেন। একবার তিনি বাংলা পদ্যে একটি লম্বা ছড়া রচনা করিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন। শেষ জীবনে শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস অতিশয় বাড়িয়াছিল। পূর্বোক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত হইতে উহা বোঝা যায়। তিনি ভাল পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন এবং ধ্রুপদ গানের সঙ্গে উহা বাজাইতেন। তিনি ধর্মসঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। শেষ অসুখের সময় তিনি সংঘের এক সন্ন্যাসীর গান মাঝে মাঝে শুনিতেন। তখন কাশীধামে সুগায়ক স্বামী অম্বিকানন্দের আগমনের সম্ভাবনা শুনিয়া তিনি উল্লসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকানন্দজীর গান শুনিবার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম নির্মম ভাবে পালন করিতেন। একবার কাশীধামস্থ অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী প্রশান্তানন্দ ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সাধুগণ এবং স্বামী আত্মানন্দ প্রমুখ নবীন সন্ন্যাসীগণ পুরুষ ভক্তগণ সহ ব্যাখ্যা শ্রবণে সমবেত। একটী বড় ফরাসের উপর সকলে উপবিষ্ট। এমন সময় হরিমতি নামক পরিচিতা একটী স্ত্রীভক্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ আসিয়া ফরাসের এক কোণে পশ্চাতে বসিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী আত্মানন্দ পাঠ শ্রবণ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, 'নারীর সহিত একাসনে সন্ন্যাসীর উপবেশন নিষিদ্ধ।' তখন স্বামী প্রেমানন্দ শিষ্যস্থানীয় স্বামী আত্মানন্দকে বলিলেন, 'তুমিত আমাদের চেয়েও বড় সাধু দেখছি!'

স্বামী আত্মানন্দের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে যাঁহারা মিশিতেন তাঁহারাই তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিকতার নীরব প্রভাব অনুভব করিতেন। গুরুস্থানীয় সন্ন্যাসীগণ

এবং গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। যোগীর ধ্যানপ্রিয়তা ও সাধুর কঠোরতায় তাঁহার জীবন অলঙ্কৃত ছিল। নির্লিপ্ত হইলেও তিনি নিষ্কাম কর্মী ছিলেন। প্রত্যেক কাজটী পূজার মত তিনি নিখুঁত ভাবে করিতেন সমগ্র মন দিয়া। স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন স্বামীজির সুযোগ্য শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ সংঘের উজ্জ্বল রত্ন। *

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৫৬ সালের ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত মল্লিখিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধে স্বামী আত্মানন্দ সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য প্রদত্ত।

চৌদ্দ

মনোমোহন মিত্র *

"মোহনিদ্রা গতা যস্য রামকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবয়া।
বন্দে মিত্রম্ অমিত্রাণাং মনোমোহন-সংজ্ঞকং॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যবর্গের মধ্যে মনোমোহন মিত্র এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের অন্যতম বিখ্যাত গৃহী ভক্ত। ইঁহার সহিত মনোমোহনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। রামচন্দ্র মনোমোহনের মাসতুতো ভাই ছিলেন। মনোমোহন গৃহী ও বিবাহিত হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবন-দেবতা ছিলেন। তৎকালে, অর্থাৎ গত শতাব্দীর নবম দশকে, যখন দক্ষিণেশ্বরের এই দেবমানবের জীবনী ও বাণী কেবল ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন রামচন্দ্রের মত তিনিও কলিকাতায় এবং অন্যত্র ঠাকুরের বাণী-প্রচারে প্রভূত আনন্দ পাইতেন। কলিকাতা উদ্বোধন অফিস হইতে প্রকাশিত 'ভক্ত মনোমোহন' নামক বাংলা পুস্তকের ভূমিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ যথার্থই লিখিয়াছেন, "মনোমোহনের যে বৈশিষ্ট্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহা ছিল তাঁহার সুগভীর তেজোদীপ্ত ভাবাবিষ্টতা। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি খুব মাতিয়া উঠিতেন। তখন তাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক আবেশের উন্মাদনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত, রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ঠাকুরের পাদস্পর্শে পূত রামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে প্রায়ই দেখিয়াছি, ঠাকুরের নাম সংকীর্তনের সময়েও তাঁহার প্রগাঢ় তন্ময়তা ও ভাবাবেশ ভক্তগণের মধ্যে এক নিবিড় উন্মাদনা সৃষ্টি করিত। তাঁহার মুখ চোখ দিয়া সেই সময়ে এক অপার্থিব জ্যোতিঃ বাহির হইত।"

---

* কলিকাতা উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ভক্ত মনোমোহন' শীর্ষক বিস্তৃত জীবনী অবলম্বনে রচিত এবং মৎপ্রণীত ইংরাজি পুস্তিকা হইতে অনূদিত।

কলিকাতার সন্নিকটে কোন্নগর গ্রামে ১৮৫১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে মনোমোহন মিত্র জন্মগ্রহণ এবং ১৯০৩ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন মিত্র চিকিৎসক ছিলেন ও পাঞ্জাব সরকারের অধীনে প্রায় দশ বৎসর স্পেশ্যাল ভ্যাক্সিনেশান অফিসারের পদে কাজ করিয়া ১৮৭২ খ্রীঃ 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। মনোমোহনের মাতা শ্যামাসুন্দরী অতীব ভক্তিমতী রমণী ছিলেন এবং প্রত্যহ গৃহদেবতার পূজায় ও ধ্যানে বহু সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন শ্যামাসুন্দরী যখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, তাঁহারই এক আত্মীয়া তখন ঠাট্টা করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে একটি বিষাক্ত কাঁকড়া বিছা ছুঁড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামাসুন্দরী তখন এত বাহ্যজ্ঞানশূন্যা ছিলেন যে, বিছার বিষয় আদৌ টের পান নাই। তখন তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় অতিশয় নিমগ্না ছিলেন। ইহাতে উক্ত আত্মীয়া অনুশোচনায় অস্থির হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। এই ভক্তিমতী রমণীর মৃত্যুঘটনাও বিস্ময়কর। একদিন রামচন্দ্রের গৃহে সংকীর্তন হইতেছিল। মনোমোহন সমভিব্যাহারে তিনি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কীর্তন শ্রবণ কালে অসুস্থ বোধ করিয়া, পুত্রকে পার্শ্বে ডাকিয়া তাঁহার কানে কানে বলিলেন, 'এই পুণ্য পবিত্র দিনে আমি দেহত্যাগ করিব। কিন্তু তুমি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া আনন্দোৎসবে বিঘ্ন সৃষ্টি করিও না।' তাঁহার কথা সত্য হইল। কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি ভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে সজ্ঞানে পরলোকে গমন করিলেন।

মনোমোহন পিতামাতার এক মাত্র পুত্র। তাঁহার চারিটি ভগিনী। কলিকাতার হিন্দু স্কুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং তৎকালে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসেন। তখন বাল্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকায় মনোমোহন ছাত্রাবস্থায় বিবাহিত হন। বাংলা সরকারের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বিভাগে তিনি প্রধান রেফারেন্স ক্লার্ক পদে বহু বৎসর কর্ম করেন।

চারিটি ভগিনী মনোমোহিনী, সিদ্ধেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী ও সুরেশ্বরী। সকলের সহিত মনোমোহন ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিতেন। মনোমোহিনী শ্রীরামকৃষ্ণের পূত

প্রভাবে পড়িয়া ছিলেন। তিনি একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে একখানি চাদর স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী ও তাঁহার পতি শশীভূষণ দে এবং সুরেশ্বরী ও তাঁহার পতি বলরাম সিংহ সকলেই ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, ঠাকুর সুরেশ্বরীকে তাঁহার ভাবী পতিকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকট মন্ত্র পাইয়া সুরেশ্বরী অতি ভক্তি সহকারে উহা জপ করিতেন। ১৯০২ খ্রীঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পর বলরাম সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী কাশিকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। মনোমোহনের তৃতীয় ভগ্নী বিশ্বেশ্বরীর বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। মনোমোহন আদর করিয়া তাঁহাকে 'বিশা' বা কেবল 'বি' বলিয়া ডাকিতেন। ছাত্রাবস্থায় রাখাল চন্দ্র ঘোষ বিশ্বেশ্বরীর সহিত বিবাহিত হন। পরবর্তী জীবনে রাখালচন্দ্র রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের তিনিই ছিলেন প্রথম অধ্যক্ষ। রাখালকে ঠাকুর তাঁহার মানস পুত্ররূপে দেখিতেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনগণ যখন শ্যামাসুন্দরীর নিকট অনুযোগ করিতেন, তাঁহার কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে এমন বরের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়েছে যে রাতদিন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে যায় ও বহুক্ষণ তথায় কাটায়, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আহা! আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে গো যে, আমার মেয়ে ও জামাই পরমহংসদেবের সেবায় প্রাণ দেবে!' রাখালের সহিত বিশ্বেশ্বরীর বিবাহের পর মনোমোহন নবদম্পতীকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া যান। ঠাকুর বিশ্বেশ্বরীর শারীরিক গঠন ও চিহ্নসকল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'রাখালের কোন ভয় নাই। তার স্ত্রী দেবীশক্তি। ধর্মজীবনে সে স্বামীর বাধা স্বরূপ হইবে না।' ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাকে সারদা দেবীর নিকট আশীর্বাদ লইতে পাঠাইলেন। বিশ্বেশ্বরীর সত্যানন্দ নামে একটী পুত্র হইয়াছিল। বালক মাত্র দশ বৎসর জীবিত থাকিয়া ১৮৯৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশ্বেশ্বরী ঠাকুরের কথা বলিতে বড় ভালবাসিতেন। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ঠাকুরের দেহাবসান ও স্বামীর গৃহত্যাগের পর মনোমোহনকে

দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। মনোমোহন তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বাল্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরার,' 'সুলভ সমাচার' এবং কলিকাতার অন্যান্য বাংলা ও ইংরাজী সংবাদ পত্রে তাঁহার বিষয়ে পড়েন। ৺কালীপূজার কয়েকদিন পর ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৩ই নভেম্বর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনে ঠাকুরকে তিনি পরিচিত পরমাত্মীয়রূপে গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের সরল জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি তাঁহার অন্তর দ্রবীভূত ও পরিবর্তিত করিল। প্রায় প্রত্যেক রবিবারে তিনি ঠাকুরের কাছে যাইতেন। ঠাকুরের সহিত পরিচয় যত নিবিড় হইল তিনি ততই আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধুগণকে তাঁহার নিকট আনিতে লাগিলেন। পরবর্তী জীবনে মনোমোহন প্রায়ই বলিতেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় আমার জীবনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহার পূত সঙ্গে আমি যে অপার শান্তি ও বিমল আনন্দ পাইতাম তাহা পূর্বে বা পরে আর কখনও পাই নাই। এত সরল, নিরভিমান ও বালকবৎ সরল মানুষের সংস্পর্শে আমি জীবনে আর কখনো আসি নাই। অন্যান্য ভক্তদের মত প্রথম সাক্ষাতে আমিও তাঁহার সহিত আত্মীয়তা বোধ করিতাম।'

মনোমোহন বড় অভিমানী ছিলেন। অপরের সামান্য সমালোচনায় তিনি মর্মাহত হইতেন। তাঁহার ও অন্যান্য ভক্তের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সুরেন্দ্রনাথের ভক্তির প্রশংসা করিলেন। মনোমোহন ইহাতে ব্যথিত হইলেন, এবং দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করিলেন। পরবর্তী রবিবারে তাঁহাকে না দেখিয়া সমবেত ভক্তগণকে ঠাকুর বলিলেন, 'মনোমোহনের কি হল? সে আসেনি কেন?' পরদিন তাঁহারই আদেশে রামচন্দ্র মনোমোহনের আফিসে যাইয়া তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মনোমোহন বলিলেন, 'ঠাকুর অন্য ভক্তদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। আমি তাঁর কেউ নই। আমার আগে ভক্তি হোক, পরে আমি তাঁর কাছে যাবো।' কয়েক সপ্তাহ মনোমোহন না আসায়, ঠাকুর মনোমোহনকে ডাকিয়া আনিবার জন্য রাখালকে বলিলেন। মনোমোহন এবারও নিজে আসিলেন না এবং রাখালের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়াও বন্ধ করিলেন।

ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেও তাঁহার মনে আদৌ শান্তি ছিল না। যতই তিনি ঠাকুরের চিন্তা ছাড়িতে চেষ্টা করেন ততই তাঁহার মানসিক অশান্তি বাড়িতে থাকে। গৃহের বা আফিসের কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যতই কাজে মন দিতে চান ততই মন দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যায়। হতাশ হইয়া তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনপ্রাণ অধিকার করিয়াছেন। যখন এইরূপ মানসিক অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন তখন একদিন গঙ্গাস্নান করিতে করিতে তিনি নৌকায় বলরাম বসুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনোমোহন বলিলেন, 'আজ আমার বড় পুণ্য দিন। আজ একজন মহাভক্তের দর্শন পেলাম।' বলরাম বসু উত্তর দিলেন, 'শুধু ভক্ত নয়, সাক্ষাৎ ঠাকুরও আসিয়াছেন!' কর্ণকুহরে এই কথা প্রবেশ করিবামাত্র মনোমোহন ভক্তিভরে টলিতে লাগিলেন। ভক্ত নিরঞ্জনও নৌকায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাও না কেন? ঠাকুর তোমার জন্য এত উদ্বিগ্ন যে, স্বয়ং তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।' তখন গ্রীষ্মকাল। নৌকায় ঠাকুর নিজেই নিজেকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। তিনি মনোমোহনের সমীপে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। মনোমোহন নির্বাক্ হইয়া এই দিব্য দৃশ্য দেখিলেন। ঠাকুরের চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। মনোমোহন ভাবিলেন, 'তিনি আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন! আমি কি অন্যায়ই না করেছি।' তিনি ভাবাবেশে পতনোন্মুখ হইলে নিরঞ্জন নৌকা হইতে লাফাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এতক্ষণে ঠাকুরের স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি মনোমোহনকে নৌকায় তুলিবার জন্য নিরঞ্জনকে আদেশ করিলেন। মনোমোহন নৌকায় উঠিলে ঠাকুর তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন, 'তোমার জন্য আমি চিন্তিত এবং তোমার জন্যই এসেছি।' মনোমোহন সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, "প্রভু! আমার অভিমানে আঘাত লাগাতেই এই সব হয়েছে।" তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। এই ভাবেই গুরুকৃপার পূত ধারায় মনোমোহনের অহংভাব বিধৌত হইল।

মাতার মৃত্যুর পর মনোমোহন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকগণ নির্ণয় করিলেন, রোগটি আমাশয়িক উদরাময়। নিয়মিত সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও রোগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। রামচন্দ্র ঠাকুরকে এই সংবাদ জানাইলেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর নীরব রহিলেন। বিদায় লইবার সময় রামচন্দ্রের মনে হইল, মনোমোহনের জন্য ঠাকুরের পবিত্র পদধূলি লইতে হইবে। সেইজন্য ঠাকুর যথায় বসিয়াছিলেন তথা হইতে তিনি কিঞ্চিৎ ধূলি লইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা লক্ষ্য করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামচন্দ্র মনোমোহনের জন্য পদধূলি লইতেছেন জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'রোগারোগ্যের উদ্দেশ্যে যখন ইহা লইতেছ তখন আমার অজ্ঞাতসারে লইলে কেন?' রামচন্দ্র এই ত্রুটীর জন্য ক্ষমা চাহিলেন ও পরে ঠাকুরের অনুমতিক্রমে উহা লইয়া গেলেন। ঠাকুরের পদধূলিস্পর্শে মনোমোহনের জীবন রক্ষা হইল। এই ঘটনায় মনোমোহনের স্ত্রীর ঠাকুরের উপর বিশ্বাস আসিল। পূর্বে তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল না।

আর একবার মনোমোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণিকপ্রভা অত্যন্ত পীড়িতা হইলেন। মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শ্যামাসুন্দরী মনোমোহনকে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে এই পীড়ার সংবাদ জানাইয়া তিনি যেস্থানে ধ্যান করেন তথা হইতে কিঞ্চিৎ ধূলি আনিতে বলিলেন। মাতার আদেশ অনুসারে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তিনি দেখিলেন, বহু ভক্ত সমক্ষে ঠাকুর বৈরাগ্যের চরম অবস্থার কথা আলোচনা করিতেছেন। ঠাকুর শৌচার্থে বাহিরে যাইবার কালে মনোমোহনকে তাঁহার পশ্চাতে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু একাকী হইয়াও শিষ্য তাঁহার মুমূর্ষু কন্যার কথা গুরুকে জানাইতে পারিলেন না। ঠাকুর মনোমোহনের অভিপ্রায় বুঝিয়া স্বীয় ধ্যানস্থানটী তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। মনোমোহন ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহার অহেতুকী করুণার কথা ভাবিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঠাকুর চলিয়া গেলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। তিনি হৃদয়কে সেই স্থান হইতে একটু ধূলি লইয়া ফুল সহ মনোমোহনকে দিতে বলিলেন। অনন্তর ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, 'যাও, ইহার একটু রোগিনীকে খাওয়াইয়া

দিও। তাহলে তোমার কন্যা সারিয়া যাইবে। মনোমোহন গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের পবিত্র পদরজঃ কন্যার মুখে দিবার অল্পকাল পরেই তাহার মৃত্যুলক্ষণ তিরোহিত হইল। যে চিকিৎসক রোগীর অবস্থা নৈরাশ্যজনক বলিয়াছিলেন তিনি হঠাৎ এই ভাল পরিবর্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই পরিবর্তন আশ্চর্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু তাহার দাঁড়াইবার বা চলিবার শক্তি হইতে আরো দুই মাস সময় লাগিল। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কথায় কথায় মনোমোহনকে বলিলেন, 'তোমার রুগ্না কন্যা এখন কেমন আছে?' মনোমোহন উত্তর দিলেন, 'বেঁচে আছে মাত্র! কিন্তু সে এত দুর্বল যে, বেড়ান ত দূরের কথা, এখন হাঁটতেও পারে না!' ইহা শুনিয়া ঠাকুর কিছুই বলিলেন না। গৃহে ফিরিয়া মনোমোহন সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার উত্থানশক্তিরহিতা কন্যা সেই দিনই দাঁড়াইতে পারিয়াছে!

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন রোগ-শয্যায় শায়িত, মনোমোহনের কোন্নগরস্থ বাটীতে তখন তাঁহার কন্যা মৃত্যুমুখে পতিতা। স্বীয় গৃহের দ্বিতলে রোগীর কক্ষে গভীর রাত্রে ভক্ত তখন দুঃখাকুল চিত্তে মনে প্রাণে গুরুর করুণা প্রার্থনা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর জীবন্ত মূর্তিতে ভক্তের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'আজ তোমার পরীক্ষার দিন।' সজল নয়নে শিষ্য বলিলেন, 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, প্রভু!' ঠাকুর অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় এই কথা সহাস্য বদনে বলিতে আসিলেন।—'ব্যষ্টিরূপে তুমি কিছু নও, কন্যা স্ত্রী বা অন্যান্য প্রিয়জন কেহই তোমার নয়। সবই তিনি, সবই তাঁহার।' কথা কয়টী মনোমোহনের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার সম্মুখ হইতে যেন একটী পর্দ্দা সরিয়া গেল। তখন তাঁহার চতুর্দিকে তিনি সবই চৈতন্যময় দেখিতে লাগিলেন, মুমূর্ষু কন্যার আরোগ্য-চিন্তা মন হইতে মুছিয়া গেল। ইতোমধ্যেই কন্যার মৃত্যু হইল। তিনি এই দুর্ঘটনার কথা জানিতে পারিলেন না। এই মাতোয়ারা ভাবে তিনি বহুক্ষণ আবিষ্ট রহিলেন। কন্যার মৃত্যু-শোক তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

মনোমোহন, রামচন্দ্র ও অন্যান্য গৃহী শিষ্যগণের প্রতি ঠাকুর কিরূপ করুণাবর্ষণ করিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। কোন্নগর হরিসভার বাৎসরিক উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর স্বয়ং না যাইয়া তাঁহার পরিবর্তে মনোমোহন ও রামচন্দ্রকে পাঠাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা দুজনে যাইলেই আমার যাওয়া হইল। সত্য ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে রামচন্দ্র উক্ত সভায় একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। সংকীর্তনের সময় সমবেত বিপুল জনতা ভাগবত শক্তি ও আনন্দে অনুপ্রাণিত হইলেন। সকলের অন্তরে আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠিল। আলো জ্বালা হইলে জনতা কোন্নগরের রাস্তা দিয়া সমস্বরে এই পদটি গাহিয়া চলিল—

'হরি বোল বল ভাই, দিন যায় বয়ে।
এ ভবসমুদ্রে ভাস, হরি নাম গেয়ে॥'

রামচন্দ্র ও মনোমোহন জনতার মধ্যে প্রেমভরে নৃত্য করিলেন এবং ভাবোন্মত্ত অবস্থায় মত্ত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন। মনোমোহন আনন্দাতিশয্যে এতদূর আত্মহারা হইলেন যে, ঘন ঘন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। কয়েকজন লোক তাঁহাকে কাঁধে লইয়া হরিধ্বনি করিল। কীর্তন শেষ হইয়া গেলেও তাঁহার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল না। রাত্রি একটার সময় তাঁহাকে ঐ অবস্থায় বাটীতে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। রাত্রি তিন ঘটিকার পর তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। পরদিন প্রভাতে তাঁহার দর্শনের আশায় ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার্থ প্রতিবেশীগণ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। হরিসভায় এমন প্রেমে মাতোয়ারা কীর্তন পূর্বে আর কখনও হয় নাই। সংকীর্তন-কালে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরে বসিয়া বলিতেছিলেন, 'লাগ ভেল্কি সবাই লাগ', অর্থাৎ ঈশ্বরের নামের ভেল্কি সকলকেই লাগুক।

ঠাকুর যখন কাশীপুর উদ্যানে রোগশয্যায় শায়িত তখন মনোমোহন তাঁহার সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া গুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে উক্ত সংকল্প হইতে নিরস্ত করেন। অফিস কামাই করিয়া তিনি তখন দিনরাত ঠাকুরের সেবারত ছিলেন। 'কেন তুমি

অফিস যাও না ?' একথা ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে মনোমোহন বিনীত ভাবে বলিলেন, 'আমার চাকুরী ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা।' কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে অফিসে যাইতে পরামর্শ দিলেন এবং ছুটির দিন বা অবসর সময়ে তাঁহার কাছে আসিতে বলিলেন। মনোমোহন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে রাজী হইলেন।

ঠাকুরের জীবদ্দশায় মনোমোহন যেরূপ দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন তদ্রূপ তাঁহার তিরোধানের পরও এক বৎসর নিয়মিত ভাবে যাইতে লাগিলেন। তথায় যাইলে তিনি পঞ্চবটীতে বা ঠাকুরের ঘরে বহুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন। এই সকল পূত স্থানে প্রস্তরবৎ নিস্পন্দ ও নির্বাক্ হইয়া বসিয়া থাকিবার কালে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া অবিরাম প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিত ও দেহ রোমাঞ্চিত হইত। দক্ষিণেশ্বর তাঁহার নিকট স্বর্গাপেক্ষা পবিত্র ছিল। যখনই তিনি কালীবাড়ীতে যাইতেন পূর্বের মত তথায় ফলমিষ্টান্নাদি লইয়া রাখিয়া আসিতেন। কোন সঙ্গী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর যখন আর নাই তখন আপনার এরূপ আচরণের কারণ কি ?' উক্ত প্রশ্নে মনোমোহন মর্মাহত হইলেন। 'তিনি আর নাই' এই নিষ্ঠুর বাক্য বাণবৎ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিল। বজ্রাহতের মত কিয়ৎক্ষণ তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিয়া দৃঢ়ভাবে তিনি উত্তর দিলেন, 'কিন্তু পূর্বের মত এখনও তিনি ভাগবতী তনুতে এখানে বর্তমান আছেন। ইহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। আমি কখনও তাঁহার অনস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না।' তাঁহার সঙ্গী ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মনোমোহন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে প্রার্থনা করিলেন, 'হে প্রভু, এই সব অবিশ্বাসীদের বুঝাও যে, তুমি এখনো এখানে আছ।'

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক পরিচালিত বাংলা মাসিক 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় ১৮৮৯ খ্রীঃ মনোমোহন নিম্নলিখিত অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিয়াছিলেনঃ—'আমার দুইটি পুত্র ও আমার ভগিনীর একটি পুত্র কলেরায় মৃতপ্রায়। চিকিৎসকগণ সকল আশা ত্যাগ করিয়াছেন। উহাদিগের জননীদ্বয় অসহ্য দুঃখে উন্মাদপ্রায়। তাহাদের হৃদয়বিদারক ক্রন্দনে আমার গৃহ পরিপূর্ণ।

আমাদের চতুর্দিকে তখন নৈরাশ্য ও অবসাদ, শোক ও বিমূঢ়তার নিবিড় ছায়া। আমার অন্ধকার ঘরে আমি লম্বা হইয়া শুইয়া আছি। হঠাৎ দিব্য সৌন্দর্যমণ্ডিত এক জ্যোতির্ময় মূর্তি আমার নিকট আত্মপ্রকাশপূর্বক আমার বক্ষে তাঁহার অমিয় হস্ত স্থাপন করিয়া প্রেমভরে বলিলেন, 'বাবা, আমি পূর্বে তোমায় যাহা বলিয়াছি তাহার সত্যতা এখন অনুভব কর। এই জগৎ জগন্মাতার ক্রীড়াক্ষেত্র। তিনি অবিরাম সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন এবং তিনিই পুনরায় সবই ধ্বংস করিতেছেন। তিনিই একমাত্র সত্য ; আর সব মিথ্যা। ইহা অনুভব কর, আর দুঃখ করিও না।' এরূপ ভাবেই দয়াল ঠাকুর অদ্ভুত উপায়ে তাঁহার শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে, অর্থাৎ ঠাকুরের তিরোধানের প্রায় তিন চার বৎসর পরে, মনোমোহন গুরুর পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে তীর্থ করিতে যান। তথায় ঠাকুরের শৈশব ও জন্ম সম্বন্ধে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন। এই উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সেবক ও ভাগিনেয় হৃদয়রাম, ভানু পিসি, গঙ্গাবিষ্ণু লাহা (ঠাকুরের বাল্যবন্ধু) ও অন্যান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাতবেড়িয়া, শিহোড়, শ্রীপুর প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঠাকুর গিয়াছিলেন সেই সকল স্থানেও তিনি যান। ঠাকুরের গৃহদেবতা রঘুবীর ও শীতলা মূর্তির নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং ঠাকুর শৈশবে যে স্থানে প্রথম সমাধিস্থ হন তথায় বসিলেন। তথায় বসিয়া ভাবাবেশে তিনি বহির্জগতের সকল জ্ঞান হারাইলেন। ক্ষণকালের জন্য তিনি নামরূপের গণ্ডী পার হইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিশালাক্ষী দেবী এবং সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটী গ্রাম স্বগৃহে ফিরিবার পথে দর্শন করেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কামারপুকুর ও জয়রামবাটী মহাতীর্থ এবং এই সকল পুণ্য স্থান দর্শন মহাভাগ্যের কথা। এই দুই স্থান হইতে কেহ আসিলে তিনি অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন এবং তাঁহাদের মিষ্ট বাক্যে ও ব্যবহারে তুষ্ট করিতেন।

১৮৯৪ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ নামে বহু আশ্রম ও সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। মনোমোহন উহাদের অধিকসংখ্যক স্বেচ্ছায়

পরিদর্শন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর তিনি আপিস হইতে ছুটি লইতেন। এই ভাবে ঘাটাল, নবদ্বীপ, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, গয়া, আরা, পুরী প্রভৃতি স্থান তিনি ভ্রমণ করেন। আরায় থিওসফিক্যাল সোসাইটীর ভূতপূর্ব সভানেত্রী এ্যানি বেসান্তের সহিত তাঁহার আলাপের সুযোগ হইয়াছিল। ঠাকুরের ভক্ত শিষ্যগণ কর্তৃক বাংলা মাসিক 'তত্ত্বমঞ্জরী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পত্রিকায় মনোমোহন নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতেন। ঠাকুরের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি উক্ত মাসিকে একুশটি সুচিন্তিত রচনা প্রকাশ করেন। এই সকল চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে তিনি ঠাকুরের সরল উপদেশের গভীর ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিতেন এবং সুযুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেন যে, সকল অবতারের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণতম। মনোমোহনের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শ্রবণোদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রীঃ হইতে দীর্ঘ দশ বৎসর ভূপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় প্রত্যহ তাঁহার বাটীতে আসিতেন। ভূপেন্দ্রকুমার বলেন, "ঠাকুরের কথা মনোমোহনের মুখ হইতে নির্ঝরিণীবৎ প্রবাহিত হইত। কখনো বা তিনি স্বলিখিত পাণ্ডুলিপি পড়িতেন, কখনো বা অনর্গল বলিয়া যাইতেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মন ভক্তিভরে আপ্লুত হইত। তিনি যখন বলিতেন, 'যদি তুমি অকপটে সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে চাও নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শনলাভে ধন্য হইবে' তখন আমার মনে হইত, তিনি যেন সর্বদাই ঠাকুরকে দেখছেন। তিনি আমাকে প্রায়ই যোগোদ্যানে রামচন্দ্র দত্ত এবং আলমবাজার মঠে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের নিকট যাইতে বলিতেন। তিনি জোর করিয়া বলিতেন যে, এঁদের পবিত্র সঙ্গ আমাদের ঈশ্বরচিন্তার পথে অতিশয় সহায়ক হইবে। শ্রীশ্রীমা যখন কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহাকে দর্শন ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইতে তিনি আমাদের বিশেষ অনুরোধ করিতেন। তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুর ও মা তত্ত্বতঃ অভেদ। তিনি বলিতেন, মায়ের আশীর্বাদ লাভ ঠাকুরের কৃপালাভ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।"

মনোমোহন ঘাটালে যাইলে শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ধর্মনিষ্ঠ যুবক তাঁহার নিকট বারংবার ঠাকুরের দর্শনের জন্য কাতর প্রার্থনা

জানাইলেন। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইয়া কয়েক রাত্রি ব্যাকুল অন্তরে ঠাকুরের দর্শন লাভার্থ প্রার্থনা করিবার জন্য মনোমোহন তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ যুবকের এত তীব্র আকাঙ্খা ছিল যে, ঘাটাল হইতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া যথোপদিষ্ট ভাবে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে রাত্রি যাপন ও প্রার্থনা করিলেন। শুনা যায়, ঠাকুর তাঁহাকে দর্শনদানে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

এক শুভদিনে যোগোদ্যানের রামকৃষ্ণ মন্দির পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করা হইয়াছিল। মনোমোহন সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তথায় ভাবাবেশে বলিলেন, 'রামকৃষ্ণভাবের বন্যা দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে।' তৎপরে 'প্রভু !....' বলিয়াই হঠাৎ নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'দেখ ! ঐ যে তিনি ! তিনি আনন্দে হাততালি দিতেছেন, আর তাঁহার ওষ্ঠে মধুর হাসি।' এই কথা বলিয়া একটী ঘণ্টার অধিক তিনি দিব্যাবেশে বিমোহিত হইয়া রহিলেন। তখন তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, গণ্ডস্থল প্রেমাশ্রুসিক্ত এবং দেহ কম্পিত। তাঁহার মন প্রকৃতিস্থ হইলে সমবেত একজন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, বিশ্বাস কি? মনোমোহন উত্তর করিলেন, 'বিশ্বাস যে কি তাহা কাহাকেও বাক্য দ্বারা বোঝান যায় না। বিশ্বাসই বিশ্বাস। কথা বা যুক্তি দ্বারা ইহা হৃদ্গত হয় না। যুক্তি বিশ্বাসের পশ্চাদ্বর্তী, বিশ্বাস যুক্তির পশ্চাদ্গামী নহে। বিশ্বাস অনুমান নয়, কল্পনা নয়, বা উপপত্তি নয়। অন্তর প্রকৃতির ভক্তিভাবই বিশ্বাস। ধর্মজীবনের জটিলতা, সন্দেহ এবং অন্যান্য সমস্যা বিশ্বাস দ্বারা নিঃসন্দেহে মীমাংসিত হয়।'

জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণিকপ্রভার মৃত্যু-কালে মনোমোহন অসাধারণ ধৈর্য্যও স্থৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সকল প্রকার সম্ভাব্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি তিনি করেন নাই। কিন্তু কন্যাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি আইস ব্যাগটি তাহার মাথা হইতে সরাইয়া রাখিলেন। কোন আত্মীয়ের দ্বারা তিনি ঠাকুরের ছবি একখানি আনাইলেন এবং কন্যার সম্মুখে তাহা ধরিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'মা, ঠাকুরের ছবি এনেছি। ভাল করে দেখ এবং তাঁকে ডাক। ভয় নেই। তিনি সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন। চোখের জল ফেলিও

না, মা। এখন কাঁদিবার সময় নয়।' এই বলিয়া স্বহস্তে কন্যার চোখের জল মুছিয়া দিলেন। স্নেহময় পিতার অনুরোধে মুমূর্ষু কন্যা ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইল। আর পিতা কয়েকবার কন্যার কর্ণে মধুর রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহা শুনিয়া কন্যার ওষ্ঠে বিমল হাস্য দেখা দিল এবং সে শান্তিতে ইহধাম ত্যাগ করিল। মনোমোহন ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'মাণিক বেঁচে গেল।' কন্যার মৃত্যুতে পিতা বিচলিত হইলেন না সত্য, কিন্তু মাতা অধরমোহিনী পাগলিনীপ্রায় হইলেন। গভীর শোকে মুহ্যমানা মাতা কাহারও সহিত কথা বলিতেন না, সর্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ও চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তিনি দিবারাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। গৃহচিকিৎসকের পরামর্শে মনোমোহন তাঁহাকে পুরীতে বায়ু-পরিবর্তন করিতে লইয়া গেলেন। কিন্তু ইহাতে মাতার শোক আদৌ কমিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ মাতা তথায় কলেরায় আক্রান্ত হইলেন। উপযুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে দেহত্যাগ করিলেন। যখন তাঁহার শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইল মনোমোহন তখন তাঁহার কানে ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীবিয়োগে মনোমোহন অটল রহিলেন। প্রিয়া পত্নীর মৃত্যুও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। ইহাই যথার্থ ভক্তের আদর্শ। শোনা যায়, পুরীতে উপস্থিত হইয়াই তিনি ধূলিধূসরিত পদে মন্দিরে ৺জগন্নাথদেব দর্শন করিতে যাইয়া জগন্নাথের স্থলে রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন। প্রথমে ইহা দৃষ্টিভ্রম মনে করিয়া তিনি চক্ষু মর্দন করিলেন। কিন্তু বার বার একই দিব্য দৃশ্য দৃষ্ট হইল। অবশেষে তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'রামকৃষ্ণরূপী জগন্নাথের জয়।'

মনোমোহনের এক মাত্র পুত্র গৌরীমোহন উচ্চ শিক্ষা লাভান্তে চিরকুমার থাকিয়া জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি বেলুড় মঠে যোগদানপূর্বক ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্য নামে পরিচিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর বহু বৎসর পরে ১৯৪৯ খ্রীঃ ১০ই জুন শুক্রবার মাতৃকাচৈতন্য শুভ স্নানযাত্রার দিন সন্ধ্যায় বাগবাজারস্থ বলরাম মন্দিরে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করেন। পিতার ন্যায় পুত্রও রামকৃষ্ণময় ছিলেন।

জীবন-সায়াহ্নে মনোমোহন ঠাকুরের ভাবে আরও অধিক বিভোর হইয়া থাকিতেন। প্রত্যহ তিনি বহুক্ষণ জপ-ধ্যান করিতেন, এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তে প্রতি নিশ্বাসে তিনি রামকৃষ্ণ নাম লইতেন। ঠাণ্ডায় তাঁহার হাঁপানির টান বাড়িত বলিয়া সূর্য্য উঠিলে তিনি ঘরের বাহিরে আসিতেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনপূত স্থানগুলি দেখিতে যাইতেন। ঠাকুর যে সকল স্থানে পাদস্পর্শ করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট সেইগুলি তীর্থতুল্য ছিল। গঙ্গার পবিত্র জলে তিনি নিত্য স্নান করিতেন। কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকিলে তিনি স্নান না করিয়া গঙ্গাবারি স্পর্শ করিতেন। গঙ্গাতীরে স্নানের পূর্বে তৈল মর্দন কালেও তিনি অপরের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতেন। স্নান করিয়া ফিরিবার কালে তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ সমবেতভাবে পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতেন। স্নানের পর প্রত্যহ তিনি গৃহে যথাবিধি ঠাকুরের পূজায় বসিতেন।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে নাটমন্দির নির্মিত হইলে ভক্তগণের আকুল প্রার্থনায় শ্রীমা তথায় আসিয়া বেদীর নিকট বসিয়া স্বহস্তে ঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন। বেদীর নিম্নে ঠাকুরের ভস্মাবশেষ প্রোথিত আছে। শ্রীশ্রীমা এখানে এমনভাবে ঠাকুরের উপস্থিতি অনুভব করিলেন যে, লজ্জায় মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন। যাহা হউক, মনোমোহন তাঁহাকে পূজায় বসিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আমি দেখলাম, কৈলাসের দেবী পার্ব্বতী শিবপূজা করিতেছেন। অর্ঘ্য নিবেদনের কালে শ্রীমা এত আকুলতা প্রকাশ করিলেন যে, সকলে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

ঠাকুরের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণ এমন এক অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন যে, সকলেই মনে করিতেন, তাঁহারা এক পরিবারভুক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের শেষ অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বীয় দৈহিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া মনোমোহন বেলুড় মঠে ছুটিয়া গেলেন। স্বামীজীর ভগ্ন শরীর দেখিয়া তিনি এতদূর বিচলিত হইলেন যে, স্বগৃহে ফিরিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ হাঁপাইতে লাগিলেন এবং সেই রাত্রে তাঁহার একটুও ঘুম হইল না; কয়েক সপ্তাহ তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন। স্বামীজির মৃত্যু-সংবাদে তিনি ভীষণ আঘাত পাইলেন।

এই শোকে তিনি এতদূর অভিভূত হইলেন যে, স্ত্রী ও পুত্রকন্যার মৃত্যুতেও এত অধীর হন নাই। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনটি তাঁহার নিকট বড় পবিত্র মনে হইত এবং প্রতি বৎসর ঐ দিনটি মহাসমারোহে উদ্যাপন করিতেন। বেলুড় মঠ বা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের উৎসবাদিতে তিনি খুব কমই অনুপস্থিত থাকিতেন। একই দিনে যদি দুই জায়গায় উৎসব পড়িত তিনি উভয় স্থানেই যোগ দিয়া আনন্দ করিতেন।

গুরু-কৃপায় মনোমোহনের বহু অলৌকিক দর্শনাদি হইয়াছিল। একদিন যোগোদ্যানের সমাধি-মন্দিরে তিনি সৌভাগ্যক্রমে দেখিলেন, পূজার বেদীতে স্থাপিত ঠাকুরের ছবির পশ্চাৎ হইতে ঠাকুর সহাস্য বদনে উঁকি মারিতেছেন। দর্শনটি এতই অপ্রত্যাশিত হইল যে, প্রথমে তিনি নিজের চক্ষুদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাতে নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, তাঁহার দর্শন সত্য এবং তখনই তিনি তথায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। গভীর ধ্যানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল। স্বামী যোগবিনোদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গভীর ধ্যানে স্থাণুবৎ নিশ্চল ও নিষ্কম্প দেহে উপবিষ্ট দেখিলেন। প্রচুর প্রেমাশ্রুতে তাঁহার জামাকাপড় আর্দ্র, নীচের মেঝেও সিক্ত, তাঁহার মুখমণ্ডলে পরম শান্তির আভা, আর ওষ্ঠে মধুর হাসি, নিশ্বাস সুধীর ও সুদীর্ঘ। কিয়ৎকাল পরে শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি যেন গভীর সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলেন এবং মন্দির হইতে মহাত্মা রামচন্দ্রের ঘরে আসিলেন। সেখানেও সেই একই দৃশ্য! যোগোদ্যানে যে ঘরেই তিনি গেলেন সেই ঘরেই সেই এক দিব্য দৃশ্য দেখিলেন। অবশেষে তিনি যোগোদ্যানের পঞ্চবটীতে আসিলেন এবং তথায়ও সেই একই স্বর্গীয় দৃশ্য! আহারের সময় হইলে তিনি আহারে বসিলেন। গ্রাসে গ্রাসে সেই অলৌকিক দর্শন পূর্ববৎ হইতে লাগিল। অবশেষে চতুর্দিকে, ঊর্ধে, নিম্নে ঠাকুরের সেই হাসিমাখা মুখ দেখিলেন। বিশ্রামান্তেও উক্ত দর্শন চলিতে লাগিল। বৈকালে সমবেত ভক্তগণের সমক্ষেও তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শনের বিরাম হইল না। ইহাই কি সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন?

জীবনের শেষ দিনগুলিতে কোন্নগরে অবস্থান কালে মনোমোহনের এইরূপ

অলৌকিক অনুভূতি হইয়াছিল। বাড়ী হইতে তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইতেছিলেন। মাঠ হইতে এক ঝাঁক সাদা পাখী উচ্চে নীলাকাশে উঠিয়া অদৃশ্য হইল। পক্ষীকুলকে উর্ধে উড়িতে দেখিয়া তাঁহার মন নামরূপের রাজ্য পার হইয়া অরূপ সাগরে ডুব দিল। তিনি বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন। বাহ্য জ্ঞান ফিরিলে তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, তাঁহার আফিসের দুইটী বন্ধু তাঁহার মস্তকে বাতাস করিতেছেন। অফিসের সময় হইলে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। সমগ্র দিবস তাঁহার অন্তর্মুখীনতা এবং আবিষ্টতা রহিল। সন্ধ্যার পূর্বে তিনি সুউচ্চ ভাবভূমি হইতে মনকে নামাইতে পারিলেন না। ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, মন কখন সসীম হইতে অসীমে যাইবে তাহা বলা যায় না।

একদা মনোমোহন এক জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করেন। প্রথমে ইহাকে তিনি ঈশ্বরীয় মূর্তিরূপে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু উহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি উহাকে নারায়ণের ধ্যানমূর্তি বলিয়া জানিলেন। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'নারায়ণরূপী রামকৃষ্ণের জয়।'

একদিন মনোমোহন শ্রীমার নিকট বহুক্ষণ কাটাইলেন। গৃহে ফিরিয়া সন্ধ্যা সমাগমে ধ্যান করিবার কালে তিনি শ্রীমাকে নিম্নবর্ণিত মহালক্ষ্মীরূপে দেখিলেন।—

"মা মণিমাণিক্য-খচিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আর দুইটী অপ্সরী তাঁহাকে ডান ও বাম দিক হইতে ব্যজন করিতেছে। সিংহাসনের নিম্নে দুইটী হস্তী শুণ্ড উঁচু করিয়া শায়িত। মার বসন হইতে বিদ্যুৎপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। মায়ের মস্তক মুকুটশোভিত, ও দেহ বহুবিধ দুর্মূল্য ভূষণে অলঙ্কৃত। তিনি বরাভয়করা এবং তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোৎস্নাবৎ হাস্যময়। তিনি যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেইদিকেই দলে দলে জ্যোতির্ময় পদ্ম ফুটিয়া উঠে। তিনি আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমার অন্তঃকরণ প্রস্ফুটিত পদ্মের মত বিকশিত হইল। তৎপরে কি হইল তাহা আমার মনে নাই, এবং যৎকিঞ্চিৎ মনে আছে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না।"

১৯০৩ খ্রীঃ ৩০ শে জানুয়ারী মনোমোহন ইহলীলা সংবরণ করেন। সেই বৎসর স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বেলুড় মঠে প্রথম স্বামীজীর জন্মোৎসব হয়। উক্ত উৎসবে যোগদানান্তে ক্লান্ত শরীরে মনোমোহন গৃহে ফিরিলেন। সেই দিনই তিনি শয্যা লইলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর শয্যা ত্যাগ করেন নাই। চিকিৎসকগণ তাঁহার অসুখকে সন্ন্যাসরোগ বলিয়া নির্ণয় করিলেন। মনোমোহন অন্তিম শয্যায় শায়িত শুনিয়া স্বামী প্রেমানন্দ দ্রুতপদে বেলুড় মঠ হইতে তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত পর পর তিন দিন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ঠাকুরের এই অন্তরঙ্গ শিষ্য সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মনোমোহনের শেষ অসুখের সময় 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'কার শ্রীম, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, হরমোহন মিত্র, দক্ষ মহারাজ, যোগোদ্যানের স্বামী যোগবিনোদ এবং তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালিক অধ্যক্ষ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মনোমোহনের অন্তিম অসুখের সময় তাঁহার সেবা করিতে ও কুশল সংবাদ লইতে বেলুড় মঠের সাধু ব্রহ্মচারীগণকে প্রত্যহ প্রেরণ করিতেন। প্রয়াণকালে মনোমোহন পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের পুণ্য নাম উচ্চারণ ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছিলেন। স্বর রুদ্ধ হইলেও নীরবে তিনি প্রভুর নাম করিতে থাকেন। সেইজন্য তাঁহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ নড়িতেছিল। যখন তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় আর নড়িল না, সমবেত সকলে উচ্চ স্বরে মধুর রামকৃষ্ণ নাম গাহিতে লাগিলেন। ঠাকুরের নাম শুনিতে শুনিতে আনন্দে তাঁহার দেহ পুলকিত হইল। এইরূপ আনন্দময় অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলেন, এমন মহাপ্রয়াণ অতি বিরল। এরূপ মৃত্যু দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী, সংসার-জয়ী।

প্রত্যেক শিষ্যের জীবন ঠাকুরের জীবনবেদের এক একটী উজ্জ্বল ও অমূল্য অধ্যায়। অনন্তভাবঘনমূর্তি ঠাকুরের এক একটী ভাবের মূর্ত প্রকাশ ছিলেন তাঁহার এক একটী শিষ্য। ঠাকুরের জীবন পরিপূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার শিষ্যগণের জীবনী অধ্যয়ন অপরিহার্য্য।

পনের

স্বামী শুদ্ধানন্দ *

স্বামী শুদ্ধানন্দ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্যবৃন্দের অন্যতম। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বামী প্রকাশানন্দও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং আমেরিকায় প্রায় বিশ বৎসর বেদান্তপ্রচারান্তে তথায় দেহরক্ষা করেন। শ্রীগুরুর গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদকরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ বাংলা সাহিত্যে অমর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের পরে তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ সংঘের সম্পাদক এবং অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। শুদ্ধানন্দপ্রমুখ ত্যাগী শিষ্যগণের জীবনকাহিনী স্বামী বিবেকানন্দের বৃহত্তর জীবনীর এক একটী অচ্ছেদ্য অধ্যায়। সেইজন্য রামকৃষ্ণ সংঘে এবং বাংলা দেশে তিনি চিরস্মরণীয়।

পূর্বাশ্রমে স্বামী শুদ্ধানন্দের নাম ছিল সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁহার পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী এক নিষ্ঠাবান্, ধর্মপ্রাণ ও উদারচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুধীরচন্দ্র কলিকাতার এক অভিজাত বংশে ১৮৭২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই তাঁহার জীবনে প্রবল ধর্মানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। বালক সুধীর ধর্মগ্রন্থ পড়িতে ভালবাসিতেন এবং সাধু-সন্ন্যাসী খুঁজিয়া বেড়াইতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি দুই বার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক বার পদব্রজে দেওঘর পর্যন্ত গমন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং সিটি কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে তিনি গৃহত্যাগপূর্বক রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ ১৮ বৎসর বয়স হইতে বরাহনগর ও কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ মঠে যাইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সঙ্গলাভ করিতে থাকেন।

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৫৬ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৮৯৩ খ্রীঃ আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার দীর্ঘসুপ্ত ভারতকে জাগ্রত করিল। বাঙালী যুবকগণের দৃষ্টি স্বামীজীর যুগান্তরকারী কর্ম এবং বজ্রবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুধীরচন্দ্র অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তখন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার কার্য্যালয় ছিল ধর্মতলায়। উহার বহির্দেশস্থ বোর্ডে ঐ পত্রিকার নূতন সংখ্যা সংলগ্ন থাকিত। সুধীরচন্দ্র তথায় যাইয়া স্বামীজীর সংবাদ বা বক্তৃতাদি সাগ্রহে পড়িতেন। স্বামীজীর স্বদেশে পদার্পণ করার পর সিংহলে বা দক্ষিণ ভারতে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেগুলিও তিনি সযত্নে পড়িয়াছিলেন। যে দিন স্বামীজী শিয়ালদহ ষ্টেশনে স্পেশাল ট্রেনে আসিলেন, সে দিনও সুধীরচন্দ্র প্লাট্‌ফর্মে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী যে কাম্‌রাতে ছিলেন, তাহা যেখানে আসিয়া থামিল, সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলেন। গাড়ী থামিতেই দর্শকমণ্ডলী স্বামীজীর কামরার সম্মুখে সমবেত হইলেন। তখন স্বামীজী দাঁড়াইয়া সমবেত দর্শকবৃন্দকে করযোড়ে নমস্কার করাতে সুধীরচন্দ্রের হৃদয় তাঁহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল। স্বামীজী ঘোড়ার গাড়ীতে ষ্টেশন হইতে রিপন কলেজের দিকে যাইতেছিলেন। কয়েক জন যুবা তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই তাহা টানিতে লাগিলেন। সুধীর তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য পারিলেন না। রিপন কলেজে স্বামীজী সমবেত জনমণ্ডলীকে দুই চার কথা বলিলেন। তখন সুধীর স্বামীজীকে ভাল ভাবে দেখিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি দেখিলেন, স্বামীজীর মুখখানি দিব্যজ্ঞানোদ্দীপ্ত ও তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। তবে ভ্রমণের ক্লান্তিহেতু তাঁহার মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন।

স্বামীজী বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাটীতে উঠিলেন। সুধীর তাঁহার বন্ধু খগেনের টমটমে চড়িয়া সেদিন বৈকালে স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এরা আপনার খুব admirer." কিন্তু স্বামীজী তখন তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সহিত কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকায় সুধীর

সেদিন তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইলেন না। কয়েক দিন পরে স্বামীজী কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে গেলেন। সেইখানেই স্বামীজীর সহিত সুধীরের প্রথম কথোপকথন হয়। স্বামীজী উজ্জ্বল গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া উপবিষ্ট, সুধীর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। হঠাৎ স্বামীজী সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি তামাক খাস্?" সুধীর কহিলেন, "আজ্ঞে না।" তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, "হাঁ, অনেকে বলে, তামাক খাওয়া ভাল নয়। আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।"

আর একদিন সুধীর তাঁহার প্রতিবেশী বন্ধু খগেনের* সহিত সন্ধ্যার পর স্বামীজীর নিকট গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হরমোহন মিত্র তাঁহাদিগকে স্বামীজীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, "স্বামীজী এরা আপনার খুব admirer এবং বেদান্ত আলোচনা করে।" ইহা শুনিয়াই স্বামীজী সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপনিষদ কিছু পড়েছ?" সুধীর বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।' স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন উপনিষদ্ পড়েছ?" সুধীর বলিলেন, "কঠ উপনিষদ পড়েছি।" তখন স্বামীজী সুধীরকে উক্ত উপনিষদ্ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন, কিন্তু উপনিষৎ তাঁহার মুখস্থ ছিল না। ইহার কয়েক বর্ষ পূর্ব হইতেই তিনি নিত্য গীতা পাঠ করিতেন। ইহার ফলে গীতার অধিকাংশই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। তাই সুধীর বলিলেন, "কঠটা মুখস্থ নেই। গীতা থেকে খানিকটা বলি।" স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা, তাই বল।' তখন সুধীর একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন "বেশ, বেশ।"

পরদিন তিনি বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে লইয়া স্বামীজীর দর্শনে গিয়াছিলেন। পাছে স্বামীজী উপনিষৎ আবৃত্তি করিতে বলেন, এজন্য একখানা উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী পকেটে লইয়া যান। সেদিনও কঠোপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল।

* স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ।

অমনি সুধীর তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বইখানি বাহির করিয়া কঠোপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে লাগিলেন। এই দুই দিনের উপনিষৎ-প্রসঙ্গের ফলে উহার প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সুধীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। উপনিষদের প্রতি এই প্রগাঢ় প্রীতি সুধীরের আমরণ ছিল। স্বামীজী কিন্নরকণ্ঠে সুমিষ্ট ছন্দে উপনিষদের যে সকল শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, সুধীরচন্দ্র দীর্ঘ ষোল বৎসরের পরও তাহা যেন দিব্য কর্ণে শুনিতে পাইতেন। যে দিন গুজরাটী পণ্ডিতগণ স্বামীজীর সহিত সংস্কৃত ভাষায় ধর্মবিচার করেন, সে দিনও সুধীর উপস্থিত ছিলেন। বিচারান্তে পণ্ডিতগণ বলিতেছিলেন, "স্বামীজী তাদৃশ পণ্ডিত নন্, তবে ইঁহার চক্ষুতে এক মোহিনী শক্তি আছে। সেই শক্তি-বলেই তিনি দেশবিদেশে নানাস্থানে দিগ্বিজয় লাভ করিয়াছেন।"

স্বামীজীর এক সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দের পরামর্শে স্বামীজী মঠের নিয়মাবলী রচনা করেন। নিয়মগুলি স্বামীজী বলিয়া যাইতেন এবং সুধীরচন্দ্র লিখিতেন। স্বামীজী তামাক খাইতেন। সেইজন্য তামাক খাওয়াটি মঠে নিষিদ্ধ হইল না। মঠের একটি নিয়ম হইল যে, মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ব্যতীত আর কিছু খাওয়া চলিবে না। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী সুধীরচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "এমন সময় আসবে যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে।" স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের প্রায় দুই মাস পরে ১৮৯৭ খ্রীঃ এপ্রিলের শেষে সুধীরচন্দ্র সংসার ছাড়িয়া আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। ইহার পূর্ব হইতেই তিনি আলমবাজার মঠে যাতায়াত করিতেন। স্বামীজী সুধীরকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং খোকা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি এই শিষ্যকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়া ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ নাম দেন। ঐ বৎসরের মধ্যে সুধীর স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামীজী তাঁহার এই নবীন সন্ন্যাসী শিষ্যের দ্বারা মাঝে মাঝে চিঠি লিখাইতেন এবং অন্যান্য কাজও করাইতেন। শ্রীগুরুর সহিত স্বামী শুদ্ধানন্দ উত্তর ভারত এবং রাজপুতানাদি অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি মানসসরোবর তীর্থেও গমন করেন। এই

তীর্থ-ভ্রমণে শ্রীগুরুর সহিত শিষ্যের ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ পরবর্তী কালে বলিতেন, "যতই দিন যাচ্ছে ততই স্বামীজীকে আরও বড় মনে হচ্ছে। যখন স্বামীজীর সঙ্গে থাকতাম এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতাম, তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে, তিনি এত বড়!"

একদিন অপরাহ্ণে মঠের বড় ঘরে বহু লোক সমাগত। তন্মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া বিরাজিত। নানা প্রসঙ্গ চলিতেছিল। এমন সময় আলীপুর আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল বিজয়কৃষ্ণ বসু আসিলেন। বিজয় বাবু ইংরাজী ভাষায় সুবক্তা ছিলেন। স্বামীজীর নিকট কেহ তাঁহার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করায় স্বামীজী তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীজীর সম্মুখে বক্তৃতা করিতে সাহস করিলেন না। স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠে যোগ দিবার পূর্বে কখনও কখনও ধর্ম সম্বন্ধে বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। তাঁহাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল। তাহাতে তিনি ইংরেজীতেও বলিবার অভ্যাস করিতেন। স্বামীজীর নির্দেশে সে দিন স্বামী শুদ্ধানন্দ দাঁড়াইলেন এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদোক্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া স্বামীজী স্বীয় শিষ্যকে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তথায় সে দিন স্বামীজীর নূতন সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ প্রায় দশ মিনিট কাল একই বিষয়ে বলিলেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন। ঠাকুরের বৃদ্ধ শিষ্য স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানিতেন না। কিন্তু স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতাগুলির সারাংশ শুনিবার খুব আগ্রহ তাঁহার ছিল। তাঁহার অনুরোধে নবীন সন্ন্যাসিগণ স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতাগুলি পড়িয়া অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শোনাইতেন। স্বামী প্রেমানন্দের পরামর্শে নূতন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন। একদিন সকলে স্ব স্ব অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু পড়িয়া স্বামীজীকে শোনাইলেন। স্বামীজী শুদ্ধানন্দপ্রমুখ অনেকের অনুবাদের প্রশংসা করিলেন। একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দ একা স্বামীজীর কাছে বসিয়া আছেন। স্বামীজী হঠাৎ তাঁহাকে বলিলেন, "রাজযোগটা তর্জমা কর্ না।" শিষ্য গুরুর আদেশে উহার অনুবাদে অবিলম্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে তিনি স্বামীজীর রাজযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। শিষ্য গুরুর ভাবে এমন প্রভাবিত ছিলেন যে, শিষ্যের লেখনীমুখে গুরুর ভাষাই বাহির হইয়াছে। শিষ্যের অনুবাদ এত প্রাঞ্জল ও মৌলিক যে, ঐগুলি গুরুর মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। বাংলাদেশে স্বামীজীর ভাব-প্রচারে এবং রামকৃষ্ণ সংঘের বিস্তারে এই অনুবাদগুলি বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। এই অনুবাদই স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি।

একদিন অপরাহ্নে বেলুড় মঠের বড় ঘরে বহু লোক বসিয়া আছেন। সে দিন স্বামীজী গীতা ব্যাখ্যা করেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ' ইত্যাদি শ্লোকটি সাধারণের উপযোগী করিয়া তিনি ব্যাখ্যা করেন। ওজস্বিনী ভাষায় যখন স্বামীজী এই শ্লোকের ভাবার্থ বিবৃত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভিতর হইতে দিব্য তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিতেন, "এই একটী শ্লোকের মধ্যে সমগ্র গীতার সার নিহিত। এই একটী মাত্র শ্লোক পড়লেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল হয়।" সেদিন স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দুই চার দিন পরেই স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা 'গীতাতত্ত্ব' নামে উদ্বোধন পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত ও পরে 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়।

একদিন স্বামীজী শিষ্যকে ব্রহ্মসূত্র পড়াইতেছিলেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পঠিত ও আলোচিত হইল। ভাষ্যাদি না পড়িয়া স্বাধীন ভাবে সূত্রগুলির অর্থ বুঝিবার জন্য গুরু শিষ্যকে উৎসাহিত করিলেন। উক্ত নির্দেশ অনুসারে শিষ্য পরে স্বামীজীর ভাবাবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের মতে রামানুজ ও শঙ্করের মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহার প্রধান কারণ মূল শ্লোকের পাঠান্তর। স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক রচিত ভাষ্যটি এখনও অপ্রকাশিত। গুরু তাঁহার শিষ্যকে সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণও শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিতেন, "আমরা আত্মা শব্দকে 'আতমা' না বলে 'আঁত্তা' বলে উচ্চারণ করি। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে

বলেছেন, শব্দের অপ-উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ। পতঞ্জলির মতে আমরা সকলে ম্লেচ্ছ।"

যেদিন 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেদিন স্বামী শুদ্ধানন্দের দীক্ষা হয়। স্বামী নির্মলানন্দ আসিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলিলেন, 'স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে?' স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' ইতঃপূর্বে তিনি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। জনৈক হঠযোগীর নিকট প্রাণায়ামাদি কয়েকটি যৌগিক প্রক্রিয়া শিখিয়া প্রায় তিন বৎসর অভ্যাস করিয়াছিলেন। শুদ্ধানন্দজী দীক্ষার্থ গুরুর নিকট যাইয়া বসিলেন। প্রথমেই স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার?" শিষ্য বলিলেন, "কখন সাকার ভাল লাগে, কখন বা নিরাকার।" একটু পরে গুরু শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া অল্পক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুই কখনো ঘট স্থাপন করে পুজা করেছিস?" শিষ্য বলিলেন, "আমি বাড়ী ছাড়বার পূর্বে ঘট স্থাপনপূর্বক কোন পূজা অনেক ক্ষণ ধরে করেছিলাম।" গুরু তখন একটি দেবতার মন্ত্র শিষ্যকে বলিয়া উহার অর্থ ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে শিষ্যের সম্বন্ধে একটী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া সস্নেহে গুরুদক্ষিণা দিতে বলিলেন। স্বামীজী একদিন শুদ্ধানন্দপ্রমুখ শিষ্যদের ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া ধ্যানপদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের নেতৃত্বে এই ভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

স্বামীজী যে দিন বেলুড় মঠ হইতে আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যান, সেদিন মঠের সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতি আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারীগণকে বলিয়াছিলেন, "দেখ বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছুই হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই একমাত্র সহায়।" এক দিন অপরাহ্ণে স্বামীজী বেলুড় মঠের বারান্দায় স্বামী. শুদ্ধানন্দ প্রভৃতি শিষ্যদের লইয়া বেদান্ত পড়াইতেছিলেন। তখন স্বামী প্রেমানন্দ মঠে ঠাকুরের পূজা করিতেন। সন্ধ্যা সমাগম হইলে স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণকে আরাত্রিকের

জন্য ঠাকুরঘরে যাইতে ডাকিলেন। স্বামীজীর তখন বেদান্ত-অধ্যাপনার নেশা কাটে নাই। তিনি উক্ত গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "এ যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, একি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একটা ছবির সামনে সল্‌তে পোড়া নাড়লে আর ঝাঁঝ পিট্‌লেই বুঝি মনে করছিস্, ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?"

স্বামীজীর মুখে স্বামী শুদ্ধানন্দ অনেক বার শুনিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বেশী প্রিয় পাত্র। এক দিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে গুরু শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ, মঠের একটা ডায়েরী রাখবি।" স্বামীজীর এই আদেশ শিষ্য যথাসাধ্য পালন করিয়াছিলেন। সেই ডায়েরী এখনও মঠে পরিরক্ষিত আছে। ইহা হইতে মঠের আদি ইতিবৃত্ত অনেকটা জানা যায়। স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিতেন. "সামান্য ইংরেজী পড়ে আমরা সব বিষয়ে সন্দেহ করতে বিশেষ শিখেছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর বাক্যে আমার কখনও অবিশ্বাস হয় নি। কারণ, তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ধ্রুব সত্য বলে দৃঢ় ধারণা হত।" গুরুবাক্যে এইরূপ গভীর বিশ্বাসের বলেই স্বামী শুদ্ধানন্দ এত বড় কর্মী ও জ্ঞানী হইতে পারিয়াছিলেন। এক দিন এক অপরিচিত দর্শক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "আপনি সন্ন্যাসী হলেন ও গেরুয়া পরলেন কেন?" তদুত্তরে স্বামী শুদ্ধানন্দ যে সরল উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমার এখনও স্পষ্ট স্মরণ আছে। তিনি বলিলেন, "সকলকেই ত এই জগৎ ছেড়ে যেতে হবে। গৃহে থাকলে ওপারের ডাক শুনে যেতে বড় কষ্ট হয়। তাই সব ছেড়ে গেরুয়া পরে এখন থেকে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি যাবার জন্য।" তিনি স্বামীজীর যে অস্ফুট স্মৃতি * লিখিয়া গিয়াছেন ইহা পাঠে দেখা যায়, গুরুবাক্যগুলি কত যত্নে সারা জীবন তিনি স্মরণ-মনন করিয়াছেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামীজীর প্রেরণায় বেলুড় মঠের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয় এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত উহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'উদ্বোধন' পরিচালনায় স্বামী শুদ্ধানন্দ ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতের দক্ষিণ

* উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'স্বামীজীর কথা' নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত।

হস্তস্বরূপ। স্বামী ত্রিগুণাতীত পাশ্চাত্যে গমন করিলে স্বামী শুদ্ধানন্দ 'উদ্বোধন' এর দ্বিতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং দশ বৎসর পর্যন্ত উহার সম্পাদনাকার্যে ব্রতী ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ তিনি বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং পরে রামকৃষ্ণ মঠের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন. প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে ১৯২৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সম্মেলন হয়। স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের পর তিনি ১৯২৭ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সাত বৎসর এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পর ১৯৩৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে তিনি বেলুড় মঠের সহকারী অধ্যক্ষ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দেহত্যাগের পর ১৯৩৮ খ্রীঃ মে মাসে প্রধান অধ্যক্ষ (প্রেসিডেণ্ট) পদে আরূঢ় হন। তিনি বেলুড় মঠের পঞ্চম অধ্যক্ষ। উক্ত উচ্চ পদে ছয় মাস মাত্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১৯৩৮ খ্রীঃ ২৩শে অক্টোবর ৬৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে ভস্মীভূত করা হয়।

শেষ জীবনে তিনি উচ্চ রক্তচাপে (blood-pressure) ভুগিতেছিলেন। ১৮ই অক্টোবর হইতে তাঁহার খুব জ্বর হয় এবং পরে হিক্কা ও মূত্রকৃচ্ছ্র দেখা দেয়। শেষ রাত্রিতে চিকিৎসকগণকে বলেন, "আর ঔষধাদি সেবনের প্রয়োজন নেই। এখন শুধু ভগবানের নাম শোনান।" শেষ কয়েক মাস যাবৎ তিনি সর্বদাই আধ্যাত্মিক আলোচনা এবং 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ-শ্রবণে রত থাকিতেন। দেহত্যাগের পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকাইয়া চণ্ডীপাঠ করাইয়া শ্রবণ করেন। বেদান্ত এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেরূপ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান রামকৃষ্ণ সংঘে বিরল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণকে লইয়া তিনি শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন। উপনিষৎপাঠে বেলুড় মঠের সাধুদিগের অনুরাগবৃদ্ধির জন্য তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য উপাখ্যানটী সংস্কৃত নাট্যাকারে পরিণত করিয়া সাধুদিগের দ্বারা ইহার অভিনয় করান। তিনি নিজেও কয়েক বার উক্ত অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে সাধুগণের শাস্ত্রশিক্ষার জন্য যে চতুষ্পাঠী আছে,

স্বামী প্রেমানন্দ উহার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও স্বামী শুদ্ধানন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ।

রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ইতিহাস স্বামী শুদ্ধানন্দ বিস্তৃত ভাবে জানিতেন। সংঘের প্রত্যেক শাখা ও সন্ন্যাসীর সবিশেষ সংবাদ তিনি রাখিতেন। সেই জন্য তাঁহাকে রামকৃষ্ণ সংঘের জীবন্ত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঢাকা শাখায় অস্পৃশ্য জাতির জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনাদি দ্বারা তিনি উক্ত আশ্রমের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সোসাইটির লাইব্রেরী স্থাপন ও উহার জন্য গ্রন্থসংগ্রহ ও পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, সদস্য নির্বাচন প্রভৃতি সকল কার্যেই তিনি অনলস ভাবে যোগদান করিতেন। রামকৃষ্ণ সংঘ পরিচালন এবং সাধুগণের জীবন-গঠনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে নিয়মাবলী প্রবর্তন করেন, সেগুলি স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের এবং পরবর্তী যুগের সাধু-ব্রহ্মচারীগণের সহিত মিশিবার সমান সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। সেইজন্য রামকৃষ্ণ সংঘের অতীত ও বর্তমান যুগের সংযোগসূত্র-স্বরূপ তিনি ছিলেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবন ছিল ত্যাগোদ্দীপ্ত অনাড়ম্বর ও প্রেমপূর্ণ। বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যাহা কিছু দিতেন তাহা তিনি দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। তাঁহার নিকট সংঘের প্রাচীন ও নবীন সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তগণের অবাধ গতি ছিল। সকলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। দেহত্যাগের কয়েক দিন পূর্বে এক অন্ধ নারী তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় দীক্ষা-প্রার্থিনীকে বিমুখ হইতে হয়। পর দিন শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি অন্ধ নারীর সংবাদ লইয়াছিলেন। দুঃখীর প্রতি সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ। বেলুড় মঠের নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের নিকট তিনি স্নেহময় পিতার তুল্য ছিলেন। গুরুর হৃদয়বত্তা শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। গুরুগতপ্রাণতাই স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনের বিশেষত্ব। গুরুর

বহু বাক্য শিষ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ ছিলেন স্বামীজীর এক একটি প্রতিবিম্ব। এই সন্ন্যাসী শিষ্যগণের জীবন-কাহিনী অধ্যয়ন করিলে স্বামী বিবেকানন্দের বৃহত্তর জীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে আছে, "যেমন তৃণাগ্নি সমুদ্রকে উত্তপ্ত করিতে অক্ষম, তদ্রূপ ক্রোধ সাধুর মনে বিকার সৃষ্টি করিতে পারে না।" সাধু শুদ্ধানন্দের রাগ জলের দাগের মত ক্ষণস্থায়ী ছিল। কোন কারণে আমাদের প্রতি বিরক্ত হইলে তিনি খুব বকিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই আমাদিগকে কাছে বসাইয়া সস্নেহে সান্ত্বনা দিতেন। কয় জন পিতা পুত্রের সহিত এমন মধুর ব্যবহার করেন? সন্ত তুলসীদাস সত্যই বলেছেন—

"জড়চেতন দোষগুণময় বিশ্ব কিন্হ করতার।
সন্ত হংস গুণ গহহিঁ পয়ঃপরিহরি বারি বিকার॥"

অর্থাৎ বিধাতা এই জড়চেতন বিশ্বকে দোষগুণময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সাধুরূপ হংস দোষরূপ জলকে ছাড়িয়া গুণরূপ দুগ্ধ গ্রহণ করেন। এই সন্তবাক্য স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনে রূপায়িত দেখিয়াছি। আমাদের অসংখ্য দোষত্রুটি অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের অকিঞ্চিৎকর গুণটী তিনি দেখিতেন এবং তাহা শতগুণে বাড়াইবার নানা চেষ্টা করিতেন। আমরা একটু ভাল লিখিতে বা বলিতে বা পড়িতে পারিলে তিনি কি খুসী হইতেন! কি উৎসাহ দিতেন! আমাদের উন্নতিতে তিনি পিতার ন্যায় আনন্দিত হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যগণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, "আমার চেয়ে বড় হও।" স্বামী শুদ্ধানন্দের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা যেন তাঁহা অপেক্ষা বড় হইতে পারি। তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রেম, সাধুত্ব, কর্মকুশলতা ও সরলতা অসাধারণ ছিল।

ষোল

স্বামী সুবোধানন্দ

"শুদ্ধবুদ্ধিপ্রশান্তায় বৈরাগ্যজ্ঞানমূর্তয়ে।
সুবোধায় নমস্তভ্যং ত্রিলোকং তীর্থীকুর্বতে॥"

উত্তর কলিকাতার ঠন্‌ঠনিয়া পল্লীতে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির অবস্থিত। মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্তি শতাধিক বর্ষ পূর্বে কোন ব্রহ্মচারী সাধক কর্তৃক স্থাপিত। তখন কলিকাতা বৃক্ষলতাদি-শোভিত এবং শ্যামল সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল, এত অট্টালিকা-সঙ্কুল ও জনাকীর্ণ হয় নাই। জনাকীর্ণতা বাড়িতেই সাধক সাধনানুকূল বিজন স্থানে যাইবার উদ্দেশ্যে দেবীকে কাতর কণ্ঠে জানাইলেন, 'মা, আমি ত এই গোলমালে এখানে থাকিতে পারিব না। কিন্তু তোমাকেই বা কোথায় লইয়া যাই ?' দেবী সাধককে স্বপ্নে বলিলেন, 'আমি এখানেই থাকিব। আমার সেবাপূজার ভার শঙ্কর ঘোষ লইবে।' ভাগ্যবান্ শঙ্কর ঘোষও দেবীর প্রত্যাদেশ এবং অভয় লাভ করিলেন। তদবধি শঙ্কর ঘোষ এবং পরে তাঁহার বংশধরগণের নিকট সিদ্ধেশ্বরী কালী মাতা পূজা লইয়াছেন। মন্দিরের অদূরে শঙ্কর ঘোষের নামে যে গলি আছে তথায় তাঁহার বংশধরগণ এখনও বাস করেন। শঙ্কর ঘোষের পৌত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের একপুত্র সুবোধচন্দ্রই রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সুবোধানন্দ নামে পরিচিত।

সুবোধচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণদাস ঘোষ আনুষ্ঠানিক হিন্দু হইলেও ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার সহধর্মিনী নয়নতারা দেবী ভক্তিমতী ছিলেন। সংসারের কাজ সারিয়া যখনই তিনি সময় পাইতেন তখনই ভাগবতাদি ধর্মগ্রন্থ লইয়া পড়িতেন। ১২৭৪ সালের ২৩শে কার্তিক শুক্রবার উত্থান একাদশীর দিন (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর) সুবোধচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পূর্বে কলিকাতায় প্রবল ঝড় হইয়াছিল। সেইজন্য বাড়ীতে কেহ

কেহ তাঁহাকে 'ঝড়ো' বলিয়া ডাকিতেন। জননী নয়নতারার বিশ্বাস ছিল, তিনি এই শিশুটীকে দেবতার আশীর্ব্বাদরূপে পাইয়াছেন। সেইজন্য তিনি সন্তানকে 'দেবতা' বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবে সুবোধ মাতৃমুখে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প শুনিতেন। মাতার শিক্ষায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে দেবদেবীর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস জাগ্রত হয়। বাটীস্থ পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্তির পর পিতা তাঁহাকে আলবার্ট কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। স্কুলে তিনি ভাল ছাত্ররূপে সকলের প্রশংসাভাজন হন। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইতেন।

পিতা ধর্মপুস্তক কিনিয়া পড়িতেন। তাঁহার ছেলেরাও কখনো তাঁহার সহিত, কখনো বা একাকী ঐ সকল পুস্তক পড়িত। একবার তিনি সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' নামক একখানি পুস্তিকা কিনিয়া আনেন। সুবোধ এই পুস্তিকাখানি পড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। ইতিপূর্বেই তিনি পিতার নিকট ঠাকুরের কথা শুনিয়াছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সংবাদপত্রেও তাঁহার কথা পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর যখন ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন, তখন কৃষ্ণদাস তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। সুবোধ ঠাকুরকে দেখিবার ইচ্ছা পিতাকে জানাইলে তিনি পুত্রকে অফিসের ছুটির দিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু, সুবোধের আর বিলম্ব সহ্য হইল না। প্রতিবেশী সহপাঠী বন্ধু ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের সহিত বাড়ীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সুবোধ ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এক শুভ প্রত্যূষে যাত্রা করেন। সেদিন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের রথযাত্রা। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পথ জানিতেন না। ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিয়া দুই বন্ধু পথ ভুলিয়া আরিয়াদহে যাইয়া উপস্থিত হন। একজন পথিক শেষে তাঁহাদিগকে দক্ষিণেশ্বরের ঠিক পথ দেখাইয়া দেয়। তখন তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

কালীবাড়ীতে আসিয়া সুবোধ সঙ্গীকে প্রথমে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। ঠাকুর স্বীয় ঘরেই ছিলেন। ক্ষীরোদ ঘরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে

প্রণাম করিতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছ?' ক্ষীরোদ উত্তর দিলেন, 'কলিকাতা থেকে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ও বাবুটি অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, এগিয়ে কাছে এস না।' সুবোধ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর অন্তরঙ্গ বলিয়া বুঝিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া স্বীয় বিছানার উপর বসাইলেন। সুবোধ সসঙ্কোচে বলিলেন, 'রাস্তায় কত লোককে ছুঁয়েছি। এই কাপড়ে আর আপনার বিছানায় বস্‌ব না।' ঠাকুর তাঁহাকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'তুই এখানকার। কাপড়ে কি আসে যায়?' পরে তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং ভাবাবেশে নানা কথা বলিলেন। অনন্তর ঠাকুর সুবোধকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তুই শঙ্কর ঘোষের বাড়ীর, কেমন? যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তোদের সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে এবং তোদের বাড়ীতে কতবার গিয়েছি। তুই তখন জন্মাস্‌নি। তুই এখানে আস্‌বি জান্‌তুম। যাদের ধর্মলাভ হবে, মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন।' সুবোধ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি যদি এখানকারই, তবে আরও আগে আনিলেন না কেন?' তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, সময় না হলে হয় না।' এইরূপে কথাবার্তার পর ঠাকুর তাঁহাকে পুনরায় শনিবারে বা মঙ্গলবারে আসিতে বলেন। সুবোধ ঠাকুরের নিকট বিদায় লইয়া বন্ধুর সহিত বাটী ফিরিলেন।

প্রথম দর্শনে সুবোধ ঠাকুরের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, পরবর্তী শনিবারেই ক্ষীরোদকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হন। ঠাকুরের নিকট তখন বহুলোক সমবেত। ঠাকুর সুবোধকে দেখিবামাত্র অঙ্গুলি-নির্দেশে তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে বলিলেন। পরে ভক্তদিগকে একটু বসিতে বলিয়া স্বয়ং বাহিরে আসিয়া সুবোধকে নিকটস্থ শিবমন্দিরের সিঁড়িতে বসাইয়া দীক্ষা দিলেন। দীক্ষাকালে তিনি সুবোধের জিহ্বায় একটী মন্ত্র লিখিয়া দেন এবং তাঁহার বুকে ও মাথায় হাত বুলাইয়া ধ্যান করিতে বলেন। গুরুকৃপায় বালক শিষ্য গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া দেখিলেন, কত সৌম্যদর্শন দেবদেবীর মূর্তি, আবার কখনও ঠাকুরের দিব্য মূর্তি। ঠাকুরের স্পর্শে তাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তি

জাগ্রতা হইয়া তাঁহাকে প্রাগুক্ত অলৌকিক দর্শনের অধিকারী করিল। ক্রমে সব অনন্তে বিলীন হইয়া এক অসীম আনন্দ-সাগরে তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর সুবোধের মাথায় ও বুকে হাত বুলাইয়া দেওয়ায় তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খুব ভয় হয়েছিল কি?' সুবোধ উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' ঠাকুর অভয় দিয়া কহিলেন, 'তুই কি বাড়ীতে ধ্যানট্যান করতিস্? সুবোধ উত্তর দিলেন. 'বাড়ীতে মায়ের নিকট ঠাকুর-দেবতার বিষয় যা শুনেছিলুম, তাই একটু আধটু ভাবতুম।' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তাই তোর এত শীগ্‌গীর হোল।'

ঠাকুর এখন হইতে বালক শিষ্যের ধর্মজীবন গঠনে মনোযোগী হইলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই সুবোধকে একান্তে ধ্যানাদি উচ্চাঙ্গ সাধনের রহস্য শিক্ষা এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ দিতেন। তিনি সব সময় সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিতেন না। অপূর্ব অহৈতুক প্রেমে শিষ্যকে আপন করিয়া লইয়া কখনও খেলায়, কখনও গল্পচ্ছলে, কখনও বা দিব্য শক্তির বলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবন গড়িতে লাগিলেন। শিষ্যও গুরুকে এত ভালবাসিতেন যে, ঠাকুরের নিকট যাইতে সর্বদা তাঁহার ইচ্ছা হইত এবং প্রায়ই যাইতেনও! অনেক সময় তিনি দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ঘর্মাক্ত দেহে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং যাইয়াই ঠাকুরকে বাতাস করিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, ইহাতেই তাঁহার শ্রান্তি দূর হইত। একদিন তিনি দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতে ছিলেন। ইহাতে কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নিজ বিছানায় বসিয়া বাতাস করিতে বলিলেন। সুবোধ দ্বিধাবোধ করায় ঠাকুর তাঁহাকে জোর করিয়া নিজ বিছানায় বসাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সুবোধকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া পাখাটি হাতে লইয়া সন্তানতুল্য শিষ্যকে জননীর ন্যায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

আধ্যাত্মিকতার চরম উপলব্ধি সুবোধ দীক্ষাকালেই গুরুকৃপায় লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত অনুভূতির পুনঃ প্রাপ্তি এবং উহাতে অটল অবস্থিতির জন্য সুবোধ মনপ্রাণ নিয়োগ করিলেন। ঠাকুর তাঁহার এই সকল শিষ্যের সম্বন্ধে

বলিতেন, 'কেউ কেউ আগে ভগবান লাভ করে, পরে সাধন করে। যেমন লাউ কুমড়োর গাছে আগে ফল হয়, তার পরে ফুল।' সুবোধ পরবর্তী জীবনে কঠোর তপস্যাদি করিলেও স্বীয় গতি-মুক্তির ভার ঠাকুরকে দিয়া চিরতরে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে নিত্য ধ্যান করিতে উপদেশ দেন। উহাতে শিষ্য উত্তর দিলেন,'অত ধ্যান ট্যান করতে পারবো না। ওসব যদি করতে হবে ত অপরের কাছেই গেলে চল্‌ত। আপনার কাছে আসবার কি দরকার ছিল?' ঠাকুর শিষ্যের গুরুভক্তি ও নির্ভরতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি একদিন সুবোধকে বলিলেন, 'তোদের পাড়ায় মহেন্দ্র মাষ্টার আছে। সে এখানে আসে। তার কাছে যাবি, আর এখানেও আসবি।' সুবোধ তাহাতে উত্তর দিলেন, 'তার কাছে কি যাব? সে কি শেখাবে? সে শেখাবার লোক হলে কি সংসার করত? সে নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে দিত।' ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'ও রাখাল! শুনেছিস্‌ খোকা শালা কি বল্‌ছে। ওরে, সেকি আর নিজের বানানো কিছু বলবে? এখানকার কথাই সব বলবে।' ঠাকুরের নির্দেশে সুবোধ মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ সদালাপের পর মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে মিষ্টমুখ করাইয়া বিদায় দেন। ক্রমে ক্রমে সুবোধ গুরুসন্নিধানে শরৎ, শশী, নরেন প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের সহিত পরিচিত হন।

ঠাকুর সুবোধকে 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন। সুবোধ গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। রামকৃষ্ণ সংঘে এবং ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে তিনি খোকা মহারাজ নামে পরিচিত। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই সুবোধের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। সে কথায় তিনি পিতাকে স্পষ্ট জবাব দিয়া ছিলেন যে, তাঁহার বিবাহ করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। পিতা পুত্রের মনোভাব ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'বিয়ে করবে না কেন? ভাল করে পড়, খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে।' তখন সুবোধের বয়স ষোল সতের বৎসর মাত্র। পিতার কথা শুনিয়া পুত্র তদবধি লেখাপড়ায় স্বেচ্ছাকৃত অমনোযোগ আনিলেন, পাছে ভালরূপে পাশ হইলে পিতা বিবাহ দেন। তিনি যখন ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্যাসাগর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। দুই বৎসর নিরন্তর

ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভের ফলে তাঁহার মনে কোটীকল্পদুর্লভ নির্মল বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বিবাহ করিলেন না, এবং সংসারে আবদ্ধ হইলেন না।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুর যখন অন্তিম অসুখে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ছিলেন তখন একদিন সুবোধ তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি দক্ষিণেশ্বরে স্যাঁৎসেতে ঘরে থাকিতেন। তাই আপনার গলায় ব্যথা হয়েছে। আপনি চা খান, গলার ব্যথা সেরে যাবে।' ঠাকুর বালকবৎ সম্মত হইয়া বলিলেন, 'তবে চা-ই খাই। ও রাখাল, এ বলছে চা খেলে নাকি গলার ব্যথা সেরে যাবে।'

রাখাল উত্তর দিলেন, 'সে কি আপনার সহ্য হবে? সে যে গরম জিনিষ।' তখনই ঠাকুর বলিলেন, 'না বাবু, তা হলে উল্‌টে আবার গরম লেগে যাবে। ওরে, সইলো নি।' ঠাকুর যখন দেহরক্ষা করেন তখন সুবোধের বয়স উনিশ বৎসর। ঠাকুরের অভাবে শিষ্যগণের হৃদয়ে বৈরাগ্যের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গৃহ তাঁহাদের নিকট কারাগারতুল্য বোধ হইল। সুবোধ একদিন গোপনে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন অনন্তের পথে। যাইবার সময় তিনি যখন সিদ্ধেশ্বরী কালীকে প্রণাম করিলেন, তখন দেখিলেন, 'মা হাসিতেছেন এবং তাঁহার মাথায় অভয়কর স্থাপন করিয়া বলিতেছেন, 'ভয় কি? আমি সর্বদা তোর সঙ্গে সঙ্গে আছি। তোর কোন ভয় নেই।'

গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরিয়া সুবোধ হাঁটিতে লাগিলেন। যেখানে রাত্রি হইত সেইখানেই শুইয়া নিদ্রা যাইতেন। শয়নের পূর্বে একবার সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে স্মরণ করিয়া বলিতেন, 'মা, দেখো।' অযাচিত ভাবে যে আহার্য্য পাইতেন তাহাই খাইতেন। যেখানে জল দেখিতেন পিপাসিত হইলে তাহাই পান করিতেন। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে লালিতপালিত হইলেও তখন তাঁহার মনে হইত না, মশা কামড়াইবে বা সাপে কাটিবে। ভগবদ্দর্শন যখন হইল না, তখন শরীর রাখিয়া আর কি হইবে? এইরূপে ব্যাকুলভাবে চলিতে চলিতে তিনি কাশীধামে উপনীত হন। পথে লোকসঙ্গ বিষবৎ ত্যাগ করিতেন। কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'মা, বাপ, ভাই, বোন তিন কুলে আমার কেউ নাই।' কাশীতে যাইয়া গঙ্গাস্নান এবং বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়া প্রাণে

পরম শান্তি পাইলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন। ঠাকুরের তিরোভাবের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যখন বরাহনগরে আদি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সুবোধ চিরতরে গৃহত্যাগপূর্বক মঠে যোগদান করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী সুবোধানন্দ নামে পরিচিত হন।

১৮৮৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে স্বামী সুবোধানন্দ বরাহনগর মঠ হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া দ্বিতীয় বার কাশীধামে যান এবং তথায় উভয়ে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের বাগানে থাকিয়া কিছুকাল তপস্যা করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারা নর্মদাতীরে ওঁকারনাথ, কাথিয়াবাড়ে গির্ণার পাহাড় ও দ্বারকাধাম, বোম্বাই প্রদেশের নানা তীর্থ এবং রাজপুতানায় আবু পাহাড় দেখিয়া বৃন্দাবনে আসেন। ভক্তবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন বৃন্দাবনে ছিলেন। উভয়ে গোস্বামিজীর নিকট মাঝে মাঝে যাইতেন এবং গোস্বামিজীও কখনো কখনো তাঁহাদের নিকট আসিতেন। বৃন্দাবন হইতে স্বামী সুবোধানন্দ হিমালয়ের তীর্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শনে যান এবং পরে গিরিরাজের নানা নিভৃত স্থানে নিঃসঙ্গভাবে থাকিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় কালাতিপাত করেন। তৎপরে তিনি দাক্ষিণাত্যে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ দেশে তিনি মাদ্রাজীদের ভাষা কিছু কিছু মৌখিক শিখিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রদেশের অনেক উপকথা জানিতেন। মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর কথা, কাবেরীর গল্প এবং রামেশ্বর সেতুবন্ধ ও কন্যাকুমারীর উপাখ্যান শেষ জীবনেও তাঁহার মনে ছিল এবং সেই সকল তিনি ভক্তদের নিকট মাঝে মাঝে বলিতেন। বেলুড়মঠের ডায়েরীতে দেখা যায়, ১৮৯৮ খ্রীঃ ২রা মার্চ তিনি মাদ্রাজ হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ ১০ই আগষ্ট তিনি আলমোড়া হইতে একটী পত্রে লিখিতেছেন, 'পুনরায় কেদারনাথ ও বদরীকাশ্রম গিয়েছিলাম এবং পাহাড়ে আমাদের যে মঠ আছে তাহাও দেখিলাম।' ১৮৯৯ খ্রীঃ ২৫শে অক্টোবর কেদারনাথ ও বদরীনাথ দর্শনান্তে তিনি বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করেন। ১৯০০ খ্রীঃ তিনি

স্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত নবদ্বীপ দর্শনে যান। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার যে এগারজন গুরুভ্রাতাকে উহার আদি ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেন, স্বামী সুবোধানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। সম্ভবতঃ ঐ বৎসর সুবোধানন্দজী দার্জিলিং হইতে স্থানে স্থানে হাঁটিয়া কামাখ্যা দর্শনে গমন করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হন এবং জ্বর ছাড়িলে স্বাস্থ্য লাভার্থ পুনরায় আলমোড়া যান। তিনি অন্য যে কত স্থান ভ্রমণ করিয়া ছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

তীর্থ ভ্রমণ কালে তাঁহার জীবনে সে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল তন্মধ্যে দুইটি নিম্নে বিবৃত হইল। একবার ভাদ্র মাসে গয়াধামে ফল্গু নদী পার হইতেছিলেন। তখন নদীতে এক কোমর জল। একজন পার হইয়া আসিল। তিনিও পার হইতেছিলেন। তাঁর পিছনে যে লোকটী ছিল সে সাঁতার জানিত। নদীর জল দেখিতে দেখিতে অনেকটা বাড়িয়া গেল। স্বামী সুবোধানন্দ অগ্রসর হইয়া গলাজলে পড়িলেন। তৎপরে তিনি ডুবিয়া যাইতেছিলেন। সঙ্গের লোকটিকে তিনি বলিলেন, 'আমি সাঁতার জানি না, ডুবে যাচ্ছি। আর ত বাঁচব না, গুরুভাইগণকে আমার প্রণাম দিও।' পরে ঠাকুরকে স্মরণপূর্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, এই নাও আমার শেষ প্রণাম।' এই বলিয়া যেই মাত্র তিনি ডুবিয়া গেলেন তখন ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া স্রোতের অগাধ জলের মধ্য হইতে তাঁহাকে উপরে টানিয়া আনিলেন।

একবার স্বামী সুবোধানন্দ হরিদ্বারে তপস্যারত ছিলেন। তখন তাঁহার জ্বর হয়। সেই জ্বরে তিনি দুই মাস ধরিয়া ভুগেন। জ্বরে এত দুর্বল হইয়াছিলেন যে, পিপাসার্ত হইলে কমণ্ডলুটি তুলিয়া জলপানের শক্তি ছিল না। পিপাসার তাড়নায় তিনি অতিকষ্টে কমণ্ডলুটী তুলিতে যাইয়া পড়িয়া গেলেন! তখন ঠাকুরের উপর তাঁহার খুব অভিমান হইল। অভিমানভরে তিনি বলিলেন, 'তাইত, এত ভুগছি, এমন কেউ নেই যে, খোঁজখবর নেয়!' এই কথা ভাবিয়া নিদ্রিত হইলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর আসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছেন, আর বলিতেছেন, 'ও কি ভাবছিস্? দেখছিস্ ত আমি সর্বদা তোর কাছে কাছে আছি। কি চাস্, লোকজন, না টাকাপয়সা?' তখন স্বামী সুবোধানন্দ

বলিলেন, 'কিছুই চাই না। শরীর থাকলে তো রোগ হবেই। এইমাত্র চাই, যেন তোমাকে সদা স্মরণ করি।' পরদিন হরিদ্বারের এক জোয়ান সাধু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'বল, কি পথ্য করবে? আমি ভিক্ষা করে এনে দেব।' স্বামী সুবোধানন্দ উত্তর দিলেন, 'আমার কিছুরই দরকার নেই।' কিন্তু তবুও সাধুটি শুনিলেন না, তাঁহার জন্য কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। আর এক সাধুর কাছে ডাকে পঞ্চাশ টাকা আসিল। তিনি আসিয়া সুবোধানন্দজীকে বলিলেন, 'তুমি ভুগ্‌ছ, এখন তোমার টাকার দরকার। এ টাকা তুমিই নাও, তোমার সেবায় লাগুক।' কিন্তু, স্বামী সুবোধানন্দ টাকা লইলেন না।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন বিশিষ্ট পরিচালকরূপে স্বামী সুবোধানন্দ বিভিন্ন সময়ে নানা স্থানে সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি সেবাকার্য্যে প্রাণপাতী পরিশ্রম করেন। তখন কোঠার হইতে একটী অনাথ বালককে কলিকাতায় আনিয়া লেখাপড়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যেখানেই রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য দেখিতেন, সেখানেই ছুটিয়া যাইতেন। প্রায়ই বলিতেন, 'লোকের বিপদে আপদে একটু দেখা ভাল।.... মন করো না কাজে হেলা, সঙ্গী জোটে বা না জোটে একাই কর মেলা।' ১৯১৫।১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একাধিক বার ঠাকুরের আদেশ পাইয়া তিনি দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীসারদা দেবী বলিতেন, 'কেন খোকা মন্ত্র দেয় না? যে কয়দিন ঠাকুরের ছেলেরা আছে, যে পারে লুটে নিক্।' সুবোধানন্দজীর অনাড়ম্বর জীবন দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনি এত বড় মহাপুরুষ এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। কেহ দীক্ষা নিতে আসিলে বলিতেন, 'আমি কি জানি? আমি যে খোকা!' কেহ বিশেষ ভাবে ধরিয়া বসিলে হাসিমুখে বলিতেন, 'আচ্ছা, আর এক দিন হবে। আজ ভাব্‌ব।' পরে তিনি শত শত নরনারীকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কোন দীক্ষিতা শিষ্যা সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতি জানিতে চাহিলে বালকস্বভাব সুবোধানন্দ বলিলেন, 'মায়ি, আমি ও সব জানি না কিছুই! আমি যে খোকা। তবে আমি যা পেয়েছি ও জেনেছি, যা পেয়ে আনন্দে আছি তাই তোমায় দিয়েছি। ধ্যান, জপ, মনঃসংযম করলেই সব হবে।'

দীক্ষাদি দানের পূর্বে তিনি স্ত্রীভক্তদের সহিত কথাবার্তা বলা ত দূরের কথা, তাঁহাদিগকে দেখিলে অন্যদিক দিয়া চলিয়া যাইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'খোকা, মেয়েরা ঠাকুরের কথা শুনতে আসে। তুমি বলিবে। তোমরাও যদি এরূপ এড়িয়ে চল, তবে তাহারা কাহার নিকট যাইবে? ইহারা জগদম্বার মূর্তি, বড়দের সহিত মাতৃজ্ঞানে এবং ছোটদের সহিত কন্যাজ্ঞানে মিশিবে।' গুরুভ্রাতার নির্দেশে তখন হইতে স্বামী সুবোধানন্দ স্ত্রীভক্তদের নিকট ঠাকুরের কথা বলিতেন। গুরুরূপে তিনি পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে এবং বিহারে, ছোটনাগপুরে ও যুক্তপ্রদেশে ঠাকুরের বাণী প্রচার এবং সন্তপ্ত নরনারীর প্রাণে শান্তিবারি সেচন করেন। শত শত, সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার পূত সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছেন।

নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনা হইতে জানা যায়, তাঁহার মধ্যে অসীম গুরুশক্তি কি ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ঠাকুরের শক্তিই তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে প্রকটিত হইয়া লোককল্যাণ সাধনে নিযুক্ত ছিল, নিম্নোক্ত ঘটনাদ্বয় হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। রাঁচীস্থ তাঁহার একটী শিষ্যা তাঁহাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। গুরু শিষ্যার সেবাশুশ্রূষায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এক রাত্রিতে দেড়টার সময় উক্ত শিষ্যা রোগে ভুগিয়া দেহত্যাগ করেন। প্রতিবাসী মুখার্জী ও তাঁহার স্ত্রী স্বামী সুবোধানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁহারা উভয়ে সেই গভীর রাত্রে দেখিলেন, খোকা মহারাজ উপরোক্ত শিষ্যাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। জ্যোৎস্না রাত্রিতে নিজ গৃহে বসিয়া তাঁহারা ইহা স্পষ্ট দেখিয়া অবাক হইলেন। একই ঘটনা দুইজনে দেখায় সন্দেহের অবসর রহিল না। উভয়ে ভাবিতে লাগিলেন, 'গুরুদেব এ পাড়ায় এলে আমাদের বাসায় একটু বসিয়া যান। কিন্তু আজ এত রাত্রে উনি গেলেন কোথায়?' তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। পরে ঘটনাটি শুনিয়া স্বামী সুবোধানন্দ বলিলেন, 'কি জানি, এখন কিছু জানি না, পরে বলব।'

ইহার কিছুদিন পরে স্বামী সুবোধানন্দ কাশীধামে যান। সেখানে তিনি কঠিন আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হন। একরাত্রে হাতপার ব্যথার যন্ত্রণায় তিনি

অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন স্বর্গগতা শিষ্যার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন, 'সে ত আমার একটু অসুখ হলেই ছুটে আসত, কত সেবা করত।' ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি শিষ্যাকে স্নেহভরে ডাকিলেন, 'কই গো, তুমি কোথায়? এই যে এত ভুগ্‌ছি, কে দেখে?' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন এবং দেখিলেন, একটী আট নয় বছরের মেয়ে এসে হাজির। স্বামী সুবোধানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' আবির্ভূতা বালিকা বলিলেন, 'আমি অমুক।' স্বামী সুবোধানন্দ—কেন এসেছ? বালিকা—আপনি ডেকেছেন, তাই এসেছি। স্বামী সুবোধানন্দ—কোথায় ছিলে এবং কি করছিলে? বালিকা—কেন, ঠাকুরের সেবা করতে বলেছিলেন, তাঁরই সেবা করছিলাম এবং তাঁর কাছেই ছিলাম। গুরু হাওয়া করতে বলায় শিষ্যা হাত নাড়িয়া পাখা দিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। গুরুর গায়ে হাওয়া বেশ লাগিল। তখন গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যখন মারা যাও, তখন কি হয়েছিল বল দেখি? কে তোমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল?' ইহার উত্তরে শিষ্যা বলিলেন, 'কোন্ জন্মের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? এক ঘুমে এক দিনের কথাই মনে থাকে না। কত জন্ম হয়ে গেছে। কোন জন্মের কথা জিজ্ঞাসা করছেন?' রাঁচীতে শেষ জন্মের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করায় শিষ্যা বলিলেন, 'আমার যে রাত্রিতে দেহত্যাগ হয়, সে রাত্রিতে এত বেশী যন্ত্রণা হচ্ছিল যে, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলুম না। তবু, আপনাকে ভুলিনি। আপনাকে স্মরণ করছি, এমন সময়ে আপনি এসে হাত ধরে বললেন, 'চল, যাই।' আমি তখন আপনার সঙ্গে চলে গেলাম। অনেক দূর এসে আপনাকে খোকা মহারাজ ভেবে আপনার সঙ্গে কথা কইছি। তখন যিনি আমার হাত ধরে এনেছিলেন তিনি বললেন, 'আমি খোকা মহারাজ নই।' শিষ্যা—তবে আপনি কে? অপরিচিত পুরুষ বলিলেন, 'খোকা মহারাজ তোমায় যাকে পূজা করতে বলেছেন, আমি সেই।' শিষ্যা—তবে আপনাকে খোকা মহারাজের মতন দেখায় কেন? উত্তর আসিল, 'নইলে তুমি আমায় চিনতে পারবে কেন? তাই খোকার রূপ ধরে টেনে এনেছি।' তখন শিষ্যা প্রার্থনা করিলেন,

'যদি তাই হয়ে থাকে, তবে কৃপা করে আপনার স্বরূপটী একবার দেখান।' তখন ঠাকুর খোকা মহারাজের রূপ ছাড়িয়া নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন। সে রূপের কি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ! সে রূপ কি সুন্দর ও শান্তিময়, তাকি আর কথায় বলা যায়? এখনও ঠাকুরের কাছে ছিলুম। আপনি বারবার ডাকছেন। তাই তাঁকে বলে এলুম, তিনি বারবার ডাকছেন, একবার শুনে আসি।' তখন গুরু শিষ্যাকে বলিলেন, 'তবে যাও যেখানে ছিলে।' তখন শিষ্যাটি অন্তর্হিতা হইলেন।

আর একদিন স্বামী সুবোধানন্দ দেখিলেন, তিনি মরে গেছেন এবং দেহ ছেড়ে এসে অনেক দূরে বসে আছেন। তাঁর দেহটা পড়ে রয়েছে। বসিয়া বসিয়া তিনি শিষ্য-শিষ্যাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গুরু ভবসাগরের কর্ণধার। তাই তাঁহাকে দেহান্তে আশ্রিত-আশ্রিতাদের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। এদিকে গুরু দেখিলেন, অনতিদূরে ঠাকুর ও মা আছেন। তিনি বেশ বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদের কাছে যাইলেই তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন, এক হইয়া যাইবেন। সেইজন্য যাঁহারা তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন তাঁহাদের জন্য বসিয়া ছিলেন। পরে একে একে সব আসিলেন, আশ্রিত অনাশ্রিত অনেকে। সকলকে তিনি বলিলেন, 'ওখানে ঠাকুর ও মা রয়েছেন, প্রণাম কর গে!' তাঁহার নির্দেশ সকলেই পালন করিলেন। সর্বশেষে তাঁর এক প্রিয়া শিষ্যা আসিলেন। তাঁরই জন্য তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিষ্যাকে গুরু বলিলেন, 'তোর জন্য বসে আছি, তুই এত দেরী করলি কেন? সঙ্গে এক-দল জুটিয়ে এনেছিস; এরা কে?' শিষ্যা বলিলেন, 'এরা আমার শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সব আমার বাড়ীর লোক। আমিও অনেকক্ষণ এদের জন্য বসেছিলাম। এঁরা আস্‌তে দেরী করলেন।' গুরু বলিলেন, 'তা এসেচ, এসেচ। যাও, ঐ ঘরে ঠাকুর ও মা আছেন, তাঁদের প্রণাম করগে।' শিষ্যা বলিলেন, 'আপনিও চলুন।' গুরু—এখন যাব না। আমি গেলে আর আমায় দেখ্‌তে পাবি না। তোরা আগে যা। শিষ্যা—কেন? না, আপনিও চলুন। গুরু—আমি গেলে ঠাকুরের সঙ্গে মিশে যাব। শিষ্যার সনির্বন্ধ প্রার্থনায় গুরুকে যাইতে হইল।

গুরু যাইয়া যেই ঠাকুরের দুই পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন, অমনি তাঁহার সহিত মিশিয়া গেলেন। শিষ্যশিষ্যাগণ আসিয়া ঠাকুর ও মাকে প্রণামান্তে গুরুর সন্ধান করিলেন। গুরু তখন শুনিতে পাইলেন, 'ঠাকুর বলছেন, তাকে ত এখন আর দেখতে পাবে না।' শিষ্যশিষ্যাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'খোকা আমার সহিত মিশে গেছে।'* ঠাকুর এবং তাঁহার শিষ্যগণ অভিন্ন, একই বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখাসমূহবৎ।

জীবনসন্ধ্যায় স্বামী সুবোধানন্দকে দেখা যাইত, হয় 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' না হয় একখানা পুরাণ হাতে লইয়া বেলুড় মঠের উপরতলায় গঙ্গার ধারে বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া একমনে পড়িতেছেন। বলিতেন, এসব পড়লে বেশ একটা সদ্ভাব নিয়ে থাকা যায়। পূর্ববঙ্গে ধর্মপ্রচারার্থ স্বামী সুবোধানন্দ অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন। সময়ে সময়ে এমন হইত যে, একটু বেড়াইবার বা বিশ্রাম করিবার সময় পাইতেন না। বিলম্বিত স্নানাহার ও নিদ্রার জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। কোন কোন দিন সকাল হইতে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত সমাগত নরনারীদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন, কখনো বা ঠাকুর ও স্বামিজীর পুস্তক পাঠ ও আলোচনা হইত। তখন নরনারীগণ দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতেন। পূর্ববঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হন। তদবধি তাঁহার শরীর আর কখনো সুস্থ হয় নাই। মহাসমাধির দুই বৎসর পূর্বে তিনি একবার রক্তামাশয়-রোগে ভুগিয়াছিলেন। তখন তিনি বিহার প্রদেশান্তর্গত জামতাড়াস্থ রামকৃষ্ণ মঠে ছিলেন। একদিন তাঁহার অবস্থা এত খারাপ হয় যে, সকলে তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দেন। সেই সময়ে তিনি ঠাকুরের দর্শন পান এবং তাঁহারই আশীর্বাদে অচিরে আরোগ্য লাভ করেন।

শেষ জীবনে স্বামী সুবোধানন্দ বৎসরাধিক কাল ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ অসুখের সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি ভাল হয়ে উঠ, আরো অনেক দিন

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের প্রবন্ধে ঘটনাদ্বয় বিবৃত

থাক।' গুরুভ্রাতার প্রীতিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া স্বামী সুবোধানন্দ বলিলেন, "আমার কিন্তু আর থাকৃতে ইচ্ছা নাই। সেদিন ভোর রাত্রে স্বপন দেখেছিলুম, দেহটা ছেড়ে গেছি। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ, এদের সব দেখলুম। কেবল স্বামীজীকে দেখলুম না। ওঁরা বল্লেন, তিনি এখানে কোথায়? তিনি অনেক দূরে, তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে আছেন। 'তা হোক অনেক দূরে, আমি চল্লুম তাঁর কাছে।'—এই বলে রওনা হলুম। এর মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেখানে দেখলুম কেবল আনন্দ। আনন্দ নগরে তাঁরা বাস কচ্ছেন, মহানন্দে আছেন সব। সেখান থেকে আর আসতে ইচ্ছা হয় না। যত কষ্ট এখানে, এই পৃথিবীতে।" *

অন্তিম শয্যায় খোকা মহারাজ পূর্ববৎ আর ধর্মগ্রন্থ পড়িতে পারিতেন না, সেবকের নিকট 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' বা ভাগবত বা উপনিষদ্ পাঠ শুনিতেন। শ্রবণ কালে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া উত্তেজিত বাক্যে বলিতেন, 'দেখ ঘরবাড়ী লোকজন সব যেন ছাইয়ের গাদা চারি পাশে সাজান রয়েছে দেখছি। কোন কিছুরই উপর টান বোধ করছি না।' রোগযন্ত্রণার কথায় বলিতেন, 'যখন তাঁর চিন্তা করি তখন কোন কিছুই মনে থাকে না।' অন্তিমকালে কঙ্কালসার দেহেও তিনি ভক্তিবিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর মুখে এই আশিসবাণী উচ্চারিত হইল, 'আমার এই অন্তিম কালে প্রার্থনা করি, ঠাকুর আমাদের সংঘের সকলের কল্যাণ করুন, সকলের সদ্বুদ্ধি দিন।' †

অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা নীরবে প্রফুল্ল চিত্তে সহ্য করিয়া স্বামী সুবোধানন্দ ৬৫ বৎসর বয়সে ১৩৩৯ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার (১৯৩২ খ্রীঃ ২রা ডিসেম্বর) হাসিমুখে মহাসমাধিতে মগ্ন হন। দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

---

* সোনার গাঁ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত 'স্বামী সুবোধানন্দের পত্রাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত অনুভূতি বিবৃত।

† 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩৯ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্যের প্রবন্ধে মহাসমাধির বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সতের

স্বামী ত্রিগুণাতীত *

"কর্মিণাঞ্চ বরিষ্ঠায় জীবসেবাব্রতায় চ।
ত্রিগুণায় নমস্তভ্যং গুণত্রয়মুপেক্ষিণে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে পাঁচ জন সন্ন্যাসী শিষ্য আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে গিয়াছিলেন তন্মধ্যে একমাত্র স্বামী ত্রিগুণাতীত তথায় দেহরক্ষা করেন। রামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম যে সুবৃহৎ হিন্দু মন্দির সানফ্রান্সিস্কোতে নির্মিত হইয়াছে উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ত্রিগুণাতীত। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে তিনি সংঘের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠা করেন ১৩০৫ সালে। তাঁহার জীবনের শেষ বার বৎসর আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে অতিবাহিত হয়। আধুনিক হিন্দু ধর্মের অন্যতম অমর প্রচারক স্বামী ত্রিগুণাতীত।

পূর্বাশ্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতের নাম ছিল সারদাপ্রসন্ন মিত্র। জগন্মাতার প্রসাদে উক্ত পুত্র লাভ হওয়ায় পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র পুত্রের এই নামকরন করেন। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত পইহাটীর নওরা গ্রামে ১৮৬৫ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী (১২৭১ সাল, ১৮ই মাঘ) শুক্লা চতুর্থী সোমবার সারদার জন্ম হয়। গণকরা গণনা করিয়া বলিলেন, 'মহা শুভক্ষণে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী হবে। মহাপুরুষদেরই এইরূপ শুভক্ষণে জন্ম হয়।' তাঁহার মাতামহ নীলকমল সরকার পইহাটীর প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। শিবকৃষ্ণের চারি পুত্র, তন্মধ্যে সারদা দ্বিতীয়। শিবকৃষ্ণ অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং ধর্মগ্রন্থপাঠ ও পূজার্চনাদিতে দিন কাটাইতেন। সারদা পিতাকে

* ১৯২৮ খ্রীঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরাজি মাসিকের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বার সংখ্যায় প্রকাশিত The Work of Swami Trigunatita in the West by His western disciples শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে বিস্তৃত জীবনী আছে।

পূজার কার্যে নয় বৎসর বয়স হইতেই সাহায্য করিতেন। পিতা যখন স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন তখন সারদা পাশে বসিয়া নিবিষ্ট মনে শুনিতেন, শুনিতে শুনিতে তাঁহার অনেক শ্লোক মুখস্থ হইয়া যাইত। নয় হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে তিনি ১০৮টি দেবতার স্তোত্র ও প্রণাম-মন্ত্র মুখস্থ করেন এবং সুমিষ্ট স্বরে চণ্ডী ও গীতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন।

শিবকৃষ্ণ মিত্রের একটি বাসভবন ছিল কলিকাতায়। স্কুলে পড়িবার জন্য সারদা তথায় আসিয়া রহিলেন এবং শ্যামপুকুরে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে ভর্তি হইলেন। লেখাপড়ায় তিনি খুব ভাল ছিলেন এবং পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হইতেন। তাঁহার সরল স্বভাব ও সুমিষ্ট ব্যবহারে শিক্ষকগণ ও ছাত্রমণ্ডলী মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি ক্লাসে ছেলেদের নিকট রামকৃষ্ণদেবের কথা প্রায়ই বলিতেন। এই স্কুলে চারি বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পড়িয়া সারদা আঠার বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। শিক্ষকগণ আশা করিয়াছিলেন, সারদা পরীক্ষায় প্রথম হইবেন বা একটি বৃত্তি পাইবেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বিতীয় দিবসে জলখাবার সময় অনবধানতা হেতু তাঁহার সোনার ঘড়িটি চুরি যায়। মূল্যবান্ জিনিষটি হারাইয়া তিনি এত বিষণ্ণ হইলেন যে, পরীক্ষা ভাল করিয়া দিতে পারিলেন না। সেইজন্য আশানুরূপ ফলও হইল না এবং মাসাধিক দুঃখিত রহিলেন। মাষ্টার মহাশয় সারদাকে খুব স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে এতকাল বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট লইয়া যান। ঠাকুরের সান্ত্বনায় সারদার বিষাদ কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইল।

১৮৮৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে সারদা মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন। ইহার পূর্বেই তিনি ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পূত সঙ্গে তিনি ধর্মসাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। ধনীর পুত্র বলিয়া ঝাঁট দেওয়া, জল আনা প্রভৃতি কাজ বাড়ীতে তাঁহাকে কখনো করিতে হইত না। তাঁহার ধারণা ছিল, ঐ সকল ছোট কাজ চাকররাই করে। ঠাকুর তাঁহার এই অভিমান এইভাবে

অচিরে নষ্ট করিলেন। একবার সারদা গ্রীষ্মের দিনে ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলেন। সেদিন সেখানে তাঁহার পরিচিত ও অপরিচিত বহু ব্যক্তি উপস্থিত। ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে আদেশ করিলেন, 'সারদা, একটু জল এনে আমার পা ধুয়ে দে।' ঠাকুরের এই কথায় তাঁহার অভিমানে এত আঘাত লাগিল যে, লজ্জায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ঠাকুর পুনরায় আদেশ করায় তিনি বাধ্য হইয়া জল আনিলেন। এই সামান্য কর্মে তাঁহার হৃদয় হইতে অভিমান চিরতরে অন্তর্হিত হইল এবং তিনি সেবাধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

পুত্রের ধর্মনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য দেখিয়া পিতা গোপনে তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। বাড়ী যাইয়া মাতার নিকট এই সংবাদ পাইয়া সারদা স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু বিবাহের ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি ঘণ্টাখানেক এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় ভাবিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন, পুরীধামে পলায়নই আপাততঃ শ্রেয়ঃ। পিতামাতাকে একখানি পত্র লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া ১৮৮৬ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারী সাড়ে এগারটার সময় তিনি গোপনে গৃহত্যাগপূর্বক ঠাকুরের কাছে গেলেন। ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে অন্তিম অসুখে শয্যাশায়ী। গুরুর শুভাশীর্বাদ গ্রহণান্তে সারদা পদব্রজে পুরী যাত্রা করিলেন। তিনি যে কাহাকেও না বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, ইহার কিছুই ঠাকুরকে জানাইলেন না। পুত্রের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে মাতাপিতা চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন এবং অবশেষে কাশীপুরে ঠাকুরের নিকট যাইয়া পুত্রের সংবাদ পাইলেন। কিছুদিন পর পাঁশকুড়া হইতে সারদার চিঠি আসিল। পাঁশকুড়া হইতে তিনি ভদ্রক হইয়া পুরীর দিকে চলিতে লাগিলেন এবং ১৮৮৬ খ্রীঃ ২৭শে জানুয়ারী বুধবার পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। পুরী যাইবার পথে তাঁহাকে খুব কষ্ট পাইতে হয়। তাঁহার দীর্ঘপথ চলিবার অভ্যাস ছিল না, এতদূর হাঁটিয়া যাইতে তিনি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইলেন। কোন কোন দিন তাঁহাকে অনাহারে কাটাইতে হইত। একদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন আহার জুটিল না। সন্ধ্যার পূর্বে নিশ্চয়ই কোন লোকালয় পাইবেন, এই আশায় চলিতেছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় একটি ছোট রাস্তায় চলিতে চলিতে এক নিবিড় জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলেন।

নির্জন অরণ্যে আহার বা আশ্রয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। ঠাকুরকে স্মরণ এবং ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিতে করিতে নিরুপায় সারদা পথশ্রমে ও অনাহারে ক্লান্তিহেতু একটী বড় গাছে উঠিয়া মোটা ডালের উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে তিনি শুনিলেন, কে তাঁকে ডাকিতেছে। তিনি শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে'? উত্তর আসিল, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর।' অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, 'তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, এই বাতাসা খাও।' এই বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল এবং একটু পরে এক ঘটি জল আনিয়া তাঁহাকে দিয়া অদৃশ্য হইল। নির্জন নিবিড় অরণ্যে লোকটি কোথা হইতে আসিল, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি জল ও বাতাসা খাইয়া গাছের ডালে ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং প্রাতে উঠিয়া লোকটির সন্ধান করিয়া কোন সংবাদ পাইলেন না। ঠাকুর অপরিচিত ব্যক্তির বেশে আসিয়া বিপদে শিষ্যকে রক্ষা করিলেন।

পিতামাতা পুত্রের সন্ধানে পুরী গেলেন এবং তথায় পুত্রকে দেখিতে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সারদা পিতামাতার সঙ্গে পুরীধামে কয়েকদিন মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আনন্দে কাটাইলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিলেন। তখন কলেজের পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকী। সারদা দিবারাত্রি পড়িয়া এফ. এ. পরীক্ষা দিলেন এবং আশাতীতভাবে পাশ করিলেন। এখন হইতে তিনি ঠাকুরের নিকট ঘন ঘন যাইতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরলাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয় কনিষ্ঠের মনকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এক বিরাট বশীকরণ-যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। দ্বাদশ ব্রাহ্মণের দ্বারা একমাস বার দিন এই যজ্ঞ চলিল। যজ্ঞ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণ সুস্পষ্ট মন্তব্য করিলেন, 'সারদার মন আর সংসারে ফিরিবে না। তিনি গৃহত্যাগপূর্বক ভগবান্ লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন।' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতাশ হইয়া বৃথা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিলেন এবং এই জন্য প্রায় চার হাজারের অধিক টাকা ব্যয়িত হইল।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ১৮৮৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ঠাকুরের নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন শিষ্য আঁটপুরে বাবুরাম ঘোষের বাটীতে যান। সারদাও

তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। গুরুভ্রাতাগণ গঙ্গাধরকে শিব এবং সারদাকে পার্বতী সাজাইয়া হরপার্বতী উৎসব করেন। রাত্রে ধুনি জ্বালিয়া সকলে মণ্ডলাকারে বসিয়া ব্রতগ্রহণ করিলেন যে, তাঁহারা আর গৃহে ফিরিবেন না। কলিকাতায় ফিরিয়া বরাহনগরস্থ রামকৃষ্ণ মঠে সকলে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। সারদার নাম হইল ত্রিগুণাতীতানন্দ। ঠাকুরের অদর্শনে সারদা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া তাঁহার প্রায়োপবেশন করিবার ইচ্ছা হইত। স্বামীজী ১৮৮৭ খ্রীঃ মে মাসে কলিকাতা গিয়াছিলেন। সেইদিন স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুদ্দেশ হইলেন। কয়েকদিন পরে তিনি স্বামীজীকে এই চিঠি লিখিয়াছিলেন, "আমি হেঁটে বৃন্দাবনে চল্‌লাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। আগে মাবাপ ও বাড়ীর সকলের স্বপ্ন দেখতাম। তারপর মায়ার মূর্তি দেখলাম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি, বাড়ী ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, 'তোর বাড়ীর ওরা সব করতে পারে। ওদের বিশ্বাস করিস্ নে'।" বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে ত্রিগুণাতীত স্বামী বরাহনগর মঠ ছাড়িবার পর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একরাত্রি কাটাইলেন। সঙ্গে শ্রীগুরুর একখানি ছবি ছিল। কিন্তু কোন্নগর পর্য্যন্ত যাইয়া রেলভাড়ার অভাবে তাঁহাকে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিতে হইল।

বরাহনগর মঠে স্বামী ত্রিগুণাতীতের জীবনে এই দুইটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তিনি ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। অপরের কাছে ভূতের গল্প শুনিয়া তাঁহার ভূত দেখিবার ইচ্ছা হইল। তাঁহার সংকল্প ছিল যেমন দৃঢ়, সাহস ছিল তেমনি অসীম। দ্বিপ্রহর রাত্রতে একটী ভগ্ন পুরাণ বাড়ীতে ভূত দেখা যায়, ইহা শুনিয়া তিনি ভূত দেখিবার সংকল্প করিলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নির্ভয়ে ভূতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্য রাত্রির একটু পরে দেখিলেন, ঘরের কোণ হইতে একটী ক্ষীণালোক আসিতেছে। ক্রমশঃ আলোকটী বৃহত্তর ও তীব্রতর হইয়া একটী ভীষণ চক্ষুতে পরিণত হইল। চক্ষুটী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার শিরাসমূহের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থায় ঠাকুরকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, যে কাজে মৃত্যু নিশ্চিত সে কাজ বোকার মত কেন করতে যাও? আমার প্রতি মন রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।" এই বলিয়া শিষ্যবৎসল গুরু স্বামী ত্রিগুণাতীতকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। *

বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তান্ত্রিক সাধনার ইচ্ছা ত্রিগুণাতীত স্বামীর হৃদয়ে বলবতী হয়। শ্মশানে মহানিশায় এই সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ অবধারিত। পাছে গুরুভ্রাতাগণ নিষেধ করেন এইজন্য তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক শুভ নিশীথে শ্মশানে যাইবার সংকল্প করিলেন। এক রাত্রে যখন সকলে আহারান্তে নিদ্রামগ্ন তখন শয্যা ছাড়িয়া তিনি ধীর পদে মঠের বাহিরে যাইতেছেন। গভীর রাত্রিতে চারিদিক নিস্তব্ধ, গাছের পাতাটীও নিশ্চল। এমন সময় গম্ভীর শব্দ শুনিলেন, 'কোথা যাচ্ছ?' শব্দ শুনিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে স্বামীজি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান! স্বামী ত্রিগুণাতীত নির্বাক্। তখন স্বামীজী বলিলেন, 'স্বপ্নে ঠাকুরকে দেখ্‌লাম। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ঠাকুর আমায় সব বল্লেন। তিনি তোমাকে ওখানে যেতে মানা করলেন। আর বল্লেন যে, তিনি সব সাধনা আমাদের জন্য করে গেছেন এবং শুধু তাতে মন রাখলেই আমাদের যথেষ্ট হবে।' স্বামী ত্রিগুণাতীতের আর শ্মশানে যাওয়া হইল না। বরাহনগর মঠ হইতে তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিতা ও দাদা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ১৮৮৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে তাঁহার পিতা কলিকাতাস্থ ভবনে দেহত্যাগ করেন।

তীর্থভ্রমণের প্রবল আগ্রহে স্বামী ত্রিগুণাতীত বরাহনগর মঠ হইতে ১৮৯১ খ্রীঃ বহির্গত হইয়া বর্ষান্তে এটোয়াতে গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হন। উভয়ে এটোয়া হইতে মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তখন বৃন্দাবন রাসোৎসবে পুলকিত। মন্দিরাদি দর্শনান্তে তাঁহারা গোবৰ্দ্ধন গিরি প্রদক্ষিণ

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪০ শ্রাবণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত সংখ্যা-ছয়টিতে স্বামী বামদেবানন্দের প্রবন্ধাবলীতে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

করিলেন। বৃন্দাবন হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত একাকী ভরতপুর এবং জয়পুর হইয়া মদনমোহন জিউ দর্শনোদ্দেশ্যে কেরোনীতে যান এবং পুষ্কর তীর্থে পুনরায় গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দজীর সহিত মিলিত হন। পুষ্করে সাবিত্রী পাহাড় এবং ব্রহ্মার মন্দিরাদি দর্শনান্তে উভয়ে আজমীরে ফিরিয়া আসেন। তত্রস্থ দ্রষ্টব্যসমূহ একদিনের মধ্যে দেখিয়া শেষ করিবার জন্য উভয়ে সারাদিন খুব ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কঠোর ভ্রমণশ্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতের জ্বর হইল। সেই জ্বরে তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ ভুগিলেন। অন্নপথ্য করিবার পর তিনি চিতোর দেখিতে গেলেন এবং রাজপুতানা ও বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থান ঘুরিয়া দ্বারকাধামে উপস্থিত হন। দ্বারকা হইতে জাহাজে করিয়া পোরবন্দরে যান এবং তথায় হাটকেশ্বর শিব মন্দিরে অবস্থান করেন। তখন স্বামী বিবেকানন্দ পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরামের অতিথি ছিলেন। রাজাও স্বামীজীকে গুরুবৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত দেওয়ানের বাড়ীতে যাইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীজীকে দেখিতে পান। অনেক দিন পরে প্রিয় দলপতিকে পাইয়া তিনি পরমানন্দিত হইলেন এবং অনেক সময় গুরুভ্রাতার সঙ্গে থাকিয়া গভীর রাত্রে শিবমন্দিরে ফিরিলেন। পরদিন দুপুরে তিনি অন্যত্র যাইবার জন্য পুঁটলি বাঁধিতে ছিলেন, এমন সময় স্বামীজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী গুরুভ্রাতার পুঁটলী নিজ হাতে করিয়া তাঁহাকে দেওয়ানের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তথায় দুই তিন দিন থাকিবার পর স্বামীজী গুরুভ্রাতাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তথা হইতে অন্যান্য নানা স্থান ঘুরিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

একবার স্বামী ত্রিগুণাতীত তীর্থভ্রমণ হইতে ফিরিবার সময় বৈদ্যবাটীতে একটী হোটেলে খাইতে যান। কয়েকদিন পেট ভরিয়া তাঁহার খাওয়া হয় নাই। তিনি খাইতে বসিয়া ডালভাত বার বার চাহিয়া লইয়া তিন চারি জনের আহার খাইয়া ফেলিলেন। হোটেলের যাত্রীরা এবং পাচক প্রভৃতি তাঁহার খাওয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শেষে হোটেলওয়ালা করযোড়ে তাঁহাকে

বলিলেন, 'বাবা, আপনাকে পয়সা দিতে হবে না, আপনি উঠুন। আপনাকে আর খাওয়াতে পারবো না।' পরবর্ত্তী জীবনে ঘটনাটী বিবৃত করিয়া তিনি খুব আমোদিত হইতেন। তিনি যেমন অধিক আহার করিতে পারিতেন তেমনি দীর্ঘ উপবাসও দিতেন। বরাহনগর মঠে থাকিবার সময় একটি মাত্র কলা রোজ খাইয়া বহুদিন তিনি কাটাইয়াছেন। তীর্থভ্রমণ বা সেবাকার্য্যের সময় তিনি ভিক্ষালব্ধ সামান্য আহারে সন্তুষ্ট থাকিতেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা তখনও পূর্ণ হয় নাই। ১৮৯৫ খ্রীঃ আলমবাজার মঠ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি তিব্বতের দুর্গম তীর্থ কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনে যান। তীর্থভ্রমণকালে তিনি বহুবার মৃত্যুর কবল হইতে ঠাকুরের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন। একবার হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে একটী বিস্তৃত নদী পার হইতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। নদীর উপর একটী পুরাতন বাঁধ, তাহাও মাঝে মাঝে ভাঙ্গা। চন্দ্রালোকের সাহায্যে তিনি ভাঙ্গা বাঁধের উপর লাফ দিয়া চলিতেছেন। যখন তিনি নদীর মধ্যস্থলে আসিলেন তখন কালমেঘে চন্দ্র আবৃত হইল। রাত্রির প্রগাঢ় অন্ধকারে তিনি চারিদিকে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এক পা অগ্রসর হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্পষ্টভাবে শুনিলেন, কে তাঁহাকে বলিতেছেন, 'আমাকে অনুসরণ কর।' বিচারের সময় বা শক্তি তাঁহার তখন ছিল না। যন্ত্রবৎ তিনি অশরীরী বাণীর নির্দেশে অগ্রসর হইয়া অপর পারে নিরাপদে পৌঁছিলেন। সেই সময় চন্দ্র মেঘমুক্ত হওয়ায় জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী প্লাবিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, নদীতীরে তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অন্তরে বুঝিলেন, ঠাকুরই তাঁহাকে সেবার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন।

হিমালয় ভ্রমণকালে তিনি একদা কোন গ্রামে সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হন। তথায় একটী পুরাতন জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরটি প্রাঙ্গণযুক্ত ও প্রাকার-বেষ্টিত; গ্রামবাসীদের নিকট শুনিলেন, সূর্যাস্তের পর উক্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হয়। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বলিলেন, 'রাত্রিতে পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মশা

মন্দিরে আসে এবং তথায় যে থাকে তাহাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। অনেক তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারী মন্দিরে রাত্রিবাস করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।' মশার কামড়ে মানুষ মরে, একথা স্বামী ত্রিগুণাতীতের বিশ্বাসযোগ্য হইল না। মন্দিরে রাত্রিযাপন স্থির করিয়া সন্ধ্যাকালে দ্বার বন্ধ হইবার পূর্বে তন্মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পরে কাল মেঘের মত মশার ঝাঁক আসিয়া চারিদিক হইতে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। তিনি মশার দংশনে অস্থির হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন এবং কম্বল মুড়ি দিয়া প্রাঙ্গণের চারিদিকে গড়াগড়ি দিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি ঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে প্রভাতের অপেক্ষায় রহিলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় প্রত্যেকটী মিনিট এক একটী ঘণ্টার মত দীর্ঘ বোধ হইল। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিল। সকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার আশা আদৌ ছিল না। ঠাকুরের কৃপায় কোন রকমে রাত্রি কাটিল। প্রাতে মশার পাল কোথায় উড়িয়া গেল। তখন গ্রামবাসীরা মন্দিরের দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া বিস্মিত হইল। যাঁহাকে ভগবান্ রক্ষা করেন, মৃত্যুও তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না।

আর একবার রাত্রিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত রাস্তার একপাশে গাত্রে কম্বল জড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। পার্শ্ববর্তী ষ্টেশন হইতে একটী দারোয়ান লণ্ঠন হাতে করিয়া বাড়ী যাইতেছিল। সে একটী সাধুকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সাদরে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল এবং রাত্রিতে তাঁহাকে আহার ও আশ্রয় দিল। ঈশ্বরের উপর যিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন মহাবিপদকালেও ঈশ্বর তাঁহার যোগক্ষেম বহন করেন। মানস সরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ দর্শন করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের ভক্ত ডাঃ শশীভূষণ ঘোষের বাড়ীতে শ্যামবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনী 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' নামক ইংরাজী দৈনিকে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শশীভূষণ বাবুর বাড়ীতে তিনি পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অনবরত চেয়ারে বসিয়া থাকার জন্য তিনি এই সময়ে সাংঘাতিক ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হন। বরাহনগরের

প্রসিদ্ধ ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে ক্লোরোফর্ম করিতে দেন নাই। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া ছয় ইঞ্চি স্থান কাটা হইল। কিন্তু তিনি ধীর স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন অন্য কাহারও শরীরে অস্ত্রোপচার চলিতেছে।

সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার বিছানার চারিদিকে রাশি রাশি পুস্তক সাজান থাকিত। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি পুস্তকপাঠ ও প্রবন্ধ রচনাদিতে ব্যস্ত থাকিতেন। এই সময় তিনি কলিকাতার নানা স্থানে গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন এবং সহরের মধ্যে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে তিনটি কেন্দ্র খুলিয়া যুবকদিগের ধর্মজীবন গঠনে ব্রতী হন। সুস্থ হইবার পর ডাঃ শশী বাবুর বাড়ী হইতে তিনি আলমবাজার মঠে যাইয়া থাকেন। উক্ত মঠে নীচের তলায় যে ঘরে থাকিতেন, তাহা ধর্মগ্রন্থাদিতে সজ্জিত থাকিত। এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে গর্ভধারিণীকে দেখিবার জন্য বাড়ী যাইতেন। একবার তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীকে সারদাদেবীর নিকট লইয়া যান। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার জননী স্বর্গগতা হন। সারদাদেবীর প্রতি ত্রিগুণাতীতজীর অপার ভক্তি বিশ্বাস ছিল। তাঁহাকে তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। একবার সারদাদেবী তাঁহাকে বাজার হইতে ঝাল লঙ্কা কিনিয়া আনিতে বলেন। মাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি বাজারের সবগুলি দোকান ঘুরিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী ঝাল লঙ্কা কিনিয়া আনেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ দিনাজপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত দুর্গত নরনারীগণের সেবাকার্যে ব্রতী হন। ক্ষুধিতের বেদনা অনুভব করিবার জন্য তিনি নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন এবং বাড়ী বাড়ী যাইয়া চাল ও কাপড় বিতরণ করিতেন। এই সেবাকার্যে তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করেন। কখনো বহুদিন অনাহারে, কখনো বা সামান্য আহারে তিনি দিন কাটাইতেন। তাঁহার সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা তদানীন্তন সংবাদপত্রসমূহে বাহির হইয়াছিল। বেলুড়ের এক বাগানবাটীতে যখন রামকৃষ্ণ মঠ আলমবাজার হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তখন স্বামিজী স্বামী ত্রিগুণাতীতকে একটী পাক্ষিক পত্রিকা

পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। স্বামীজী নিজের এক হাজার টাকা দিলেন এবং ঠাকুরের গৃহী ভক্ত হরমোহন মিত্র আর এক হাজার টাকা ধার দেন। এই টাকা লইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত উক্ত কাজ আরম্ভ করিলেন। শ্যামবাজারে রামচন্দ্র মৈত্রের গলিতে একটি ভাড়াবাড়ীতে কার্যালয় স্থাপিত হইল। ঠাকুরের ছবি পূজান্তে আরব্ধ কার্যের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া ছাপাখানা খোলা হইল। একটি প্রেস কিনিয়া ছাপার কাজ চলিল। স্বামীজী পত্রিকার নাম রাখিলেন 'উদ্বোধন'। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

স্বামী ত্রিগুণাতীত পত্রিকা পরিচালনা ও প্রচারের জন্য প্রাণপণ করিলেন। স্বামীজীর আদেশ ছিল, পত্রিকার জন্য প্রদত্ত টাকা অন্য কার্যে ব্যয়িত হইবে না। সেইজন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত ভক্তদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন এবং স্বামীজীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। প্রথমে পয়সার অভাবে কর্মচারী রাখা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত পত্রিকা-সংক্রান্ত সকল কার্য একাকী করিতেন। কখনো পায়ে হাঁটিয়া পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত চলিতেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দেখিয়া স্বামীজী গুরুভ্রাতার অশেষ প্রশংসা করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বাড়ী বাড়ী যাইয়া প্রবন্ধ ও গ্রাহক সংগ্রহ এবং পত্রিকা বিতরণাদি কার্য নিজেই করিতে হইত। ভীষণ জ্বর বা অন্য অসুখ অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি কাজ করিতেন। তিনি পত্রিকাটীকে সমৃদ্ধ ও স্থায়ী করিতে চেষ্টা করেন। পরে কিঞ্চিৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা হইলে ছাপাখানার কর্মচারী নিযুক্ত হয়। একবার এক কর্মচারীর কলেরা হয়। তিনি স্বয়ং দরিদ্র কর্মচারীকে ঔষধপথ্যাদি দিয়া এবং সেবা শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিলেন। এইভাবে দীর্ঘ চারি বৎসর প্রাণপাত করিয়া তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯০২ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ সান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির কার্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক ভারতে ফিরিয়া আসিতে চাহেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্থানে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে যাইতে আদেশ দেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতও আমেরিকা যাত্রার সকল আয়োজন করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ সেই বৎসর ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর দেহত্যাগ হওয়ায় তাঁহার আমেরিকা যাত্রা বিলম্বিত হয়।

১৯০২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি কলিকাতা হইতে জাহাজে উঠেন এবং সিংহল, জাপান প্রভৃতি দেশ দেখিয়া ১৯০২ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারী সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হন। উক্ত সহরের বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি সমিতির সভাপতি ডাঃ এম. এইচ. লোগানের বাটিতে সপ্তাহ-কাল থাকিয়া মিঃ সি. এফ. পিটারসনের বাড়ীতে যান। তথায় তিনি নিয়মিত ভাবে বেদান্তব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি আরম্ভ করেন। শ্রোতার সংখ্যা শীঘ্রই এত বাড়িয়া উঠিল যে, পিটারসনের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হইল না। সেইজন্য ১৯০৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে স্টানার স্ট্রিটে একটি বড় বাড়ী ভাড়া করা হয়। নূতন বাড়ীতে প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে গীতা ও উপনিষদের ব্যাখ্যা এবং প্রতি রবিবার সাধারণ বক্তৃতা হইত। সভাতে স্ত্রীভক্তগণ ধর্মসঙ্গীত গাহিতেন।

কিছুদিন পরে সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহর হইতে ৪২৫ মাইল দূরবর্তী লস্ এঞ্জেলেস্ নগরে ১৯০১ খ্রীঃ স্বামী ত্রিগুণাতীত একটী বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। সেই কার্য চালাইবার জন্য উক্ত সালে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সচ্চিদানন্দকে তিনি লইয়া যান। কিন্তু স্বামী সচ্চিদানন্দ অসুস্থতাহেতু প্রায় এক বৎসরের পরে আমেরিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন। ১৯০৪ খৃঃ স্বামী ত্রিগুণাতীত বেদান্ত সমিতির স্থায়ী গৃহ নির্মাণের সঙ্কল্প করেন। সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে ওয়েবষ্টার স্ট্রীটের মোড়ে এক খণ্ড জমি ক্রীত এবং উক্ত ভূমিতে ১৯০৫ খৃঃ ২৫শে আগষ্ট মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ধাতুনির্মিত পাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর এবং অন্যান্য ছবি রাখিয়া ভিত্তির মধ্যে প্রোথিত করা হয়। দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আবশ্যকীয় অর্থ সংগৃহীত এবং গৃহ নির্মিত হইল। ১৯০৬ খৃঃ ৭ই জানুয়ারী মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ১৫ই জানুয়ারী রবিবার বক্তৃতাদি আরম্ভ হয়। গৃহটী ত্রিতল। ইহার ছাদ হইতে একদিকে সান্‌ফ্রান্সিস্কো উপসাগর এবং অন্যদিকে ওক্‌ল্যাণ্ড ও বার্কেলে শহরদ্বয় দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত উত্তর-পশ্চিম দিকে গোল্ডেন গেট (স্বর্ণ দ্বার) এর দৃশ্য অতিশয় মনোরম। তিনতলায় শিব মন্দির। তথায় পূজার যাবতীয় উপকরণ আছে এবং ঠাকুরের নিত্য পূজা হয়। ইহাই সমগ্র

পাশ্চাত্য জগতে সর্বপ্রথম হিন্দু মন্দির। মন্দিরের জমি ও গৃহ নির্মাণের জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। ইহাই স্বামী ত্রিগুণাতীতের অক্ষয় কীর্তি। মন্দিরে সাপ্তাহিক শাস্ত্রব্যাখ্যায় ও বক্তৃতাদিতে লোক সমাগম বাড়িতে লাগিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর স্বামী ত্রিগুণাতীত ভক্তদের বলিয়াছিলেন, 'এই মন্দিরে বাস করিবার আনন্দ আমি বেশী দিন ভোগ করিতে পারিব না। পরে অন্যান্য সাধুগণ আসিয়া ইহাতে বাস করিবেন। বিশ্বাস কর, যদি এই মন্দির নির্মাণে আমার বিন্দুমাত্র স্বার্থ থাকে, ইহার ধ্বংস হইবে। কিন্তু যদি ইহা ঠাকুরের কাজ হয়, ইহা চিরস্থায়ী হইবে।' ঠাকুরের ইচ্ছার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত হিন্দু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন স্থানীয় ভক্তগণের জীবনগঠনের জন্য মন্দিরের একাংশে একটী মঠ খোলা হইল। মঠে আট দশটি ভক্ত বাস করিতে লাগিলেন। ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। প্রাতে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে বসিয়া সঙ্গীত ও স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন। মন্দির হইতে অর্ধ মাইল দূরে সান্‌ফ্রান্সিস্কোর সমুদ্রতীর। কোন কোন দিন প্রাতে তিনি ছাত্রদের লইয়া সমুদ্রতীরে যাইতেন এবং সমস্বরে সঙ্গীত ও ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেন। তখন সমুদ্রতীর জনশূন্য, মাত্র ধীবরগণ তাহাদের নৌকা লইয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়াছে। কোন কোন সমুদ্রগামী জাহাজ হয়ত তখন বন্দর ছাড়িবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। সাধু ও ভক্তগণের সুমধুর সঙ্গীত লহরী সমুদ্র-তরঙ্গের সহিত নৃত্য করিতে করিতে দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত।

স্বামী ত্রিগুণাতীত মঠবাসিগণের জন্য নিজে রান্না করিতেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, চিত্তশুদ্ধির জন্য বিশুদ্ধ আহার্য্য ভক্ষণ আবশ্যক। তিনি নিম্নোক্ত প্রাণপ্রদ বাক্যগুলি কাগজে ছাপাইয়া মঠের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিতেন এবং প্রত্যেককে সেগুলি জীবনে পরিণত করিতে উপদেশ দিতেন। 'তপস্বীর মত জীবন যাপন কর, কিন্তু অশ্বের মত কাজ কর।' 'কর্তব্যটি এখনই কর।' 'কর বা মর। কিন্তু তুমি মরিবে না।' ইত্যাদি। মঠবাসিগণকে অমৃতের

অধিকারী করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না। যে সকল ভক্তের ধর্মভাব গভীর ও আন্তরিক ছিল, তাহাদের তিনি বলিতেন, 'আমি কিছু মনে করিব না, যদি আমি তোমাদের ধর্মজীবন গঠনের জন্য তোমাদের দেহের হাড়গুলি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলি। কিন্তু যদি আমি তোমাদিগকে অমৃতসাগরের দিকে টানিয়া লইয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারি, আমার কর্তব্য সমাপ্ত হইবে।' স্থানীয় ভক্তগণ বলিতেন, 'স্বামী ত্রিগুণাতীত পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহাকে সর্বদা জগদম্বার ভাবে আবিষ্ট দেখা যাইত। কর্তব্যসাধনে তিনি বজ্রবৎ কঠোর হইলেও স্নেহ ও সহানুভূতিতে কুসুমবৎ কোমল ছিলেন।' ১৯০৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহকারীরূপে প্রেরিত হইলেন।

মঠে রান্নাঘরের পাশে কয়েকটি দড়িতে দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন আকারের বড় বড় কৃত্রিম মাকড়সা ঝুলান থাকিত। মঠবাসিগণ মনে করিতেন, ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে স্বামীজি এগুলি রাখিয়াছেন। এই বিষয়ে নানা জনে নানা জল্পনা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিয়াছিলেন, "শৈশব হইতে মাকড়সার প্রতি আমার একটা অব্যক্ত ভীতি ছিল। গঙ্গায় সাঁতার দিবার সময় একবার অসংখ্য জলীয় মাকড়সার জালে আবদ্ধ হই। ইহাতে আমি এত ভীত হইয়া পড়ি যে, কোন রকমে রুদ্ধশ্বাসে তীরে আসিয়া উঠি। শৈশবাগত এই ভীত ভাব দূর করিবার জন্য, কিংবা ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম মাকড়সাগুলি ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। বারে বারে এগুলি দেখিলে ইহার প্রতি ভয় মন হইতে চলিয়া যায়।" স্বামী ত্রিগুণাতীতের অসামান্য সত্যনিষ্ঠার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। একবার সানফ্রান্সিস্কোর কোন বিশিষ্ট ধর্মযাজকের বাড়ীতে তাঁহার আহারের নিমন্ত্রণ হয়। আহারান্তে তিনি স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার খাওয়া ভাল হ'ল ত?' স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রথমে কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্মযাজক কর্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'দেখুন, আপনি যখন আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করছেন, তখন আমি আপনাকে অপ্রিয় হলেও সত্য কথা

না বলে পারছি না। আমি আপনাদের এ খাওয়া মোটেই পছন্দ করি না।' ইহা শুনিয়া ধর্মযাজক বিরক্ত হইলেও বুঝিলেন, স্বামিজী কিরূপ সত্যনিষ্ঠ। কিন্তু তিনি বন্ধুভাবে স্বামিজীকে পরামর্শ দিলেন যে, সামাজিক জীবনে এরূপ সত্যনিষ্ঠ হইলে তিনি সর্বত্র নিন্দাভাজন হইবেন। সেদিন হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি উক্ত প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

সানফ্রান্সিস্কো হইতে বহু দূরে সান্ আন্তোন উপত্যকায় যে শান্তি আশ্রম আছে সেখানে স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রতি বৎসর শিষ্যদের লইয়া যাইতেন। তৎকর্তৃক ১৯০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে 'ভয়েস অব্ ফ্রিডাম' (স্বাধীনতার বাণী) নামক একটি ইংরাজি মাসিক প্রকাশিত হয়। তিন বৎসরের মধ্যেই পত্রিকাটি সুনাম অর্জন করে। ইহা প্রায় ছয় সাত বৎসর চলিয়াছিল। স্বামী ত্রিগুণাতীতের চেষ্টায় স্ত্রীভক্তগণের জন্য একটী নারী-মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় মন্দির হইতে অদূরে অবস্থিত একটী ভাড়া বাড়ীতে। কয়েক বৎসর চলিবার পর নারীমঠটী অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যায়। জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর স্বামী ত্রিগুণাতীত বাত প্রভৃতি রোগে অশেষ কষ্ট পান। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি পূর্ববৎ অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজ করিয়া যাইতেন। এই বিষয়ে কোন শিষ্যকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'অত্যধিক শারীরিক যন্ত্রণার সময় ভাবি, শরীরটা যাক্। কিন্তু যখনই মনে পড়ে, ঠাকুরের কাজ শেষ হয় নি তখন কেবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা শরীরটাকে ধরে রাখি। শরীরটা যেন খোলসের মত আলগা হয়ে গেছে। যে কোন সময়ে ইহা পড়ে যেতে পারে। গত তিন বৎসর শুধু মনের জোরে শরীরটা টেনে রেখেছি।' ১৯১৪ সালের বড় দিনের উৎসব তিনি মহাসমারোহে হিন্দু মন্দিরে সম্পন্ন করেন। তখন কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, তাঁহার মহাপ্রয়াণ আসন্ন।

ইতিপূর্বে 'রামকৃষ্ণ কথামৃতে'র একটি প্রাঞ্জল ইংরাজি অনুবাদও তিনি একখণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু হিন্দু মন্দিরে বক্তৃতা দিতেন তাহা নহে সহরের নানা প্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহাকে হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা

দিতে হইত। মঠে ডেব্‌রা নামক একটী অষ্ট্রীয়ান শিষ্য বাস করিত। মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্য সে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হইত। সেইজন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাকে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করিতেন। ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে সে আবার উক্ত কারণে পলাইয়া যায়। ৩০শে ডিসেম্বর রবিবার বৈকালে মন্দিরে যখন বক্তৃতা হইতেছিল তখন উন্মাদরোগগ্রস্ত ডেব্‌রা শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিল। বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া প্লাটফর্মের দিকে একটী বোমা ছুঁড়িয়া মারে। বোমাটী পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়া যায় এবং প্ল্যাটফর্মটি ধূমাবৃত হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীত ভীষণভাবে আহত হন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। ডেব্‌রাও বোমা ফাটার সময় মারা যায়। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রায় দুই সপ্তাহ হাসপাতালে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিলেন। কিন্তু কাহাকেও কোন দিন কষ্টের কথা বলেন নাই। ডাঃ স্বর্ণকুমার মিত্র এম. স., পি. এইচ. ডি. তখন ছাত্ররূপে সানফ্রান্সিস্কোতে ছিলেন। তিনি স্বামীজিকে চিনিতেন এবং সংবাদপত্রে এই দুর্ঘটনার কথা পড়িয়া তাঁহার সহিত হাসপাতালে দেখা করিতে যান। স্বামিজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'যন্ত্রণা খুব আছে, তবে টের পাচ্ছি না। এসব প্রারব্ধের ফল, তাই এ বিষয়ে আদৌ ভাবি না। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ মা, মা।' ১৯১৫ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারী বৈকালে স্বামী ত্রিগুণাতীত সেবক শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'আগামীকাল স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিন। কালই আমি দেহত্যাগ করিব।' সেবকটী স্বামীজীর কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প স্বামীজির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। পরদিবস বৈকাল ৭৷৷টার সময় তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন।

মৃত্যুকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলেন, 'তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে সমুজ্জ্বল এবং দিব্যানন্দে পরিপ্লুত ছিল। তাঁহার সৌম্যমূর্তি দেখিলে মনে হইত না, তিনি চিরনিদ্রামগ্ন।' স্বামী ত্রিগুণাতীতের শেষ দর্শন লাভের জন্য সহরের বহু বিশিষ্ট ধনী, ব্যবসায়ী, বিদ্বান্ ও ধর্মযাজক আসিলেন। মৃত দেহটী কফিনে করিয়া সাইপ্রাস লন সিমেটারীতে লইয়া জ্বলন্ত চুল্লীতে

ভস্মীভূত করা হয়। ১৯১৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে স্বামী প্রকাশানন্দের নেতৃত্বে স্থানীয় ভক্তগণ স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহাবশেষ শান্তি আশ্রমে লইয়া 'সিদ্ধ গিরিতে' প্রোথিত করেন। *

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪২ আষাঢ় সংখ্যায় ডাঃ স্বর্ণকুমার মিত্রের প্রবন্ধে স্বামী ত্রিগুণাতীতের শেষাবস্থার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

আঠার

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

"নিরক্ষরোঽপি সর্বং যো জানাতি গুরুসেবয়া।
নমোঽস্ত্বদ্ভুতপাদায় পশ্চিমোত্তরদেশিনঃ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী অদ্ভুতানন্দ ছিলেন একমাত্র অবাঙ্গালী। তিনি ছিলেন বেহারী। অপরা বিদ্যায় নিরক্ষর হইয়াও স্বামী অদ্ভুতানন্দ পরাবিদ্যায় পারদর্শী এবং পরমহংস ছিলেন। নাট্যাচার্য্য গিরিশ ঘোষের ভ্রাতা অতুল চন্দ্র বলিতেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের miracle (আশ্চর্য্য) যদি দেখিতে চাও তবে লাটু মহারাজকে দেখ। এর চেয়ে বড় miracle (আশ্চর্য্য) আমি আর কিছু দেখি না।' স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "লাটু ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে সে যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতি করেছি এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চ বংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম। লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা ধ্যানধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম। লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না, তাহাকে একটী মাত্র ভাব অবলম্বনেই আজীবন চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ও তাহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।"

বিহার প্রদেশে ছাপরা জেলার অন্তর্গত কোন গণ্ডগ্রামে স্বামী অদ্ভুতানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম তারিখ বা বাল্যজীবনের কথা কিছুই জানা

যায় না। এই বিষয়ে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি খুব বিরক্ত হইতেন। একদা কোন ভক্ত তাহার জীবনী লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার জীবনী লিখে কি হবে? যদি জীবনী লিখিতে চাও ঠাকুরের এবং স্বামীজীর লেখ। তাতে জগতের কল্যাণ হবে।' পূর্বাশ্রমে তাঁহার ভাল নাম ছিল রাখতুরাম চৌধুরী, ডাক নাম লাটু। পিতামাতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। লাটু পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন এবং খুল্লতাত তাঁহাকে লালন পালন করেন। শৈশবে তাঁহার বিদ্যার্জন আদৌ ঘটিয়া উঠে নাই, এমন কি অক্ষর পরিচয় পর্যন্তও নয়। শিশু লাটু একবার ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিল। এমন সময় কোথা হইতে এক অপরিচিতা নারী আসিয়া তাঁহার সর্বশরীরে হাত বুলাইয়া দেন এবং সকলকে অভয় দিয়া চলিয়া যান। ইহার অল্প দিন পরেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় পরবর্তী জীবনে লাটু মহারাজ বলেছিলেন, 'সে কোন দেবী এসেছিল।'* লাটু যৌবনের প্রারম্ভে অর্থোপার্জনের জন্য খুল্লতাতের সহিত কলিকাতায় আসেন। অনেক চেষ্টার পর ডাঃ রামচন্দ্র দত্তের নিকট লাটুর চাকরী হয়। কলেজ স্কোয়ারে রাম দত্তের একটী মনিহারী দোকান ছিল। লাটু সেই দোকানে বিল সরকারের কাজ করিতেন এবং দোকান ঝাড়িয়া পরিষ্কার রাখিতেন। কিছুকাল পরে দোকানটি উঠিয়া যায়। তখন রাম দত্ত লাটুকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যান। সেখানে লাটু বেহারার কাজ করিতেন। প্রায় এক বৎসর কাল বেহারারূপে কাজ করিবার পর তিনি ঠাকুরের দর্শন লাভে কৃতার্থ হন। রামবাবু ঠাকুরের কাছে কখনো কখনো ছাঁচি পান, বরফ, মিঠে তামাক, পানমশলা, ফলমিষ্টি ইত্যাদি লাটুর হাতে পাঠাইতেন। এই ভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া লাটু ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন।

রামবাবু তাঁহার এই ভৃত্যটিকে খুব বিশ্বাস করিতেন। একদা তাঁহার এক

* 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৩১ সালে শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত পাঁচ সংখ্যায় স্বামী সিদ্ধানন্দের প্রবন্ধাবলীতে ঘটনাটিউল্লিখিত।

বন্ধু অভিযোগ করেন যে, বাজার করিবার জন্য লাটুকে যে টাকা দেওয়া হয়, লাটু তাহা হইতে নিশ্চয়ই কিছু চুরি করে। চুরির অপবাদ শুনিয়া যুবক ভৃত্য ক্রুদ্ধ হইয়া অর্ধেক বাংলা ও অর্ধেক হিন্দীতে বলিলেন, 'নিশ্চয়ই জানবেন বাবু, আমি চাকর হলেও চোর নয়।' এমন দৃঢ়তা ও তেজের সহিত বাক্যটি উচ্চারিত হইল যে, বন্ধুটির মুখ বন্ধ হইয়া গেল। বন্ধুটী ভৃত্যবাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া রামবাবুর নিকট নালিশ করেন। প্রভু বিশ্বাসী ভৃত্যের পক্ষ লইলেন। রামবাবু রামকৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রায় রোজই কীর্তনাদি হইত, লাটুও কীর্তনে যোগদান করিতেন। কিছুদিন পরে লাটুর ভাব হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নিজের কর্তব্যগুলিও তিনি ভাবের ঘোরে ভুলিয়া যাইতেন। গৃহকর্তা বা গৃহ-কর্ত্রীর মৃদু তিরস্কারে কোন ফল হইল না। একবার রামবাবুর নিকট লাটু শুনিলেন, "যিনি আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরকে ডাকেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন লাভ করেন। নির্জনে যাইয়া তাঁহার জন্যে প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিলে তিনি অবশ্যই ভক্তকে কৃপা করেন" ইত্যাদি। এই সকল সরল বাক্য লাটুর কোমল প্রাণে এমন গভীর রেখাপাত করিল যে, তিনি সারাজীবন এইগুলি ভুলিতে পারেন নাই। এই দুটি বাক্য যেন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল। তিনি সেগুলি পরবর্তী জীবনে উল্লেখ করিয়া ভক্তদিগকে উপদেশ দিতেন। তিনি রামবাবুর বাড়ীতে থাকার কালেই ধ্যানাভ্যাস আরম্ভ করেন। কখনো কখনো তিনি একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতেন। তাঁহার চক্ষু তখন অশ্রুপূর্ণ হইত এবং তিনি বাম হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিতেন। কোমলপ্রাণা গৃহকর্ত্রী মনে করিতেন, যুবক ভৃত্য সম্ভবতঃ বাড়ীর কথা মনে করিয়া কাঁদিতেছে। সেইজন্য তাঁহারা মাঝে মাঝে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন।

একবার লাটু রামবাবুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন। রামবাবু ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, লাটুও প্রণামান্তে ঠাকুরের পদধূলি লইলেন। ঠাকুর তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রামবাবুকে বলিলেন, 'বাঃ! রাম এ ছেলেটি কোথায় পেলে? এর বেশ সাধু লক্ষণ দেখছি।' তারপর রামবাবুর সহিত ঠাকুরের কথাবার্তা হইতে লাগিল, লাটু দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ঠাকুর

তাঁহাকে বলিলেন, 'বস্ না রে বস্।' তারপর তিনি লাটুর দিকে বারবার চাহিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'বা! ছেলেটি বেশ, বেশ সুন্দর ছেলে।' ঠাকুরের কথামত লাটু ঘরের একপাশে বসিলেন। তখন ঠাকুর রাধিকার কীর্তন গাহিতে লাগিলেন, গাহিতে গাহিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার পর তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলে রামবাবু ও লাটু তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পদধূলি গ্রহণান্তে লাটু দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় লাটুর মস্তকে ও বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে দরদরিত ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। তাঁহার মস্তকের কেশ কদম্ব-কেশরের ন্যায় প্রফুল্লিত এবং শিহরিত হইয়া উঠিল। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার দিব্য স্পর্শ লাটুকে গভীর ভাবে নিমজ্জিত করিল একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'দেখলে! এই ছেলেটার কথা যেমন বলেছিলাম, এখন মিলিয়ে নাও।' প্রায় এক ঘণ্টা পরে লাটু প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন এবং পশ্চাৎ উচ্চ হাস্য করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত ঘটনার সময় ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

রাম বাবুর বাড়ী হইতে জিনিষ দিতে আসিয়া লাটু ঠাকুরের কাছে এক বা দুই বা তিন দিন পর্যন্ত থাকিয়া যাইতেন। ঠাকুর যেমন তাঁহাকে স্নেহ করিতেন তিনিও ঠাকুরকে তেমনি ভক্তি করিতেন। ঠাকুরকে লাটুর প্রথম দর্শনের পরেই ঠাকুর আট মাসের জন্য কামারপুকুরে চলিয়া যান। যাঁহাকে লাটু পিতৃতুল্য ভক্তি করিতেন তাঁহার অভাবে তিনি মর্মাহত হইলেন। তিনি বিষণ্ণ বদনে পূর্ববৎ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং দুঃখিত চিত্তে কিছুক্ষণ তথায় কাটাইতেন। লোকে মনে করিত, লাটু রাম বাবুর বাড়ীতে কর্তব্য অবহেলার জন্য তিরস্কৃত হইয়া দুঃখভার লাঘব করিতে তথায় গিয়াছে। লাটুর হৃদয়ে যে কি ভাবান্তর হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানিতেন। এই সম্বন্ধে পরবর্তী জীবনে লাটু বলিতেন, "ঠাকুরের অভাবে তখন আমার মনে যে কি দারুণ কষ্ট হয়েছিল তা তোমরা ভাবনাও করতে পারবে না। আমি কালীবাড়ীতে যাইয়া ঠাকুরের ঘরে

বসিতাম বা বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু আমার কিছুই ভাল লাগিত না। আমি কাঁদিয়া মনটা হাল্‌কা করিতাম। একমাত্র রামবাবুই আমার মনোবেদনা কিঞ্চিৎ বুঝিয়া ছিলেন। তখন তিনি আমাকে ঠাকুরের একটী ফটো উপহার দেন।" ঠাকুর জন্মস্থান হইতে কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে লাটু যেন মৃত দেহে প্রাণ পাইলেন এবং পূর্ববৎ ঠাকুরের কাছে ঘন ঘন যাইতে লাগিলেন।

স্বামী শিবানন্দ বলেন, "দক্ষিণেশ্বরে তখন প্রত্যহই ঠাকুরের কাছে হরিনাম কীর্তন হইত। রাখাল, হরিশ, লাটু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ঠাকুরের কাছে কীর্তন করিত। মধ্যে মধ্যে কীর্তনের সময় লাটুর ভাব হইত। ভাবে সে কখনো ক্রন্দন করিত, কখনো বা হাসিত। ঠাকুর বলিতেন, এর ভাব ঠিক্ ঠিক্।" সেই সময় শ্রীশ্রীমা নহবতে থাকিতেন। তিনিও বালক লাটুকে দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইতেন না। তিনি বালকের দ্বারা জল আনা, ময়দা ঠাসা, বাজার করা প্রভৃতি ছোটখাট কাজগুলি করাইয়া লইতেন। বালকও মাতার আজ্ঞা পালন করিয়া ধন্য হইতেন। লাটুর উচ্চাবস্থা দর্শনে রাম বাবু তাঁহার দ্বারা কোন নীচ কর্ম করাইতে শঙ্কিত হইয়া ঠাকুরকে একদিন বলিলেন, 'একে আমাদের বাড়ীতে সামান্য চাকর রূপে রাখা হয়েছে। কিন্তু এর এরূপ অলৌকিক ভাবদর্শনে আমি কুণ্ঠিত ও ভীত হয়েছি। আমাদের বাড়ীতে এর দ্বারা যে সব 'নীচ কর্ম' করান হইত তাহা করাইতে আমার আর সাহস হইতেছে না। এই সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' ঠাকুর কহিলেন, 'নীচ কর্ম করাইও না। তবে নিজ পুত্রবোধে যত টুকু পার করিয়ে নিও তাতে কোন দোষ হবে না। এর পর ও যদি তোমার কাছে থাকতে ভাল না আসে, বা ওকে রাখতে তোমাদের যদি দ্বিধা হয় তাহলে এখানে দিও। কেন না, ওযে 'এখানের'; ওযে শাপভ্রষ্ট।'

কিছুদিন এইভাবে কাটিল। লাটু ক্রমেই অন্তর্মুখী হইলেন, রামবাবুর বাড়ীতে তাঁহার মন আর টিকিল না। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিলেন, 'আমি আপনার কাছে থাকবো।' ঠাকুর রামবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'ছেলেটী এখানে থাকতে চায়। তুমি বলত সে এখানে থাকে।' রামবাবু বলিলেন, 'আপনার যখন দয়া হয়েছে তখন সে ত মহাভাগ্যবান্। আপনার কাছেই থাকুক্।' লাটু সেইদিন হইতেই ঠাকুরের কাছে থাকিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম গৃহত্যাগপূর্বক গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি মধ্যে মধ্যে রামবাবুর বাড়ীতে যাইতেন। শেষে তাঁহার কলিকাতায় যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। কালীবাড়ীতে থাকিয়া তিনি ঠাকুরের সেবা ও জপধ্যানে দিনরাত কাটাইতেন। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার মন সমাধির ন্যায় স্থির হইত। ধ্যানমগ্নতাহেতু যথাসময়ে তিনি আহার করিতে পারিতেন না। ঠাকুর কখনো কখনো তাঁহাকে ধমকাইতেন, 'খাবার সময় ঠিক্ খাবি। আমাকেই কে দেখে তার ঠিক নাই। আবার তোকে কে দেখবে?'

কালীবাড়ীতে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় দিনে বা রাত্রে একটা সামান্য কম্বল বা মাদুরের উপর চিৎ হইয়া লাটু মোটা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়া মন্তব্য করিতেন, এ বড় ঘুমঘোরে। একদিন কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের সামনে রামলাল দাদা চাদর তুলিয়া দেখিলেন, লাটুর দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিতেছে। তদ্দর্শনে সকলে চমকিত হইলেন। সন্তপ্ত চিত্তে রামলাল দাদা চাদরখানি পূর্বে যেরূপ ছিল সেরূপ রাখিয়া দিলেন। চাদর তোলা সত্ত্বেও তাঁহার ধ্যান ভগ্ন বা চক্ষু উন্মীলিত হইল না। তিনি সমভাবে পড়িয়া রহিলেন এবং প্রায় দুই ঘণ্টা পরে উঠিলেন। ঠাকুর এই গানটী প্রায়ই গাহিতেন—

মনুয়ারে সীতারাম ভজন করলিয়ো।
ভূখে অন্ন, প্যাসে পাণি, লেঙ্গে বস্ত্র দিয়ো॥

লাটুও এই গানটী খুব পছন্দ করিতেন এবং যখন তখন গাহিতেন। সারাদিন নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় দিবাভাগে বিশ্রাম লাভ লাটুর ঘটিয়া উঠিত না। তাই অধিকাংশ দিনই তিনি সন্ধ্যাকালে ঘুমাইয়া পড়িতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিলেন, 'সে কিরে? সন্ধ্যায় ঘুম কিরে? সন্ধ্যায়

ঘুমুবি ত ধ্যান ধারণা করবি কখন ?' ব্যস, ইহাই যথেষ্ট। সেইদিন হইতে তিনি রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রাত্রিতে আর নিদ্রামগ্ন হন নাই। ঠাকুরের সঙ্গে এবং তাঁহার দেহান্তে তিনি আজীবন প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় কাটাইতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। এইরূপে সারারাত্রি ধ্যানরত থাকিলেও তিনি নিয়মিত ভাবে গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার বিন্দু মাত্র অলসতা বা অসুবিধা বোধ হইত না। ঠাকুরের প্রত্যেকটী আদেশ পালনে কখনো কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া অগ্রসর হইতেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের যে ভাব ছিল ঠাকুরের প্রতি লাটুরও সে ভাব ছিল।

শিষ্যকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর দেখিয়া গুরু চিন্তিত হইলেন। তিনি একদিন জনৈক ভক্তকে বলিলেন, 'দেখ, লেটো একেবারে আমার মত মুক্খু থাকবে গা! তা' তুমি একটা 'বর্ণপরিচয়' (প্রথম ভাগ) এনে দিও ত, ওকে পড়াব। একটু একটু পড়ুক, কেমন?' ঠাকুরের আদেশানুসারে 'বর্ণপরিচয়' আনা হইল। লাটু আহারাদির পর বইটি লইয়া ঠাকুরের নিকট পড়িতে বসিলেন। ঠাকুর প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া লাটুকে তদনুরূপ করিতে বলিলেন। কিন্তু লাটু 'ক' স্থলে 'কা', 'খ' স্থানে 'খা' ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বারবার ঠাকুর শিষ্যকে 'ক', 'খ' পড়াইলেন। কিন্তু, শিষ্য শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া যখন ঠাকুর শিষ্যকে 'ক', 'খ' এর উচ্চারণ শেখাইতে পারিলেন না, তখন তিনি তাঁহাকে পড়াইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'যা, তোর লেখাপড়া হবে না।' লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ লাটুর জীবনে আর কখনো হয় নাই। পুঁথিগত বিদ্যায় তিনি মূর্খ হইলেও পরাবিদ্যায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন।

ঠাকুর একদিন লাটুকে বলিলেন, 'ভগবান্ ছুঁচের মধ্য দিয়া উট পার করাইতেছেন।' ঠাকুরের কথার অর্থ নম্রতার প্রতিমূর্তি লাটু এইভাবে বুঝিলেন, ঈশ্বর তাঁহার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে গড়িয়া স্বীয় কৃপার অধিকারী

করিতেছেন। ঠাকুরের কাছে অবস্থানকালে লাটুর ধ্যানমগ্নতা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। গঙ্গাতীরে বসিয়া তিনি একদিন ধ্যান করিতে ছিলেন, এমন সময় প্রবল জোয়ার আসিল। লাটু জলবেষ্টিত হইলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা আসিল না। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া তখনই ছুটিয়া আসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ধ্যানমগ্ন শিষ্যের সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলেন। আর একদিন বৈকালে লাটু কালীবাড়ীর এক শিবমন্দিরে ধ্যান করিতে বসেন। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তথাপি লাটু উঠিলেন না। ঠাকুর চিন্তিত হইয়া শিষ্যের সন্ধানে একজনকে পাঠাইলেন। লোকটি যাইয়া দেখিল, লাটু গভীর ধ্যানে নিমগ্ন এবং তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। ইহা শুনিয়া ঠাকুর দ্রুতপদে শিবমন্দিরে যাইয়া ধ্যানস্থ শিষ্যকে হাওয়া করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে লাটুর বাহ্য সংজ্ঞা ফিরিল। তিনি ঠাকুরকে হাওয়া করিতে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইলেন। গুরু স্নেহপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্যে শিষ্যকে শান্ত করিলেন।

লাটু এইভাবে দিবারাত্র ভাগবত ভাবে অভিভূত থাকিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, 'লাটু যেন চড়েই আছে, নামতে চায় না।' শ্রীগুরুর দিব্য সঙ্গে থাকিয়া শিষ্য ঈশ্বর দর্শনকেই জীবনের চরম লক্ষ্য রূপে স্থির করিলেন এবং সংসার হইতে মন গুটাইয়া আনিয়া ঈশ্বরচিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। একদিন তিনি অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে 'গোলোকধাম' খেলা খেলিতে ছিলেন। গোলোক অর্থে স্বর্গ। খেলোয়াড়ের ঘুঁটি গোলোকে গেলেই জয়লাভ হয়। যখন লাটুর ঘুঁটি গোলোকে পৌছিল, তিনি আনন্দে আটখানা হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, তিনি যেন সত্যসত্যই জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি লাভে ধন্য হইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার বালক শিষ্যদের খেলা দেখিতেছিলেন। তিনি লাটুর মহানন্দ দেখিয়া বলিলেন, 'লাটু এত পুলকিত কেন জান? সে এই জীবনেই মুক্তি লাভ করিতে চায়।'

একদিন লাটু প্রভৃতি বালক ভক্তগণের বিবেক বৈরাগ্য সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা বলিতেছিলেন। তখন তিনি লাটুর সম্বন্ধে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেন। ঠাকুর বলিলেন, 'একদিন গভীর রাত্রে লাটু কি করছে দেখবার

জন্য পঞ্চবটীতে গেলাম। গিয়ে দেখি, লেটো* বেলতলায় বসে ধ্যান করছে। তার দু'পাশে দুটো বড় কাল কুকুর কান খাড়া করে বসে আছে, লেটোকে পাহারা দিচ্ছে। ওরা ভৈরবের বাহন। তখন আমিও যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে যেতাম, ঐরকম দুটো কাল কুকুর এসে আমার দুপাশে বসে থাকত, পাহারা দিত।' আর একদিন লাটু বাগানে যাইয়া কলাপাতা কাটিতে কাটিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহা দেখিয়া প্রক্রিয়া বিশেষে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই সময় লাটুর প্রায়ই গভীর ভাবসমাধি হইত। ঠাকুর অনেক বার তাঁহাকে হাঁটু দিয়া ডলিয়া তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ফিরাইতেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেন, 'এদের মধ্যে লাটুরই ঠিক ঠিক ভাব হয়। লেটো চড়েই রয়েছে, ক্রমে লীন হবার যো।'

একদিন ঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে লাটুর মনে তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা জাগে। কারণ তিনি শুনেছিলেন, তীর্থদর্শনে পুণ্য হয়। ঠাকুর মনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'এখান থেকে যাস্‌নি, এখানেই সব আছে। কোথায় ঘোরাঘুরি করবি ? আর এখানে দুটি খাবার মিলছে, এ ছেড়ে যাস্‌নি।' গুরুর আদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক শিষ্য তীর্থভ্রমণের বাসনা ত্যাগ করিলেন। যত দিন ঠাকুরের দেহ ছিল ততদিন শিষ্য গুরুসেবায় একনিষ্ঠ চিত্তে নিযুক্ত ছিলেন। ঠাকুর অসুস্থ হইয়া যখন শ্যামপুকুরে ও পরে কাশীপুরে অবস্থান করেন তখনো লাটু তাঁহার সেবায় ব্যাপৃত। কাশীপুরে ঠাকুর তাঁহার যে কয়জন শিষ্যকে গেরুয়া কাপড় দেন, লাটু তাঁহাদের অন্যতম। ঠাকুরের দেহান্তে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বরাহনগরে প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলেই লাটু, তারক ও বুড়ো গোপাল এই তিনজনেই সর্বপ্রথম মঠে থাকিতে আরম্ভ করেন। লাটুর অদ্ভুত ভাবসমাধি, ধ্যানমগ্নতা ও জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি অসামান্য গুণ স্মরণপূর্বক স্বামীজী তাঁহাকে 'অদ্ভুতানন্দ' নামে অভিহিত করেন।

ঠাকুরের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে শ্রীশ্রীমা স্বামী অদ্ভুতানন্দ ও

* ঠাকুর লাটুকে লেটো বলিয়া ডাকিতেন।

যোগানন্দ প্রভৃতি শিষ্য এবং কয়েকজন স্ত্রীভক্তের সহিত বৃন্দাবনে যান। বৃন্দাবনে মাতৃসমীপে অবস্থানকালে স্বামী অদ্ভুতানন্দের পূর্ববৎ আহারাদির কোন ঠিক থাকিত না। তিনি প্রায়ই তাঁহার ভাগের রুটি বানরদের খাওয়াইয়া অসময়ে শ্রীশ্রীমা বা তাঁহার সঙ্গিনীদের নিকট খাইতে চাহিতেন। এই জন্য অনেকেই বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই শিষ্যের বালকবৎ আচরণে কখনো বিরক্ত হইতেন না। তিনি সকলকে নিষেধ করিতেন, তাঁহার সন্তানকে কেহ যেন তিরস্কার না করে এবং জননীর মত তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া পরিতোষপূর্বক খাওয়াইতেন। তিনি সঙ্গিনীদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, সন্তানের খাবার আলাদা ঢাকিয়া রাখিতে। বেলুড়ে ভাড়া বাড়ীতে মা যখন থাকিতেন তখন স্বামী যোগানন্দ একদিন অনুপস্থিত। সেদিন শ্রীশ্রীমা লাটু মহারাজকে বাজার করিতে বলেন। তখন লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'আমার দ্বারা ওসব হবে না। তোমাদের হাঙ্গামা পোহাতে পারব না। যাই, যোগীনকে ডেকে দিগে।' তখন মা বলিলেন, 'যেয়ে কাজ নেই থাক্।' এইরূপ অপার স্নেহের ডোরেই সঙ্ঘজননী তাঁহার সন্তানদের বাঁধিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দ বরাহনগর মঠে বাস করেন এবং প্রায় দেড় বৎসর অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সহিত তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকেন। বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁহার একবার নিউমোনিয়া হয়। এই রোগে তিনি এত দুর্বল হইয়া পড়েন যে, একাকী উঠিয়া বসিতে পারিতেন না। কিন্তু সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দিবার জন্য বালকবৎ তিনি জিদ্ করিতেন। ডাক্তারের নিষেধবাক্য তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ডাক্তার কি জানে? তাঁর (ঠাকুরের) আদেশ পালন করতেই হবে।' বরাহনগর মঠেও তাঁহার আহারাদির সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সেই জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার ঘরে খাবার প্রেরিত হইত। কিন্তু অনেক দিন দেখা যাইত, দ্বিপ্রহরে প্রেরিত আহার রাত্রি পর্য্যন্ত অভক্ষিত আছে! তিনি যে আহার করেন নাই, একথাও তাঁহার মনে থাকিত না।

বৈরাগ্যের আধিক্যে ক্ষুৎপিপাসাদি দৈহিক প্রয়োজন পর্যন্ত তিনি অস্বীকার করিতেন। যখন অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ নিদ্রিত হইতেন তখন তিনি উঠিয়া জপ করিতেন। এই সম্বন্ধে একটি আমোদজনক ঘটনা ঘটে। যখন লাটু মহারাজ জপ করিতেন তখন মুখের বা মালার একটু শব্দ হইত। রাত্রিতে এই শব্দ শুনিয়া কোন গুরুভ্রাতা ভাবিলেন, ঘরে ইঁদুর এসেছে। তিনি ইঁদুর তাড়াইবার জন্য ঘরে আলো জ্বালিলেন। তখন সকলে জানিতে পারিলেন, ইহা লাটু মহারাজের জপের শব্দ, ইঁদুরের নহে। ইহা লইয়া গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার সহিত কৌতুক করিতেন।

অতঃপর বাগবাজারে কেদারনাথ দাসের বাড়ীতে তিনি প্রায় তিন চার বৎসর ছিলেন। বাগবাজারস্থ উদ্বোধন মঠের জমি কেদারবাবু দান করেন। মধ্যে মধ্যে লাটু মহারাজ শালখিয়ায় তাঁহার এক আত্মীয়ের ডাল, চাল ও চিঁড়ে ইত্যাদির দোকানেও থাকিতেন। অনেক সময় তিনি বসুমতী কার্যালয়ের ভূতপূর্ব সত্ত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় থাকিতেন। আলমবাজার মঠে অবস্থানকালে স্বামী অদ্ভুতানন্দ একবার এই সঙ্কল্প করেন, 'যখন ঈশ্বরলাভ হলো না তখন আর খাবো না, অন্ন ত্যাগ করবো।' ইহা বলিয়া তিনি টান হইয়া খাটিয়ায় শুইয়া রহিলেন। দুইজন গুরুভ্রাতা অনেক বুঝাইয়া টানাটানি করিয়া সে বার তাঁহাকে প্রয়োপবেশন হইতে নিরস্ত করেন। অনেক দিন তিনি গঙ্গার ধারে রাত্রি কাটাইতেন। খোড়ো নৌকার মাঝিদের সহিত তাঁহার বেশ জানাশুনা হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা তাঁহাকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করিত। অনেক সময় তিনি নৌকাস্থিত খড়ের গাদার উপর উঠিয়া ধ্যান করিতেন। মাঝিরা গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে বহু দূর যাইবার পর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তীরে নামাইয়া দিত। তিনি সেখান হইতে পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেন।

এক রাত্রিতে বৃষ্টি হইতেছিল। তিনি পার্শ্ববর্তী ষ্টেশনে রেলগাড়ীর একটী খালি কামরার মধ্যে বসিয়া ধ্যান নিমগ্ন হইলেন। কামরাটি কখন যে মালগাড়ির সহিত সংযুক্ত হইয়া বহুদূরে চলিয়া গেল তাহা তিনি বুঝিতেই

পারেন নাই। পরের ষ্টেশনে কুলীরা সেই কামরাতে মাল বোঝাই করিতে ভিতরে যাইয়া দেখে একটী কৌপীনধারী সাধু ধ্যানে বাহ্য-চৈতন্যহীন। অনেক ঠেলাঠেলি করিবার পর লাটু মহারাজের সংজ্ঞা আসিল। তথা হইতে তিনি হাঁটিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামী শিবানন্দ বলেন, 'লাটু মহারাজ আলমবাজার মঠে বা বেলুড় মঠে বেশী দিন থাকেন নাই, মাঝে মাঝে আসিতেন মাত্র।' লাটু গিরিশ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র প্রভৃতি গৃহী ভক্তদের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে আহার করিতেন। শেষে গৃহস্থদের বাড়ীতে খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বাজারে পুরি তরকারি কিনিয়া খাইতেন। কিছুদিন তিনি চানা ভিজা বা ছোলা ভাজা খাইয়া কাটাইয়াছিলেন। সে সময় তিনি গঙ্গাতীরে পড়িয়া থাকিতেন। তখন তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'হম্‌কো দো পয়সা চানা ভুজা মে হো যাতা হ্যায়। হমে আউর ক্যা পরোয়া হ্যায়।' (আমার দু পয়সার চানা ভাজায় খাওয়া হয়ে যায়। আমার আর ভাবনা কি?) সেই সময় প্রায়ই তিনি গামছার খুঁটে ছোলা বাঁধিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া বসিয়া থাকিতেন, জলে ছোলা ফুলিলে খাইবেন এই ভাব। একদিন গামছায় বাঁধা ছোলা একখানা ইট চাপা দিয়া গঙ্গায় ভিজাইয়া রাখিলেন। তখন ভাঁটা ছিল। ইতোমধ্যে জোয়ার আসিল। কিন্তু তাঁহার সেদিকে খেয়াল ছিল না, তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। যখন ধ্যান ভাঙ্গিল তিনি দেখিলেন গামছাটি জলে ডুবিয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে না। কি করিবেন, সেখানে বসিয়া রহিলেন। জোয়ার নামিয়া গেলে দেখিলেন, যেখানকার জিনিষ সেখানেই পড়িয়া আছে। তখন তিনি গামছা খুলিয়া ভিজা ছোলা খাইতে লাগিলেন।

১৮৯৫।৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অদ্ভুতানন্দ একবার পুরীধামে গিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার পুরীধামে যান। পুরীধামে জগন্নাথদেবের নিকট এই দুইটি বর তিনি প্রার্থনা করেন। প্রথমতঃ, তিনি যেন ভবঘুরে না হইয়া সাধনভজনে নিমগ্ন থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, যা খাবেন তা যেন হজম হইয়া যায়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি দ্বিতীয় বরটি চাহিলেন কেন? তিনি

বলিলেন, 'সাধুজীবনে এইটি খুব দরকার। সাধু কখন কি খেতে পাবে তার ঠিক নেই। হজমশক্তিটি ঠিক থাকলে যা পাবে তা খেয়েই দেহরক্ষা করতে পারবে। তা'হলে তার সাধনভজনে বাধা হবে না।' স্বামীজী যখন প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া উত্তর ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন তখন তিনি স্বামী অদ্ভুতানন্দকে সঙ্গে লইয়া যান। সেই সময় লাটু মহারাজ স্বামীজীর সহিত যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা ও কাশ্মীরের নানাস্থান ভ্রমণ করেন।

স্বামিজী শ্রীনগরে ভাড়াকরা হাউস বোটে থাকিতেন। হাউস বোটের কাশ্মিরী মাঝি তাহার স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সেই বোটেরই একপাশে থাকে। তাহাদের ঘর-সংসার ঐ বোটের মধ্যেই। অবশ্য, বড় বড় বোটের মাঝিরা অন্য একটি ছোট নৌকায় স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া থাকে। স্বামী অদ্ভুতানন্দ নৌকায় উঠিয়াই দেখিলেন স্ত্রীলোক। তিনি তৎক্ষণাৎ বোট হইতে লাফাইয়া তীরের উপরে পড়িলেন। স্বামিজী তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু, লাটু মহারাজ পুনঃপুনঃ অসম্মতি প্রকাশপূর্বক বলিলেন, 'আমি মেয়েদের সঙ্গে থাকবো না।' শেষে স্বামিজী যখন অভয় দিলেন, 'আমি আছি, তোর ভয় কি রে? আমি থাকতে তোর কিছুই হবে না।' স্বামিজীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি বোটে উঠিলেন। রাজপুতানায় খেতড়ির মহারাজার সহিত লাটু মহারাজ এমন বুদ্ধিমত্তার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন যে, তিনি যে একেবারে নিরক্ষর তাহা মহারাজা বুঝিতে পারেন নাই। বরং, তাঁহার কথা-বার্তা শুনিয়া প্রীত হইয়া তিনি স্বামিজীর নিকট তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। লাটু মহারাজ একথা স্মরণ করিয়া বলিতেন, 'স্বামিজী আমায় আগে থাকতেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলেন।'

আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি রাজ-অতিথি হইয়া একদিনও রাজার অন্ন গ্রহণ করেন নাই। বলিতেন, "রাজঅন্ন সাধুর খেতে নাই। তাই আমি খেতড়ি রাজার ওখানে থাকতে একদিনও তাঁর অন্ন খাইনি। চুপি চুপি বাইরে গিয়ে খাবার কিনে অথবা ভিক্ষা করে খেয়ে আসতুম। রাজা জিজ্ঞেস করলে বলতাম, 'আমি খেয়ে এসেছি।' একদিন রাজার দারোয়ানের কাছ থেকে

জোর করে বেগুনপোড়া ও রুটী চেয়ে খেয়েছিলুম। সে কিছুতেই দিতে চায় না ; ভয়, পাছে রাজা জানতে পেরে কিছু বলেন। আমি কিন্তু জোর করে নিয়ে খেয়েছিলাম।" স্বামিজী আমেরিকা হইতে আসিবার পর বেলুড় মঠে নিয়ম করিলেন, ভোর চারিটার সময় উঠিয়া সকলকে ধ্যান করিতে হইবে। ঘণ্টা দিয়া সকলের ঘুম ভাঙ্গান হইত। ইহার পর একদিন স্বামী অদ্ভুতানন্দ সকালে উঠিয়া গামছা ও কাপড় কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস ?' তিনি বলিলেন, "তুমি বিলেত থেকে এসেছ, কত নতুন নতুন আইন চালাবে। আমি ওসব মানতে পারব না। মন কি ঘড়ি-ধরা যে, ঘণ্টা বাজল আর মন বসে গেল ! আমার এমন হয়নি। তোমার যদি হয়ে থাকে ত ভালই। তাঁর কৃপায় কলিকাতায় আমার দুটো অন্নের সংস্থান হবে।" স্বামিজী গুরুভ্রাতার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, 'তোকে যেতে হবে না। তোদের জন্য ওসব নিয়ম নয়। যারা নূতন এসেছে তাদের যাতে একটা ভাব স্থায়ী হয়, এই নিয়ম সেই জন্য।' তখন লাটু মহারাজ বলিলেন, 'তাই বল।'

বেলুড় মঠে থাকিবার সময় তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, 'আমি প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যনারায়ণকে মানি, অন্য কোন দেবতাকে মানি না।' ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রামচন্দ্র দত্ত যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন তখন লাটু মহারাজ সপ্তাহাধিক তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া পুরাতন প্রভুর সেবা করিলেন। কথিত আছে, তখন লাটু মহারাজ দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা রাম বাবুর সেবা করিতেন। রামবাবুর সহধর্মিণী অন্তিম অসুখে শয্যাশায়িনী হইলে লাটু মহারাজ তাঁহারও প্রায় একমাস সেবা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে লাটু মহারাজ চিরতরে সেই গৃহ ত্যাগ করেন। লাটু মহারাজ স্বামিজীকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি স্বামিজীর সম্বন্ধে বলিতেন, 'যদি লরেন ভাইয়ের সঙ্গ পাই, আমি শত শত জন্ম নিতে প্রস্তুত।' তিনি নরেন শব্দটি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া 'লরেন' বলিতেন। স্বামিজী যখন আমেরিকা হইতে প্রথমবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, তিনি লাটু মহারাজের সন্ধান করেন। লাটু মহারাজ আসিলে স্বামিজী তাঁহার হাত

ধরিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'এতক্ষণ আসিস্ নাই কেন ?' লাটু মহারাজ স্বাভাবিক সরলতার সহিত উত্তর দিলেন, 'তুমি বড় বড় লোকের সঙ্গে আছ, তাই আসতে ভয় হয়েছিল।' তখন স্বামিজী স্নেহবিগলিত স্বরে তাঁহাকে বলিলেন, 'চিরতরে তুমি আমার সেই লাটু ভাই, আর আমিও তোমার সেই নরেন ভাই।' স্বামিজী কখনো কখনো আদর করিয়া তাঁহাকে 'প্লেটো' বলিতেন।

কাশ্মীরে স্বামিজী একটী মন্দির দেখিয়া মন্তব্য করিলেন, 'এইটি নিশ্চয়ই দুই তিন হাজার বৎসর প্রাচীন।' ইহাতে লাটু মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি করে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে এলে ?' স্বামিজী মুস্কিলে পড়িয়া উত্তর দিলেন, 'আমার সিদ্ধান্তের কারণগুলি তোমাকে বুঝান শক্ত। তুমি যদি আধুনিক শিক্ষা পেতে, তাহলে তোমাকে বুঝান সম্ভব হত।' লাটু মহারাজ নির্বাক্ না হইয়া বলিলেন, 'তোমার এমন শিক্ষা যে, আমার মত মূর্খকে বোঝাতে পারলে না!' উত্তর শ্রবণে হাসির রোল উঠিল। ১৯০৩ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নয় বৎসর স্বামী অদ্ভুতানন্দ বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে অবস্থান করেন। তথায় প্রথমে তিনি উপর তলায় থাকিতেন, পরে নীচের তলায় বাড়ীতে ঢুকিতে ডান দিকের ঘরে। একদিন ভাবস্থ হইয়া জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার বাপ আছে, মা আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে। আমি কিন্তু অনাথ, আমার গুরু বৈ আর কেউ নেই। তাই গুরুস্থানের পঞ্চক্রোশের মধ্যে পড়ে আছি।'

তখন আর্য মিশনে রোজ পঞ্চানন ভট্টাচার্য গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত একদিন সেই গীতা-ব্যাখ্যা শুনিতে যান। সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'সাঙ্কেতিক ব্যাখ্যা করলে। যদি ঠিক ঠিক করে, তাহলে ভাল।' তাঁহার এলোথেলো বেশ ও উদাস ভাব থাকায় তাঁহাকে পাগলের মত দেখাইত। আর্য মিশনে সেদিন তাঁহাকে দেখিয়া কোন শ্রোতা বলিয়াছিলেন, 'এ cracked (পাগল)।' তিনি এই ইংরাজী শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় স্বামী শুদ্ধানন্দকে বারবার বালকবৎ বলিতে লাগিলেন, 'সুধীর, 'আমাকে cracked (পাগল) বল্লে!' বলরাম মন্দিরেও তিনি দিবারাত্র ধ্যানজপে কাটাইতেন। ঘরের দরজা সর্বদা

খোলা থাকিত, ঘরের একপাশে নীচু খাটের উপর তিনি শুইতেন এবং কোণে লোহার উনুনের উপর চায়ের কেট্‌লী একটি চড়ান থাকিত। তিনি কথা খুব কম বলিতেন। তাঁহার অভাবও ছিল খুব অল্প। তাঁহার রুক্ষ চেহারার মধ্যে মাতৃহৃদয় লুক্কায়িত ছিল। দুঃখী দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অগাধ সমবেদনা ছিল। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'আপনি এদের সঙ্গে কিরূপে মেশেন?' তিনি বলতেন, 'এদের মনটা অন্ততঃ ভাল।' পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁহার সহিত খেলা করিত এবং তাঁহার কোলে পিঠে উঠিত। তিনি তাহাদিগকে ছোলা গুড় খাইতে দিতেন। একবার এক মাতাল তাঁহার জন্য কিছু আহার্য আনিয়া তাঁহাকে খাইতে অনুরোধ করেন। কঠোর তপস্বী পাগলের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'এরা একটু সহানুভূতি চায়, সেটুকু দেওয়া উচিত নয় কি?'

১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে (১৯১২ খ্রীঃ অক্টোবরে) স্বামী অদ্ভুতানন্দ কাশীধামে অবশিষ্ট জীবন কাটাইবার জন্য চিরতরে কলিকাতা ত্যাগ করেন। পথে বৈদ্যনাথধামে দুই এক দিনের জন্য নামিয়াছিলেন। কাশীতে যাইয়া প্রথমে তিনি রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে উঠেন, পরে অন্য বাসায় থাকেন। তিনি নিরক্ষর হইলেও শাস্ত্রপাঠ শুনিতে ভালবাসিতেন। একবার গভীর রাত্রে উঠিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই সুধীর, সুধীর, গীতাপাঠ কর।' স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহাকে নিশীথে গীতা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। কাশী অদ্বৈত আশ্রমে চন্দ্র মহারাজ তাঁহাকে গীতা শুনাইতেন, তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন। কখনো কখনো তিনি বিড় বিড় করিয়া বকিতেন। কাশীতে একবার পূজার সময় তিনি তিন দিন ধরিয়া বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা, এবং বীরেশ্বর মহাদেব প্রভৃতির পূজা দিয়াছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহাকে একবার সমগ্র কঠোপনিষৎটি অনুবাদ সহ পড়িয়া শুনান। নিম্নোক্ত শ্লোকটি পড়া হইতেছিল—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেন॥
তং বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতং....।

অনুবাদ—'অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পরমাত্মা সর্বভূতের হৃদয়ে সদা অবস্থিত। মুঞ্জতৃণ হইতে যেরূপ শিষ আলাদা করা হয়, সেরূপ ধৈর্যের সহিত মুমুক্ষু পরম পুরুষকে স্বীয় দেহ হইতে পৃথক্ করিবেন এবং তাঁহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন।' এই শ্লোকের অর্থ শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, ঠিক্ বলেছে। এই অনুভূতি নিশ্চয়ই তাঁহার লাভ হইয়াছিল।

কাশীধামে শেষ জীবনে দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি ধ্যানস্থ থাকিতেন। তখন তাঁহার অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছিল। মনে কেহ অসৎ চিন্তা করিলে বা অসৎ কার্য্য করিয়া আসিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং আপন মনে বিড় বিড় করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে ভৎসনা করিতেন। এমন কি, বাসা বাটীর মধ্যে যে কোন স্থানে কাহারো মনে অসৎ চিন্তা উদিত হইলে কখনো তিনি বিড় বিড় করিয়া বকিতেন, কখনও বা চীৎকার করিয়া উঠিতেন, 'নিজেরাও কিছু করবে না, আমাকেও কিছু করতে দেবে না।' কোন ভক্ত কাশীতে শিবরাত্রিতে তাঁহার কাছে ছিলেন। চার প্রহরে চার বার পূজো হবে, গান বাজনা হবে ও খাওয়া হবে। ভক্তটি গুণিতেছিলেন, কত জন ভক্ত আছেন ও সেই অনুপাতে কত লুচি করা হবে। লাটু মহারাজ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'কোথায় মহাদেবের পূজা দিবি, না নিজেদের জন্য গুণছিস? তুই তো বড় লোভী দেখ্‌ছি।' একথা শুনিয়া ভক্তটি বলিলেন, 'কেন মশায়, ঠাকুর যখন খেতেন, আর আপনি পাশে বসে থাকতেন, তখন কি আপনার মুখে জল আসত না?' তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'না, আমার তা কখনো আসত না।' স্বামী অদ্ভুতানন্দ চৈতন্যদেবের মত জিহ্বাজয়ী ছিলেন।

কঠোর তপশ্চরণ, নামমাত্র আহার এবং অনিদ্রায় তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়িল। শেষ দুই তিন বৎসর তিনি অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগিয়াছিলেন। কিন্তু শরীরের দিকে তিনি আদৌ নজর দিতেন না। দেহত্যাগের এক বৎসর পূর্বে তাঁহার পায় একটা ফোস্কা পড়িয়া ঘা হয়। উহার কোন যত্ন না লওয়ায় উহা বিষাক্ত হইয়া দুষ্ট

ক্ষতের আকার ধারণ করে। উপর্য্যুপরি চারি দিন প্রত্যহ দুই তিনটা অস্ত্রোপচার তাঁহার ক্ষতস্থানে করা হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য! অস্ত্রোপচারকালে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিকার নাই, যেন অন্য কাহার শরীরে অস্ত্রচালনা হইতেছে! ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারো এরূপ দেহজ্ঞানরাহিত্য অসম্ভব। তাঁহার মন দেহ ছাড়িয়া উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ সত্যই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে গুরু দুঃখেও মন বিচলিত হয় না। প্রায় আট বৎসর কাশীবাসান্তে স্বামী অদ্ভুতানন্দ ১৯২০ খ্রীঃ ২৪শে এপ্রিল মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁহার মহাসমাধির সুন্দর বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী তুরীয়ানন্দের ২৫।৪।২০ তারিখের পত্রে * এইভাবে আছে।—

"....লাটু মহারাজের অন্তিম সংবাদ আপনি তার-যোগে নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন। এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন দেখিয়াছি। অসুখের সময় হইতেই একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন, ভ্রূমধ্যবদ্ধ দৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত। সদা সচেতন, অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না। একদিন ড্রেসিং হইতেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অসুখ? ডাক্তাররা কি বলিতেছে?' আমি বলিলাম, 'অসুখ তেমন কিছু নহে, খালি দুর্বলতা। না খেয়ে শরীর পাত করিয়াছ, এখন আর লড়িবার ক্ষমতা নাই।' তাহাতে বলিলেন, 'শরীর গেলেই ত ভাল।' আমি বলিলাম, 'তোমার ওকথা বলিতে নাই। ঠাকুর যেমন করিবেন সেইরূপ হইবে।' তাহাতে বলিলেন, 'তা ত জানি। তবে আমাদের কষ্ট।' ইহার পর আর তেমন কথাবার্তা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায় প-কে ডাকিতেন, প-র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প- বলিত, তবে আমিও কিছু খাবো না। অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না। প- বলিল, 'খাইলেন না! তবে আমিও আর খাইব না।' লাটু মহারাজ এবারে বলিলেন, মৎ খা। একেবারে মায়ানির্মুক্ত উক্তি!

---

* উদ্বোধন পত্রিকার ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

"পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি, খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম, নাড়ী নাই। ডাক্তার আসি।। হার্ট পরীক্ষা করিলেন, শব্দ পাইলেন না। শরীরের উত্তাপ ১০২·৬ ডিগ্রী। বেশ সজ্ঞান, তবে কোন বাহ্য চেষ্টা নাই। প্রাতে একবার দাস্ত হইয়াছিল। বেশ স্বাভাবিক মল নির্গত হইল। তবে অন্য দিন উঠিয়া বসিতেন, সেদিন আর উঠিতে পারেন নাই। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও ২।৪ ফোঁটা বেদনার রস এবং ২।৪ ফোঁটা জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইতে পারা যায় নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। মাথায় বরফ ও অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল। বেলা দশটার সময় আমি বিদায় লইয়া পুনরায় সাড়ে চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। সেই সময় ডাক্তার শ্রীপদ সহায়েরও আসিবার কথা ছিল। বাটী আসিয়া আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি। সংবাদ পাইলাম, লাটু মহারাজ ১২টা ১০মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তখনই....আমি তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ৯৬নং হারার বাগ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, ডান দিক চাপিয়া পাশ বালিশে হাত রাখিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন! গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বরের সময় যেমন গরম ছিল সেইরূপ গরমই রহিয়াছে। কাহার সাধ্য বোঝে যে, চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন, কেবল অধিক প্রশান্ত ভাব মাত্র। মঠের সকলেই উপস্থিত, খুব নাম কীর্তন আরম্ভ হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল প্রগাঢ় ভগবদ্‌ভজন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে চারটার পর তাঁহাকে যথারীতি বসাইয়া পূজাদি করিয়া আরত্রিকান্তে নীচে নামাইয়া আনা হইল।

"যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয় তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল তাহা লিখিয়া জানান যায় না। এমন প্রশান্ত সকরুণ মহানন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্বে কখনো লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতিপূর্বে নেত্র অর্ধনিমীলিত থাকিত, এখন একেবারে উন্মুক্ত ও বিস্ফারিত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা, কি প্রসন্নতা,

কি সাম্য ও মৈত্রীভাব দেখিলাম তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই, আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে। সকলকে যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত, চমৎকার ও প্রাণস্পর্শী। অদ্ভুতানন্দ নাম সার্থক করিতেই যেন প্রভু এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন' তাঁহার শরীর যখন নতুন বসন ও মাল্য চন্দনে বিভূষিত করিয়া সকলের সম্মুখে আনীত হইল তখন সাধারণে সে শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এমন যমজয়ী যাত্রা অপূর্ব, ও অনন্য-সাধারণ বটে। প্রভুর অনন্ত মহিমার সুস্পষ্ট বিকাশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রতিবেশী সকলে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণামাদি মনের সাধে করিয়া লইলে প্রভুর সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাঁহাকে বহন করিয়া কেদারঘাটে লইয়া যান ও তথা হইতে নৌকাযোগে গঙ্গাবক্ষে স্থাপন করিয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে আনা হয়। সেখানে পূর্বকৃত্য পূজাদি পরিসমাপ্ত করিয়া যথাবিধানে জলসমাধি দিয়া শুভ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ণ সমাপন হয়।"....

স্বামী অদ্ভুতানন্দের সরল উপদেশ 'সৎকথা' নামক গ্রন্থে (দুই খণ্ডে) কলিকাতা উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা' শীর্ষক বৃহৎ গ্রন্থে এই মহাপুরুষের জীবনের বহু ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ। কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে অদ্ভুতানন্দ স্মৃতিমন্দির আছে। তথায় মাঘী পূর্ণিমার দিন তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উনিশ

স্বামী শিবানন্দ

"শিবে যস্য পরা ভক্তিস্ত্যাগেঽপি রতিরুত্তমা।
অহৈতুককৃপাসিন্ধুং শিবানন্দং নমাম্যহম্॥"

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯২২ খ্রীঃ হইতে ১৯৩৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল। বেলুড় মঠের আদি এগার জন ট্রাষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বিবাহিত জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দেন। সেইজন্য তিনি রামকৃষ্ণ সংঘে 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে অভিহিত। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখিবার পূর্বে তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় জানিতে চাহেন। স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'আমার নিজেরই তাঁর স্পর্শে ও ইচ্ছায় তাঁর জীবৎকালেই তিন বার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল।' জনৈক সন্ন্যাসীকে পূর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানকালে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আর কি আসব? এসেছি যে তাতেই সন্দেহ হয়। মনে হয়, আসাও হয় নি।' ব্রাহ্মী স্থিতির ফলে তাঁহার মনে বিদেহ ভাব এত প্রবল হয় যে, তাঁহার দেহবোধ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

পূর্বাশ্রমে স্বামী শিবানন্দের নাম ছিল তারকনাথ ঘোষাল। চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসতে ১৮৫৪ খ্রীঃ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীতে তারকনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। বারাসতে ঘোষাল পরিবারের সমধিক প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ হরেকৃষ্ণ ঘোষাল কৃষ্ণনগর রাজার দেওয়ান ছিলেন। তারকনাথের মাতামহ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় বারাসতে মোক্তারী করিতেন।

তাঁহার পিতা কানাইলাল ঘোষালও সেখানে মোক্তার ছিলেন। কানাইলাল দানশীল, ধর্মপ্রাণ এবং গুপ্ত সাধক ছিলেন এবং ২৫।৩০টী ছাত্রকে বাড়ীতে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেন। তিনি যখন স্বাধীন আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন তখন তাঁহার আয় কমিয়া যায়। তিনি পরে কুচবিহার ষ্টেটের সহকারী দেওয়ানের পদ লাভ করেন। কার্য্যোপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত পরিচিত হন। তিনি কালীবাড়ীতে আসিলে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেন না। সাধনকালে যখন ঠাকুরের অসহ্য গাত্রদাহ হয় তখন কানাইলাল-প্রদত্ত ইষ্টকবচেই তাঁহার গাত্রজ্বালার উপশম হয়। কানাইলালের সহধর্মিণী বামাসুন্দরী দেবী অতিশয় ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র গতাসু হইলে ৺তারকেশ্বরের প্রসাদে যে পুত্রলাভ হয় তাঁহারই নাম তারকনাথ। নয় বৎসর বয়সে তারকনাথ মাতৃহীন হন। তাঁহার দুইটী ভগ্নী ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর বড় দিদি তাঁহাকে লালন পালন করেন।*

তারকনাথ বারাসত হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। গৃহের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য অধ্যয়ন ছাড়িয়া তাঁহাকে চাকুরী লইতে হয়। শৈশবেই তাঁহার মন উচ্চ ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিত। তিনি লেখাপড়া বা খেলার সময় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িতেন। তখন হইতেই তিনি নিয়মিত ধ্যানাভ্যাস করিতেন। কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে তিনি যাইতেন। এই সময়ে তিনি কর্মোপলক্ষে দিল্লীতে যান। তথায় প্রসন্ন বাবুর নিকট ঠাকুরের কথা শুনেন। সমাধির বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রসন্নবাবু তাঁহাকে বলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের ঘন ঘন সমাধি হয়। ইহা শুনিয়া তারক ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। দিল্লী হইতে কলিকাতা ফিরিয়া তিনি মেসার্স ম্যাকিনন মেকেঞ্জির অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। উক্ত কর্মে তিনি প্রায় দুই বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮০।৮১ খ্রীঃ ডাঃ রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে তিনি ঠাকুরের

* কলিকাতা উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা'তে বিস্তৃত বিবরণ আছে। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'শিবানন্দের অনুধ্যান' গ্রন্থও দেখুন।

প্রথম দর্শন লাভ করেন। সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের দর্শন এবং উপদেশ শ্রবণ মানসে বহু লোক সমবেত। ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় অনেকের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। স্বামী শিবানন্দ বলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় স্থানটীর আকাশ বাতাস তখন ভরপূর হয়ে উঠেছে। কথাবার্তা চলতে চলতে তিনি সমাধিতে ডুবে গেলেন।' সমাধির কথা শুনিবার জন্য তারক উৎসুক ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুর সেদিন সমাধির কথই বলিলেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া তিনি প্রাণে পরম শান্তি পাইলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

পরবর্তী শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যাইয়া তারক পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করেন। ঠাকুর নিজের ঘরেই ছিলেন। মাতৃহীন তারকের মনে হইল, ঠাকুর যেন তাঁহার সাক্ষাৎ মা! তিনি ঠাকুরের কোলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। তখন হইতে তিনি ঠাকুরকে মা বলিয়া জানিতেন। পরিচয়াদি জিজ্ঞাসার পর ঠাকুর তারককে লইয়া কালীমন্দিরের দিকে গেলেন। তখন মন্দিরসমূহ ঘণ্টার সুমধুর ধ্বনিতে মুখরিত, কালীবাড়ীর আকাশবাতাস দিব্যভাবে প্লাবিত। কালীমন্দিরে যাইয়া ঠাকুর জগন্মাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের পর তারক দেবমূর্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সেইজন্য দেবীকে প্রণাম করিতে তাঁহার চিত্ত প্রথমে দোলায়মান হইল। কিন্তু ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে তাঁহার মনের এই সঙ্কীর্ণতা মুহূর্তে কাটিয়া গেল এবং তিনি কালীমাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। ঠাকুর তারককে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তারক বলেন, 'আমাকে দেখলে তাঁর হৃদয় বাৎসল্যে ভরে উঠত। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কত আদর করতেন, ঠিক যেমন মা তাঁর শিশুকে আদর করেন। সে কি দিব্য অনুগ্রহ!' দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় কি তৃতীয়বার দর্শনের সময় ঠাকুর হঠাৎ পায়ের তলা দিয়া তারকের বুক স্পর্শ করেন। ইহাতে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। যখন তারকের চৈতন্য হইল তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, 'মা নেমে এস, নেমে এস মা।' এই স্পর্শ সম্বন্ধে তারক বলেন, 'ইহার ফলে আমার দিব্য জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া গেল। ঠিক ঠিক উপলব্ধি করলাম, আমি

শাশ্বত চিরমুক্ত আত্মা, আর শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সেই সনাতন আদিকারণ ঈশ্বর। জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ! আমি এসেছি তাঁর সেবার জন্য।'* দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে আর একবার ঠাকুর তারককে এইভাবে সমাধিস্থ করেন।

ভগ্নীকে বিবাহ দিবার নিমিত্ত তারককে ভগ্নীর শ্বশুরবাড়ীতেই বিবাহ করিতে হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে রাজী হইতে হয়। তখন তারকনাথের তীব্র বৈরাগ্য। তিনি স্ত্রীর সহিত কোনদিন এক বিছানায় শয়ন করেন নাই। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয় এবং তিনি সংসারবন্ধন হইতে চিরতরে মুক্ত হন। এই সময়ের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তারকনাথ বলিয়াছিলেন, "সময় সময় মনে হত, ঠাকুরের সম্মুখে খুব কাঁদি। একদিন রাত্রিতে মা কালীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে খুব কাঁদলুম। এদিকে ঠাকুর আমাকে অনুপস্থিত দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নিকটে যেতেই বললেন, 'যারা ভগবানের জন্য কাঁদে তিনি তাঁদের কৃপা করেন। চোখের জলে পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপ ধুয়ে যায়।' আর একদিন আমি পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছি, এমন সময় ঠাকুর সেখানে এলেন। আমার দিকে তাকাতেই আমি কেঁদে ফেললুম। তিনি একটী কথাও না বলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন আমার ভিতরে কি একটা যেন সুড়সুড় করে চলছে মনে হল এবং সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। আমার এই অবস্থা দেখে ঠাকুর আনন্দিত হয়ে বললেন যে, আমার এ অবস্থা ভগবদ্ভাবের ফলে হয়েছে। অতঃপর আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দিলেন। দৃষ্টিমাত্রেই তিনি ভক্তের অন্তরের সুপ্ত ধর্মবোধ জাগ্রত করতে পারতেন।" ঠাকুরের স্পর্শে সেদিন তারকের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইলেন।

ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে তারক ঈশ্বরলাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিলেন এবং সাধনভজনে ডুবিয়া গেলেন। ঠাকুরের শিক্ষা সম্বন্ধে তারকনাথ একদিন

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪৬ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী শিবানন্দের পত্র' হইতে উদ্ধৃত।

কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'তখন আমরা অনেক সময় গঙ্গাতে শৌচাদি কার্যও করতুম। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এই কথা ঠাকুরকে বলিতে তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'সে কিগো, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি।' তারপর আর কখনও গঙ্গাতে শৌচাদি কার্য করি নি।' ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর অসুস্থ হইয়া কাশীপুর বাগানবাটীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করেন। তখন একবার কিছুদিন ধরিয়া নরেন্দ্রনাথ শুধু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বুদ্ধের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও তপস্যা শ্রবণে তাঁহার বুদ্ধগয়ায় যাইতে ইচ্ছা হয়। তারক পাথেয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ তারক ও কালীকে লইয়া বুদ্ধগয়ায় চলিলেন। গয়া ষ্টেশন হইতে তাঁহারা তিনজন সাত মাইল পথ হাঁটিয়া বুদ্ধগয়ায় যান। ভগবান্ বুদ্ধের সিদ্ধিপীঠে তাঁহারা দিনের পর দিন জপধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। এক সন্ধ্যাকালে গুরুভ্রাতৃত্রয় বোধিদ্রুমতলে পাশাপাশি বসিয়া ধ্যানমগ্ন। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ তারকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কান্না আর কিছুতেই থামে না! তারক আশ্চর্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর বরাহনগরে আদি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে তারক, বুড়োগোপাল ও লাটু প্রথমে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঠাকুরের জীবিতাবস্থাতেই তারক গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠে যখন ঠাকুরের শিষ্যগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন তারকনাথ 'শিবানন্দ' নামে অভিহিত হন। শৈশব হইতে তিনি শিবের মত ধ্যানপ্রিয় ছিলেন বলিয়া স্বামিজী তাঁহার এই নাম রাখেন। বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে স্বামী শিবানন্দ ঈশ্বরলাভের জন্য গভীর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। মাঝে মাঝে তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ দর্শনে যাইতেন। একদিন বলরাম মন্দিরে স্বামিজীপ্রমুখ গুরুভ্রাতাগণ ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিলেন, 'বিবাহিত জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন শুধু ঠাকুরের জীবনেই সম্ভবপর হইয়াছিল।' তখন স্বামী শিবানন্দ বলিলেন, 'ঠাকুর আমাকে এমন একটী বস্তু শিক্ষা দিয়াছিলেন যার জন্য আমার পক্ষে উহা সম্ভবপর হইয়াছিল।'

তখন স্বামিজী বলিলেন, 'তবে ত আপনি মহাপুরুষ।' সেইদিন হইতে গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া ডাকিতেন।

বরাহনগর মঠে স্বামী শিবানন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ একত্রে একটা বড় মশারির মধ্যে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন। তাঁহাদের তখন পৃথক্ বিছানা ছিল না। এক রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী শিবানন্দের পার্শ্বে নিদ্রিত। মহানিশায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বামী শিবানন্দের এই অলৌকিক অনুভূতি হইল। তিনি দেখিলেন, 'মশারি জ্যোতিতে আলোকিত। গুরুভ্রাতাদের পরিবর্তে সাত আট বৎসর বয়স্ক নগ্ন সুন্দর বালকবৎ কয়েকটী জটাধারী শ্বেতকায় শিব শায়িত।' প্রথমে তিনি দর্শনের গূঢ়ার্থ বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে চাক্ষুষ ভ্রম মনে করেন। সেইজন্য তিনি চোখ রগড়াইলেন, তবুও সেই দিব্য দর্শন অন্তর্হিত হইল না। তখন হইতে ভোর পর্যন্ত তিনি ধ্যানে কাটাইলেন। ভোরে দেখিলেন, তাঁহার গুরুভ্রাতাগণই যথাস্থানে শায়িত। ঘটনাটী গুরুভ্রাতাগণের নিকট বিবৃত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ ইহা শুনিয়া হাসিলেন। পরে যখন শিবানন্দজী কাশীর বীরেশ্বর শিবের ধ্যানটী পাঠ করেন তখন বুঝিলেন, দর্শনটী সত্য। বাবা বীরেশ্বরের অংশে স্বামীজীর জন্ম। বীরেশ্বরের ধ্যানটী এই—

> বিভূতিভূষিতং বালং অষ্টবর্ষাকৃতিং শিশুং
> আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ সুবক্ত্রদশনচ্ছদম্।
> চারুপিঙ্গজটামৌলিং নগ্নং প্রহসিতাননং
> শৈশবোচিতনেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্॥

অনুবাদ—৺বীরেশ্বর শিব আট বৎসর বয়স্ক শিশুবৎ। তাঁহার দেহ নগ্ন ও ভস্মলিপ্ত। তাঁহার চক্ষুদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত, মুখমণ্ডল ও দন্তপংক্তিযুগল সুন্দর, মস্তক জটামণ্ডিত, বদন সহাস্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শৈশবোচিত অলঙ্কারে সুশোভিত।

ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণান্তে স্বামী শিবানন্দ ১৮৯৪ খ্রীঃ আলমোড়ায় উপস্থিত হন। তথায় ইংরাজ থিয়জফিষ্ট ই. টি. ষ্টার্ডির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ষ্টার্ডি সাহেব স্বামী শিবানন্দের ধর্মালোচনায় মুগ্ধ

হন এবং স্বামীজীর কথা তাঁহার নিকট শুনিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক স্বামীজীকে আমেরিকা হইতে লণ্ডনে আসিতে আমন্ত্রণ পাঠান। ১৮৯৭ খ্রীঃ স্বামীজী ভারতে প্রত্যাগমন করিলে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সহিত স্বামী শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে একত্রে কলিকাতায় আসেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে সিংহলে যাইয়া তথায় প্রায় এক বৎসর ধর্মপ্রচার করেন। কলম্বোতে ইংরাজ মহিলা মিসেস্ পিকেট তাঁহার নিকট বেদান্ত শিক্ষা করেন। তিনি মহিলাটির নাম রাখেন ভগ্নী হরিপ্রিয়া। সিংহল হইতে হরিপ্রিয়া অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে যাইয়া হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। সিংহলে স্বামী শিবানন্দের প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে হরিপ্রিয়া মান্দ্রাজের অধুনালুপ্ত ইংরাজি পাক্ষিক 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৮৯৭ খ্রীঃ ১৬ই নভেম্বর সংখ্যায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামী শিবানন্দ কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সিংহলে আসিয়াছেন। ভারতীয় বন্ধুগণের সাহায্যে তিনি সিংহলের কয়েকটী বিশিষ্ট ইউরোপীয় এবং হিন্দুর পরিচিত হইয়াছেন। হিন্দুগণের উৎসাহে তিনি তাঁহাদের জন্য শাস্ত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। সপ্তাহে চারি দিন তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে দুই সন্ধ্যায় মিউসয়াস স্কুলে ইউরোপীয়গণকে রাজযোগ শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত রবিবার সন্ধ্যায় তিনি কয়েকটী ধর্মপিপাসু ইউরোপীয়কে ধ্যানধারণাদি শেখান। সম্ভবতঃ তাঁহার কষ্টসাধ্য কার্য্যের মূল্যবান অংশ এই যে, তিনি মুষ্টিমেয় ধর্মশিক্ষার্থীকে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে গুরুতুল্য সাহায্য করেন। তাঁহারা স্বামিজীর পূতস্পর্শে আসিয়া ধর্মজীবনে বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন। স্বামীজী মনে করেন, তাঁহার এই সামান্য কাজ ভাবী বিরাট কর্মের সূত্রপাত মাত্র। এত শীঘ্র তাঁহার কার্য্যের স্থায়িত্ব বা সফলতার কথা বলা সম্ভব নয়। তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে সাফল্যের বীজ নিহিত।" ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে কলম্বো সহরে প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে বিবেকানন্দ সমিতি স্থাপিত হয়। উক্ত সমিতি অদ্যাপি বর্তমান। স্বামী শিবানন্দ সিংহলে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা আজ বিশাল মহীরুহে

পরিণত। কলম্বোকে কেন্দ্র করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মজাল সমগ্র দ্বীপে বিস্তৃত। তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মঠে ফিরিয়া আসেন। মঠ তখন আলমবাজার হইতে বেলুড়ে এক ভাড়াবাটীতে উঠিয়া গিয়াছে।

সেই বৎসর কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী শিবানন্দ ভগ্নী নিবেদিতা প্রভৃতিকে লইয়া প্লেগগ্রস্ত রোগীদের সেবায় নিযুক্ত হন। তখন তিনি স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া রোগার্তদের সেবায় প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর স্বামী শিবানন্দ তাঁহার সহিত মায়াবতীতে গমন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে পিলিভিটে অর্থ-সংগ্রহের জন্য রাখিয়া আসেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পূর্বে ভিঙ্গারাজ কাশীতে বেদান্তপ্রচারের নিমিত্ত তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা দেন। স্বামী শিবানন্দ কাশীতে আশ্রম স্থাপনের জন্য ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দিনই স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেন। ১৯০২ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত আশ্রম পরিচালনা করেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি আশ্রমের বাহিরে খুব কম যাইতেন, সর্বদাই গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। আহারাদি অতি কষ্টেই চলিত, সামান্য একটি বেঞ্চে শুইয়া তিনি রাত্রি যাপন করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সমগ্র জীবন তীব্র তপস্যায় অতিবাহিত। কাশীর অদ্বৈতাশ্রমে তিনি একটি পাঠশালা স্থাপন করেন এবং নিজে কয়েকটি হিন্দুস্থানী ছেলেকে ইংরাজি পড়াইতেন। এই সময়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'চিকাগো বক্তৃতা' হিন্দীতে অনূদিত করাইয়া প্রচার করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এগারজন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতার নামে বেলুড় মঠের একখানি ট্রাষ্ট ডিড্ সম্পাদন করেন। স্বামী শিবানন্দ উক্ত একাদশ জনের অন্যতম। ১৯০৯ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মিশন রেজেষ্ট্রী করা হয়। এই সময় হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মিশনের কোন না কোন পরিচালকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী প্রেমানন্দ অসুস্থ হইলে স্বামী শিবানন্দ কার্য্যতঃ বেলুড় মঠের ভার গ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রীঃ এপ্রিল

মাসে বেলুড় মঠের প্রথমাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ করিলে স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তখন হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসর তিনি সঙ্ঘের অধ্যক্ষপদে আরূঢ় ছিলেন। এই দ্বাদশ বৎসরকে রামকৃষ্ণ সংঘের 'শিবানন্দ যুগ' বলা যাইতে পারে। স্বামী শিবানন্দই সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ।

সংঘাধ্যক্ষরূপে তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন এবং বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি সহরে বহু নরনারীকে দীক্ষা দেন। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি পাহাড়ে উতকামণ্ডে তিনি কিছুদিন বাস করেন। তাঁহার দীক্ষিত শিষ্যদের অনেককেই তিনি চিনিতেন না। কেহ কেহ তাঁহার নিকট শিষ্যরূপে পরিচয় দিয়া উত্তর পাইয়াছেন, 'আমার ওসব মনে থাকে না, আমি ত দীক্ষা দিই না। দীক্ষা দেন ঠাকুর, আমি শুধু উপলক্ষ্য।' ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী পূজার সময় তিনি বৈদ্যনাথ ধামে রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত গৃহে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিতে যান। তথায় তিনি ২৩।২৪ দিন মাত্র ছিলেন। তখন সেখানে আনন্দের হাট বসিয়াছিল। বিদ্যাপীঠের মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি বলিতেন, 'কালে এই বিদ্যাপীঠ খুব বড় হয়ে উঠবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, এখানে খুব বড় কাজ হবে।' মহাপুরুষ শিবানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ আজ স্বাধীন ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন।*

স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠে যখন ঠাকুর পূজা করিতেন তখন লেডি মিণ্টো মিস সোরাবজীর সহিত মঠ দর্শনে এসেছিলেন। স্বামী শিবানন্দের নিকট তিনি শুনিলেন, ঠাকুর স্বয়ং এই সংঘের সৃষ্টি করেন। লেডি মিণ্টো ইহা শুনিয়া বিস্মিতা হন। তিনি স্বামী শিবানন্দের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়ছিলেন। বেলজিয়ামের রাজা আলবার্ট বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসিয়া স্বামী শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি স্বামী শিবানন্দের সহিত

* 'উদ্বোধন পত্রিকার ১৩৪৩ ফাল্গুন সংখ্যায় মল্লিখিত 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

আলাপ করিয়া বলেন, 'জীবনে আমি প্রথম একজনকে পেলাম যাঁর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনভাবে মানুষের মত কথা বলা যায়।' মহীশূরের মহারাজার প্রাসাদে স্বামী শিবানন্দ একবার নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজা তখন বহু সভাসদ-পরিবেষ্টিত ছিলেন। স্বামী শিবানন্দ আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মূত্রত্যাগের বেগ অনুভব করেন। শিশুসুলভ সারল্যে সিদ্ধ মহাপুরুষ মহারাজাকে বলিলেন, 'আপনাদের প্রস্রাবের স্থানটি কোন দিকে ?' মহারাজার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন অপমানজনক। কিন্তু মহারাজা ইতিপূর্বে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের সংস্পর্শে আসিয়া বুঝিয়াছিলেন, সিদ্ধপুরুষগণ সরলস্বভাব ও স্বাধীনচেতা হন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে নির্দেশ করেন, স্বামীজীকে যথাস্থানে লইয়া যাইবার জন্য। বাংলা সরকারের তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী মিঃ পি. সি. লায়ন একবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসেন। পদে ও সামর্থ্যে তিনি গভর্ণরের পরবর্তী বলিয়া তাঁহাকে কৃত্রিমতা ও তোষামোদের পরিবেশে থাকিতে হয়। প্রাথমিক সম্বর্ধনাদির পর স্বামী শিবানন্দ চীফ সেক্রেটারীকে বলিলেন, 'আচ্ছা মিঃ লায়ন, আপনি এখন পিঞ্জরের বাহিরে এসেছেন!' লায়ন শব্দের অর্থ সিংহ। মিঃ লায়ন কৌতুকটি সমর্থনপূর্বক বলিলেন, 'হাঁ স্বামী, আমি পিঞ্জরমুক্ত হইতে চাই।' স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা নেহেরু প্রভৃতি বিশিষ্ট নরনারীগণ স্বামী শিবানন্দের শিষ্যশিষ্যা ছিলেন।

সংঘগুরুরূপে স্বামী শিবানন্দের জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা প্রকটিত হয়। তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে স্পষ্ট প্রতীত হইত, তিনি ব্রহ্মবিৎ। রাত্রিকালে আহারান্তে ঘণ্টাখানেক তিনি গম্ভীরভাবে ভাবাবেশে বসিয়া থাকিতেন। একা হইলেই তিনি আর এক রাজ্যের মানুষ হইতেন। আহারান্তে তিনি সমাধিস্থ হইতেন এবং মাঝে মাঝে 'শ্রীগুরু' 'শ্রীগুরু' ধ্বনি করিতেন। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে স্বামী শিবানন্দ চিঠি পড়িতেছিলেন। তখন একটি গৃহী ভক্ত প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ কেমন আছেন!' স্বামী শিবানন্দ একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'কেমন আছি? আমি ভাল আছি। শরীর

কিন্তু ভাল নেই, তবে আমি ভাল আছি। আমি সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা।' এই কথা বলিতে বলিতে শিবপুরুষ শিবানন্দ ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইলেন। ১৯৩০ খ্রীঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠের দোতালায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সদানন্দ পুরুষ। সংঘের কয়েকজন দক্ষিণদেশীয় সাধু আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আমি এখন চলতে পারি না, দেহটা অথর্ব হয়ে গেছে। তাতে কিছু আসে যায় না। আমি মহানন্দে আছি। গুরু মহারাজের কৃপায় আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করেছি।' ইহা বলিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিলেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

তারপর বলিলেন, 'তোমরাও এই পূর্ণব্রহ্মের আস্বাদ করবে।....যারা শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে এসেছে তারা এই চরম তত্ত্ব উপলব্ধি করবেই।'

শেষ বয়সে স্বামী শিবানন্দ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাকা হইল। ডাক্তারের আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, 'ডাক্তার আর আমাকে কি দেখবে? আমি ত নিরাকার।' ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, মহাপুরুষজী কত দেহজ্ঞানশূন্য ছিলেন এবং তাঁহার ব্রাহ্মী স্থিতি কত সুদৃঢ়! পুরীধামে একবার তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে ভূমার দর্শন লাভ করেন। উপনিষদে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে ভূমা বলা হইয়াছে। একদিন স্বামী শিবানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতাদের একখানি গ্রুপ ফটো দেখিতেছিলেন। ফটোর মধ্যে তাঁহার প্রতিকৃতিও ছিল। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি স্বীয় প্রতিকৃতির উপর পড়িল। তাহা দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এ আবার কে? সাধুসঙ্গে থেকে শালা সাধু হয়ে গেছে! ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ছয় জনকে ঈশ্বরকোটী বলিতেন। আমি এত বড় উচ্চস্তরের ছিলাম না। কিন্তু গুরুকৃপায় আমিও ঈশ্বরকোটী হয়ে গেছি।' ঈশ্বরকোটী মহাপুরুষগণ নিত্যমুক্ত এবং অবতারের পার্ষদ। 'দেহরক্ষার পর আপনি কোন্ লোকে

যাইবেন'—জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী শিবানন্দ বলিতেন, 'ঠাকুরের কাছে যাব।' জীবিতকালে তিনি সারাজীবন যাঁহার চিন্তা করিয়াছেন, দেহান্তে তিনি তাঁহার চিরসান্নিধ্য নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন।*

একদা কলিকাতার এক ধনী মহিলার একমাত্র পুত্র মারা যায়। পুত্রটি স্বাস্থ্যবান্ ও আঠার বৎসর বয়স্ক ছিল। পুত্রশোকে জননী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। উন্মাদিনীবৎ তিনি মাঝে মাঝে পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিতেন 'বংশী, বংশী।' পিতা পুত্রশোক কিঞ্চিৎ সামলাইয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বেলুড় মঠে স্বামী শিবানন্দের নিকট লইয়া আসেন। শোকার্ত পিতা প্রথমে দুঃসংবাদটি মহাপুরুষের নিকট বর্ণনান্তে স্ত্রীর জন্য শান্তি প্রার্থনা করেন। ইতোমধ্যে শোকাতুরা জননী মহাপুরুষজীর পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'বাবা! আমার বংশীকে কি আর একটিবার দেখতে পাব না?' জননীর প্রার্থিনা শ্রবণে শিবানন্দজীর কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি আশিস প্রদানপূর্বক বলিলেন. 'ঠাকুরের ইচ্ছা হলে নিশ্চয়ই একবার তোমার ছেলেকে দেখতে পাবে।' এই আশ্বাসবাণীতে শোকসন্তপ্ত মাতাপিতা পরম সান্ত্বনা পাইলেন। সমবেত সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মাতাপিতা মৃত পুত্রের দর্শন পাইবেন। মহাপুরুষের আশীর্বাদে আশ্বস্ত হইয়া মাতাপিতা গৃহে ফিরিলেন। দুই তিন দিন পরে তাঁহারা পুনরায় বেলুড় মঠে আসিলেন। তখন তাঁহারা নূতন মানুষ—শোকমুক্ত, প্রশান্ত। তাঁহারা শিবানন্দজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে বলিলেন, 'আপনার কৃপায় আমরা শোকরহিত হয়েছি এবং আমাদের প্রিয় পুত্রের দর্শন পেয়েছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সে সুখে আছে এবং বাঁশী বাজাচ্ছে ও খেলা করছে। আপনার প্রসাদে মৃত পুত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছি। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

১৯২৬ সালে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনী হয়। সেই সময় মহাপুরুষজী যে সারগর্ভ অভিভাষণ দেন তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের

* সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত 'ভারতবাণী' পত্রিকার ১৯৪৬ জানুয়ারী সংখ্যায় স্বামী শিবানন্দ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত।

আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত। ১৯২৭ সালে সংঘের সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ দেহরক্ষা করেন। সেই সময় তাঁহার শরীরও খুব খারাপ হয় এবং বায়ু পরিবর্তনার্থ তিনি মধুপুরে যান; তিনি যখনই যেখানে যাইতেন সেখানে আনন্দের হাট বসিয়া যাইত। কিছুদিন মধুপুরে কাটাইয়া তিনি কাশীধামে যান এবং তথায় প্রায় দুই মাস অবস্থান করেন। ইহাই কাশীতে তাঁহার শেষ গমন। একদিন রাত্রিবেলা খাবার পর বেলুড় মঠে নীচে সাধুরা একত্রে বসিয়া গল্প করিতে করিতে খুব হাসিতেছিলেন। সেই হাসির রোল মহাপুরুষজীর ঘরে দোতালায় শুনা যাইতেছিল। মহাপুরুষজী ইহা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, 'ছেলেরা খুব হাস্‌ছে। এতে বুঝা যায়, এরা খুব আনন্দে আছে। আহা! আনন্দের জন্য এরা বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছে। ঠাকুর এদের আনন্দে রেখো, আনন্দে রেখো।' সংঘের সাধুব্রহ্মচারীর প্রতি তাঁহার কত যে করুণা ছিল এই কয়টি কথা হইতে জানা যায়।

জনৈক সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিলে তিনি বলিলেন, "কেমন আছ? 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'—ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নেই, জেনো বাবা।" নিম্‌তাবাসী জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার সন্তানাদি কি?' স্বামী শিবানন্দ মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই বলিলেন, 'ঠাকুর। ঠাকুরই ছেলে, বাবা, মা, সব।' পরে বলিলেন, 'এই যুগে মা রামকৃষ্ণ নামেই অধিক প্রসন্ন। যে রামকৃষ্ণ নাম লইবে তার মঙ্গল হইবে। তাঁর নাম লইয়া তাঁর দুয়ারে পড়িয়া থাকিলে একদিন না একদিন অবশ্যই তাঁর দয়া হইবে।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন দেহরক্ষা করেন তখন স্বামী শিবানন্দ তিনবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। মহাপুরুষজী স্বল্পাহারী ছিলেন। তাঁহার জিহ্বা-সংযম ছিল অসাধারণ। সেইজন্যই বোধ হয়, তিনি ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় আশী বৎসর জীবিত ছিলেন। দেওঘরে কোন ধনীগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি একবার গিয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ প্রকার চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার্য্যের সম্মুখে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ উপবিষ্ট। আহার্য্যগুলি দর্শনে তিনি শিশুর ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৃহকর্ত্রী ভাবিয়াছিলেন, স্বামিজী নিশ্চয়ই

বিবিধ আহার্য্যে উদর পূর্ণ করিবেন। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিল। শিবানন্দজী মাত্র কোন কোন দ্রব্যে অঙ্গুলী ডুবাইয়া তাহা জিহ্বায় ঠেকাইয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে।' তিনি সামান্য আহার করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। শাস্ত্রে সত্যই উক্ত হইয়াছে, 'জিতং সর্বং জিতে রসে।' অর্থাৎ যিনি রসনাজয়ী তিনিই জিতেন্দ্রিয়।

স্বামী শিবানন্দ নিজের ঠিকুজীখানি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার জন্মতারিখ নিঃসংশয়ে জানা যায় না। জন্মতারিখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'আমি আনন্দস্বরূপ আত্মা। আমার আবার জন্মমৃত্যু কি? আমই বিক্রী হয়ে গেল। আর ঝুড়ীর কি দরকার?' শাস্ত্রমতে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পূর্বস্মৃতি ও পূর্বসংস্কার বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে মনে সংস্কার ও বাসনা বাস করে জীবন্মুক্তিতে সেই মনের বিনাশ হয়। ভগবান্ বুদ্ধ যখন সংসার ত্যাগপূর্বক নির্বাণলাভের জন্য বোধিদ্রুম-তলে ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন তাঁহারও উক্ত অবস্থা লাভ হয়ে ছিল। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের অবস্থান সংবাদ বণিকদিগের নিকট পাইয়া পিতা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের বাল্যবন্ধু মন্ত্রীপুত্র উদঙ্গীকে তাঁহার কুশল সংবাদ আনয়নের জন্য প্রেরণ করেন। উদঙ্গী বুদ্ধদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন, 'সিদ্ধার্থ, আমি তোমার বাল্যসখা উদঙ্গী। তোমার পিতা শুদ্ধোদন তোমার জন্য চিন্তিত। তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।' গৌতমের শুধু যে পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার নিজ নামটী পর্যন্ত স্মরণ ছিল না। তিনি বলিলেন, 'কে উদঙ্গী? কে শুদ্ধোদন? কে সিদ্ধার্থ?' স্বামী শিবানন্দের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক সম্বন্ধের সকল স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয়। তিনি যখন শেষবার কাশীধামে ছিলেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা কাশীবাসিনী। তিনি বয়োবৃদ্ধা, বাল্যবিধবা। মাতার মৃত্যুর পর তিনিই ভ্রাতা তারকনাথকে লালনপালন করেন। কাশীস্থ আশ্রমদ্বয়ের সাধুব্রহ্মচারীগণ তাঁহাকে পিসীমা বলিয়া সম্বোধন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও সাধুগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তখন শীতকাল। একদিন প্রাতে মহাপুরুষজী সাধুব্রহ্মচারীগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া

সেবাশ্রমে উপবিষ্ট। এমন সময় তাঁহার ভগিনী আসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নির্বাক্ ও নিস্পন্দ! পিসীমা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আমার এই ভাইটীকে কত কষ্টে লালনপালন করেছি। কিন্তু এখন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।' ইহা শুনিয়া মহাপুরুষজী সমবেত সাধুগণকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'দেখ বাবা, পাঁচ বছর পূর্বে এঁকে দেখলে মনে হত এঁর সঙ্গে কখনো কোন রক্তসম্বন্ধ ছিল! কিন্তু এখন রাস্তার কোন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত উহার কোন পার্থক্য দেখি না। তোমরাই ত আমার বাপ, মা, ভাই, বোন সব।' স্বামী শিবানন্দ ঐহিক সম্পর্কের স্মৃতি মন হইতে এমন ভাবে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, রক্ত-সম্বন্ধের স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত। ইহাই প্রকৃত বিদেহ অবস্থা। কেবল, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণেরই ঐরূপ অবস্থা লাভ হয়।

স্বামী শিবানন্দ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ন্যায় নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি এডুইন আরনল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' বইখানি পড়িতে ভালবাসিতেন। তাঁহাকে এই জগতের লোক বলিয়া মনে হইত না। বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে, ডান পায়ের আঙ্গুল হইতে এক গজ দূরে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে খুব ধ্যান হয়। শিবানন্দজী চলিবার সময়ও দৃষ্টি পথ-নিবদ্ধ রাখিয়া ধ্যান করিতে করিতে চলিতেন। স্বীয় ধ্যানপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'মহাব্যোম বা মহাশূন্যের মধ্যে বসে নিরাকার বা নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করি। কোন চিন্তা মনে উঠতে দিই না, দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে থাকি।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি নিরাকার বা নির্গুণ ব্রহ্মের সাকার সগুণ মূর্তি জ্ঞানে ধ্যান করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার আমিত্ব এত নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তিত্ব সর্বদা হৃদয়ে অনুভব করিতেন। একবার তিনি নিজমুখে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ তাঁহার হৃদয়মন্দিরে বিরাজমান। গীতার বাণী 'সর্ব ভূতের হৃদয়ে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত' শিবানন্দজীর জীবনে রূপায়িত হইয়াছিল। যখন তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে গিয়াছিলেন তখন তথায় 'বিপিন কুটীরে' অবস্থান করিতেন। একদিন প্রাতে সাধু-ব্রহ্মচারীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। জনৈক ব্রহ্মচারী প্রণামান্তে

তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, 'মহারাজ! আমার মনে হয়, আপনারা আমাদিগকে স্তোকবাক্য দিয়ে সংঘের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু, ঈশ্বরলাভ করবার জন্য আমাদিগকে সাধনভজন করতে হবে।' ইহা শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া শিষ্যকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, 'আরে, একি আমি বলছি! আমার মুখ দিয়ে ঠাকুর বলছেন। আমার মধ্যে আমি নেই, জাগ্রত জীবন্ত ঠাকুর রয়েছেন। আমাদের মুখ দিয়ে যা বলেন তা বিশ্বাস কর, perfect (পূর্ণ) হয়ে যাবে। কবে বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি অবতার এসেছিলেন, কে জানে? এই সেদিন তিনি এসেছিলেন। তাঁর কথা বিশ্বাস কর, আর চিন্তা কর। তোদের আর কিছু করতে হবে না, তাতেই তোদের দেবত্বলাভ হবে।'

শেষ তিন বৎসর তিনি হাঁপানী প্রভৃতি অসুখে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অসহ্য কষ্টের মধ্যেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়াই থাকিত। হাঁপানীর যন্ত্রণায় বহু রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না। কিন্তু, প্রাতে হাসিমুখে সকলকে কুশলপ্রশ্নে কৃতার্থ করিতেন। দেওঘরে অবস্থানকালে হাঁপানীতে এক রাত্রে তাঁহার এত কষ্ট হয় যে, সারারাত্রি তিনদিকে বালিশ ঠেস দিয়া তিনি বসিয়া কাটাইলেন, আদৌ ঘুমাইতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে সাধুগণ যখন প্রণাম করিতে যাইয়া তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন তখন তিনি দিব্যভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, 'বাবা, আমার ত কোনই কষ্ট হয় নি। আমি নিঃসংশয়ে জানি, আমি শরীর নয়, আমি জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিহীন আত্মা। শরীরটা আমার খোলস। আমার কষ্ট হবে কি করে? আমি ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন ছিলাম।' সকল মানুষের মধ্যে তিনি ব্রহ্মদর্শন করিতেন। একবার তিনি গঙ্গাপূজা করিতে যাইয়া স্নানরত একটি লোকের মাথায় সচন্দন ফুল ও মুখে মিষ্টি দিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। তিনি বলিতেন, 'গঙ্গাপূজার চেয়ে নারায়ণজ্ঞানে মানুষপূজা বড়।'

শেষ বয়সে তিনি মধুর 'মা', নামে বিভোর হইয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ শিশুর মুখে 'মা'‚ 'মা' বুলি বড় মধুর শুনাইত। তাঁহার শয্যার সম্মুখে ও পার্শ্বে দেওয়ালে কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, দশভুজা, কন্যাকুমারী ও বংশবাটীর হংসেশ্বরী দেবীর ছবি ঝুলান থাকিত। অমাবস্যার দিন তিনি সাধুব্রহ্মচারীর

দ্বারা হংসেশ্বরী দেবীর পূজা পাঠাইতেন। দূর্গাপূজার সময় তিনি বালকের মত আনন্দে আত্মহারা হইতেন। পূজার এক মাস পূর্ব হইতে প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহাকে আগমনী সঙ্গীত শুনাইতে হইত। তিনিও গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেন, 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।' রামপ্রসাদ গাহিতেন, 'আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে।' স্বামী শিবানন্দও সিদ্ধ পুরুষ রামপ্রসাদের ন্যায় সর্বভূতে ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করিতেন। সেইজন্য শেষ বৎসর তন্ত্রমতে শিবাবলির ব্যবস্থা করিয়া জগদম্বার নিত্যপূজা করাইতেন। গভীর নিশীথে যখন জগৎ নিস্তব্ধ, তখন দূরে শিবা-ধ্বনি শুনা গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিতেন, 'ঐ যে ডাক্‌ছে, জয় মা! জয় মা! যা, বলি নিয়ে যা।' সেবক বলি লইয়া অদূরে বিল্ববৃক্ষমূলে শিবাকে দিয়া আসিতেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মহাপুরুষ শিবানন্দের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। উক্ত সালের বৈশাখ মাসে হঠাৎ তিনি সন্ন্যাস-রোগে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতে বহু সাধু ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বেলুড় মঠে আসিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মঠপ্রাঙ্গণটি জনসমাকীর্ণ রহিল। এইভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। সন্ন্যাস-রোগের আক্রমণের সময় হইতে তাঁহার বাক্‌শক্তি ও উত্থানশক্তি উভয়ই তিরোহিত হয়। এই অবস্থাতেও তিনি ইসারা-ইঙ্গিতে সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের কুশল সংবাদ লইতে ভুলিতেন না। মঠের বার মাসে তের পার্বণের নিত্য সংবাদ তাঁহাকে দিতে হইত। এইভাবে ঠাকুরের জন্মোৎসবটি অতিক্রান্ত হইল। উৎসবের দুইদিন পর ১৯৩৪ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার বৈকালে মহাপুরুষ শিবানন্দ রামকৃষ্ণলোকে প্রয়াণ করিলেন। মহা-সমাধির কালে তাঁহার বয়স প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার দিব্য দেহ বিবিধ পুষ্পমাল্যে শোভিত করিয়া বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল। তাঁহার উপদেশাবলী এবং পত্রাবলী সেবক স্বামী অপূর্বানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া যথাক্রমে 'শিবানন্দ বাণী' (দুই খণ্ডে) ও 'পত্রাবলী' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁহার উপদেশাবলী ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে।

বিশ

দুর্গাচরণ নাগ *

"যোহংভাববিবর্জিতস্তপশশীজ্যোৎস্নাভিরুদ্‌ভাসিত
ভোগাসক্তিনিরাকৃতো গুরুকৃপামন্ত্রেণ সংপ্রাণিত।
দৈন্যামানিত্বকেতনং গুরুপদে ভৃঙ্গায়মানো মুদা
বন্দ্যেহং শিরসা সদা তমমরং নাগাখ্যমুদ্ধারকম্‌॥"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সন্ন্যাসীর আদর্শ এবং গৃহীরও আদর্শ। তিনি বিবাহ করিলেন, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীর সহিত তাঁহার কোন দৈহিক সম্বন্ধ রহিল না। তিনি বিবাহিত জীবনের যে সমুচ্চ আদর্শ দেখাইলেন তাহাই তৎশিষ্য দুর্গাচরণের জীবনে প্রকটিত। ভক্তবীর দুর্গাচরণ 'নাগ মহাশয়' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।' নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলিতেন, 'নরেনকে ও নাগ মহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন সে তত বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর কুলায় না। শেষে নরেন এত বড় হলো যে, মহামায়া হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। নাগ মহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু মহামায়া যত বাঁধেন নাগ মহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে তিনি গলে চলে গেলেন।" স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেন, 'নাগ মহাশয় দেবদুর্লভ মহাপুরুষ।'

---

* শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র প্রণীত দুইখানি পুস্তকে সাধু দুর্গাচরণের বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত। শরচ্চন্দ্রের পুস্তকখানি ইংরাজী হিন্দী কানাড়া তেলেগু গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত।

পূর্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের আধক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ গ্রামে দুর্গাচরণ ১২৫৩ সালের ৮ই ভাদ্র (১৮৪৮ খ্রীঃ ২১ শে আগষ্ট) শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম দীনদয়াল, মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। দীনদয়াল দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি কলিকাতায় কুমারটুলীতে পালচৌধুরীদের গদিতে সামান্য চাকরী করিতেন। তাঁহার মত নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী বিরল। তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। দুর্গাচরণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বালক আট বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। বালবিধবা পিসীমা ভগবতী তাঁহাকে জননীবৎ লালন পালন করেন। পিসীমার সম্বন্ধে তিনি পরে বলিতেন, 'এই পিসীমাই আমার জন্মজন্মের মা ছিলেন।' শৈশব হইতেই তিনি স্বল্পভাষী ও সরল ছিলেন। তাঁহার দেহ সুপুষ্ট এবং মাথায় লম্বা লম্বা চুল থাকায় তাঁহাকে বেশ সুন্দর দেখাইত। বালক সন্ধ্যাকালে একা বসিয়া তারকাখচিত আকাশপানে চাহিয়া থাকিতেন। তখন পিসীমাকে আব্দার করিয়া বলিতেন, 'চল মা, আমরা ঐ দেশে চলে যাই। এখানে থাকতে আর ভাল লাগে না।' চন্দ্র উদিত হইলে বালক পরমানন্দে হাততালি দিয়া নাচিয়া বেড়াইতেন। বাতাসে গাছ দুলিলে তিনি ভাবিতেন, তাহারা ডাকিতেছে। তখন তিনি পিসীমাকে বলিতেন, 'মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলা করবো।' এই বলিয়া দোদুল্যমান বৃক্ষরাজির মত হেলিয়া দুলিয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেন। পিসীমার মুখে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির গল্প না শুনিলে রাত্রে বালকের চক্ষে ঘুম আসিত না। পিসীমা যে গল্প বলিতেন কোন কোন রাত্রে বালক তাহা স্বপ্নে দেখিতেন। স্বপ্নে দেবদেবীর মূর্তি দেখিয়া কখনো কখনো ভয়ে জাগিয়া উঠিতেন।

বাল্যে খেলাধূলায় তাঁহার তেমন মন ছিল না। ক্রীড়া বা পরিহাসচ্ছলেও তিনি মিথ্যা বলিতেন না। যে সঙ্গী মিথ্যা বলিত তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেন না। খেলায় জয়লাভের জন্য বাল্যবন্ধুগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি একটী মিথ্যা বলেন নাই। তজ্জন্য তৎপক্ষের হার হওয়ায় তাহারা সত্যনিষ্ঠ বালককে ধান্য-ক্ষেত্রের উপর দিয়া টানিয়া টানিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত

এবং রক্তাক্ত করিয়া দিত। নারায়ণগঞ্জের বাংলা স্কুলে পড়া শেষ করিয়া দুর্গাচরণ ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে। ঢাকায় পড়িবার সময় তাঁহাকে রোজ দশ ক্রোশ হাঁটিতে হইত। তখন তাঁহার বয়স তের চৌদ্দ বৎসর। ঢাকা হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যাকালে পথে তিনি দুই তিন বার ভূত দেখিয়া ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'ভূতপ্রেত প্রভৃতি অপদেবতা কিছুই মিথ্যা নহে। ঠাকুর বল্‌তেন, ওসব সত্য।' আর একবার বাড়ী আসিবার সময় ঝড়বৃষ্টির দিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে নারায়ণগঞ্জের অনতিদূরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পাশে রাস্তার ধারে পুকুরে পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যান। নর্মাল স্কুলের ছাত্ররূপে তিনি বাংলা ভাষা ভালরূপে আয়ত্ত করেন। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন সুন্দর, রচনাও তেমনি সারবান্। তাঁহার চির সুহৃদ্ সুরেশচন্দ্র দত্ত বলেন, 'পরে নাগ মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইয়া দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। পরে বিখ্যাত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন।....' দুর্গাচরণ কৈশোরে পদার্পণ করিলে প্রসন্নকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

তিনি বিবাহিত স্ত্রীর সহিত এক বিছানায় কখনো শয়ন করেন নাই। বাড়ীতে থাকিলে পাছে স্ত্রীর সহিত রাত্রিযাপন করিতে হয় এই ভয়ে সন্ধ্যা হইলে গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। পিসীমা তাঁহাকে নিজের ঘরে শয়ন করিতে দেবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে তিনি নামিয়া আসিতেন। আমাশয়-রোগে প্রসন্নকুমারীর অকালে মৃত্যু হয়। তখন তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। অল্পকালের মধ্যে চিকিৎসকরূপে তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইল। তিনি দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য দিতেন। কোন কোন রোগীকে তিনি স্বীয় শীতবস্ত্র এবং তক্তাপোষও দিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষক ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী তাঁহার খুব প্রশংসা করিতেন। ভিজিট বলিয়া তিনি কাহারো নিকট কিছু চাহিতেন না। যে যাহা দিত তাহাই তিনি পরমাদরে গ্রহণ করিতেন। পরোপকারের সুযোগ পাইলে তিনি কখনো তাহা ছাড়িতেন না। সুহৃদ্ সুরেশের সঙ্গে তাঁহার নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা চলিত। দুর্গাচরণ সুরেশকে

বলিতেন, 'ঈশ্বর যে আছেন তাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।' যৌবনে পদার্পণ করিলে নিত্য গঙ্গাস্নান, ব্রতপালন ও ঈশ্বরচিন্তায় তাঁহার অনুরাগ বাড়িল। কাশীমিত্রের শ্মশানঘাটে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাইতেন। উক্ত শ্মশানবাসী এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর পরামর্শে মধ্যে মধ্যে মহানিশায় তিনি শ্মশানে বসিয়া জপধ্যান করিতেন। পুত্রের বৈরাগ্য দেখিয়া পিতা তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন। পিতার ক্রন্দনে এবং অভিশাপের ভয়ে তিনি দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হন। বিবাহ বিষবৎ বোধ হইলেও পিতার আজ্ঞায় বাধ্য হইয়া শরৎকামিনী নাম্নী বালিকার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইহার পর তাঁহার পিসীমার মৃত্যু হয়। পিসীমার মৃত্যুতে তাঁহার বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া গেল। দুর্গাচরণ অবসর সময়ে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ পাঠ করিতেন। ভাগবতের ভবাটবীর বর্ণনা এবং জড়ভরতের উপাখ্যান তাঁহার খুব ভাল লাগিত।

সুরেশ এবং কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত গঙ্গাতীরে উপাসনা করিতেন। দুর্গাচরণ সেখানে একপাশে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইতেন। উপাসনার শেষে কোনদিন কীর্তন হইত। কীর্তনের সঙ্গে দুর্গাচরণ নৃত্য করিতেন। কীর্তনে ভাবাবেশে মত্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে তিনি মধ্যে মধ্যে পড়িয়া যাইতেন। পতনে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইত। একদিন নৃত্যকালে গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া যান। অবশ্য সবদিন তাঁহার ঐরূপ মত্তভাব দেখা যাইত না। ভাব সম্বরণে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, 'যত থাকে গুপ্ত তত হয় পোক্ত।' তাঁহাদের কুলগুরু বঙ্গচরণ ভট্টাচার্য কৌল সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক তাঁহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষাগ্রহণান্তে দুর্গাচরণ সাধনসমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন। [illegible] ধ্যানে রাত্রি কাটিয়া যাইত। অমাবস্যা নিশিতে উপবাস করিয়া গঙ্গাতীরে জপ করিতেন। জপ করিতে করিতে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইত। বাহ্য-জ্ঞানশূন্য জাপককে একদিন জোয়ারের জল ভাসাইয়া লইয়া যায়। সংজ্ঞা আসিলে তিনি সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়া আসেন। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আহারের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া কিছুকাল তিনি নক্ত ব্রত পালন করেন।

সহধর্মিণীকে তিনি বলিতেন, 'ছাই এ হাড়মাসের খাঁচায় যেন বদ্ধ হয়ো না। কায়িক বা মানসিক সম্বন্ধ কখনো চিরস্থায়ী হয় না। আমাকে ছাড়িয়া মহামায়ার শরণাপন্ন হও। তোমার ইহকাল পরকাল ভাল হইবে।' তপস্বীর গৃহিণী তপস্বিনী হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় দুর্গাচরণ সহধর্মিণীর সহিত কায়িক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন না। গুরুর ন্যায় শিষ্য আধুনিক যুগে যে আদর্শ দেখাইলেন তাহা বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রকেই সম্মুখে রাখিতে হইবে। ইহার কিছুকাল পরে সুরেশের সহিত দুর্গাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তাঁহার সহিত প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষাতের বিবরণ এই পুস্তকের 'সুরেশচন্দ্র দত্ত' শীর্ষক অধ্যায়ে প্রদত্ত। যেদিন দুর্গাচরণ একাকী কালীবাড়ীতে যান সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হইল। ঠাকুর উপবিষ্ট ছিলেন : বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া তিনি প্রথমে ভয় পাইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'ওগো, তুমি নাকি ডাক্তারী কর। দেখ দেখি, আমার পায়ে কি হয়েছে।'

ঠাকুরের স্বাভাবিক কথা শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। প্রথম দর্শনে ঠাকুর তাঁহাকে স্বীয় পাদস্পর্শ করিতে দেন নাই। সেইজন্য তাঁহার খুব ক্ষোভ ছিল। আজ সেই সুযোগ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি পরমানন্দে ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং দেবদুর্লভ চরণ হৃদয়ে ও বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন। সেই দিন তাঁহার ধ্রুব ধারণা হইল, ঠাকুর ঈশ্বরাবতার। তিনি বলিতেন, ঠাকুরের নিকট কয়েকদিন যাতায়াতের পর জানিতে পারিলাম, ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, গোপনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া লীলা করিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'কিরূপে জানিলেন?' উত্তর দিলেন, 'ঠাকুরই কৃপা করে নিজ গুণে জানিয়ে দিলেন, তিনি কে?' ইহার কিছুকাল পরে ঠাকুর নিজ দেহ দেখাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার এটা কি বোধ হয়?' দুর্গাচরণ করযোড়ে বলিলেন, 'প্রভো! আর আমায় বলতে হবে না। আপনারই কৃপায় আমি জানতে পেরেছি, আপনি সেই!' তৎশ্রবণে গুরু সমাধিস্থ হইয়া শিষ্যের বুকে দক্ষিণ

চরণ স্থাপন করিলেন। ইহাতে শিষ্যের অদ্ভুত অনুভূতি হইল। তিনি দেখিলেন, স্থাবর জঙ্গম চরাচর এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। গুরুকৃপায় শিষ্যের সর্বভূতে ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন হইল।

এক জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহরে ঠাকুর স্বীয় কক্ষে আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। খুব গরম। দুর্গাচরণের হাতে পাখাটী দিয়া ঠাকুর ঘুমাইলেন। অনেকক্ষণ বাতাস করিবার পর তাঁহার হাত ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু গুরুর আদেশ ব্যতীত ইহা বন্ধ করিতে পারিলেন না। ক্রমে হাত এত বেশী ভারী হইল যে, আর চলে না। অমনি ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া পাখা বন্ধ করিলেন। দুর্গাচরণ বলিতেন, 'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নিদ্রাবস্থা সাধারণের ন্যায় নহে। তিনি সর্বদা জাগ্রত থাকিতেন। এক ভগবান্ ভিন্ন সাধক বা সিদ্ধপুরুষে এ অবস্থা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না।' গুরুর সমীপে নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ গুরুভ্রাতাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি গুরুর বাক্যকে বেদবাক্যবৎ সত্যরূপে গ্রহণ করিতেন। একদিন তিনি শুনিলেন, ঠাকুর কোন ভক্তকে বলিতেছেন, 'দেখ ডাক্তার, উকিল, মোক্তার ও দালাল এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন।' তারপর ডাক্তারদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিলেন, 'এতটুকু ঔষধে মন পড়ে থাকলে কিরূপে বিরাট ব্রহ্মের ধারণা হবে?' ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে দুর্গাচরণ দেখিতেন, তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীদের মূর্তি সর্বদা তাঁহার মনে আসিত। ইহাতে তাঁহার ধ্যানের বড় ব্যাঘাত হইত। ঠাকুরের কথা শুনিয়া তিনি স্থির করিলেন, চিকিৎসার ব্যবসায় তিনি ছাড়িয়া দিবেন। সেইদিনই বাসায় ফিরিয়া ঔষধের বাক্স ও পুস্তকাদি গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন। তারপর গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় আসিলেন। তখন হইতে কুতের কার্যই তাঁহার একমাত্র জীবিকা হইল। ডাক্তারী ব্যবসায় ছাড়িয়া তিনি দিবারাত্রির অধিক সময় জপধ্যানে কাটাইতেন। তখন তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য! সংসারত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুরের অনুমতি লইতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। ঠাকুরের ঘরে ঢুকিয়াই তিনি ঠাকুরকে ভাবাবেশে বলিতে শুনিলেন, 'সংসারাশ্রমে দোষ কি? তাঁতে মন থাকলেই হয়। গৃহস্থাশ্রম কিরূপ জান? যেমন কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই করা। ....তুমি

জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমাকে দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।’

গুরুর আদেশে দুর্গাচরণ সংসারে রহিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর মত। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বুঝাইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণপদে নিবেদিত দেহ মন দ্বারা তাঁহার আর সংসারের কোন কার্য হইবে না। তাঁহার বাটীর পার্শ্বস্থ জমিতে তাঁহার ভগিনী সারদামণি একটি লাউগাছ লাগাইয়াছিলেন। গাছটি বেশ সতেজ হইয়া উঠিতেছিল। একদিন গাছের কাছে পাড়ার কোন লোক একটা গরু বাঁধিয়া দিয়া যায়। দড়িটি ছোট থাকায় গরু লাউগাছটি খাইবার চেষ্টা বারবার করিয়াও কৃতকার্য হইতেছিল না। দুর্গাচরণের প্রাণে ইহা সহ্য হইল না। তিনি গরুর দড়িটি খুলিয়া দিলেন। গরুটি তখন মহানন্দে লাউগাছ খাইতে লাগিল। দীনদয়াল পুত্রের কার্য দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি পুত্রকে ভৎ সনা করিয়া বলিলেন, ‘নিজে ত উপার্জন কর না, সংসারের অনিষ্ট করছ কেন?’ পরে কথায় কেথায় বলিলেন, ‘ডাক্তারী ত ছেড়ে দিয়ে বস্‌লি! কি খেয়ে কি করে দিন কাটাবি?’ নাগমহাশয়—যাহা হয় ভগবান্ করিবেন, আপনি সেজন্য ভাবনা করিবেন না। দীনদয়াল—হাঁ, তা জানি! এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি, আর ব্যাঙ খেয়ে থাকবি। পুত্র ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া পরিধেয় বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া প্রাঙ্গণে পতিত একটি মৃত ব্যাঙ খাইতে খাইতে পিতাকে বলিলেন, “এক্ষণে আপনার দুই আজ্ঞাই পালন করিলাম। খাওয়া-পরার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি বসিয়া বসিয়া ইষ্টনাম জপ করুন। আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এই বৃদ্ধ বয়সে আর সংসারচিন্তা করিবেন না।” পুত্রের বাক্যে ও ব্যবহারে পিতা স্তম্ভিত! পুত্র পিতাকে ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন এবং সংসারচিন্তা করিতে দিতেন না। পুত্রের প্রসাদে পিতার মন কালক্রমে ভগবন্মুখী হইয়াছিল। দুর্গাচরণের তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া ঠাকুর আর একদিন তাঁহাকে বলিলেন, ‘গৃহেই থেকো, যেন তেন করে মোটা ভাত, মোটা কাপড় চলে যাবে। ....ঘরে থাকলে তোমার কোন দোষ হবে না।’ কিছুদিন পরে তাঁহার পক্ষে কুতের কাজও সম্ভব হইল না। তখন ইহার ভার আর একজনের উপর দিলেন। সেই ব্যক্তি লাভের

অর্ধাংশ তাঁহাকে দিতেন। তাহাতেই দুর্গাচরণের কোন রকমে সংসার চলিত।

এখন হইতে দুর্গাচরণ জামাজুতার ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। বার মাস একখানি ভাগলপুরী খেস গায়ে দিয়া থাকিতেন। জিহ্বাজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি লবণ বা মিষ্ট খাওয়া বর্জন করিলেন। কিছুদিন লবণ বা মিষ্টি না দিয়া কেবল গঙ্গাজল মাখিয়াই কুঁড়ো খাইয়া ছিলেন! দেবতার প্রসাদী বা ঠাকুরের মহোৎসবের প্রসাদী সন্দেশ ব্যতীত অন্য সন্দেশ তিনি খাইতেন না। বলিতেন, 'জিহ্বার স্বখেচ্ছা হবে।' তিনি কখনো বিষয়প্রসঙ্গ করিতেন না, অন্যে করিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য তিনি দীর্ঘ নিরম্বু উপবাস করিতেন, এমন কি পাঁচ ছয় দিন পর্যন্ত! শিরঃপীড়ার জন্য তিনি শেষ বিশ বৎসর স্নান করেন নাই। সেইজন্য তাঁহাকে খুব রুক্ষ দেখাইত। অন্তরের দীনতা তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি কাহারো ছায়া মাড়াইতে পারিতেন না। কেহ বাড়ীতে আসিলে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগান বাড়ীতে গলরোগে শয্যাশায়ী তখন অন্তর্দাহের জন্য একদিন তিনি দুর্গাচরণকে বলিয়াছিলেন, 'ওগো এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁসে বস। তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শীতল হবে।' এই বলিয়া গুরু অনেকক্ষণ শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া রহিলেন। একদিন শিষ্য গুরুর সাংঘাতিক ব্যাধি মানসিক শক্তিবলে স্বদেহে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'তা তুমি পার, রোগ সারাতে পার।'

তিরোভাবের পাঁচ সাত দিন পূর্বে ঠাকুর একদিন বলিতেছেন, 'এমন সময় কি কোথাও আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়েছে, আমলকী চিবোলে বোধ হয় মুখ পরিষ্কার হবে।' তখন শ্রাবণ মাস, আমলকীর সময় নয়। দুর্গাচরণ ইহা শুনিয়া ভাবিলেন, ঠাকুরের মুখ থেকে যখন এই কথা বেরিয়েছে তখন কোথাও না কোথাও আমলকী পাওয়া যাবে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমলকীর অন্বেষণে বাহির হইলেন এবং বাগানে বাগানে ঘুরিয়া তৃতীয়

দিবসে আমলকী লইয়া ঠাকুরের কাছে ফিরিলেন। আমলকী পাইয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে বলিলেন, 'এমন সুন্দর আমলকী তুমি এই অসময়ে কোথা থেকে জোগাড় করলে?' সেদিন একাদশীর উপবাস। ঠাকুরের আদেশে শশী মহারাজ দুর্গাচরণের জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। ঠাকুর সকল সামগ্রীর অগ্রভাগ জিহ্বাস্পর্শ করিয়া দিলেন। 'প্রসাদ, প্রসাদ, মহাপ্রসাদ' বলিয়া শিষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রসাদকে প্রণাম করিলেন ও পরে খাইতে বসিলেন। প্রসাদ খাইতে খাইতে পাতাখানি পর্যন্ত তিনি উদরস্থ করিলেন! প্রসাদ বলিয়া দিলে তিনি ফলের ছাল ও বিচি, আখ প্রভৃতির ছোবড়া পর্যন্ত খাইয়া ফেলিতেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদে দুর্গাচরণ মর্মাহত হইয়া পানাহার ত্যাগ করিয়া একখানা লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন, এমন কি স্নান শৌচাদির জন্যও উঠিলেন না! ইহা শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসায় যাইয়া অতিকষ্টে তাঁহার উপবাস ভঙ্গ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে গেলে তিনি কালীবাড়ীর ফটকের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। ঠাকুরের লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বর তাঁহার নিকট স্বর্গাদপি গরীয়সী মহাতীর্থ। ঠাকুরের ঘরের কাছে যাইয়া বিলাপ করিতে করিতে আছড়াইয়া পড়িতেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর সেই শূন্য ঘরে আর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বলিতেন, 'আর কি দেখ্‌তে যাব? এ জন্মের মত দেখাশুনা সব হয়ে গেছে।' কাশীপুর বাগান বাটীর নাম শুনিলে তাঁহার মর্মযন্ত্রণা হইত, তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। তিনি সেই বাগানে আর কখনো প্রবেশ করেন নাই। ঠাকুরের গলরোগের কথা উত্থাপন করিলে বলিতেন, 'লীলা, লীলা! জীবের উদ্ধারকল্পে লীলার্থে রোগধারণ।' গুরুনিন্দা শ্রবণে অক্রোধ পরমানন্দ মহাপুরুষ ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন। বারদীর ব্রহ্মচারী একবার শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নানা অযথা বাক্য প্রয়োগ করেন। নাগ মহাশয় গুরুনিন্দা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধে তাঁহার আরক্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সহসা দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক ভীষণাকৃতি কৃষ্ণপিঙ্গল

ভৈরবমূর্তি আবির্ভূত এবং ব্রহ্মচারীকে ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য উদ্যত। নাগ মহাশয় ক্রোধ সংবরণ করিবামাত্র ভৈরব তিরোহিত হইলেন। সিদ্ধাই সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'ও ত পাঁচ মিনিটের কাজ। পাঁচ মিনিট বসলেই যে কোন সিদ্ধাই লাভ করা যায়।'

নারায়ণগঞ্জের এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক নাগ মহাশয়ের শ্বশুরবাড়ীতে বসিয়া ঠাকুরের নিন্দা করেন। নাগ মহাশয় অতি বিনীতভাবেও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তখন ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে পাদুকাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, 'বেরোও শালা এখান থেকে! এখানে থেকে ঠাকুরের নিন্দা!' মহাপুরুষের প্রহারে লোকটির চৈতন্য হইয়াছিল। গিরিশবাবু এই ঘটনা শুনিয়া নাগ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি ত জুতো পরেন না। তবে তাকে মারতে জুতো পেলেন কোথায়?' নাগ মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, 'ক্যান্, তার জুতা দিয়াই তারে মারলাম।' বেলুড় মঠে নৌকাযোগে একবার তিনি আসিতেছিলেন। নৌকা লালাবাবুর ঘাটের কাছে আসিতেই মঠ দেখা গেল। তখন নাগ মহাশয় মঠের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া এক নৌকারোহী যাত্রী মঠের নিন্দা আরম্ভ করিল। ইহাতে আরও দুই তিন জন যোগ দিল। নাগ মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় নিন্দুকদের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, 'তোমরা ত জান কেবল যোগাযোগ, আর রূপার চাকতি! তোমরা মঠের কি জান? চোখে ঠুলি দিয়ে বসে আছ। ধিক্ ঐ জিহ্বাকে যাতে বৃথা সাধুনিন্দা করলে।' নিন্দুকগণ তাঁহার উগ্রমূর্তি দেখিয়া নিরস্ত হইল। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'স্থানবিশেষে নাগ মহাশয়ের মত সিংহ হওয়াই দরকার। এ কি নকল রে, এ যে আসল সোনা।' গিরিশচন্দ্র বলেন, 'নাগমহাশয় যথার্থই ফণাধারী নাগ।' আর একবার নাগ মহাশয় বেলুড় মঠ দর্শনে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলাম ঠাকুর তথায় নাই, বেলুড় মঠে আসিয়া বসিয়াছেন।'

নাগমহাশয় অতিথিগণকে রামকৃষ্ণমূর্তিজ্ঞানে সৎকার করিতেন। এই

সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'ঠাকুর লীলাশরীরে এক ছিলেন। ইদানীং তিনিই আবার নানা মূর্তিতে আমাকে কৃপা করিতে আসিতেছেন।' একদিন বর্ষাকালে তাঁহার কুটীরে দুইজন অতিথি উপস্থিত। সেদিন অবিরাম বৃষ্টি হইতেছিল। তাঁহার বাটীতে মাত্র চারখানি ঘর ছিল। তন্মধ্যে তিন খানিতে চাল দিয়া জল পড়িত। যে ঘরটি ভাল ছিল তাহাতে তিনি শয়ন করিতেন। অতিথিদ্বয়ের আহারাদি হইলে তাঁহাদের শয়নের জন্য ভাল ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া ঘরের কানাচে বসিয়া তিনি ঠাকুরের নাম করিতে করিতে সারা রাত্রি কাটাইলেন। তিনি কখনো মুটের দ্বারা মোট বহাইতেন না। বাজার হইতে জিনিসপত্র নিজেই মাথায় করিয়া আনিতেন। তিনি কখনো বাকী প্রাপ্য কাহারো নিকট ফেরৎ চাহিতেন না। বাজারে জিনিষপত্রের দাম করিতেন না। দোকানদার যে দাম বলিত তাহাই দিতেন। তিনি কখনো চাকর রাখিতেন না। তিনি দেশে থাকিলে লোক নিযুক্ত করিয়া গৃহ-সংস্কারের উপায় ছিল না। নৌকায় উঠিয়া তিনি মাঝিকে নৌকা চালাইতে দিতেন না, নিজেই লগি মারিয়া বা দাঁড় টানিয়া নৌকা বাহিতেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ একজন সাধুকে লইয়া নাগ মহাশয়কে দর্শন করিতে দেওভোগ গিয়াছিলেন। তখন বর্ষাকাল। গ্রামটি জলে ডুবিয়া সমুদ্রে পরিণত। সাধুদ্বয় নৌকাযোগে একেবারে নাগ মহাশয়ের বাড়ীর ভিতরে যাইয়া পৌছিলেন। নাগ মহাশয় গুরুভ্রাতাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া 'জয় রামকৃষ্ণ'; 'জয় রামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে জলে লাফাইয়া পড়িলেন। একেবারে সংজ্ঞাহীন! সাধুদ্বয় সযত্নে তাঁহাকে জল হইতে তুলিলেন। সংঘজননী সারদাদেবী যখন বেলুড় গ্রামে গঙ্গাতীরস্থ কোন বাগানবাটীতে ছিলেন তখন নাগ মহাশয় একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে নৌকাযোগে আসেন। ঘাটে পৌছিয়াই তিনি বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন এবং 'জয় মা', 'জয় মা' বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া গেলেন। নাগ মহাশয় যে সন্দেশ আনিয়াছিলেন তাহা শ্রীমা নিজহাতে তুলিয়া খাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইলেন, পরে তাঁহাকে

পান দিলেন। আধ ঘণ্টা পরে মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া তিনি ভাবের ঘোরে বলিয়া উঠিলেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল'

শ্রীমা তাঁহাকে একখানি কাপড় দিয়াছিলেন। তিনি তাহা মাথায় বাঁধিয়া রাখিতেন। গিরিশ বাবু তাঁহাকে একখানি কম্বল পাঠাইয়াছিলেন। তাহা তিনি মাথায় করিয়া রাখিতেন। একবার আলমবাজার মঠে তিনি সারারাত্রি বসিয়া কাটাইলেন, শুইলেন না। বাগবাজারের বলরাম বসুর বাটীকে তিনি 'শ্রীবাসের অঙ্গন' বলিতেন। রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাটীতে নাগ মহাশয় একবার ঠাকুরের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি বৈঠকখানার এক কোণে দাঁড়াইয়া সমবেত ভক্তগণকে বাতাস করিতে লাগিলেন, আসন গ্রহণ করিলেন না। সকলের অনুরোধে প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিলেন, খাইতে বসিলেন না। তাঁহার কুলগুরুবংশের দুই ব্রাহ্মণ একবার তাঁহার বাড়ীতে আসেন। দীনদয়ালের অনুরোধে তন্মধ্যে একজন তাঁহাকে গৃহস্থধর্ম পালনার্থ সন্তানোৎপাদন করিবার জন্য আদেশ করেন। আদেশ কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেলেন, তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। 'গুরুকুলের ব্রাহ্মণ হইয়া আপনি এই অসঙ্গত আদেশ করিতেছেন'—এই বলিয়া তিনি নিকটে পতিত একখণ্ড ইষ্টক দ্বারা স্বীয় মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইষ্টকাঘাতে কপাল ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িল। ব্রাহ্মণ তখন অনুতপ্ত হইয়া আদেশ প্রত্যাহার করেন। নাগ মহাশয় কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, পশুপক্ষীর যোনি পর্যন্ত আমি আজন্ম মাতৃযোনির মত দেখিয়াছি।' শিষ্য গুরুর ন্যায় কামজয়ী ছিলেন এবং বলিতেন, 'কাম ছাড়লেই রাম, রতি ছাড়লেই সতী।'

যে বৎসর অর্দ্ধোদয় যোগ হয় সেই বৎসর নাগ মহাশয় যোগের তিন চার দিন পূর্বে দেওভোগ যান। তাঁহাকে তখন বাটীতে আসিতে দেখিয়া পিতা বলিলেন, 'এই গঙ্গাস্নানের যোগে কত লোক সর্বস্বান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছে। আর তুই এমন সময়ে গঙ্গাতীর ছাড়িয়া দেশে আসিলি। তোর ধর্মকর্মের মর্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এখনো তিন চার দিন সময় আছে, আমায় একবার

গঙ্গাতীরে নিয়ে চল।' পিতৃবাক্য শুনিয়া পুত্র বলিলেন, 'যদি মানুষের যথার্থ অনুরাগ থাকে ত মা গঙ্গা গৃহে আসিয়াই দর্শন দেন, তাহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না।' সত্যসঙ্কল্প মহাপুরুষের বাক্য অচিরে সিদ্ধ হইল। অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তাঁহার বাটীর পূর্বদিকের ঘরের অগ্নিকোণে প্রাঙ্গণ ভেদ করিয়া প্রবলবেগে গঙ্গাজল উঠিল। জল ক্রমে কল কল নাদে প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল। নাগ মহাশয় তথায় আসিয়া 'মা ভাগীরথী', 'মা পতিতপাবনী' বলিয়া উৎসের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পরে সেইজল অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া স্বীয় মাথায় দিয়া পুনরায় প্রণামপূর্বক সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন বাটীর সকলে এবং পল্লীর লোক দলে দলে আসিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। 'জয় গঙ্গে' রবে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। কোন কোন ভক্ত সেদিন কালীঘাটের মা কালীকে তথায় প্রকটিত দেখিয়াছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে জলস্রোত ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। এই ঘটনা শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় ইহা কিছু অসম্ভব নহে। ইঁহাদের অমোঘ শক্তিতে জীব উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে।' স্বামিজী দেওভোগ যাইবেন শুনিয়া নাগ মহাশয় তাঁহার জন্য শৌচাদির স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার জীবিতকালে স্বামিজী দেওভোগ যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর স্বামিজী ঢাকা যাইবার পথে দেওভোগে একদিন বাস করেন। পূর্ববঙ্গে প্রচার-কার্যে যাইবার পূর্বে স্বামিজী কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'ওদেশে গিয়ে আর বক্তৃতা দিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নাই। যে দেশ নাগ মহাশয়ের চন্দ্রালোকে আলোকিত, সেখানে আমি গিয়ে আর কি বলব?' তাহাতে ভক্তটি বলেন, 'তিনিত অতি গুপ্তভাবে ছিলেন, কিছু প্রচার করেন নাই।' ইহাতে স্বামিজী বলিলেন, 'মুখে নাই বা কিছু বলিলেন। নাগ মহাশয়ের মত মহাপুরুষদের চিন্তাতরঙ্গে দেশের ভাবধারার মোড় ফিরিয়া যায়।'

নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিমায় দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর পূজা হইত। একবার সরস্বতী পূজার সময় নাগ মহাশয় দেবীমূর্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'মা যে সাক্ষাৎ বিদ্যারূপিণী। এঁর কৃপা না হলে কি কেউ অবিদ্যার

পারে যেতে পারে?' ইহা শুনিয়া কোন ভক্ত ভাবিলেন, নাগ মহাশয় বোধ হয় দেবতাসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। ইতোমধ্যে তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতের আম গাছের তলায় যাইয়া ভাবাবেশে দাঁড়াইলেন। ভক্তটী যাইয়া দেখিলেন, তিনি তখন সমাধিস্থ। তিনি বলিলেন, 'মা কি আমার এই খড়মাটীতে আবদ্ধ। তিনি সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময়ী; মা আমার ব্রহ্মময়ী।' তিনি সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করিতেন। তাঁহার নিকট জগৎপ্রপঞ্চ রামকৃষ্ণময়, ব্রহ্মময় ছিল। তিনি পিপীলিকা, মশা, ছারপোকা বা উই মারিতেন না। তাঁহার গৃহের বাঁশের বেড়াতে উই ধরিয়া ছিল। কোন ভক্ত বল্মীকগুলি ফেলিয়া দেন। নাগ মহাশয় কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিলেন, 'হায়, হায়! আপনি কি করিলেন?' পরে নিরাশ্রয় কীটগুলির সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, 'আপনারা আবার বাসা তৈয়ারী করুন, আর ভয় নাই।' তিনি সর্পকেও কখনো হিংসা করিতেন না। একবার এক গোখুরা সাপ তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে দেখা দেয়। বাড়ীর সকলে ভীত হইয়া উঠিলেন। তখন নাগ মহাশয় বলিলেন, 'বনের সাপে খায় না, মনের সাপে খায়।' পরে সাপটিকে করজোড়ে বলিলেন, 'আপনি মা মনসা দেবী। আপনি জঙ্গলে থাকেন, দরিদ্রের কুটীর ছাড়িয়া স্বস্থানে গমন করুন।' এই বলিয়া তুড়ি দিতে দিতে সাপটিকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। সাপটিও নতশিরে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'অনিষ্ট না করিলে কেহ কাহারো অনিষ্ট করে না।'

১৩০৬ সালের শরৎকালে নাগ মহাশয়ের শরীর ভীষণভাবে অসুস্থ হইল। পূজার পূর্ব হইতে শূলবেদনা বাড়িয়া গেল। তাহার উপর আমাশয় রোগ আক্রমণ করিল। যে দিন তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন সেদিন হইতে আর ঘরে প্রবেশ করেন নাই, বারান্দায় একখানি ছেঁড়া কাঁথার উপর পড়িয়া থাকিতেন। সহধর্মিণীকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন, 'আমার প্রারব্ধ কর্মের শেষ হইয়া আসিয়াছে, অতি অল্পই বাকী।' ভাদ্র মাসের শেষ হইতে দিবসে দুই চার গ্রাস মাত্র অন্ন খাইতেন, আর রাত্রে উপবাসী থাকিতেন। অনাহারে, অনিদ্রায় ও অসুখে তাঁহার দেহ ক্রমে কঙ্কালসার হইল। তখন তাঁহাকে কেহ

ঔষধ খাওয়াইতে পারেন নাই। পথ্যৌষধিরূপে হিঞ্চে শাকের রস একটু একটু পান করিতেন। প্রাণান্তিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য কাতর হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের গৃহী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শেষ তের দিন তাঁহার কাছে থাকিয়া গীতা, ভাগবত, উপনিষদাদি শাস্ত্র এবং স্তোত্রাদি পড়িয়া শুনাইতেন। কখনো বা তিনি শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেন, আবার কখনো বা কীর্তন করিতেন। এই সকল শুনিতে শুনিতে নাগ মহাশয় মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হইতেন। সমাধিতে কখনো কখনো এক দেড় ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি যথাসময়ে সুপ্তোত্থিত শিশুর ন্যায় 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। তখন তাঁহার দেহে প্রেমের অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইত। কখনো কখনো গভীর সমাধিভঙ্গের পর বলিতেন, সচ্চিদানন্দ অখণ্ড চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য। অসুখের সময় তিনি সহধর্মিণী ব্যতীত অপর কাহারো সেবা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাকে যে সকল ভক্ত দেখিতে আসিতেন তাঁহাদিগকে বলিতেন, 'এ হাড়-মাসের খাঁচা আর বেশী দিন থাকিবে না।' শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া কোন ভক্তের মনে হইয়াছিল, ভগবান্ কি নিষ্ঠুর! তিনি ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'ভগবান্ দয়াময়! ভগবান্ দয়াময়! তাঁহার অপার করুণায় কখনো সন্দিহান হইবেন না।' তারপর ক্ষীণকণ্ঠে স্বগতোক্তি করিলেন, 'দেহ জানে আর দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।' একদিন শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বিভোর হইয়া এই গানটি গাহিলেন, 'আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নেই মা জ্ঞানবিচারে।' তখন নাগ মহাশয় এত দুর্বল ছিলেন যে, তিনি সর্বদা শায়িত থাকিতেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া পাশ ফিরাইয়া দিতে হইত। গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবেশে তিনি উঠিয়া বসিলেন। নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি, নয়নে প্রেমাশ্রু, সমাধিমগ্ন! সমাধি শীঘ্রই ভাঙ্গিল। তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, দুই জনে ধরিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলেন। ব্যাধিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আহারও প্রায় বন্ধ হইল। তখন ঝিনুকে করিয়া সামান্য পানিফলের পালো খাইতেন। পরে তাহাও খাইতে পারিতেন না, ন্যাকড়ার পলিতা করিয়া তাঁহাকে একটু গরম দুধ খাওয়ান হইত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ তখন কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। তিনি প্রায় নিত্য নাগ মহাশয়কে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন। একদিন তিনি নাগ মহাশয়কে এই তিনটী শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া শুনাইলেন। —(১) শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা মা (২) মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে (৩) গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়। গুরুভ্রাতার গান শুনিতে শুনিতে নাগ মহাশয় সমাধিস্থ হইলেন। স্বামী সারদানন্দের উপদেশে নাগ-মহাশয়ের কর্ণে কালীনাম উচ্চারণ করিতে সমাধি ভঙ্গ হইল। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সারদানন্দ কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। নাগ মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে ৯ই পৌষ শনিবার রাত্রে কালী-পূজার আয়োজন হইল। কালীর প্রতিমাখানি তাঁহার শিয়রদেশে রাখা হইলে তিনি চোখ মেলিয়া প্রতিমা দর্শন করিতে করিতে 'মা, মা' বলিয়া গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। পূর্ব্ববৎ কালীনাম তাঁহার কর্ণে উচ্চারণ সত্ত্বেও সমাধি ভঙ্গ হইল না। নাড়ী নিশ্চল, হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি 'মা আনন্দময়ী', 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। কালীপূজাতে বলির পরিবর্তে চিনির নৈবেদ্য এবং কারণের পরিবর্তে সিদ্ধি দেওয়া হইল। ভক্তগণের কল্যাণ কামনায় তিনি এই কালী-পূজার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

তখন শীতকাল। একদিন তাঁহার দেহ অনাবৃত। হঠাৎ বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে তিনি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। দুইখানি পাখায় বাতাস করিয়াও তাঁহাকে সুস্থ করা গেল না। সহসা 'বাঁচাও', 'বাঁচাও' বলিয়া তিনি আর্তনাদ করিলেন। আধ ঘণ্টা পরে একটু তন্দ্রা আসিল এবং তিনি সুস্থ হইলেন। মায়ামুক্ত মহাপুরুষ মৃত্যুর পূর্বে ক্ষণিক মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'ভিতরে তিনি পূর্ণপ্রস্তুত ছিলেন। শরীর ধারণ করিলে এক আধটুকু জৈবিক ধর্ম না থাকিলে তাঁহাকে আর শরীরী বলা যায় না। এইরূপ অবস্থা সকল রুমেহাপুষরই দেখা গিয়াছে! ইহাতে জীবন্মুক্ত

নাগ মহাশয়ের কিছু যায় আসে না।' মহাসমাধির তিন দিন পূর্বে তিনি শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পঞ্জিকা দেখিয়া মহাযাত্রার দিন স্থির করিতে বলেন। শরৎচন্দ্র পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলেন, '১৩ই পৌষ ১০টার পর যাত্রা শুভ।' নাগ মহাশয় বলিলেন, 'আপনি যদি অনুমতি করেন তবে ঐ দিনেই মহাযাত্রা করিব।' তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

মহাপ্রয়াণের দুইদিন পূর্বে রাত্রি দুইটার সময় তিনি মুদ্রিত নয়নে শায়িত। সহসা চক্ষু মেলিয়া ব্যস্তভাবে পার্শ্বে উপবিষ্ট ভক্তকে বলিলেন, 'ঠাকুর এসেছেন। আজ আমায় তিনি তীর্থ দর্শন করাবেন।' ভক্তকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি যে সকল তীর্থ দেখিয়াছেন, একে একে আবার নাম করুন, আমি দেখিতে থাকি।' ব্যাসদেব যেমন সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ দর্শনার্থ দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন ঠাকুর তেমনি মুমূর্ষু শিষ্যকে তীর্থদর্শনের জন্য দিব্য চক্ষু দিলেন। ভক্তটী হরিদ্বারের নাম করিলেন। নাগ মহাশয় দিব্য নয়নে তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'হরিদ্বার! হরিদ্বার! ঐ যে মা ভাগীরথী কুল কল নিনাদে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছেন! এই যে মায়ের তরঙ্গ-ভঙ্গে তীরস্থ তরুরাজি দুলিতেছে! ও পারে ঐ যে চণ্ডীর পাহাড়! ওঃ কত ঘাট মায়ের গর্ভে নামিয়াছে! আমি আজ বিশ বৎসর স্নান করি নাই। একবার গঙ্গাস্নান করিয়া মানবজন্ম সফল করিয়া যাই। গঙ্গা! গঙ্গা! মা পতিতপাবনী! মা অধমতারিণী!' এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। সমাধিভঙ্গের পর তিনি অন্য তীর্থের নাম বলিতে বলিলেন।

ভক্তটী প্রয়াগ তীর্থের নাম করিতেই নাগ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 'জয় যমুনে, জয় গঙ্গে।' পরে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 'এইখানেই না ভরদ্বাজের আশ্রম? কই, তাতো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ঐ যে গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারা। ঐ যে ওপারে পাহাড় দেখ্‌ছি। হায়, ঠাকুর ত ভরদ্বাজের আশ্রম দেখাচ্ছেন না।' এই বলিয়া দুই তিন মিনিট তন্দ্রাবিষ্ট রহিলেন। পরে বলিলেন, 'হাঁ, ঐ যে মুনির কুটীর দেখা যাচ্ছে।' আবার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মা তুমি রাজরাজেশ্বরী, মহাশক্তির

অবতার হয়ে কেন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? জয় রাম, জয় রাম।' ইহা বলিতে বলিতে নাগ মহাশয় আবার গভীর সমাধিতে ডুবিলেন। সমাধিভঙ্গের পর সাগর তীর্থের নাম করা হইল। তখন তিনি সগরবংশের উদ্ধার ধ্যান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সমুদ্রকে পুনঃপুনঃ প্রণাম জানাইলন। পরে কাশীধামের নাম শুনিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'জয় শিব, জয় শিব বিশ্বনাথ! হর হর ব্যোম ব্যোম।' পরে বলিলেন, 'এবার আমি মহাশিবে লয় হয়ে যাব।' জগন্নাথ ক্ষেত্রের নাম শুনিয়া বলিলেন, 'ঐ যে উচ্চ মন্দির! ঐ যে আনন্দ-বাজারে বেচা-কেনা হইতেছে।' এইরূপে তীর্থদর্শনে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল এবং রাত্রি চারিটার পর তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল।

১৩ই পৌষ আটটার পর হইতে তাঁহার মুহুর্মুহুঃ সমাধি হইতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি তাঁহার সম্মুখে ধৃত হইলে তিনি উহাকে দর্শন ও করজোড়ে প্রণাম করিলেন। তারপর অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, 'কৃপা, কৃপা, নিজগুণে কৃপা।' ইহাই মহাপুরুষের শেষ কথা। বেলা নয়টার সময় তাঁহার মহাশ্বাস আরম্ভ হইল। চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধর কম্পিত। ইহার প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ, সর্বশরীর কণ্টকিত ও নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। বেলা ১০টা ৫ মিনিটের সময় তিনি মহাসমাধিতে নিশ্চল হইলেন। মহাসমাধির পর অনেক সময় তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দেহ উষ্ণ ছিল।

জীবিত অবস্থায় নাগ মহাশয় কাহাকেও তাঁহার ফটো তুলিতে দেন নাই। তিনি বলিতেন, 'এ ছাই হাড়-মাসের খাঁচার আর ছবি রাখবার প্রয়োজন কি?' ভক্তগণের আগ্রহে মৃত দেহের দুইখানি ফটো তোলা হইল। এই ছবি হইতেই প্রিয়নাথ সিংহ একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করেন। এখনো সেই তৈলচিত্র নাগ মহাশয়ের বাটীতে আছে। রাত্রি দশটার পর চন্দনকাষ্ঠের চিতায় মহা-পুরুষের পূতদেহ অগ্নিসাৎ করা হইল। জ্বলন্ত চিতায় জনৈক ব্রাহ্মণ ভক্ত বিল্বপত্রে ব্যাহৃতি হোম করিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী সারদানন্দ ঢাকা হইতে আসিলেন এবং চিতার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে প্রায় ৫৩৷৷০ বৎসর বয়সে মহাপুরুষ দুর্গাচরণ দেহরক্ষা করিলেন।

স্বামী সারদানন্দের নির্দেশে একটি পিত্তল কলসে তাঁহার পূত ভস্মাস্থি সংগৃহীত এবং চিতাস্থলে প্রোথিত হইল। মৃত্যুর পূর্বে যে প্রতিমায় কালীপূজা হইয়াছিল তাহা সমাধিস্থানের উপর স্থাপিত হইল। মহাপুরুষের পুণ্য স্মৃতি ও পূত ভস্মাস্থি বক্ষে ধারণ করিয়া দেওভোগ পুণ্য-তীর্থে পরিণত। নাগ মহাশয় বলিতেন, 'পরমহংসদেব সত্য সত্যই ভগবানের অবতার। ইদানীন্তন কালে তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণই জগতের শ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরু। শেষ জন্ম না হলে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে বিশ্বাস হয় না।' দেশ কালক্রমে গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছিল। মহাপুরুষ দুর্গাচরণ বর্তমান যুগে গৃহীর উৎকৃষ্ট আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

একুশ

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

"রামকৃষ্ণকথোল্লাসামৃতোৎসায় যশস্বিনে।
নমো মহেন্দ্রগুপ্তায় গুপ্তগোপীদেহায় বৈ॥"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' জগদ্বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল এবং বুদ্ধ ও সক্রেটিশের কথোপকথনের সহিত ইহাকে তুলনা করা হয়। মূল গ্রন্থখানি বাংলায় রচিত হইলেও হিন্দী, ইংরাজি প্রভৃতি বহু দেশী ও বিদেশী ভাষায় ইহা অনূদিত। ইহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং শ্রীম-কথিত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'শ্রীম' এই ছদ্মনামে গুপ্ত হইয়াছেন। 'কথামৃতে' তিনি মাষ্টার, মণি, মোহিনীমোহন বা এক জন ভক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান গৃহী শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের পরে তাঁহার নাম বিশ্ববিদিত। স্বামী বিবেকানন্দের পরে তাঁহার 'কথামৃত'ই ঠাকুরের ভাবরাশি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচার করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ স্বামী, প্রেমানন্দ স্বামী, সুবোধানন্দ স্বামী এবং পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি রামকৃষ্ণশিষ্যগণ তাঁহার ছাত্র। এইজন্য ভক্তমণ্ডলীতে তিনি 'মাষ্টার মহাশয়' নামে পরিচিত। ঠাকুরও তাঁহাকে 'মাষ্টার' বলিয়া ডাকিতেন। 'কথামৃত-প্রণেতারূপে মহেন্দ্রনাথ অমর।

কলিকাতার শিমুলিয়া পল্লীতে শিবনারায়ণ দাসের লেনে মহেন্দ্রনাথ ১২৬১ সালের ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার শ্রীনাগপঞ্চমী দিবসে (১৮৫৪ খ্রীঃ ১৪ জুলাই) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন গুপ্ত এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। মধুসূদনের চারি পুত্র ও চারি কন্যার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ তৃতীয় সন্তান। মহেন্দ্রনাথের জন্মের কিছুদিন পরে পিতা সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্বক গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একখানি বাড়ী ক্রয় করেন। অদ্যাবধি সেই বাড়ী

বিদ্যমান এবং উক্ত পল্লীতে 'ঠাকুর বাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, দীর্ঘকাল শিবারাধনার ফলে মাতা এই পুত্র লাভ করেন। বালক পাঁচ বৎসর বয়সে বড় বাড়ীর ছাদ হইতে অনন্ত আকাশ দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতেন, তাঁহার মনে তদ্দর্শনে অনন্তের ভাব উদ্দীপিত হইত। বৃষ্টি হইলে তিনি ছাদে যাইয়া ভিজিতেন। নির্জন, নীরব, নিস্তব্ধ ছাদের উপর বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইতে তিনি আনন্দ বোধ করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি একদিন মাতার সহিত নৌকাযোগে মাহেশের রথ দেখিতে যান। ফিরিবার পথে সকলে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীর ঘাটে নামিলেন ভবতারিণী দেবীকে দর্শনের জন্য। বালক নবনির্মিত সুন্দর শ্বেতবর্ণ মন্দিরগুলি দেখিতে দেখিতে মাতার সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান এবং মাতাকে না পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকেন। মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া একজন অপরিচিত ব্যক্তি মন্দির হইতে বাহির হইয়া শিশুকে আদর করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ শিশু কার? এর মা কোথায় গেছে?' পরবর্তী কালে শ্রীম বলিতেন, 'হয় তা বা ঠাকুরই হবেন। কেন না, তার কিছুদিন আগে রাণী রাসমণি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঠাকুরই তখন মা কালীর পূজক।' ১৮৫৫ খ্রীঃ কালী-বাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীম মাতার সহিত তথায় যান। এই স্মৃতি তাঁহার মনে আজীবন সমুজ্জ্বল ছিল।

বালক মাতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মাতার ধর্মপ্রাণতা তাঁহার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেইজন্য মাতার মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত ও রোরুদ্যমান হন। তখন এক রাত্রে মাতাকে স্বপ্নে দেখেন। মাতা শোকমগ্ন সন্তানকে বলেন, 'বাবা! এত কাল তোমাকে আমি যত্ন ও রক্ষা করেছি। এখনও সেইরূপই করিতে থাকিব। কিন্তু তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না।'* পরবর্তী কালে শ্রীম বলিতেন, জগন্মাতাই পার্থিব জননীরূপে আমাকে পূর্বে লালন পালন করেছিলেন। এখনও তিনিই আমাকে গর্ভধারিণীর ন্যায়

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৩২ আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যাত্রয়ে প্রকাশিত স্বামী রাঘবানন্দের 'মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে ঘটনাটি উল্লিখিত।

সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।' কি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী! মহেন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুলে পড়িতেন। স্কুলে যাইবার এবং তথা হইতে ফিরিবার পথে ঠন্ঠনিয়ার কালী মন্দির পড়িত। তিনি মন্দিরের পাশ দিয়া যাইলেই দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন। কখনো কখনো সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে যাইয়া প্রণত হইতেন। তাঁহাদের গৃহের পাশের্ বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইত। তিনি পূজামণ্ডপে যাইয়া দেবীর সম্মুখে অনেকক্ষণ বসিয়া নিবিষ্ট মনে পূজাপাঠ শুনিতেন।

শৈশব হইতে তিনি পূজাপার্বণ, মহোৎসব এবং সাধুসন্ত দর্শন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বারুণী, রথযাত্রা, রাসপূর্ণিমা ও দশহরা প্রভৃতি উৎসব দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন এবং কখনো মাতার সহিত কখনো বা একাকী যাইয়া উহাতে যোগদান করিতেন গঙ্গাস্নান ও মেলাদি উপলক্ষে বা পুরীযাত্রার পথে যে সকল সাধু কলিকাতায় আসিতেন তিনি তাঁহাদের দর্শন ও সৎসঙ্গ করিতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বলিতেন, 'সাধুসঙ্গের সন্ধান করিবার ফলে সাধুশ্রেষ্ঠ পরমহংসদেবের সহিত আমি সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হই।' সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্তন কালে তিনি পক্ষীযজ্ঞের কথা উল্লেখ করিতেন। পক্ষীযজ্ঞে শালিকপ্রমুখ নানা বর্ণের এবং নানা জাতির পক্ষিসকল সমবেত হইল। সর্বশেষে আসিলেন পক্ষীরাজ পরমহংস। মহেন্দ্রনাথ খুব বুদ্ধিমান ও অধ্যয়নশীল ছাত্র ছিলেন। তিনি হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারপূর্বক উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. পরীক্ষায় তিনি পঞ্চম স্থান লাভ করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হন। সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান গৃহাদি নির্মিত হয়। তিনি ইংরাজি ভাষার অধ্যাপক সি. এইচ. টনি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। উক্ত অধ্যাপক অবসর গ্রহণপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পরও তিনি তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন। অধ্যাপক টনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটী ইংরাজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনাদির সহিত মহেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য ছাত্রজীবনে অধ্যয়ন করেন। তখন কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, ভট্টিকাব্য, মনুসংহিতা,

চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধীত হয়। পরবর্তী জীবনে তিনি ভক্তদের নিকট বলিতেন, "কলেজে পড়বার সময় 'কুমার সম্ভবে' মহাদেবের ধ্যানের বর্ণনা পড়ে খুব আনন্দ হত। কবি লিখেছেন, 'মহাদেবের ধ্যান যাতে ভঙ্গ না হয়, নন্দী শিবের কুটিরদ্বারে দাঁড়িয়ে বাম হাতে সোনার বেত নিয়ে ও ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটের উপর রেখে অনুচরগণকে এবং বনের বৃক্ষরাজীও পশুপক্ষী সকলকে ভয় দেখিয়ে বল্‌ছেন, কেহ যেন চপলতা বা শব্দ বা বিঘ্ন না করে। তা না হলে সে উপযুক্ত শাস্তি পাবে। তাঁর ভয়ে গাছপালা ছবির মত, পাখীরা বোবার মত, জীবজন্তু শান্তভাবে আর ভ্রমরগুলো নীরব হয়ে রইল।" 'শকুন্তলা' নাটকে কণ্বমুনির আশ্রমের বর্ণনা পাঠকালে তাঁহার মনে ঋষিদের কথা উদিত হইত এবং তাঁহাকে অভিভূত করিত। ভট্টিকাব্যের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেন, 'রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিবার পর বিশ্বামিত্র যখন যজ্ঞরক্ষার্থ তাঁহাদিগকে আশ্রমে আনিলেন তখনকার আশ্রমের বর্ণনায় আছে যে, বৃক্ষলতাগুলি যজ্ঞধূমে কজ্জলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।' ছাত্র জীবনে তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি কোন ভক্তকে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃত পড়। ঠাকুরের কাছে যাবার আগে আমি পাগলের মত ঐ বই পড়িতাম। আইন পড়িবার সময় তাঁহাকে 'মনুসংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র পড়িতে হয়। তিনি মনুসংহিতার অনেকগুলি নিয়ম সাধ্যমত পালন করিতেন।*

১৮৬৪ খ্রীঃ ৫ই অক্টোবর আশ্বিন মাসে বাংলাদেশে ভীষণ ঝড় হয়। তখন মহেন্দ্রনাথের বয়স নয় দশ বৎসর মাত্র। প্রবল ঝড়ের সময় যখন গাছপালা ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হইতেছিল তখন বালক একাকী ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া একাগ্র মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, তিনি বাল্যকাল হইতেই প্রার্থনাপরায়ণ। আজীবন তিনি এই অভ্যাস রক্ষা করেন। ছাত্রজীবনের শেষ দিকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার বয়স আঠার উনিশ বৎসর তখন তিনি ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা

* স্বামী জগন্নাথানন্দ প্রণীত 'শ্রীম-কথা' পুস্তকে 'জীবন কথা' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লিখিত।

নিকুঞ্জ দেবীকে বিবাহ করেন। নিকুঞ্জদেবী কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নী সম্পর্কীয়া ছিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীকে অশেষ ভক্তি করিতেন এবং অবসর সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে যাইতেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, তেলিপাড়ায়, কম্বুলিয়াটোলায় তাঁহাদের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ঠাকুর আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাদের বাড়ী আসিলেই তিনি স্বহস্তে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে সস্নেহে ধর্মশিক্ষা দিতেন এবং শিবপূজা করিবার উপদেশ দেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে নিকুঞ্জ দেবী পুত্রশোকে উন্মাদিনীপ্রায় হইলে ঠাকুর স্বহস্তে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করেন এবং সুমিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর যখন অসুস্থ হইয়া কাশীপুরে ছিলেন তখন নিকুঞ্জদেবী মাঝে মাঝে যাইয়া তাঁহার সেবা করেন।

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্রনাথ অর্থোপার্জন করিতে বাধ্য হন। আইন পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প ছাড়িয়া তিনি পিতাকে সাহায্য করিবার জন্য কিছুদিন সওদাগরী অফিসে কাজ করেন। তাঁহার পিতা উক্ত অফিসে চাকরী করিতেন। ইহার পরে তিনি অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। প্রথমে তিনি নড়াইল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। পরে সিটি স্কুল, এরিয়ান স্কুল, মডেল স্কুল, মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন (শ্যামবাজার শাখা) এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সিটি কলেজ, রিপন কলেজ এবং মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরাজি, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং রাজনীতির অধ্যাপক ছিলেন। কখনো কখনো এক সময়ে দুইটি কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। কর্মস্থলে তিনি পাল্কীতে যাইতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। তখন তিনি শ্যামবাজার মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তখন তিনি বিবাহিত এবং একটি সন্তানের পিতা। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঠাকুরের কাছে যাইবার পূর্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও উপাসনায় যোগ দিতেন। কেশবচন্দ্রের বাগ্মীতা এবং ধর্মোন্মত্ততা

তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। উত্তরকালে ভক্তদের নিকট তিনি বলিতেন, 'ওঃ! তাঁকে যে এত ভাল লাগত ও দেবতা বলে মনে হত তার কারণ, তিনি তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলি তাঁর নাম না দিয়ে প্রচার করছেন।'

মহেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহবিবাদে মর্মাহত হইয়া বরাহনগরে ভগ্নীপতি ঈশানচন্দ্র কবিরাজের বাড়ীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। তখন এই স্বার্থময় সংসার হইতে নিষ্কৃতির উপায় উদ্ভাবনে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সন্ধিক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার জীবনদেবতার সন্ধান ও সাক্ষাৎ পাইলেন। উক্ত বৎসর ফাল্গুন মাসে (মার্চ) রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে বরাহনগরবাসী সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সহিত কালীবাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া তিনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। প্রথম দর্শনে তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয় দর্শনে ঠাকুর তাঁহাকে গৃহস্থ-সন্ন্যাসের উপযোগী নিম্নলিখিত উপদেশ কয়েকটি দেন।—

"সব কাজ কর্‌বে, কিন্তু মন ঈশ্বরে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। বড় লোকের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে। কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে, 'আমার রাম', 'আমার হরি।' কিন্তু মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান? আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি থাকে। সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এসবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। কিন্তু এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জন

হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাত্‌তে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তার পর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনীকাঞ্চনের চিন্তা। সংসার জল, আর মনটী যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটী দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।"

গুরুকৃপায় মহেন্দ্রনাথের জীবনে এই সকল উপদেশ রূপায়িত হয়েছিল। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'নিরাকার। আমার এইটী ভাল লাগে।' ঠাকুর তাঁহাকে তদুপযোগী শিক্ষা দেন। তিনি শিষ্যকে একদিন মতি শীলের ঝিল দেখাইতে লইয়া যান। হ্রদের বিস্তৃত নির্মল জলে মাছ যেমন বিচরণ করে সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মে মন ডুবিয়া থাকিবে—এইরূপ ধ্যান করিতে শিক্ষা দেন। কিন্তু পরে ১৮৮৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে তাঁহাকে সাকার ধ্যানে উৎসাহিত করিয়া ঠাকুর বলেন, 'আর তোমায় বলছি, ঈশ্বরীয় রূপ মেন, অবিশ্বাস করো না। ঈশ্বরের রূপ আছে, বিশ্বাস কর। তারপর যে রূপটি ভালবাস সেই রূপ ধ্যান কর।' ১৮৮২ খ্রীঃ ২২শে অক্টোবর স্বীয় ধর্মজীবনের কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরকে তিনি বলেন, 'আমি দেখছি প্রথমে নিরাকারে মন স্থির করা সহজ নয়।' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'দেখলে ত? তাহলে সাকার ধ্যানই কর না কেন?' তখন হইতে তিনি সাকার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। মহেন্দ্র নাথ এখন হইতে নিয়মিতভাবে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন, কয়েকদিন না যাইলেই ঠাকুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন। একবার বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড রৌদ্রে পদব্রজেই শ্যামবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর ঘর্মাক্ত-কলেবর মহেন্দ্রনাথকে বলিলেন, 'তাই ত তোমার এ বারই নয়। (নিজেকে দেখাইয়া) এর মধ্যে কি একটা আছে যার টানে ইংলিশম্যান্‌রা (ইংরাজি শিক্ষিতরা) পর্যন্ত ছুটিয়া আসে।' কিছুদিন ঠাকুরের পূত সঙ্গে থাকিয়া মহেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার এবং তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ। গুরু শিষ্যকে বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর-বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে, এসব জানি! সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গপাঙ্গো দেখেছিলাম, তার মধ্যে তুমি ছিলে। তোমার সময় হয়েছে। পাখীর ডিম ফোটাবার সময় না হলে ডিম ফোটায় না। তোমার যে ঘর বলেছি সেই ঘরই বটে। তোমার 'চৈতন্য ভাগবত' পড়া শুনে তোমায় চিনেছি। তুমি আপনার জন, একসত্তা যেমন পিতা আর পুত্র। তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন? কলিকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারো প্রীতি হল না, তোমার হল কেন? এর কারণ, জন্মান্তরের সংস্কার।"

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যাইয়া নীরবে তাঁহার কথামৃত পান করিতেন। ঠাকুর অন্যত্র যাইলে তিনিও তথায় উপস্থিত হইতেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মন ঠাকুরের চিন্তায় ডুবিয়া গেল। তাহা দেখিয়া ঠাকুর একদিন কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'মাষ্টার এখন আনন্দ পেয়েছে।' আবার কখন কখন বলিতেন, 'এর সখী ভাব।' গুরু শিষ্যকে উত্তম অধিকারী জানিয়া উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?' শিষ্য বলিলেন, 'ঈশ্বরের শক্তি আপনাতে মূর্ত।' ১৮৮৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে শিষ্য গুরুকে বলেন, 'আমার মনে হয়, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক।' ঠাকুর একদিন অবতার-তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'অবতার যেন একটি ছিদ্র যাহার মধ্য দিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়।' তখন শ্রীম বলিলেন, 'আপনিই সেই ছিদ্র।' ইহা শুনিয়া ঠাকুর সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, 'শেষে তুমি তা বুঝেছ, বেশ।' আর একদিন শ্রীম বলিলেন, 'সাকার রূপের মধ্যে ঈশ্বরের নররূপ আমার ভাল

লাগে।' তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'ইহাই যথেষ্ট এবং তুমি ত আমাকে দেখছ।' আর একদিন শিষ্য গুরুর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, গুরুধ্যানে তাঁহার তৃপ্তি পূর্ণ হইতেছে না। তখন গুরু বলিলেন, 'ঈশ্বরে ভক্তের তৃপ্তি অসীম, সে তৃপ্তির শেষ নাই।'

অবসর পাইলেই মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে দুই চার দিন কাটাইতেন। তখন সারাদিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি গুরুসঙ্গ করিতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় সমগ্র ডিসেম্বর মাসটি শিষ্য গুরুসমীপে অবস্থান করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে ঠাকুর ভাবাবেশে শিষ্যের জন্য জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, 'মা তাকে এক কলা শক্তি দিলে কেন? বুঝেছি, তাতেই তোমার কাজ হবে।' আর একদিন মহেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগের ইচ্ছা ঠাকুরের নিকট প্রকাশ করেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, 'যতদিন তুমি এখানে আসনি ততদিন তুমি আত্মবিস্মৃত ছিলে। এখন তুমি নিজেকে জানতে পারবে। ভগবানের বাণী যারা প্রচার করবে তাদের তিনি একটু বন্ধন দিয়ে সংসারে রাখেন। তা না হলে তাঁর কথা বলবে কারা? সেইজন্য মা তোমাকে সংসারে রেখেছেন।' গুরু একদিন শিষ্যের জন্য জগদম্বার নিকট এইভাবে প্রার্থনা করেন, 'মা তাকে সংসারত্যাগ করাইও না, শেষে যা হয় করো। যদি তুমি তাকে সংসারে রাখ, মাঝে মাঝে তাকে দেখা দিও। তা না হলে সে সংসারে থাকবে কি করে? জীবনের আনন্দ পাবে কোথায়?' গুরুর আদেশে শিষ্য গৃহস্থ-সন্ন্যাসীরূপে সংসারে রহিলেন।

শ্রীম নরেন্দ্রনাথকে গভীর প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হইবার পর যখন তাঁহার গৃহে অন্নকষ্ট উপস্থিত, কোথাও চাকরী পাইতেছেন না, আত্মীয়গণও দুর্দিনে সরিয়া পড়িয়াছেন, তখন মাষ্টার মহাশয়ই মেট্রোপলিটান স্কুলে তাঁহাকে শিক্ষকতা-কর্ম জোগাড় করিয়া দেন। তিনি দুই তিন বার নরেন্দ্রনাথকে গোপনে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানবাটীতে অসুখে শয্যাশায়ী তখন মাষ্টার মশাই শ্রীগুরুর জন্মস্থান কামারপুকুর দর্শন করিতে যান। সেই সময় তিনি জয়রামবাটী, শিহড়, শ্যামবাজার

প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সঙ্গে গরু-গাড়ী থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্ধমান হইতে অধিকাংশ পথ পদব্রজে গিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'যেতে যেতে শুনলাম, সেই পথে এক জায়গায় ডাকাতের ভয়। সঙ্গে অনেক টাকা আছে মনে করে ডাকাতরা একবার এক যুবককে মেরে দেখে, তার কাছে চারটী পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন তারা তার দেহটা রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে চলে যায় এবং যাবার সময় তারা সেই চারটি পয়সা তার বুকের উপর রেখে দেয়। কয়েক দিন পরে আমরা নিরাপদে কামারপুকুরে গিয়ে পৌছালাম।' মাষ্টার মহাশয় আরও বলেন, 'সেই সময় চোখে কে যেন নবানুরাগের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল। তথায় সবই ঠাকুরের সহিত জড়িত দেখতাম। যাকে দেখতাম তাকে প্রণাম করতাম! দূর থেকে কামারপুকুর দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।'

কামারপুকুর গ্রামের পথে চলিতে চলিতে তাঁহার মনে হইত, ঠাকুরের পদধূলি সর্বত্র বিকীর্ণ। ঠাকুরের বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দে পুলকিত হইতেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'কি করে গেলে ও ডাকাতের দেশে ? আমি ভাল হলে এক সঙ্গে যাব।' ঠাকুর অন্য এক ভক্তকে বলিলেন, "দেখ, তার কি ভালবাসা! কেউ তাকে বলেনি, ভক্তির আধিক্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এত কষ্ট সহ করে সে ঐ সকল স্থানে গিয়াছিল। কারণ, আমি ঐ সকল স্থানে যাতায়াত করতাম। এর ভক্তি বিভীষণের মত। বিভীষণ কোন মানুষ দেখলে ভাল করে সাজিয়ে পূজা, আরত্রিক করতেন। আর বলতেন, এই আমার প্রভু রামচন্দ্রের একটি মূর্তি।" ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীম আট নয় বার কামারপুকুর গিয়াছিলেন। একবার তাঁহার মনের অবস্থা এমন হয় যে, কামারপুকুরে স্থায়ীভাবে বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। সেখানে থাকিবার আয়োজনও হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমাকে সকল কথা নিবেদন করায় তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'বাবা, ও জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো, ওখানে থাকতে পারবে না। পাড়া গাঁ ম্যালেরিয়ার জায়গা, কি করে থাকবে?' মাতার আদেশ প্রতিপালিত হইল। ঠাকুর যখন জীবিত ছিলেন তখন শ্রীম দার্জিলিঙে যাইয়া

হিমালয় দর্শন করেন। তখন কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখর দর্শনে ঈশ্বরের বিরাটত্ব অনুভব করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন, হিমালয় দর্শন করে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল?'

ঠাকুরের তিরোভাবের পর শ্রীম পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে গমন করেন। কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে কিছু নিবেদন করা হইলে তিনি বালকের মত সন্দেশের চাঙারিটি লুকাইয়াছিলেন। কাশীতে স্বামী ভাস্করানন্দের সহিত তাঁহার ভগবৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। অযোধ্যায় তিনি রঘুনাথদাস বাবাজীর দর্শন লাভ করেন। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-কুটীরে কিছুদিন তিনি তপস্যারত ছিলেন। কিন্তু ঘরটি খুব আর্দ্র বলিয়া তিনি অচিরে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তিনি এই অসুখে এত দুর্বল হইয়া পড়েন যে, তাঁহার চলৎশক্তি লুপ্ত হয়। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে একটী গাড়ীতে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেন। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গলাভের জন্য তিনি বরাহনগর মঠে প্রায়ই যাইতেন। শ্রীগুরুর স্মৃতিপূত মঠটি তাঁহার এতই পবিত্র মনে হইত যে, মঠের চৌবাচ্চার জল স্বগাত্রে ছিটাইতেন বিশুদ্ধ হইবার জন্য। দক্ষিণেশ্বরে নহবৎঘরে এবং বরাহনগর মঠে তিনি মাঝে মাঝে যাইয়া বাস করিতেন।

তিনি স্বগৃহে অবস্থানকালে গভীর রাত্রে উঠিয়া বিছানাটি সঙ্গে লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের উন্মুক্ত বিস্তৃত বারান্দায় যাইয়া শুইতেন। গৃহহীনদের মধ্যে নিদ্রা যাইয়া গৃহহীনতার ভাব মনে মুদ্রিত করিতেন। কেন তিনি এত কঠোরতা করিয়াছিলেন—জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, 'গৃহ এবং পরিবারের ভাব মন থেকে যেতে চায় না, আঠার মত মনে লেগে থাকে।' কোন মেলা উপলক্ষে গঙ্গার তীরে সাধু সমবেত হইলে তিনি গভীর রাত্রে তাঁহাদের কাছে যাইতেন এবং দেখিতেন কেহ ধুনী জ্বালিয়া ধ্যানমগ্ন, কেহ বা হাতে মালা লইয়া জপে নিযুক্ত। কখন কখন তিনি হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া পুরীধাম হইতে প্রত্যাগত তীর্থযাত্রীদের আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দেখিতেন, কখনো বা তাঁহাদের নিকট একটু মহাপ্রসাদ চাহিয়া খাইতেন। ঠাকুরের কথা—

মহাপ্রসাদ ব্রহ্মের স্বরূপ। কলেজে অধ্যাপকরূপে কাজ করিবার সময়ও অবসরকালে নির্জন কক্ষে যাইয়া স্বীয় দিনলিপি হইতে ঠাকুরের কথা পাঠ ও চিন্তা করিতেন।

স্বকর্মে ব্যস্ততার জন্য শ্রীম ঠাকুরের কাছে ঘন ঘন যাইতে পারিতেন না। সেইজন্য যেদিন যাইতেন সেদিন ঠাকুরের নিকট যাহা যাহা শুনিতেন তাহা লিখিয়া রাখিতেন। এই সকল দিনলিপি হইতেই 'কথামৃতে'র উৎপত্তি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'কথামৃত' প্রথমে ইংরাজি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা পড়িয়া স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন, 'যখন আমি ইহা পড়ি তখন আনন্দে অভিভূত হই। ইহার বর্ণনাকৌশল অতি সুন্দর, ভাষা খুব সরল ও প্রাঞ্জল। আমি এখন বুঝি, আমাদের অন্য কেহ ইহা লিখিতে চেষ্টা করে নাই কেন। এই মহৎ কার্য্য আপনার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।' পরে 'কথামৃত' বাংলা পত্রিকাসমূহে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ভক্তবীর রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে শ্রীম ইংরাজি ছাড়িয়া বাংলায় 'কথামৃত' লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি অচিরে পাঠক-প্রিয় হইয়া উঠে। শ্রীযুক্ত এন. ঘোষ 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, 'কথামৃতে'র ভাষা বাইবেলের মত সরল। যদি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক ও চৈতন্যের কথা এইভাবে লিপিবদ্ধ হইত তাহা হইলে সেইগুলি কি অমূল্য ধর্মসম্পদই না হইত!'

১৯০৫ সালে 'কথামৃতে'র দ্বিতীয় ভাগ, ১৯১২ সালে তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১৬ সালে চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কথামৃত' ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত হয়। একদিন বৈকালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে স্বামিজীর ঘরের সামনের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। এমন সময় মাষ্টার মহাশয় কয়েকজন ভক্তের সহিত মঠের মন্দিরাদি দর্শনান্তে তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি মাষ্টার মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বের এক চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, মাষ্টার মহাশয়, আপান কি অদ্ভুত 'কথামৃত'ই লিখেছেন। তাতে কি মোহিনী শক্তিই যে আছে তা মুখে বলে শেষ করা যায় না। যে পড়ে

সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। 'কথামৃত' পড়েই অধিকাংশ যুবক সাধু হতে মঠে আসে। লোকে বলে, এই রকমটি আর কোন যুগেই হয় নি। অপর কেহ যদি এরকম 'কথামৃত' লেখবার চেষ্টা করে সেটা নকল হবে, আসল আর হবে না।'

প্রায় ত্রিশ বৎসর বিভিন্ন স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করিবার পর ১৯০৫ খ্রীঃ তিনি নকড়ি ঘোষের পুত্রের নিকট হইতে ঝামাপুকুরের মর্টন ইনস্টিটিউশনটি ক্রয় করেন। এই স্কুল কিছু দিন পরে ৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। স্কুলবাড়ীর চারতলার ঘরখানিতে তিনি থাকিতেন। তাঁহার নিকট প্রাতে ও সন্ধ্যায় বহু ভক্তের সমাগম হইত। তিনি তাঁহাদের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। মাষ্টার মহাশয় প্রায় বিশ বৎসর এই ঘরে বাস করেন। তথায় অবস্থান কালে দিনে একবার তিনি স্বগৃহে যাইতেন অল্প সময়ের জন্য কাজকর্মের ব্যবস্থা করিতে। স্কুলের তত্ত্বাবধান করিয়া তিনি স্বকক্ষে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের চিন্তায় মগ্ন হইতেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর ভগবৎবাণী প্রচার করিলেও তিনি কখনো গুরুগিরি করেন নাই, কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, mutual admiration (পরস্পরের প্রশংসা) ছেড়ে দাও। তুলসী ও ফুল গাছে পূর্ণ ছাদে ভক্ত-বেষ্টিত হইয়া নীলাকাশতলে শ্বেতশ্মশ্রু উজ্জ্বলনয়ন, প্রশান্তবদন, সৌম্যমূর্তি মহেন্দ্রনাথকে ভগবদ্‌প্রসঙ্গে তন্ময় দেখিলে মনে হইত, প্রাচীন ভারতের তপোবনে বৈদিক ঋষি শিষ্যসমাবৃত হইয়া উপবিষ্ট। 'কথামৃত' প্রকাশের পর গুপ্ত মহাশয় আর গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না। বাংলার নানা স্থান এবং ভারতের বিভিন্নপ্রদেশ, এমন কি সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়া এই বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

১৯১২ খ্রীঃ দুর্গাপূজার পর শ্রীম শ্রীশ্রীমার সহিত কাশীধামে গমন করেন। তথায় কিছুদিন থাকিবার পর তিনি নানা তীর্থে বৎসরাধিক যাপনান্তে হরিদ্বারে উপনীত হন। হৃষীকেশে ও স্বর্গাশ্রমে সন্ন্যাসীদের সহিত চার পাঁচ মাস এক কুটীরে ছিলেন। স্বর্গাশ্রমে যে কুটিয়ায় তিনি থাকিতেন উহার পার্শ্বে একটী প্রস্রবণ পাহাড় হইতে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিল। তথায় গভীর রাত্রে

ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বন্য জন্তু জল খাইতে আসিত। সেইজন্য শ্রীম অধিক রাত্রে উঠিলে লণ্ঠন জ্বালিতেন। কনখলে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অনতিদূরে গঙ্গাতীরবর্তী কুটিয়ায় তিনি মাসাধিক বাস করেন। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন। গুরুভ্রাতাদ্বয়ের সহিত রামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে মহানন্দে তাঁহার দিন কাটিত। ইহার পর তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া ঝুলন দর্শন করেন। ঝুলনোৎসবে 'রাসধারীর গান' তাঁহার খুব ভাল লাগিত। ঠাকুরের কথা—গৃহে থাকিলেও মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়। তাই সত্তর বৎসর বয়সেও শ্রীম এই গুরুবাক্য বিস্মৃত হন নাই। ১৯২৩ খ্রীঃ মিহিজামে নয় মাস এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে পুরীধামে চার মাস কাল তিনি নির্জন বাস করেন।

বাহিরে গৃহী হইলেও অন্তরে তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। তাই তিনি হবিষ্যান্ন ভোজন, পর্ণকুটীরে বাস, বৃক্ষমূলে উপবেশন এবং একাকী ভ্রমণাদি ভালবাসিতেন। মিহিজামে অবস্থান কালে পাকাবাড়ী থাকা সত্ত্বেও তিনি পর্ণকুটীরে নয় মাস ছিলেন। অবশ্য তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণ পাকাবাড়ীতে থাকিতেন। বর্ষাকালে মেঘ ও বিদ্যুৎ দেখিলে কঠোপনিষদের এই শ্লোকটী তিনি আবৃত্তি করিতেন।—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

প্রভাতে অরুণালোক দর্শনে তাঁহার হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইত। তৎক্ষণাৎ তিনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ আরম্ভ করিতেন। আর বলিতেন, 'ঋষি সূর্য্যের ভিতরে জগৎপ্রসবিতাকে দর্শন করেছিলেন। তাই তাঁর মুখ থেকে গায়ত্রী বেরিয়েছিল। ঋষিরাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনিই সকলকে চালাচ্ছেন। তিনিই যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র।' ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে স্কুলবাড়ীতে বসিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ' শুনাইতেছিলেন। তখন উপনিষদের ভাবে এত অভিভূত হইলেন যে, বইখানি রাখিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। এক ভক্ত কিছুক্ষণ বাতাস করিবার পর তিনি কথা বলিতে পারিলেন। স্বামী কমলেশ্বরানন্দের আগ্রহে তিনি একবার পাঁচ ছয় মাস ভবানীপুরস্থ গদাধর আশ্রমে ছিলেন। তখন

সেখানে নিত্য বহু ভক্তের সমাগম হইত। কার্য্যোপলক্ষে স্কুলবাড়ীতে দুই একদিনের জন্য যাইতেন মাত্র। তখন গদাধর আশ্রমে বলিয়া যাইতেন, 'আমি এখানে খাব না। এক ভক্তের বাড়ী যাচ্ছি, সেখানে খাব।' স্বগৃহকে তিনি 'ভক্তের বাড়ী' বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তাঁহার বাড়ীটি 'ঠাকুরবাড়ী' বলিয়া পরিচিত। শ্রীমা উক্ত বাড়ীতে পক্ষাধিক বা মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বাস করিতেন। উক্ত বাড়ীতে গত ষাট বৎসরাধিক নিত্য ঠাকুরপূজা হয়। মা সেখানে থাকিলে তিনিই ঠাকুরপূজা করিতেন।

১৯২২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ অন্তিম অসুখে শয্যাশায়ী হইলেন। তখন শ্রীম স্কুলবাড়ী হইতে প্রত্যহ তথায় যাইয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। যেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাসমাধির সংবাদ আসিল সেদিন তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন আহার বা কাহারো সহিত দেখা করেন নাই। সন্ধ্যায় যখন ঘরের দরজা খুলিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন, তখনো তাঁহার চক্ষে জল ও মুখে কথা নাই। প্রিয় গুরুভ্রাতৃ-বিয়োগে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পরদিন ব্যাকুলভাবে পদব্রজে ডাঃ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি ভক্তদের বাড়ীতে যাইয়া মহারাজের কথা শুনিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া ছিলেন। দিনের পর দিন এইরূপ চলিয়াছিল। একদিন বৈকালে স্কুলবাড়ীর চারতলার ঘরে গদাধর আশ্রম হইতে সমাগত কোন সাধুকে দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন এবং গদগদ চিত্তে তাঁহাকে বলিলেন, 'দেখ, তোমায় এক অদ্ভুত জিনিষ দেখাব।' এই বলিয়া মহারাজের একখানি ফটো আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন এবং গাহিলেন।—

উদ্ধবরে তুই কিনা কৃষ্ণ সখা মথুরাতে।
শ্রীবৎস-চিহ্ন নাই তোর বক্ষেতে' ॥ ইত্যাদি

গান গাহিতে গাহিতে প্রেমাশ্রুতে তাঁহার গণ্ডদেশ প্লাবিত হইল। কাহারো মৃত্যু-সংবাদ পাইলে তাঁহার বৈরাগ্য বহু গুণ বর্ধিত হইত। তিনি বলিতেন, 'পুরাকালে মিশরে নরবলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। বলিদানের আগে লোকটাকে সাত দিন নানা রাজভোগে রাখা হত। কিন্তু, সে জানত সাতদিন পরে

তার মৃত্যু নিশ্চিত। সেইরকম মৃত্যুচিন্তা করলে কোন জিনিষে আসক্তি থাকে না।'

আহারে ও পরিধানে মহেন্দ্রনাথ অতিশয় সরল ছিলেন। দুধ ভাত তাঁহার প্রধান আহার ছিল। দেহরক্ষার তিন মাস পূর্বে তিনি ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া বাস করেন। শেষ বৎসর তিনি 'কথামৃতে'র পঞ্চম ভাগ রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং দেহ-ত্যাগের পূর্বরাত্রে উহার প্রুফ দেখা শেষ করেন। শেষ জীবনে তিনি হাতের স্নায়ুশূলে অতিশয় কষ্ট পান। তখনো নিজে কাপড়ের পুঁটলী গরম করিয়া নিজ হাতে সেঁক দিতেন, কাহারো সেবা লইতেন না। তাঁহার বাড়ীতে ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে বসিয়া কোন ভক্ত ধ্যান করিতেছিলেন। ধ্যানে তাঁহার এই অলৌকিক দর্শন হইল। তিনি দেখিলেন, শ্রীম নিশ্চিন্তভাবে এক অত্যুচ্চ স্থানে উঠিলেন ও তথা হইতে অসীম শূন্যে ঝম্পদানের চেষ্টা করিলেন। তখন ভক্তটি ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' ভক্তটি এই স্বপ্নদর্শন অন্যের কাছে বিবৃত করিলেন। কিন্তু সকলে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বাভাষ সূচিত। ১৯৩২ খ্রীঃ ৩রা জুন ফল-হারিণী কালীপূজার দিন ভক্তগণের অনেকে দক্ষিণেশ্বরে ও গদাধর আশ্রমে পূজা দেখিতে গেলেন। সেদিন তাঁর স্নায়ুশূল বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার নাড়ী ভাল। পরদিন প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় 'মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও'—বলিয়া তিনি মহাসমাধিমগ্ন হইলেন। অপরাহ্ন চারটার সময় গঙ্গাতীরে কাশীপুর শ্মশানে ঠাকুরের সমাধিস্থানের দক্ষিণে তাঁহার নশ্বর দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। শত শত সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার চিতাস্থলে ভক্তগণ কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মহেন্দ্রনাথ আটাত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ঠাকুরের দর্শন লাভের পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অর্ধ শতাব্দী তিনি একনিষ্ঠভাবে রামকৃষ্ণধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছেন। এমন গুরুগতপ্রাণতা, এমন অনাড়ম্বর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা সুদুর্লভ।

ইংরাজ সাংবাদিক ও পর্য্যটক পল ব্রাণ্টন ১৯৩০-৩১ খ্রীঃ ভারতে আসিয়া

মাষ্টার মহাশয় প্রমুখ মহাপুরুষদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার চিত্তাকর্ষক গ্রন্থে * তিনি শ্রীম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন বাইবেল-বর্ণিত পূজনীয় প্যাট্রিয়ার্ক, যেন মুসার যুগের মানুষ। সেই গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তির সম্মুখে লঘুতা ও চপলতা বা নাস্তিকতা অন্তর্হিত হয়। তিনি যেন প্রাচীন প্যালেষ্টাইনের এক প্রফেট। কি মহান্ ও শ্রদ্ধেয় মূর্ত্তি! সততা, সাধুতা, ভক্তি, বিশ্বাস ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমগ্র জীবন বিবেক-বাণী অনুসরণ করিলে যে আত্মমর্য্যাদা লাভ হয় তাহা তাঁহাতে মূর্ত। তিনি যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন তাহা তিনি সদা সকলকে বিতরণ করিতেছেন। আমি হয়ত তাঁহার কথাগুলি কালক্রমে ভুলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাঁহার দিব্য ব্যক্তিত্ব কখনো বিস্মৃত হইব না।"

---

* পল ব্রান্টন প্রণীত An Englishman's Search in Secret India.

বাইশ

রামচন্দ্র দত্ত

"বীরভক্তিস্বরূপায় রামকৃষ্ণপ্রচারিণে।
আমৃত্যোরেকনিষ্ঠায় রামচন্দ্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত অন্যতম প্রধান। তিনি ঠাকুরের সর্বপ্রথম শিষ্য ও প্রচারক এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময় শ্রীগুরুর প্রথম দর্শন লাভ করেন। কলিকাতায় কাঁকুড়গাছি পল্লীতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ যোগোদ্যানের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। ঠাকুরের নির্দেশে উক্ত যোগোদ্যান ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার জীবৎকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুর তথায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহা এখন বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত। ঠাকুর যে মাসে দেহরক্ষা করেন সেই মাসেই এই যোগোদ্যানে তাঁহার ভস্মাস্থির কিয়দংশ প্রোথিত হয়, বাকী অংশ ১৯০০ খ্রীঃ বেলুড় মঠে। শ্রীগুরুর সর্বপ্রথম জীবনী তৎকর্তৃক বাংলায় রচিত এবং ১৮৯০ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ খ্রীঃ তিনি কলিকাতার স্টার থিয়েটার, সিটি থিয়েটার এবং মিনার্ভা থিয়েটারে বাংলায় আঠারটী বক্তৃতা দিয়া ঠাকুরের অবতারত্ব ও অমৃত বাণী প্রচার করেন। ঠাকুরের উপদেশাবলী তৎকর্তৃক সংগৃহীত এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ মে মাসে ঠাকুরের অদর্শনের বৎসরাধিক কাল পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থ তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর এই মাসিকটী চলিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিকট জ্ঞাতি ছিলেন। তিনিই স্বামীজীকে প্রথমে ঠাকুরের নিকট লইয়া যান।*

রামচন্দ্র দত্ত ১২৫৮ সালে ১৪ই কার্তিক শুক্লা ষষ্ঠী তিথি (১৮৫১ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে) বুধবারে কলিকাতার এক পুরাতন পল্লীতে কায়স্থ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ নিকুঞ্জবিহারী দত্ত কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে বাস

* স্বামী যোগবিনোদ প্রণীত 'রামচন্দ্র মাহাত্ম্য' দেখুন।

করিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব এবং পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অনেক মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শোনা যায়, তাঁহারা অনেকেই প্রায় সন্ন্যাসী ছিলেন। পিতামহের নানা সদ্‌গুণের সহিত হাঁপানী রোগটীও পৌত্র লাভ করেন! পিতা নৃসিংহপ্রসাদ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। নিকুঞ্জবিহারীর মৃত্যুর পরে নৃসিংহপ্রসাদ সর্বস্বান্ত ও নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। অর্থাভাবে পিতৃগৃহটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া তিনি গৃহহীন হন। রামচন্দ্রের মাতা তুলসীমণি অতিশয় দানশীলা ও দয়াবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার আহারকালে দ্বারে অভুক্ত অতিথি আসিলে তিনি স্বীয় আহার্য্য তাহাকে দিয়া পরমানন্দে উপবাসিনী থাকিতেন। বৎসরের বহুদিন তাঁহার এই ভাবে কাটিত। আড়াই বৎসর বয়সে রামচন্দ্র মাতৃহীন হন। মাতৃহীন শিশু আত্মীয়গণ কর্তৃক লালিত-পালিত হন।

দেবতার পূজা ও ভোগ নিবেদন এবং সঙ্গীদিগের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ রাম-চন্দ্রের একটী প্রিয় বাল্যক্রীড়া ছিল। কখনো বা বালক গোপী সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নৃত্য করিতেন। নারিকেলডাঙ্গায় শ্রীনিবাস বাবাজীর আশ্রম ও শিখের বাগান নামে দুইটি ধর্মস্থান ছিল। এই দুই স্থানে যে সকল সাধুসন্ন্যাসী আসিতেন রামচন্দ্র সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতেন। বৈষ্ণব বংশে তাঁহার জন্ম। পিতৃপিতামহের বৈষ্ণবাচার তিনি কখনো বর্জন করেন নাই। তিনি আবাল্য নিরামিষভোজী ছিলেন, জীবনে কখনো মাংস ভোজন করেন নাই। দশ বৎসর বয়সে হরিপালে এক কুটুম্বের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার ভোজনপাত্রে নিষেধ সত্ত্বেও মাংসের তরকারী পরিবেশিত হওয়ায় তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হইয়া পদব্রজে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সেইজন্য তাঁহাকে পথে অনাহার, অনিদ্রা ও অপমান ভোগ করিতে হয়। এক বার তাঁহার পত্নী কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তারগণ মাংসের ঝোল পথ্যরূপে ব্যবস্থা দেন। রামচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার স্ত্রী মরিয়া যায়, যাইবে। তথাপি আমি মাংস বাটীতে আনিয়া কুলাঙ্গার হইব না।' সৌভাগ্যক্রমে, মাংস পথ্য ব্যতীত তাঁহার পত্নী রোগমুক্ত হইলেন।

রামচন্দ্র বাল্যে নারিকেলডাঙ্গা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি জেনারেল এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভর্তি হন। তথায় এণ্টান্স ক্লাশ অবধি পড়িয়া ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী পড়েন। উক্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রতাপনগরে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছু কাল পরে রাসায়নিক কুইনাইন পরীক্ষক সি. এইচ. উড সাহেবের অন্যতম সহকারীরূপে তিনি নিযুক্ত হন। তখন বালখানানিবাসী ক্ষেত্রমোহন বসুর একমাত্র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উড সাহেবের নিকট তিনি রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; মিঃ উড রামচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ ও সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উভয়ের নামাঙ্কিত একটী ঘড়ি এবং বিবিধ পুস্তক তাঁহাকে উপহার দিয়া যান। রামচন্দ্র কুর্চি গাছের ছাল হইতে কুর্চিসিন নামক একটী ঔষধ আবিষ্কার করেন। ইহা রক্তামাশয়ের মহৌষধ। এই আবিষ্কারের দ্বারা দেশ বিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি হয়, তিনি বিলাতের রাসায়নিক সভার সভ্য হন। ইহার পর তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদিগের অধ্যাপক এবং সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুবাজারস্থ ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভায় ১২৯৯ সালের শেষ ভাগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য সভাসমিতিতেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা হইত। এইরূপে তিনি চব্বিশ বৎসর সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে তিনি নাস্তিক হইয়া পড়েন। অবসর সময়ে তিনি নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে ব্যাপৃত হইতেন। এই সময়ে তিনি একটি সখের যাত্রাদলের পরিচালক হন। বেলঘরিয়া গ্রামে যাত্রার আখড়া ছিল। তিনি নাটক রচনায় ও নাট্যাভিনয়ে সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার দুই একখানি নাটক মুদ্রিত হইয়াছিল।

নাস্তিকতার নেশা চারি পাঁচ বৎসর রহিল। তখন তাঁহার এক কন্যার মৃত্যু হয়। কন্যার অকাল মৃত্যুতে তিনি শোকসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কালীপূজার সন্ধ্যায় তাঁহার মনে জিজ্ঞাসা উঠিল, 'ঈশ্বর আছেন কি? তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় কি?' তিনি স্বীয় কুলগুরুর কাছে এই বিষয়ে কোন আলোক পাইলেন না। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ে

মিশিয়াও সন্দেহের নিরসন হইল না। কোন যোগাচারী সাধক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'বাপু! তোমার যে রোগ তাতে স্বয়ং শিব ভিন্ন কেহ উহাকে আরোগ্য করিতে পারিবে না। একমাত্র তিনিই তোমার মনের সন্দেহ ঘুচাইতে সমর্থ।' এই সময়ে তিনি মনোমোহন মিত্র ও গোপালচন্দ্র মিত্রের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন। সম্ভবতঃ ইহা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ। ঠাকুরের ঘরের সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ। কি বলিয়া ডাকিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া 'নারায়ণ' বলিয়া নমস্কার করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। রামচন্দ্র উপবিষ্ট হইলে ঠাকুর মৃদুমধুর হাস্যে বলিলেন, 'হ্যাঁগা তুমি নাকি ডাক্তার? আমার হাতটা দেখ না!' রামচন্দ্র বিস্মিত। সহস্র বৎসরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেমন প্রদীপের আগমনে দূরীভূত হয় সেইরকম রামচন্দ্রের নাস্তিকতা ঠাকুরের দর্শনমাত্রেই তিরোহিত হইল।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঈশ্বর আছেন কি? তাঁহাকে কিরূপে দেখা যায়?' ঠাকুর বলিলেন, 'দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে একটিও তারা দেখা যায় না। সেইজন্য তারা নাই একথা বলা যায় না। দুগ্ধে মাখন আছে, কিন্তু দুগ্ধ দেখিলে কি মাখনের কোন জ্ঞান জন্মে? মাখন দেখিতে হইলে দুগ্ধকে দধি করিতে হয়, পরে সূর্যোদয়ের পূর্বে দধি মন্থন করিলে মাখন পাওয়া যায়। কোন বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে হইলে অগ্রে যাহারা উহাতে মাছ ধরিয়াছে তাহাদের নিকট জানিতে হয়—কি মাছ আছে, কি টোপ খায়, কি চার প্রয়োজন, ইত্যাদি। তাঁহাদের পরামর্শানুসারে মাছ ধরিবার চেষ্টা করিলে সে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে। আবার ছিপ ফেলিবামাত্র মাছ ধরা যায় না, স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। ক্রমে সে 'ঘাই' ও 'ফুট' দেখিতে পায়। তখন তাহার বিশ্বাস হয় যে, উহাতে মাছ আছে ও ক্রমে সে মাছ ধরিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। সাধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া মন-ছিপে, প্রাণ-কাঁটায়, নাম-টোপে ভক্তি-চার ফেলিয়া অপেক্ষা করিলে ঈশ্বরের ভাব-রূপ 'ঘাই' ও 'ফুট' দেখিতে পাওয়া যায়। পরে একদিন তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়।' ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের

ফলে রামচন্দ্রের মনে হইয়াছিল, ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহাকে দেখা যায় না। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয়। যাঁহার মায়া এত সুন্দর ও মধুর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন? তাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহার সহিত কথা বলা যায়।' রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই জন্মে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।' এই বলিয়া ঠাকুর নিম্নলিখিত গানটি গাহিলেন—

'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধা-হ্রদে (যদি) চিত্ত ডুবে রয়।
তবে জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়॥'

রামচন্দ্র—ঈশ্বর আছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ কিছু না দেখিলে অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

ঠাকুর—'সান্নিপাতিক রোগী এক পুকুর জল পান করিতে চায়, এক হাঁড়ি ভাত খাইতে চায়। কবিরাজ কি সে কথায় কান দেন? আজ জ্বর হইয়াছে, কাল কুইনাইন দিলে কি জ্বর বন্ধ হয়? না, ডাক্তার রোগীর কথায় ব্যবস্থা করিতে পারেন? জ্বর পরিপাক হইলে ডাক্তার আপনিই কুইনাইন দিয়া থাকেন। রোগীকে আর কিছু বলিতে হয় না।' প্রথম দর্শনেই রামচন্দ্র ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি প্রত্যেক রবিবার প্রাতে ঠাকুরের নিকট যাইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেন। রামচন্দ্র বলিতেন, 'রবিবার সন্ধ্যায় ঠাকুরের নিকট হইতে যখন গৃহে ফিরিতাম তখন তাঁহার কথামৃত পান করিয়া আমরা আনন্দে বিভোর হইতাম। ইচ্ছা হইত না যে, গৃহে ফিরিয়া আসি। সংসারকে তখন সংসার বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা প্রাণের আবেগে প্রায়ই গান করিতাম—

'গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার॥'

ইহার কিছুদিন পরে একদিন নিশার শেষে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি

কোন এক পরিচিত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া উঠিলেন। তখন ঠাকুর আসিয়া তাঁহাকে একটি মন্ত্র দিলেন ও প্রত্যহ স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্রে ইহা এক শত বার জপ করিতে বলিলেন। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তাঁহার সর্বশরীর পুলকে শিহরিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্তটি বলিলেন। ঠাকুর স্বপ্নের কথা শুনিয়া আনন্দসহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'স্বপ্নসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার ঠাঁই।' এইসকল সত্ত্বেও তাঁহার বিজ্ঞান-বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কে অবিশ্বাস আসিত। অবিশ্বাসের উত্তাপে অস্থির হইয়া একদিন বেলা এগারটার সময় তিনি পটলডাঙ্গায় গোলদীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া কোন বন্ধুর নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতেছিলেন। সহসা এক দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ পুরুষ নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সয়ে থাক।' উভয়ে অভ্যাগতকে প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন। নৈরাশ্যের নিদাঘে অধীর হইয়া তিনি একদিন ঠাকুরের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'কি করব বাপু, সকলই হরির ইচ্ছা।' রামচন্দ্র তখন নিবেদন করিলেন, 'আপনি অমন কথা বলিলে কোথায় যাইব?' ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি কাহারো খাইও না, কাহারো কিছু নিইও না। তোমাদের এখানে ইচ্ছা হয় আসিও, নচেৎ আসিও না।'

ঠাকুরের কথায় রামচন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার অভিমানও আহত হইল। তিনি ঠাকুরের গৃহের উত্তর দিকের বারান্দায় শায়িত হইয়া স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। ভক্তের অব্যক্ত বেদনা ভগবানের হৃদয় স্পর্শ করিল। দ্বার খুলিয়া ঠাকুর রামচন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন এবং বিবিধ স্নেহপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভক্তসেবা করিতে আদেশ করিলেন। তখন হইতে রামচন্দ্রের জীবনে ভক্তসেবাই মহাব্রত হইল। তিনি বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোলের দিন ঠাকুরকে স্বগৃহে আনিয়া মহোৎসব করিলেন। ফুলদোলের দিবসটি তিনি চির-জীবন মহা শুভদিন বলিয়া গণ্য করিতেন। প্রতিবৎসর সেইদিন ঠাকুরের

বিশেষ পূজা ও মহোৎসবাদি হইত। ফুলদোলের পরদিন রামচন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাইলেন। ঠাকুরের কথা শুনিতে শুনিতে প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তিনি গৃহে ফিরিবার জন্য বিদায় লইলেন। তিনি যখন কক্ষের বাহিরে আসিলেন তখন ঠাকুর সহসা ভিতর হইতে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'কি চাও?' এই বলিয়া ঠাকুর 'কল্পতরু' হইয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কি চাহিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ঠাকুরকে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, 'প্রভু আপনার নিকট কি চাহিব, জানি না। কি চাহিতে হয় আমায় বলিয়া দিন।' তখন ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি স্বপ্নে যে মন্ত্রটি পাইয়াছ তাহা প্রত্যর্পণ কর। আজ হইতে তোমার সাধনভজনের শেষ হইল। আর তোমায় কিছুই করিতে হইবে না। যদি কিছু দেখিবার ইচ্ছা হয়, আমায় দেখ। যখন এখানে আসিবে আমার জন্য এক পয়সার কিছু কিনিয়া আনিও।'

কালবিলম্ব না করিয়া রামচন্দ্র অবনত দেহে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন্ত্রটি পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদান করিলেন। প্রভু ভাবাবেশে তাঁহার দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ প্রণত শিষ্যের ব্রহ্মতালুতে লাগাইলেন। রামচন্দ্র বাহ্যসংজ্ঞাহীন ও ভাবাবিষ্ট। সেইদিন হইতে শিষ্যের হৃদয়ের অশান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হইল এবং শিষ্য গুরুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জানিলেন। তখন হইতে রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের প্রসাদ আনিয়া বাড়ীতে রাখিতেন এবং প্রত্যহ স্নানান্তে একবিন্দু প্রসাদ মুখে দিয়া আহারে বসিতেন। প্রসাদ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি প্রভুর নিকট যাইয়া পুনরায় প্রসাদ আনিতেন। একবার তিনি কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন প্রসাদী করাইয়া আনিবার জন্য। সারাদিন প্রভুর নিকট রহিলেন, কিন্তু প্রভু মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন না। মিষ্টান্ন কতবার তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, কিন্তু প্রভু তাহা স্পর্শ করিলেন না। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। তাঁহাকে শীঘ্র বাড়ী ফিরিতে হইবে। প্রভু পঞ্চবটীর দিকে গিয়াছেন। তখন রামচন্দ্র প্রভুর একটি ডাবর দেখিতে পাইলেন। ডাবরটি প্রভুর মুখ-নিসৃত শ্লেষ্মা ও লালায় পরিপূর্ণ। রামচন্দ্র মিষ্টান্নের হাঁড়ি হইতে দুই চারিটি সন্দেশ লইয়া সেই ডাবরে ডুবাইলেন ও তাহাই প্রসাদরূপে গৃহে আনিতে স্থির

করিলেন। ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ আসিয়া মিষ্টান্ন প্রসাদী করিয়া রামচন্দ্রকে দিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'জগন্নাথদেবের প্রসাদে লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা, রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদে রামচন্দ্রের সেইরূপ অবিকল শ্রদ্ধা ছিল।'*

রামচন্দ্র তাঁহার সিমলা-স্থিত ভবনে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সঙ্কীর্তন করিতেন। সঙ্কীর্তনে বহু ভক্ত সমবেত হইতেন এবং ইহা গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চলিত। ইহাতে প্রতিবেশিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি সঙ্কীর্তনাদির জন্য একটি উদ্যান ক্রয়ের ইচ্ছা করেন। প্রভুও উক্ত প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি দিয়া বলিয়াছিলেন, 'এমন স্থানে বাগান কিনিও যেখানে একশ'টা খুন হলেও টের পাওয়া যায় না।' রামচন্দ্র অনেক অন্বেষণের পর কাঁকুড়গাছিতে একটি বাগান ক্রয় করেন। ইহাই বর্তমানে 'যোগোদ্যান' নামে প্রসিদ্ধ। ঠাকুর একবার তথায় শুভাগমন করেন। এখন যেখানে সমাধি-মন্দির অবস্থিত তথায় একটি তুলসীকানন রচিত হয়। প্রভু উদ্যানের চারিদিক বেড়াইয়া কাননমধ্যস্থ একটী বৃহৎ তুলসীবৃক্ষের তলায় প্রণাম করেন। পরে উদ্যানস্থ একটি গাছের দুইটি আম ও কলিকাতা হইতে আনীত কিছু মিষ্টান্ন খাইয়া পুকুরের জল পান করেন। ঠিক যেখানে তিনি প্রণাম করেন সেখানেই তাঁহার ভস্মাস্থি সমাহিত হইয়াছে। ঠাকুর যে গাছের আম খাইয়াছিলেন তাহা 'রামকৃষ্ণ-ভোগ' ও যে পুকুরের জল পান করিয়াছিলেন তাহা 'রামকৃষ্ণ-কুণ্ড' নামে রামচন্দ্র কর্তৃক অভিহিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রভুর আদেশে তাঁহারই নির্দিষ্ট স্থানে সাধন ভজনের নিমিত্ত একটি পঞ্চবটী নির্মিত হইয়াছে। স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ অনেকে এই পঞ্চবটীতে কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। রামচন্দ্র শেষজীবনে তাঁহার শিষ্য-গণকে বলিতেন, 'আমি মরিয়া যাইলে তোরা আমার চারটী ভস্ম যোগোদ্যানের ফটকে পুঁতিয়া রাখিস্। যে কেহ এখানে প্রবেশ করিবে সেই আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে; তাহা হইলে চিরদিন আমি ভক্ত-পদধূলি পাইব।'

* 'তত্ত্ব-মঞ্জরী'তে ১৩১১ সালের নবম সংখ্যায় প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাম দাদা' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত।

রামচন্দ্র যোগোদ্যানের রামকৃষ্ণ-কুণ্ডে নিত্য স্নান করিতেন, মহাযোগের সময়ও গঙ্গাস্নানে যাইতেন না। এক দিন দক্ষিণেশ্বরে রামচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলেন, 'গিরিশ দাদা, বুঝিয়াছ কি এবার একে তিন? গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব! একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। গৌরাঙ্গাবতারে তিন আধারে তাহার বিকাশ ছিল।' একবার গিরিশচন্দ্র উন্মত্ত অবস্থায় থিয়েটারে ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাকে তাকে বলেন, 'শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তা বলে গালাগালি দিয়েছে।' কেহ বলিলেন, 'ওটা পাষণ্ড, আমি জানি। ওর কাছে আপনি যান কেন?' কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রকে তিরস্কার করিলেন। ঠাকুর রামচন্দ্রকে ভক্তগণের 'কাপ্তেন' বলিতেন। কাহারো বাড়ীতে উৎসবের কথা উঠিলে রামচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিতে হইত। কাহারো অশিষ্ট আচরণ দেখিলে রামচন্দ্র তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। এবার ঠাকুর রামচন্দ্রকে সমস্তই বলিলেন। সব শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, 'বেশ ত করিয়াছে।' ঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'শোন, শোন, রাম কি বলে শোন। সে আমার মাতৃপিতৃ উচ্চারণ করিয়াছে।' রামচন্দ্র অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, "হাঁ ত! কালীয় নাগকে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাড়না করিয়া বলেন, তুমি কি জন্য বিষ উদ্গীরণ কর? কালীয় নাগ বলিয়াছিল, ঠাকুর তুমি আমাকে বিষ দিয়াছ, সুধা উদ্গীরণ করিব কিরূপে? আপনি থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন তাই দিয়া সে আপনার পূজা করিয়াছে।" রামচন্দ্রের কথা ঠাকুর শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'যাই হোক, আর কি তার বাড়ীতে যাওয়া ভাল?' অনেকেই বলিলেন 'না'। পতিতপাবন বলিলেন, 'রাম, তবে গাড়ী আনিতে বল। চল, তার বাড়ী যাই।' ঠাকুর রামচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি শিষ্যদের সহিত গিরিশের বাড়ীতে ভক্তোদ্ধার করিতে গেলেন।

১৮৮৫ খ্রীঃ ঠাকুর যখন শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে পীড়িত অবস্থায় ছিলেন কালীপূজার দিন শিষ্য কালীপদ ঘোষকে বলিলেন, 'আজ কালী পূজার আয়োজন করিও।'

কালীপদ পূজার প্রচুর আয়োজন করিলেন। সন্ধ্যাকালে প্রভুর সম্মুখে বিবিধ নৈবেদ্য স্তূপীকৃত এবং রক্তকমল, রক্তজবাদি ফুল এবং অন্যান্য উপচার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্থাপিত হইল। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ঘরখানি ভক্তে পরিপূর্ণ, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে রামচন্দ্র ও গিরিশ উপবিষ্ট। প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য রামচন্দ্র গিরিশকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'যাও, যাও না!' রামচন্দ্রের উৎসাহে গিরিশের সঙ্কোচ অপসৃত হইল। তিনি ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি কি এসব আজ করতে হয়।' 'তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই' এই বলিয়া গিরিশ দুই হাতে ফুল লইয়া 'জয় মা' শব্দে প্রভুর পাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। তখন সকলে ভক্ত গিরিশের অনুকরণ করিলেন। প্রভু বরাভয়কররূপে সমাধিস্থ হইলেন।

একদা রামচন্দ্র 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়িতেছিলেন। তিনি যতই চৈতন্যদেবের জীবনী অবগত হন ততই ঠাকুরকে চৈতন্যদেবের মতই অবতার মনে হইল। এক সন্ধ্যাকালে তিনি ঠাকুরের কাছে বসিয়া তাঁহার দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ? রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, আপনাকে দেখিতেছি। রামচন্দ্র আরও বলিলেন, 'আপনাকে আমার চৈতন্যদেব বলিয়া মনে হয়।' ঠাকুর কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'বাম্‌নীও* এই কথা বল্‌ত বটে।' ১৮৮৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী কাশীপুর বাগান বাটীতে পরম দয়াল ঠাকুর 'কল্পতরু' হইয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হউক।' এই বলিয়া তিনি কাহারো বুক, কাহারো মস্তক স্পর্শ করিলেন। প্রভুর দিব্য স্পর্শে প্রত্যেকের চৈতন্য হইল। কেহ ইষ্টদর্শন করিলেন, কেহ বা ভাবাবিষ্ট হইলেন। রামচন্দ্র কৃপালাভান্তে মহানন্দে সকলকে ডাকিয়া ঠাকুরের কাছে লইয়া গেলেন। ১লা জানুয়ারীতে তিনি প্রত্যেক বৎসর যোগোদ্যানে কল্পতরু উৎসব করিতেন। তিনি বলিতেন, ঠাকুর নিত্য কল্পতরু।

ঠাকুরের লীলার শেষের দিকে একদিন অপরাহ্নে রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ

* ঠাকুরের তান্ত্রিক গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী।

প্রভুর পার্শ্বে উপবিষ্ট। তখন ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ আমি মাকে বলিতেছিলাম যে, আর আমি লোকের সহিত কথা বলিতে পারি না। রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, বিজয় ও কেদার এদের একটু শক্তি দে। এরা উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় রামচন্দ্র প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। ঠাকুরের আদেশে তিনি সর্বপ্রথমে কোন্নগরের হরিসভায় সত্যধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ঠাকুরের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া তিনি 'তত্ত্ব-সার' নামক একটি পুস্তক মুদ্রিত করেন। এই কার্যে অনেক ভক্তের অনভিমত ছিল। তাঁহাদের অভিযোগ ঠাকুরের কর্ণগোচর হইল। তৎপরে ঠাকুর একদিন রামচন্দ্রকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁগা, এরা সব বলছিল, তুমি কি ছাপছ। তাতে কি লিখেছ?' রামচন্দ্র কহিলেন, 'আমি অন্য কিছু লিখি নাই। কেবল আপনি যে সব উপদেশ দিয়ে থাকেন সেই সকল কথা লিখেছি।' এই বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিছু আভাস দিলেন। ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন, 'ওঃ এই লিখেছ, বেশ করেছ।....আর দেখ, এখন আমার জীবনী ছেপ না। আমার জীবনী বাহির করিলে আমার শরীর থাকিবে না।' 'তত্ত্ব-সার' পুস্তকখানি পরে পরিবর্ধিত আকারে 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' নামে মুদ্রিত হয়। ঠাকুরের লীলা-সম্বরণের কিছু পূর্বে তিনি 'তত্ত্ব-মঞ্জরী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি ঠাকুরের যে জীবনী বাংলায় প্রকাশ করেন তাহাই সর্বপ্রথম জীবনী। ১২৯৩ সালে জন্মাষ্টমীর পূর্বের প্রতিপদ তিথিতে ঠাকুর দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার দেহাবশেষ তাম্রকলসে সংগ্রহ করিয়া কাশীপুর বাগান-বাটীতে রক্ষিত হয়। ইহা এক সপ্তাহ পরে জন্মাষ্টমীর দিন প্রাতে রামচন্দ্রের বাটীতে আনীত ও তথা হইতে সংকীর্তন সহযোগে যোগোদ্যানে সমানীত ও প্রোথিত হয়।

রামচন্দ্র শেষ বয়সে যোগোদ্যানে আসিয়া বাস করিতেন। তখন যোগোদ্যান ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি ছিল। সমস্ত উদ্যান বর্ষাকালে ডুবিয়া যাইত। চারিদিকে নর্দমার জল পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইত। রাস্তা কাঁচা ছিল,

কাজেই এক হাঁটুর উপর কাদা জমিত। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তথায় থাকিয়া ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ১২৯৯ সালে ১৯শে চৈত্র শুক্রবার তিনি ষ্টার থিয়েটারে ঠাকুরের বাণী সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা দেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে রঙ্গালয় শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হয়। এইরূপে তিনি যে আঠারোটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন, 'ভক্তের অর্থ সাঁকোর জলের মত হবে।' সেইজন্য তিনি প্রত্যেক মাসে বহু শত টাকা আয় করিলেও তাঁহার উপার্জিত অর্থ দানে নিঃশেষিত হইত। গরীব ছাত্রদের স্কুলের বেতন, পরীক্ষার ফি ও বইয়ের দাম তিনি দিতেন। অনেক ছাত্রকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া স্কুল কলেজে পড়াইতেন। শেষ বয়সে যখন তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় তখন তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহাকে বলিলেন, 'মহাশয়, এত অর্থ উপার্জন করিলেন, কিন্তু কিছুই রাখিবার চেষ্টা করিলেন না। আপনার স্ত্রীর কি হইবে?' একথা শুনিয়া রামচন্দ্র সহাস্যে বলিয়াছিলেন, 'ইচ্ছা করিলে আমি অনায়াসে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা রাখিতে পারিতাম। কিন্তু আমি একদিনের জন্যও ভাবি নাই যে, আমি আমার স্ত্রীকে অন্ন দিতেছি। প্রভু আমাকে ও আমার স্ত্রীকে অন্ন দিতেছেন। এখন যিনি অন্ন দিতেছেন, আমি মরিয়া গেলে তিনিই তাহাকে অন্ন দিবেন।'

রামচন্দ্রের পুত্র ছিল না, কয়েকটি কন্যা ছিল। তিনি অনেককে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। অনেকে স্বপ্নে তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছেন। এমন কি, তাঁহার দেহত্যাগের পরও কেহ কেহ তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী যোগবিনোদ এবং স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বামী যোগেশ্বরানন্দ পরে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস লইয়া বাঙ্গালোর শহরের উলসুর পল্লীতে একটি মঠ স্থাপন করেন। তিনি তথায় বহু বৎসর থাকিয়া লোকান্তরিত হন। রামচন্দ্রের দেহান্তে স্বামী যোগবিনোদ যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ হন। স্বামী যোগবিনোদের কয়েকটি সন্ন্যাসী শিষ্য আছেন। তন্মধ্যে স্বামী যোগবিলাস সাঁওতাল পরগণার সিমুলতলাতে একটী আশ্রম স্থাপনপূর্বক তথায়

বাস করিতেছেন। স্বামী যোগবিমল স্বামী যোগবিনোদের মৃত্যুর পর যোগোত্থানের অধ্যক্ষ হন। তিনিই যোগোত্থানকে বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যান।

রামচন্দ্রের দীনভাব অতুলনীয়। কর্মস্থল ব্যতীত অন্যত্র তিনি একখানি থানকাপড় এবং লংক্লথের চাদর একটী ব্যতীত অন্য পরিধেয় ব্যবহার করিতেন না। আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে যাইবার কালেও তাঁহার পোষাক পরিবর্তিত হইত না, যদিও তাঁহার অধিকাংশ কুটুম্বই বড় লোক ছিলেন। মিলিটারী ছাত্র-দিগকে যখন রসায়ন বিজ্ঞান পড়াইতেন তখন একটী জীর্ণ বহুছিদ্রযুক্ত পাণ্টালুন, সুতার বোতামযুক্ত একটী কামিজ এবং একটী সাদা ঝলঝলে কোট পরিতেন। যোগোত্থানে তিনি পাঁচ হাতি কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তখন সেই কাপড় টাকায় চারি খানা পাওয়া যাইত। শেষ জীবনে কয়েক বৎসর তিনি যোগোত্থানে ঠাকুরের ভোগ রান্না করিতেন। অনেক সময় যোগোত্থানে নিজেই বাগান কোপাইতেন ও নিজেই শাকসব্জী লাগাইতেন। তাঁহার দয়ারও তুলনা ছিল না। অপরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত এবং অর্থাদি দান বা অন্য উপায়ে দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অসামান্য নির্লোভতার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদা কোন মাড়োয়ারীর চারি জাহাজ কেরোসিন বিলাত হইতে আসে। ইহা পরীক্ষার্থ কেমিক্যাল একজামিনারের নিকট প্রেরিত হয়। রামচন্দ্রই কেরোসিন পরীক্ষা করিতেন। একজামিনার সাহেব সেটীও তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে দিলেন। রামচন্দ্র পরীক্ষা করিয়া দেখেন, দুই তিন পয়েণ্ট কম হইয়াছে। সুতরাং ইহা পাশ হইতে পারে না। মাড়োয়ারী দুঃসংবাদটী পাইয়া বজ্রাহতবৎ হইলেন। কারণ, পাস না হইলে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসায়ে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তিনি প্রত্যেক জাহাজের জন্য দশ হাজার করিয়া চারি জাহাজের জন্য মোট চল্লিশ হাজার টাকা রামচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া অনুরোধ করিলেন, আপনি ইহা লইয়া পাস লিখিয়া দিন। বাস্তবিক দুই তিন পয়েণ্ট বেশী লিখিলে কার্য্যের অপকার বা অফিসের গোলমালের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামচন্দ্র তাহা না করিয়া সত্যরক্ষা করিলেন। প্রভূত অর্থের প্রলোভন ত্যাগ মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব হয়।

রামচন্দ্রের জীবনে শেষকালে বিপুলা ঐশী শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। এখানে তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল। এক ব্যক্তি রামচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একদিন রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'মহাশয়! কিছু অদ্ভুত দেখাতে পারেন ত আপনার কথা বিশ্বাস করিতে পারি, রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলে মানতে পারি।' বার বার একথা বলায় রামচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া সহসা বলিয়া ফেলিলেন, 'নিশ্চয়ই আজ হইতে তিন দিবসের মধ্যে তোমার মধ্যে কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিবে।' এই বাক্য উচ্চারিত হইবার পরে লোকটী যখন নিজ বাড়ীতে যাইতেছিলেন হঠাৎ তাঁহার হাস্যের উদ্দীপনা হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে চলিলেন, ক্রমেই হাস্য বৃদ্ধি পাইল। তিনি বাড়ীতে গেলেন, সেখানেও হাস্য বন্ধ হইল না। তিনি কথা বলিতেও পারিলেন না। বাড়ীর লোকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উচ্চ হাস্য করেন। সকলে ভাবিল, তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। হাসিতে হাসিতে তাঁহার নাড়ীভূঁড়ি যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল! কিন্তু হাসির বিরাম হইল না। ঠাকুর বার বার তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন, 'তুমি রামের উপদেশ গ্রহণ করিও।' তিনি রামচন্দ্রকেও স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন, লোকটীকে এই কথা বলিও। রামচন্দ্রের বাক্যে বিশ্বাসী হইতেই তাঁহার এই উপদ্রব কাটিল, তাঁহার নবজীবন লাভ হইল।

একটি উকিল রামচন্দ্রের কর্মস্থলে যাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। কর্মস্থলে তাহার একটী পৃথক ঘর ছিল। তথায় বসিয়া তিনি সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত ধর্ম কথা বলিতেন। একদিন উকিলটী বলিলেন, 'মহাশয়! এসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না। আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারি, যদি আমার মত পাষণ্ডের মনকে বিগলিত করিয়া ভগবানের জন্য কাঁদাতে পারেন।' রামচন্দ্র বলিলেন, 'ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে সব হইতে পারে।' তখন উকিলটী উপহাসচ্ছলে বলিলেন, 'আমি এই কথায় বিশ্বাস করি না। বলুন! কাঁদাতে পারেন কি না? বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়া রামচন্দ্র আরক্তিম নয়নে বলিয়া উঠিলেন, 'আপনি অবশ্যই তিন দিনের মধ্যে ঠাকুরের জন্য কাঁদিবেন।' মহাপুরুষের বাক্য অবিলম্বে

সত্য হইল! কি আশ্চর্য্য! তিন দিন ত দূরের কথা, তিন মুহূর্তও অতীত হইতে না হইতে উকিলটী হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। ভক্তের কৃপায় পাষাণ দ্রবীভূত হইল। রামকৃষ্ণের ভাগবতী শক্তি রামচন্দ্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১২৯৯ সালে যখন তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন তাহার বহু পূর্ব হইতেই তিনি ডায়াবিটিস্ (বহুমূত্র) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বক্তৃতাবলী আরব্ধ হইবার পর একবার পৃষ্ঠব্রণে, আর একবার রক্তামাশয়ে দারুণ কষ্টভোগ করেন। ডায়াবিটিস্ আলবিমিনিউরিয়া রোগে পরিণত হইল। হাঁপানী রোগও বাল্যকাল হইতেই ছিল। নানা রোগে এবং অবিরাম শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। প্রথমে তিনি ডাঃ মেকোনেল সাহেবের চিকিৎসাধীন ছিলেন। সহসা সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় কবিরাজ নিশিকান্ত সেন তাঁহাকে আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা করেন। ইহাতে তিনি অনেক পরিমাণে সুস্থ হন। রুগ্ন শরীরেই প্রতিমাসে বক্তৃতা প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক রবিবারে যোগোদ্যানে সংকীর্তন ও ধর্মালোচনা হইত। এইভাবে দুই চারি বৎসর কাটিল। ১৩০৫ সালের হেমন্ত ঋতুতে তাঁহার শরীর অতিশয় অসুস্থ হইল। পায়ে শোথ দেখা দিল। হাঁপানী-জনিত শ্বাসকষ্টে রাত্রে নিদ্রা হইত না। তিনি রাত্রিতে শয়ন করিতে পারিতেন না, বসিয়া রাত কাটাইতেন। শ্বাসকষ্টের সময় শরীরে কম্পন দেখা দিত। কবিরাজী চিকিৎসায় অস্থায়ী উপশম হইত, আবার অসুখ বাড়িত।

পৌষ মাসের শেষ হইতে তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ হইল, বমির সহিত রক্ত উঠিল। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে আনা হইল। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেও বিশেষ উপকার হইল না। আহার প্রায় বন্ধ, মাঝে মাঝে ঠাকুরের চরণামৃত খাইতেন। ব্যাধিযন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার জিহ্বা প্রায়ই মধুর রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিত। ৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইল। এক প্রকার অঘোর নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় ভক্তের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইল। মহানিদ্রাভিভূত মহাপুরুষের মুখমণ্ডল বিকচ কমলের ন্যায় প্রফুল্ল ও

প্রশান্ত দেখাইতেছিল। তাঁহার দেহ পুষ্পে, মাল্যে ও চন্দনে শোভিত করা হইল। ভক্তগণ তাঁহার ফটোগ্রাফ লইলেন। গঙ্গাতীরে চন্দনকাষ্ঠের চিতায় তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ রামচন্দ্রের দেহান্তে একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখেন, তাঁহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, অনাবৃত গাত্র, সাদা ধুতি পরা। গিরীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাম দাদা! কি কর এখন?' রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, 'যাহা করিতাম তাহাই করি; প্রভুর সেবা করি। দেবমূর্তি রামচন্দ্র ইহলোকে যাহা করিতেন রামকৃষ্ণলোকে যাইয়া তাহাই করিতেছেন। তাঁহার ইহকাল ও পরকাল রামকৃষ্ণ-সেবায় উৎসৃষ্ট।

তেইশ

গিরীশচন্দ্র ঘোষ *

"ভৈরবস্থাবতারায় জলদ্‌বিশ্বাস্‌মূর্তয়ে।
পূর্ণাদধিকবুদ্ধির্যস্তস্মৈ ঘোষায় তে নমঃ॥"

বিদুষী ইংরাজ মহিলা মিসেস গ্রে হ্যালক ভারত ভ্রমণান্তে মন্তব্য করিয়াছেন, "ভারতে গিরীশচন্দ্র ঘোষই আমার মনে গভীরতম ছাপ দিয়াছেন। তাঁহার মত বিরাট ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। আমি যতদূর জানি, তাঁহার গ্রন্থাবলীর সমগ্র অনুবাদ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাহা থাকিলে আমার মনে হয়, তাঁহার নাম রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিকতর সুবিদিত হইত। তিনিই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং অনুভব করিতে সাহায্য করিয়াছেন যে, আমাদের জীবনে যাহা ঘটে তাহার তত মূল্য নাই, কিন্তু ঐ সকল ঘটনার প্রতি আমাদের মনোভাবের মূল্যই সমধিক।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদা বলিয়াছিলেন, "বাংলা এখনো ঠিকভাবে গিরীশ ঘোষের প্রতিভা বোঝে নাই। যেমন সেক্ষপীয়র এক শতক পরে ইংলণ্ডে সমাদৃত হয়েছিলেন, তেমনি গিরীশচন্দ্র ভবিষ্যৎ বঙ্গে আরো ব্যাপকভাবে পঠিত ও আদৃত হবেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার প্রতি নিশ্চয়ই ভারতের প্রদেশসমূহ, এমন কি বিদেশ, হইতেও ছাত্রছাত্রীগণ আকৃষ্ট হইবে। কারণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যসমূহের মধ্যে তাঁহার নাটকাবলী নানাগুণে অদ্ভুত ও অসাধারণ।"

স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. এবং এম. এ. ক্লাসে গিরীশ নাটকাবলী পাঠ্যপুস্তকরূপে মনোনীত। তাঁহার সুযোগ্য সন্তান ও প্রতিনিধি শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরীশ বক্তৃতার

---

* মৎপ্রণীত **'Girish Ghose And His Dramas'** অবলম্বনে লিখিত এবং 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার ১৩৫৬ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশবন্ধু দাশের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কয়েকটি গিরীশ-নাটক হিন্দী, গুজরাটী, উড়িয়া, আসামী ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত। ভারতীয় প্রাদেশিক রঙ্গমঞ্চসমূহে গিরীশ-নাটক অভিনীত হয়। আসামী নাটক 'বেহুলা,' উড়িয়া নাটক 'কোণারক' প্রভৃতি গিরীশ-নাটকের অনুকরণে রচিত। গিরীশচন্দ্রকে 'বাংলা রঙ্গালয়ের জনক' এবং 'বাংলার সেক্ষপীয়র' বলা হয়। 'লাইট অব এশিয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা সার এডুইন আরনল্ড গিরীশ-প্রতিভায় বিমুগ্ধ ছিলেন। 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকের গিরিশকৃত বুদ্ধাভিনয় দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে † লিখিয়াছেন, 'কলিকাতার এক রঙ্গমঞ্চে গিরীশচন্দ্রের বুদ্ধাভিনয় দেখিয়া অশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। শ্রোতৃমণ্ডলী আমার মত তাঁর প্রশংসারত ছিলেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে হয়, 'হিন্দুরা স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ ও দার্শনিক। অভিনয়ে সূক্ষ্ম চিন্তার এবং সুরুচির বিশেষ প্রকাশ ছিল। ইংরাজ রঙ্গমঞ্চের নায়কগণ উক্ত অভিনয়ের অন্তর্দৃষ্টি এবং নাট্যকৌশল দেখিয়া নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন। বাংলা নাটকের উচ্চ নৈতিক সুর পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ।'

নটভৈরব গিরীশচন্দ্রের নাট্যাভিনয় দর্শনে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দাপ্লুত হইয়া অভিনেতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কলিকাতার জমিদার রায় বাহাদুর নন্দলাল বসু গিরীশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিত' অভিনয় দর্শনে এত বিমোহিত হন যে, তাঁহার বাড়ীতে প্রতিবৎসর দুর্গাপূজায় চিরাচরিত বলিদান বন্ধ করেন। লেডী ডাফরিন্ ভারত সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে গিরীশচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব মিলিটারী সেক্রেটারী লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড এবং আইন সভ্য মিঃ স্কোবল গিরীশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ ক্রাইন আই. সি, এস. গিরীশচন্দ্রের এত গুণগ্রাহী ছিলেন যে, ভাইসরয়ের কাউন্সিলে তাঁহাকে সি. আই. ই. পদবী প্রদানের প্রস্তাব করেন। যখন তাঁহার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় তখন তিনি

† 'India Revisited' (২৫০ পৃষ্ঠায়)

দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'জগৎ তার শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে!'

উত্তর কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বসুপাড়া লেনে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে গিরীশচন্দ্র ১৮৪৪ খ্রীঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নীলকমল ঘোষ কলিকাতার সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিতেন। তিনি সাধুতা, ধর্মপ্রাণতা এবং জাগতিক বুদ্ধির জন্য পল্লীতে সুখ্যাত ছিলেন। গৃহদেবতা শ্রীধরের সেবায় গিরীশের মাতার অশেষ অনুরাগ ছিল। কথিত আছে, শ্রীধরদেব একদিন স্বপ্নে তাঁহার নিকট পাকা কাঁঠাল খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গিরীশ মাতাপিতার অষ্টম সন্তান। বৈষ্ণব পরিবারের ধর্মভাবের মধ্যে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়। প্রত্যেক বৎসর তাঁহাদের বাড়ীতে গৃহদেবতাকে কেন্দ্র করিয়া নানা বৈষ্ণবোৎসব হইত। প্রথম পুত্র গতাসু হওয়ায় মাতা গিরীশকে দূরে দূরে রাখিতেন, ভয়ে অধিক স্নেহাদর করিতেন না। পুত্র প্রথমে মাতার এই ঔদাসীন্যের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। একবার পুত্রের কঠিন অসুখ হয়। পুত্র রোগশয্যায় অর্ধ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িত। তখন মাতা দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন, 'হা ভগবান্! প্রথম পুত্রকে অত্যধিক আদরযত্নে হারিয়েছি। সেইজন্য গিরীশকে আমি কাছে আসতে দিই নাই, পাছে তার কোন অনিষ্ট হয়। যদিও আমার অন্তর তার জন্য প্রত্যেক মুহূর্তে লালায়িত হোতো, তবুও তাকে দূরে রাখতাম। তথাপি সে অসুখে পড়েছে! আমি এখন কি করি?' পুত্র রোগশয্যায় ইহা শুনিয়া মাতার বাহ্য উদাসীনতার কারণ বুঝিয়া সুখী হইলেন।

মাতার সত্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। মাতা পুত্রকে সদা সত্যনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিতেন। পুত্র কখন মিথ্যা কথা বলিলে মাতা পুত্রের মুখে একটু গোবর-জল দিয়া তাহার মুখ শুদ্ধ করিতেন হিন্দু প্রথামতে গোবর শুদ্ধিকর পদার্থ। ইহার জল ছিটাইলে স্থান বা বস্তু পবিত্র হয়। মাতার সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা পুত্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল। গিরীশ এগার বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। এক বিধবা দিদিমা বালককে লালন পালন করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতৃহীন বালককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। ইহার ফলে বালক অসংযত এবং যথেচ্ছাচারী

হইয়া উঠেন। তিনি এক বিদ্যালয় ছাড়িয়া অন্য বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা ব্যাহত হইল। হঠাৎ তাঁহার পিতা স্বর্গগত হইলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তাঁহার জন্য চিরতরে রুদ্ধ হইল। পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরে গিরীশ বিবাহিত হন।

তাঁহার শ্বশুর মেসার্স জন আটকিন্সন এ্যাণ্ড কোম্পানিতে চাকুরী করিতেন। শ্বশুরের পরামর্শে ১৮৬৬ খ্রীঃ জামাতা উক্ত অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই কর্মস্থলে তিনি অসাধারণ নির্ভীকতা ও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেন। তখন অফিসের এক ছোট সাহেব সদ্য বিলাত হইতে আসেন। তিনি টেবিলস্থ ঘণ্টা বাজাইয়া অধস্তন কর্মচারীদিগকে ডাকিবার নূতন নিয়ম প্রবর্তিত করেন। গিরীশের নিকট উক্ত নিয়ম অপমানজনক প্রতীত হইল। একদিন নবাগত ছোট সাহেব ঘণ্টা বাজাইয়া গিরীশকে ডাকিলেন। গিরীশ ঘণ্টা শুনিয়াও কোন সাড়া দিলেন না। সহকর্মিগণ চাকুরী যাবার ভয় দেখাইলেও তিনি স্বস্থানে বসিয়া রহিলেন। যখন বড় সাহেব মিঃ আটকিন্সন এই অবাধ্যতার জন্য জবাব চাহিলেন তখন তিনি নম্রভাবে উত্তর দিলেন, 'মহাশয়, ঘণ্টার শব্দে উঠিতে বসিতে অভ্যস্ত নহি।' বড় সাহেব ভদ্রোচিত উত্তর শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন, 'আপনি আমার অফিসের মর্যাদা রেখেছেন।' সেই দিন হইতে নূতন নিয়ম তিরোহিত হইল।

গিরীশ যেমন সাহসী তেমনি ভীত ছিলেন। একদা সাঁওতাল পরগণার একটী পাহাড়ে তিনি বেড়াইতে যান। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাঘের গর্জন শোনা গেল। তৎশ্রবণে তাঁহার সাঁওতাল সঙ্গী বাড়ী ফিরিতে চাহিল। তিনি সঙ্গীর নিকট অবগত হইলেন যে, অদূরে একটী গুহা আছে। গিরীশ উক্ত পর্ব্বত-গুহায় রাত্রিযাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সাঁওতালরা খুব ভূতের ভয় করে। সেইজন্য সাঁওতালটী বলিল, 'গুহাতে ভূত আছে। তথায় রাত্রিবাস বিপজ্জনক।' সঙ্গীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি গুহাতে যাইয়া রহিলেন এবং বাঘ তাড়াইবার জন্য নিজের মূল্যবান্ শালটী এবং অন্যান্য শুষ্ক পাতা ও

ঘাস পোড়াইয়া সারারাত্রি আগুন জ্বালাইয়া রাখিলেন। বাঘ কেবল আগুনের ভয়ে ভীত। ১৮৬৬ খ্রীঃ গিরীশের প্রথম পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। যেমন পিতা তেমনি পুত্র। সুরেন্দ্রনাথের ডাক নাম ছিল দানী বাবু। পুত্রও পিতার ন্যায় প্রসিদ্ধ অভিনেতা হইয়াছিলেন। কিছুকাল গিরীশ অন্য অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ তিনি মেসার্স ফ্রে বার্জার এণ্ড এণ্ডারসন কোম্পানীর ক্রয়কারী কর্মচারীরূপে ভাগলপুরে যান। এই কাজে তাঁহাকে বিহারের অন্যান্য জেলায়ও ঘুরিতে হইত। উক্ত প্রদেশের পার্বত্য স্থানের সৌন্দর্য এবং নির্জনতা তিনি বিশেষভাবে উপভোগ করেন। তথায় তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং পরবৎসর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরীশ উক্ত লীগের প্রধান কেরাণী ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খ্রীঃ তিনি মোটা মাহিনায় মেসার্স পার্কার এণ্ড কোম্পানীতে চাকরী গ্রহণ করেন। এইরূপে তিনি বিভিন্ন অফিসে প্রায় পনের বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ পাইলেই পড়িতেন। রাজভাষা তাঁহার বিশেষ আয়ত্ত ছিল। তিনি সুন্দর ইংরাজি লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহে তিনি বহুবাজারস্থ বিজ্ঞানসভায় যোগদান করেন। তথায় তিনি কলিকাতার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। শেষজীবনে তিনি হোমিওপ্যাথি শিখিয়াছিলেন এবং উক্ত পদ্ধতিমতে বিনা পারিশ্রমিকে স্বীয় পল্লীতে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে অনেক মৃত্যুশোক সহিতে হয়। তাঁহার দুই ভগ্নী ও দুই ভ্রাতা এবং অবশেষে তাঁহার প্রথমা পত্নী ১৮৭৪ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। তেত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার পরিণীত হন। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ও কন্যার মৃত্যুও তাঁহাকে দেখিতে হয়। শেষজীবনে তিনি এক বিধবা ভগ্নী এবং একমাত্র পুত্রের সহিত বাস করিতেন।

দ্বিতীয় বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যে ১৮৭৫ খ্রীঃ গিরীশের কলেরা হয়। রোগ বাড়িয়া চলিল এবং চিকিৎসকগণ আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিলেন। যখন তিনি সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ক্রন্দনরত আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রোগশয্যায় শায়িত তখন তিনি এই অলৌকিক দর্শন লাভ করেন। লালপেড়ে শাড়ী পরিহিতা কোন দেবীমূর্তি তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে কৃপাপূর্বক পুরীর জগন্নাথদেবের একটু মহাপ্রসাদ খাইতে দেন। দেবীর নির্দেশে তিনি মহাপ্রসাদ মুখে দিলেন। ইহার পরে তিনি ধীরে ধীরে এই কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হন। বহু বৎসর পরে গিরীশ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা দেবীকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, ইনিই সেই স্বপ্নদৃষ্টা জ্যোতির্ময়ী নারী। তিনি এই সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে বলিয়াছিলেন, 'ষোল বছর পরে যখন আমি জয়রামবাটী গ্রামে যাইয়া সারদা দেবীকে প্রথম দর্শন করি তখন পরমানন্দিত এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া বুঝিতে পারিলাম, ইনিই মহাপ্রসাদ দিয়া যৌবনে আমার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন।' গিরীশ তাঁহাকে আজীবন জগজ্জননী জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বাগবাজারে তাঁহার বাড়ীর অদূরে উদ্বোধন মঠে সারদা দেবী থাকিতেন। এক সন্ধ্যায় গিরীশ স্বগৃহের ছাদে দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত পাদচারণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি উদ্বোধন মঠের ছাদের উপরে ভ্রমণরতা সারদা দেবীর উপর পড়িল। গিরীশ তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন এবং স্বপত্নীকে বলিলেন, 'এই ভাবে গোপনে শ্রীমাকে দেখা আমার উচিত নয়।'

গিরীশ যৌবনের মত্ততায় কিছুকালের জন্য নাস্তিক হইয়া পড়েন। তিনি নিজে এইভাবে তাঁহার যৌবনাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।—"আমার আদি শিক্ষা, শৈশব হইতে অভিভাবকের অভাব, যৌবনসুলভ তুমুল ইন্দ্রিয়লালসা আমাকে ধর্মপথ হইতে দূরে টানিয়া ফেলিয়াছিল। নাস্তিকতা ছিল সেকালে বেশ প্রচলিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস নির্বোধ ও দুর্বল মনোভাবরূপে পরিগণিত হইত। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে আমি উপহাস করিতাম। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক পড়িয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস কল্পনার বিষয়মাত্র এবং

মানুষকে অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার কৌশল এবং যেন তেন প্রকারেণ স্বার্থসিদ্ধি সাধনই বুদ্ধিমানের কার্য। কিন্তু এই জগতে উক্তরূপ বুদ্ধিমত্তা বেশীদিন কার্যকরী হয় না। এই কঠোর শিক্ষা দুর্দিনে আমি লাভ করি। দুঃসময়ে আমি বুঝিতে পারিলাম, পাপগোপনের কোন অমোঘ উপায় নাই; যে কোন ভাবেই হোক সেগুলি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই মৎকৃত পাপকর্মের কুফল ফলিতে লাগিল। নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভবিষ্যতের ভীষণ চিত্র আমার মানস পটে অঙ্কিত হইল। শাস্তির পালা আরম্ভ হইল, কিন্তু ইহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখিলাম না। বিপদ্বেষ্টিত, বন্ধুহীন এবং নির্দয় শত্রুপরিবৃত হইয়া ধ্বংসের সম্মুখীন হইলাম। দুষ্কর্মসমূহ আমার দিকে কটাক্ষপাত করিল। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে মনে প্রশ্ন জাগিল, 'ভগবান্ কি সত্যই আছেন? যদি তাঁহাকে কেহ ডাকে তিনি কি তাঁহাকে পথ দেখান?' গিরীশের নবজন্মের শুভমুহূর্ত সমাসন্ন। ঈশ্বরকৃপা তাঁহার উপর বর্ষণোন্মুখ হইল। বিবেকের দংশনে মানবমনে যখন অনুতাপ উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরকৃপা অবতরণ করে। গিরীশ যখন অনুতপ্ত হইলেন তখন তাঁহার গুরুলাভ হইল, তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন।

ইতিপূর্বে গিরীশ কেশব সেনের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরাজি সংবাদপত্র হইতে জানিয়াছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন এবং কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যবর্গের সহিত তাঁহার নিকট প্রায়ই যান। কৌতূহলবশে তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বাগবাজারের প্রসিদ্ধ এটর্ণী প্রতিবেশী দীননাথ বসুর বাড়ীতে দেখিতে যান। তখন সন্ধ্যাকাল, প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে আলো দেখিতে পান নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি সন্ধ্যা?' গিরীশ এই প্রকার সংজ্ঞাহীনতাকে অসম্ভাবনার চূড়ান্ত ভাবিয়া বিরক্ত চিত্তে চলিয়া আসিলেন। উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে আগমন করেন। তথায় গিরীশও নিমন্ত্রিত হন। সেবার তিনি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে, অন্যান্য পরমহংস ও যোগী হইতে এই পরমহংসের আচরণ সম্পূর্ণ পৃথক্। ঠাকুরের ভদ্র ব্যবহার, দীনভাব ও

ঈশ্বরোন্মত্ততা দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ তথায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার তত শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি গিরীশকে বলিলেন, 'চল, এখন যাই। এসব অনেক দেখেছি।' গিরীশের আরও বসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণকে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় দর্শন।

১০৮৪ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে গিরীশের 'চৈতন্যলীলা' নাটক ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ধর্মভাবোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক বলিয়া নাটকটি সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জন করিল। একদিন গিরীশ ষ্টার থিয়েটারের উঠানে পাদচারণ করিতেছিলেন। এমন সময় এক শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত আসিয়া বলিলেন, 'পরমহংসদেব অভিনয় দেখতে এসেছেন। আমরা কি তাঁর জন্য একটি টিকিট কিনিব, না আপনি তাঁর জন্য একটি বিনামূল্যে আসন দিবেন?' গিরীশ উত্তর দিলেন, 'তাঁহার প্রবেশ বিনামূল্যে হইবে, কিন্তু অপর সকলের জন্য টিকিটক্রয় আবশ্যক।' তিনি অগ্রসর হইয়া ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, ঠাকুর ইতঃপূর্বেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশকে নমস্কার করিলেন। গিরীশ প্রতি নমস্কার করিবার পর ঠাকুর নত হইয়া আবার নমস্কার জানাইলেন। পুনরায় গিরীশ প্রতি নমস্কার করিলেন। কিন্তু ঠাকুর আবার নমস্কার করিলেন। পাছে এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া চলে, সেইজন্য গিরীশ প্রতি নমস্কার বন্ধ করিলেন। তিনি ঠাকুরকে লইয়া একটি বাক্সে বসাইলেন এবং তাঁহাকে বাতাস করিবার জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ বোধ করায় বাড়ী চলিয়া গেলেন। ইহাই তৃতীয় দর্শন।

সেই সময়ে এক ভক্তিমান্ বৈষ্ণব চিত্রকরের সহিত গিরীশের পরিচয় হয়। এই চিত্রকরের সহিত তিনি পারিবারিক ব্যাপার এবং বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে ঘন ঘন ঘনিষ্ঠ আলোচনা করিতেন। চিত্রকর একদিন কথাপ্রসঙ্গে গিরীশকে বলেন, 'আমার ইষ্টদেবতা প্রত্যহ নিবেদিত বস্তুর কিয়দংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু গুরুকৃপা ব্যতীত এই অনুভূতিলাভ সম্ভব নয়।' এমন অকপট অবিচল ভক্তি এবং

সরলতার সহিত বৈষ্ণব ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন যে, ইহা গিরীশের মনে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি গৃহে ফিরিয়া স্বীয় কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, গিরীশের চিত্ত এখন গুরুলাভের জন্য আকাঙ্খিত। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে তিনি একদিন চৌরাস্তার পার্শ্বে এক প্রতিবেশীর বারান্দায় বসিয়া আছেন। তখন দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদল ভক্তসহিত বলরাম বসুর বাড়ীতে যাইতেছেন। একটি ভক্ত দূর হইতে গিরীশকে দেখাইয়া ঠাকুরকে মৃদু স্বরে কিছু বলিলেন। ঠাকুর গিরীশকে রাস্তা হইতে নমস্কার করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি অধিকদূর অগ্রসর হন নাই, এমন সময় অনুভব করিলেন, কোন কিছু যেন তাঁহাকে ঠাকুরের দিকে টানিতেছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আকর্ষণ এত প্রবল মনে হইল যে, তিনি ছুটিয়া ঠাকুরকে ধরিতে ইচ্ছা করিলেন। তখনই ঠাকুরের নিকট হইতে একটি ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। গিরীশ মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভক্তটির অনুসরণ করিলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর বলরামের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট। তিনি ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, গুরু কি?' উত্তর হইল— 'ভগবান ও ভক্তের মিলনের ঘটকই গুরু।' ঠাকুর আরো বলিলেন, 'তোমার গুরু নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।' গিরীশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মন্ত্র কি?' ঠাকুর—ঈশ্বরের নাম। এইভাবে নানা প্রসঙ্গ চলিল, যেন উভয়ের মধ্যে বহুবৎসরব্যাপী ঘনিষ্ঠ পরিচয়! একটি নাটকাভিনয় দেখাইবার জন্য ঠাকুর গিরীশকে বলিলেন। গিরীশ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। স্থির হইল, ঠাকুর 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' দেখিতে আসিবেন। কিছুক্ষণ পরে গিরীশ প্রণামান্তে একটি ভক্তের সহিত বিদায় লইলেন। ভক্তটি পথে গিরীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরকে আপনার কেমন লাগল?' গিরীশ বলিলেন, 'মহাভক্ত।' গিরীশের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অন্তরে বুঝিলেন, তাঁহাকে আর গুরুর অন্বেষণ করিতে হইবে না।

এই সাক্ষাতের কিছুকাল পরে গিরীশ একদিন তাঁহার থিয়েটারের সাজঘরে বসিয়া আছেন। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্রুত পদে আসিয়া তাঁহাকে জানাই-

লেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। গিরীশ উত্তর দিলেন, 'বেশ। তাঁকে একটা বাক্সে বসান।' দেবেন্দ্রনাথ—আপনি গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন না? গিরীশ—কেন? আমি না গেলে কি তিনি গাড়ী থেকে নেমে আসতে পারেন না? এইরূপ বলিলেও গিরীশ শ্রীরামকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়ী হইতে নামিতেছেন। ঠাকুরের সৌম্য দিব্য মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার চিত্ত অনুশোচনায় উত্তপ্ত হইল পরমহংসদেবকে আরো সাদর সম্বর্ধনা না করার জন্য। তিনি ঠাকুরকে উপর তলায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন এবং তাঁহার পাদস্পর্শ করিলেন। কেন যে তিনি ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিলেন তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ঠাকুরকে একটী গোলাপ ফুল উপহার দিলেন। কিন্তু ঠাকুর গোলাপটী ফেরৎ দিয়া বলিলেন, 'ফুল দেবতাদের ও বাবুদের উপভোগ্য। আমি কোনটিই নই।' কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, তোমার মন সবটা খাঁটি হয় নি। গিরীশ মনে মনে ভাবিলেন, ঠাকুর বোধ হয় তাঁহার দুষ্কর্ম ও দুর্বলতার কথা বলিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে সে সব যাবে? উত্তর আসিল, বিশ্বাসী হও।

আর একদিন রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে গিরীশ ঠাকুরকে দর্শন করেন। ঠাকুর তখন ভাবাবিষ্ট। সংকীর্তন সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বৈঠকখানায় গেলেন। গিরীশও তথায় আসিলেন। গিরীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার মনের বক্রতা কি যাবে?' ঠাকুর—নিশ্চয়ই। গিরীশ তিন বার একই প্রশ্ন করিলেন এবং ঠাকুর তিন বার একই উত্তর দিলেন। সমবেত ভক্তগণের মধ্যে মনোমোহন মিত্র বলিলেন, 'আপনি ত উত্তর পেয়েছেন। তবে কেন তাঁকে এরূপ বিরক্ত করছেন?' এই কথায় উত্যক্ত না হইয়া গিরীশ ভাবিলেন, 'ইনি ঠিকই বলেছেন। যদি কেহ অন্যের কথা প্রথমবার বুঝিতে না পারে শত পুনরাবৃত্তিতেও কোন ফল হয় না।' তিনি ঠাকুরকে প্রণামপূর্বক থিয়েটারে ফিরিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে গভীরভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার ঘরের দক্ষিণ বারান্দায় কম্বলে উপবিষ্ট। ঠাকুর তখন

একটি তরুণ ভক্তের সহিত কথা বলিতেছিলেন। গিরীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর নিকট আত্মীয়ের ন্যায় বলিলেন, 'তোমার কথাই হচ্ছিল। সত্যি, একে জিজ্ঞাসা কর।' ঠাকুর তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিতে যাইতেছিলেন। তখন গিরীশ বাধা দিয়া বলিলেন, 'আমি উপদেশ চাই না। আমার বইগুলিতে অনেক উপদেশ লিখেছি। আমার কিছু করে দিন।' ইহা শুনিয়া ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া হাসিলেন। এই দিব্য হাস্যে গিরীশ ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হইয়াছে। বিদায় গ্রহণকালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আমি এখানে এলাম, আপনাকে দেখলাম। আমি যা করছি তা করতে থাকব তো?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'হাঁ।' গিরীশ বুঝিলেন, রঙ্গালয়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অনিষ্টকর নহে। তাঁহার বিশ্বাস হইল, পরমহংসদেব তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং এখন তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরলাভ সহজসাধ্য। তিনি অসীম বিশ্বাস ও সাহসে পূর্ণ হইলেন। গুরু পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন শিষ্য কিয়ৎ পরিমাণে তাহা অনুভব করিলেন। তাঁহার মৃত্যুভয় বিদূরিত হইল। তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত হইলেন।

গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল অদ্ভুত। গুরু শিষ্যকে পিতৃতুল্য স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে অনেক বিষয়ে প্রশ্রয় দিতেন। ঠাকুর গিরীশকে বীরভক্ত বলিতেন। একদিন ঠাকুর বলিলেন, "কালীমন্দিরে ধ্যানকালে দেখিলাম, একটি ন্যাংটা ছেলে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। তাহার মাথায় একগোছা চুল, বাম বগলে একটি মদের বোতল এবং ডান হাতে একটি অমৃতপাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে তুমি?' সে বলিল, 'আমি ভৈরব।' তাহার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল, 'আপনার কাজ করতে এসেছি' পরিপক্ব বয়সে যখন গিরীশ আমার কাছে আসিল আমি তাহার মধ্যে সেই ভৈরবকে দেখিলাম।" তাই ঠাকুর বলিতেন, 'গিরীশ ভৈরব। তাহার অন্তর কোমল, বিশ্বাসপূর্ণ এবং নির্মল।' গিরীশের প্রধান ত্রুটি ছিল অসংযম। তিনি একদিন মদের নেশায় থিয়েটারে ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দেন। ঠাকুর কি ভাবে তাহা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন তাহা অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে। এই

ঘটনার কিছুদিন পরে ঠাকুর কলিকাতায় এক ভক্তের বাড়ীতে গিয়াছেন। গিরীশ তথায় উপস্থিত। তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে স্বকৃত দুষ্কর্মের কথা বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিতে-ছিলেন। ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় বলিলেন, 'গিরীশ ঘোষ, তার জন্যে ভেবো না। তোমার জীবনে যে মহাপরিবর্তন আসবে, তা দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে। গিরীশ গুরুর আশ্বাসবাণী শ্রবণে নিশ্চিন্ত হইলেন।

ঠাকুর জানিতেন যে, শুধু কথায় গিরীশের দৃঢ়মূল অভ্যাসগুলি উৎপাটিত হইবে না। তিনি শিষ্যকে স্বভাবানুযায়ী প্রশ্রয় দিলেও ক্রমে তাঁহাকে অসীম স্নেহে আবদ্ধ করিলেন। ঠাকুরের অপার প্রেমে গিরীশের পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইল। একদিন গিরীশ কোন অসুস্থা অভিনেত্রীকে দেখিতে যান। তথায় অত্যধিক মদ্যপানে এত অবশ হইয়া পড়েন যে, তথায় রাত্রিবাস করিতে বাধ্য হন। জীবনে তিনি এই প্রথম এমন স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রাতে যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন তখন অন্যায় কর্মের জন্য তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। একটি মদের বোতল সঙ্গে লইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি ঠাকুরের কাছে ছুটিয়া গেলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ঠাকুর কোন ভক্তের দ্বারা গিরীশের চাদর, জুতা ও মদের বোতলটী গাড়ী হইতে আনাইয়া রাখেন। ভাবোচ্ছ্বাস হ্রাস পাইলে গিরীশের মদ্যপানের ইচ্ছা হইল। শিষ্য গুরুর সম্মুখে, ভক্তগণের সমক্ষে মদ্যপান করিলেন। কিন্তু নেশা কাটিবার পর তিনি কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইলেন। ঠাকুর কেবল বলিলেন, 'বেশ, বেশ। যত পার ভোগ কর, কিন্তু বেশী দিন তোমার এই ভোগেচ্ছা থাকবে না।' ইহার পর সত্য সত্যই গিরীশের মদ্যপানেচ্ছা কমিয়া গেল।

তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অসীম প্রেম সম্বন্ধে গিরীশ লিখিয়াছেন, "যখন তখন ঠাকুর আমার থিয়েটারে আসতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে আমার জন্যে মিষ্টি সঙ্গে আনতেন। তিনি জানতেন যে, তিনি অগ্রভাগ গ্রহণ না করলে আমি খাবো না। সেইজন্য তিনি প্রথমে একটু মুখে দিয়া বাকীটা আমাকে খেতে দিতেন। আমি তাহা শিশুর মত পরমানন্দে খেতাম। একদিন আমি

দক্ষিণেশ্বরে গেছি। তিনি তাঁহার মধ্যাহ্নভোজন প্রায় শেষ করেছেন। তিনি আমাকে তাঁর প্রসাদ খেতে বললেন। আমি তৎক্ষণাৎ বসে খেতে লাগলাম। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিই।' ছোট ছেলের মত আমি তাঁর হাতে খেতে লাগলাম এবং তিনি তাঁহার অসাধারণ কোমল হস্তে আমায় খাইয়ে দিলেন। মায়েরা যেমন শিশুদের খাওয়ান তেমনি তিনি বাটিটি পুছে শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত আমার মুখে ধরলেন। তাঁহার অসীম স্নেহে আমি তখন একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি একজন বয়স্ক ব্যক্তি। আমার মনে হইতেছিল, আমি যেন মায়ের প্রিয়তম সন্তান এবং মা আমাকে সস্নেহে খাইয়ে দিচ্ছেন। যখন আমি মনে করি যে, আমার এই ওষ্ঠদ্বয় অযোগ্য অন্য ওষ্ঠকে স্পর্শ করেছে এবং ঠাকুরের পবিত্র হস্ত এই ওষ্ঠে হাত দিয়েছে, আমি তখন অনুশোচনায় পাগল হয়ে যাই। আর ভাবি, একি সত্যই ঘটেছিল, না স্বপ্নমাত্র? আমার সম্মুখে বসে তিনি আমার খাওয়া দেখতেন। আমার খাওয়া শেষ হলে মুখ ধোবার জন্য হাতে জল ঢেলে দিতেন। তিনি আমাকে একদিন তাঁর পদসেবা করতে বল্লেন। আমি অনিচ্ছুক। ভাবলাম, কি মুস্কিল! কে বসে বসে তাঁর পদসেবা করবে! সে কথা এখন স্মরণ করলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁহার অসীম স্নেহের স্মৃতিই আমার জীবনপথের প্রধান সম্বল। ঠাকুর সকলকে মিথ্যাকথন থেকে নিবৃত্ত হতে বলতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মশায়, আমি অনেক মিথ্যা বলি। কি করে সত্যবাদী হতে পারি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তার জন্য ভেবো না। তুমি সত্য-মিথ্যার পারে।' যখন অভ্যাসবশে আমি মিথ্যা বলতে প্রলুব্ধ হই, তখন ঠাকুরের মূর্তি আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে, আর মিথ্যা বলতে পারি না। নিঃস্বার্থ প্রেমের বলে তিনি আমার চিত্তের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব করছেন। তাঁর দিব্য প্রেমের কথা স্মরণ করলেই কাম-ক্রোধাদি রিপু পলায়ন করে, অন্য সাধনের প্রয়োজন হয় না। এই অনুভূতিই মানবজীবনের উচ্চতম লক্ষ্য।"

একদিন গিরীশ ঠাকুরকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, 'এখন থেকে কি করবো?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'যা করছ তাই করে যাও। এখন

এদিক্ (ভগবান্) ওদিক্ (সংসার) দুদিক্ রেখে চল। তারপর যখন একদিক্ ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকাল-বিকালে তাঁর স্মরণ মননটা রেখো।' এই বলিয়া গিরীশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। গিরীশ ইহা শুনিয়া বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার যে কাজ তাহাতে স্নানাহারনিদ্রা প্রভৃতি নিত্য কর্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে বিকালে স্মরণ মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব।' তিনি স্বীয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া নীরব রহিলেন, 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলিলেন না। গিরীশকে নীরব দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তা যদি না পার তবে খাবার শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ করে নিও।' গিরীশ তখনও নীরব। তিনি স্বীয় জীবনের অনিয়মিততার কথা ভাবিয়া এই সহজ কাজটী করিবার ও প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না। গিরীশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির ও নীরব রহিলেন; আর তাঁহার অন্তরে একটা দুশ্চিন্তা, ভীতি ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরীশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তুই বল্‌বি, তাও যদি না পারি? আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।' ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা! কথাটী গিরীশের মনোমত হইল। তাঁহার প্রাণ শীতল হইল। ঠাকুরের অপার করুণার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তি বিশ্বাস অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল।*

ঠাকুরের উপর স্বীয় জীবনের গুরুভার অর্পণ করিয়া শিষ্য চিরতরে নিশ্চিত হইলেন, নিজের কোন দায়িত্ব আর রহিল না। নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বোঝা যায়, তাঁহার বিশ্বাস 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা', 'আঁকড়ে ধরা যায় না।' অসুস্থ শরীরে ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আছেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। ঠাকুর সেদিন একটু সুস্থ বোধ করিতেছেন। তিনি বাগানে একটু বেড়াইতে চাহিলেন। ছুটীর দিন বলিয়া সেদিন প্রায় ত্রিশজন ভক্ত উপস্থিত। কেহ কেহ

* স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' (গুরুভাব, পূর্বার্ধ) ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

বড় ঘরে, কেহ বা বৃক্ষতলে অবস্থিত। বৈকাল তিনটার সময় ঠাকুর নীচের তলায় নামিয়া ফটকের দিকে ধীরে ধীরে চলিলেন। গিরীশ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর হঠাৎ গিরীশকে বলিলেন, 'আচ্ছা গিরীশ, তুমি আমার মধ্যে কি দেখেছ, যেজন্য আমাকে সকলের কাছে অবতার বলে প্রচার কর।' উক্ত প্রশ্নে গিরীশ আদৌ অপ্রতিভ না হইয়া হাঁটু গাড়িয়া করযোড়ে ভক্তিবিগলিত স্বরে ঠাকুরকে বলিলেন, 'ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণ যাঁহার মহিমা বর্ণিতে অক্ষম আমার মত ক্ষুদ্র জীব তাঁর কথা কি বলিতে পারে?' ভক্তির আতিশয্যে উচ্চারিত কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং সকলকে বলিলেন, 'আর কি বলবো? তোমাদের চৈতন্য হউক।' বুড়ো গোপাল যে বারখানি গেরুয়া কাপড় আনিয়াছিলেন তাহার এগারখানি বিতরণান্তে ঠাকুর একখানি গিরীশের জন্য রাখিয়া দেন। গিরীশ শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌রূপে দেখিতেন। তাঁহার নিকট গুরু এবং ইষ্ট একই ছিল।

ঠাকুর যখন কাশীপুরে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিলেন তখন আর একটী ঘটনা ঘটে। ১৮৮৫ খ্রীঃ কালীপূজার পূর্ব দিবসে ঠাকুর কয়েকজন ভক্তকে সহসা বলিলেন, 'পূজার উপকরণসকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস্। কাল কালীপূজা করিতে হইবে।' পূজোপকরণ সংগৃহীত হইল। পূজার দিন সন্ধ্যার পর ভক্তগণ উপকরণসমূহ ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে সাজাইয়া রাখিলেন। ধূপদীপ প্রজ্বলিত হওয়ায় গৃহটী আলোকিত ও সুরভিত হইল। গিরীশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ত্রিশাধিক ভক্ত সমবেত। তখন গিরীশের মনে হইল, 'নিজের জন্য কালীপূজার কোন প্রয়োজন ঠাকুরের নাই। তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় ভক্তগণ জগদম্বার পূজা করিয়া ধন্য হইবেন বলিয়া নিশ্চয়ই এই আয়োজন।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং সম্মুখস্থিত পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। উহাতে ঠাকুরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় ও দিব্য হাস্যে বিকশিত হইল। হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণপূর্বক দেহে জগদম্বার আবেশ সূচিত করিল।

গিরীশ তখন অন্যান্য ভক্তগণের সহিত বারম্বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন।

১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রিল গিরীশ কাশীপুর বাগানবাটীতে ঠাকুরকে দেখিতে যান। ঠাকুর তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসান্তে লাটুকে বলিলেন, 'গিরীশের জন্য পান, তামাক ও জলখাবার আন।' কোন ভক্ত সেদিন ঠাকুরকে অনেকগুলি পুষ্পমাল্য উপহার দেন। ঠাকুর একটির পর একটি মালাগুলি স্বীয় গলায় পরিলেন এবং দুটি মালা গিরীশকে দিলেন। জলখাবার আনা হইলে নিজে কিঞ্চিৎ খাইয়া বাকী স্বহস্তে গিরীশকে দিলেন। গিরীশ ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া জলখাবার খাইলেন। গ্রীষ্মকাল। ঠাকুর বলিলেন, 'এখানে ভাল জল নাই।' তিনি এত দুর্বল ছিলেন যে, দাঁড়াইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি গিরীশের হাতে জল ঢালিয়া দিতে চাহিলেন। তিনি উঠিয়া গ্লাসে একটু জল ঢালিলেন এবং নিজের হাতে একটু জল লইয়া দেখিলেন, উহা ঠাণ্ডা কি না। কিন্তু জল তত ঠাণ্ডা ছিল না। অধিকতর ঠাণ্ডা জল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তিনি সেই জলই গিরীশকে দিলেন। পরে বিছানায় বসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে গিরীশপ্রমুখ ভক্তদের সহিত নানা প্রসঙ্গ করিলেন। এই সকল ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়, ঠাকুর গিরীশকে কত স্নেহ করিতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর গিরীশ প্রায় পঁচিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি রামকৃষ্ণ-ধ্যানে এবং রামকৃষ্ণ-ভাব প্রচারে অতিবাহিত করেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কর্তৃক একবার গিরীশ সন্ন্যাসী হইতে অনুরুদ্ধ হন। গিরীশ একটু থামিয়া উত্তর দিলেন, 'তোমার কথা আমি ঠাকুরের বাক্য বলে মেনে নিতে পারি, কিন্তু আমি ঠাকুরকে বকল্‌মা দিয়েছি। সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের স্বাধীনতা আমার নেই।' কখন কখন তিনি ভাবের আবেগে বলিতেন, 'ধর্মজীবনে যারা পুরুষকারের সাফল্যে বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে সাধনভজন করা আমা অপেক্ষা সহজ। আমার এখন নিঃশ্বাসটি পর্য্যন্ত ফেলিবারও স্বাধীনতা নেই।' গিরীশের আত্মসমর্পণ ছিল ষোল আনা।

স্বামী বিবেকানন্দ গিরীশকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাঁহাকে 'জি. সি.' বলিয়া ডাকিতেন। গিরীশ বেলুড় মঠে আসিলে তথায়

আনন্দের হাট বসিত। গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকট বসিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেন। বেলুড় মঠে যেবার প্রথম ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়, সেবার স্বামী বিবেকানন্দ স্বহস্তে গিরীশকে শিববেশে সাজাইয়া গুরুভ্রাতৃগণকে বলিলেন, 'তোমরা চুপ কর। আজ আমরা ভৈরবের মুখে ঠাকুরের কথা শুনব।' গিরীশের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি রামকৃষ্ণ-ভাবে পরিপূর্ণ। ঠাকুরের অমৃতবাণী গিরীশ নাটকের মাধ্যমে বাংলায় কম প্রচারিত হয় নাই। স্বামী আত্মানন্দ 'কালাপাহাড়', 'নসীরাম', 'পূর্ণচন্দ্র', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি গিরীশ নাটক পড়িতে ভালবাসিতেন এবং বেলুড় মঠের সাধুব্রহ্মচারীগণকে ঐসকল পড়িবার পরামর্শ দিয়া বলিতেন, 'ধর্মগ্রন্থের মতই এগুলি পড়া উচিত।' জনৈক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী লেখক সত্যই বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর কোন নাট্যকার গিরীশের মত মানবমনের ধর্মভাব এবং মুমুক্ষত্বের উপর এত জোর দেন নাই। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ঠাকুরের কৃপায়।'

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে গিরীশের দেহে হাঁপানীর লক্ষণ দেখা দিল। ইহার পর প্রত্যেক বৎসর শীতকালে তিনি হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হইতেন। কলিকাতার বদ্ধ আবহাওয়া তাঁহার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর বোধ হইত। ১৯০৯ এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালদ্বয় তিনি কাশীধামে অতিবাহিত করেন। শেষজীবনে তাঁহার মুখমণ্ডল এবং নয়নযুগল ভক্তি-বিশ্বাসে, জ্ঞানপ্রেমে ভাস্বর হইয়া থাকিত। তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। জীবনের শেষ কয়েকটি দিন তাঁহার মুখে নিরন্তর 'রামকৃষ্ণ' নাম শুনা যাইত। তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে বলিতেন, 'আমি আর কিছু চাই না। কেবল এই আশীর্বাদ কর, যেন তাঁকে অনন্ত প্রেম ও করুণার সিন্ধুরূপে স্মরণ করি। আমার ভবভয় চিরতরে তিরোহিত। গুরুকৃপায় আমার মৃত্যুভয় অতিক্রান্ত।' দেহ ত্যাগের পূর্ব রাত্রে গিরীশ শান্তভাবে তিনবার ঠাকুরের নাম উচ্চারণপূর্বক প্রার্থনা করিলেন, 'প্রভু! আমায় শান্তি দাও। প্রভু! আমায় শান্তি দাও, আমায় তোমার বুকে টেনে নাও।' এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বীরভক্ত গিরীশচন্দ্র শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। সেদিন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার।

চব্বিশ

স্বামী সারদানন্দ *

"সারদায়াপদাব্জে বৈ নিত্যং যো ভ্রমরায়তে।
নমোঽস্তু সারদানন্দ স্বামিনে জ্ঞানদায়িনে॥"

উত্তর কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে অবস্থিত উদ্বোধন মঠে বহু বৎসর পূর্বে এক দর্শক প্রবেশ করিয়াছিলেন। বামপার্শ্বস্থ ছোট ঘরটীর মধ্যে একটী স্থূলকায় সাধুকে উপবিষ্ট ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া নবাগত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?' স্বতঃস্ফূর্ত গম্ভীর উত্তর আসিল, আমি এই মাতৃধামের দ্বাররক্ষক। নবাগত ইহা বিশ্বাস করিয়া পরবর্তী কক্ষস্থ অফিসে যাইয়া কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন, এই গম্ভীর সাধুটী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ। দর্শক তখন বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক ছিলেন কিঞ্চিৎ ন্যূন ত্রিশ বৎসর। তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে'র অমর রচয়িতা এবং কিঞ্চিদধিক একুশ বৎসর সংঘজননী সারদা দেবীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনিই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্পাদক। তৎপূর্বে দুই বৎসর তিনি আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে ব্রতী ছিলেন। জয়রামবাটীতে 'মাতৃমন্দির', বেলুড় মঠে 'সারদা মন্দির' এবং বাগবাজারে উদ্বোধন মঠ তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

পূর্বাশ্রমে স্বামী সারদানন্দের নাম ছিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। ১২৭২ সালের ৯ই পৌষ (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর) শনিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে

---

* স্বামী সারদানন্দের এই চারখানি জীবনী অদ্যাপি প্রকাশিত।—(১) ব্রহ্মচারী প্রকাশ প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ', (২) ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত 'সারদানন্দ প্রসঙ্গ,' (৩) মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'সারদানন্দের অনুধ্যান' এবং (৪) স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ—যেমনটী দেখিয়াছি।'

শরচ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতার নাম নীলমণি দেবী। তিনিই মাতাপিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। গিরীশচন্দ্রের পিতা রামানন্দ এবং শশিভূষণের পিতামহ রাজচন্দ্র দুই সহোদর ও কালীপ্রসাদ বাপুলীর পুত্র। শরৎচন্দ্রের পিতামহ রামানন্দ হুগলী জেলার অন্তর্গত ইছাপুরে স্বগ্রামে একটী টোল স্থাপনপূর্বক বহু ব্রাহ্মণকুমারকে বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইতেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র গিরীশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন। গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঔষধালয়ের অংশীদাররূপে তিনি প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। বর্তমান আমহার্ষ্ট স্ট্রীট এবং হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে তাঁহার নিজস্ব গৃহ ছিল। অধুনালুপ্ত উক্ত গৃহে শরৎচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। শনিবার সন্ধ্যায় তাঁহার জন্ম বলিয়া অনেকে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত ছিলেন। কিন্তু শরতের জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিৎ কোন খুল্লতাত গণনান্তে সকলের আশঙ্কা দূরীভূত করিয়া বলেন, 'নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং সে বংশের গৌরবস্থল হইবে।'

বালক শরতের প্রকৃতি অতি গম্ভীর ও প্রশান্ত ছিল। তিনি আলবার্ট স্কুলে অধ্যয়নকালে মেধাবলে সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। স্কুলের বিতর্ক সভায় এবং ব্যায়ামাগারেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। মাতা যখন গৃহদেবতার পূজা করিতেন তখন বালক তথায় স্থিরভাবে বসিয়া পূজা দেখিতেন। ক্রীড়া-পুত্তলিকার পরিবর্তে বালক মাতার নিকট দেবমূর্তি চাহিতেন। উপনয়নের পর তিনি স্বগৃহের ঠাকুরঘরে বসিয়া গায়ত্রীজপ ও পূজাদির অধিকার পাইলেন। বাল্যেও তিনি মিষ্টভাষী, শান্তস্বভাব ও দয়াশীল ছিলেন। কটুবাক্যে তিনি কাহারো মনে আঘাত দিতেন না। রোজ জলখাবারের জন্য যে সামান্য পয়সা পাইতেন তাহা জমাইয়া দরিদ্র সহপাঠীদের জন্য জামাকাপড় কিনিয়া দিতেন। একদা প্রতিবাসীর এক গৃহদাসীর কলেরা হয়। নিষ্ঠুর গৃহকর্তা উহাকে স্বগৃহের ছাদে ফেলিয়া রাখিলেন রোগ সংক্রমণের ভয়ে, কিন্তু উহার চিকিৎসার বা সেবাশুশ্রূষার কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। শরৎ সংবাদ পাইয়া অসহায়া দাসীর সেবাদিতে স্বয়ং নিযুক্ত হইলেন। ইহা সত্ত্বেও রোগিনী মৃত্যুমুখে পতিতা

হয়। গৃহকর্তা দাসীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন ব্যবস্থা না করায় শরৎ সানন্দে শবদাহে অগ্রসর হইলেন।

শশীর ন্যায় শরৎও কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা এবং উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। ১৮৮২ খ্রীঃ তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্তী বৎসরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। তখন ফাদার লাফ্রণ্ট ছিলেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি শরতের ধর্মভাবে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাইবেল পড়াইতেন। ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া শরতের হৃদয়ে খ্রীষ্ট-ভক্তি জাগ্রত হয়। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় শরৎ ঠাকুরের কথা পড়িয়া ১৮৮৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন করেন। শশীও সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর শরৎ ও শশীকে জীশু খ্রীষ্ট ও সেণ্ট পলের বাণী পড়াইয়া ধর্মোপদেশ দেন। প্রথম দর্শনেই শরৎ ঠাকুরের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। তখন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ বৃহস্পতিবার দিনে বন্ধ থাকিত। প্রায় প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শরৎ ঠাকুরের নিকট একাকী আসিতেন। ঠাকুরের পূত স্পর্শে আসিয়া তাঁহার মনে বিবেকবৈরাগ্য জাগ্রত হয় এবং তিনি ধর্মজীবন গঠনে মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণের নিকট গণেশ-চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন। গণেশের ইন্দ্রিয়সংযম এবং মাতৃভক্তির কথা শুনিয়া শরৎ বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, গণেশের চরিত্রটি আমার খুব ভাল লাগে, গণেশই আমার আদর্শ।' ঠাকুর তৎক্ষণেই তাঁহার ভ্রম সংশোধনার্থ বলিলেন, 'না, গণেশ তোমার আদর্শ নয়। তোমার আদর্শ শিব। তুমি শিবাংশে সম্ভূত। সর্বদা নিজেকে শিবরূপে এবং আমাকে শক্তিরূপে ভাব্‌বে। আমিই তোমার সব শক্তির আধার।' উক্ত বাক্যের গূঢ়ার্থ সাধারণ বুদ্ধির বোধগম্য নয়।

আর একদিন ঠাকুর শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ভাবে তুমি ঈশ্বরদর্শন করিতে চাও? ধ্যানে কিরূপ দিব্য দর্শন লাভের ইচ্ছা তোমার মনে জাগে?' শরৎ উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরের কোন বিশেষ রূপ আমি ধ্যানে দেখিতে চাই না। আমি সর্বভূতে তাঁহাকে প্রকটিত দেখিতে চাই। ঈশ্বরীয় রূপাদি দর্শন আমার

প্রার্থনীয় নয়।' ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'তাহা আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ কথা। সেটি হঠাৎ লাভ করা যায় না।' ইহা শুনিয়া শরৎ উত্তর দিলেন, 'ইহা ব্যতীত অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হইব না। যত দিন সেই উচ্চ অবস্থা লাভ না হয় ততদিন আমি ধর্ম সাধনে বিরত হইব না।' কি অসামান্য শুভ সংস্কার লইয়া শরৎ জন্মিয়াছিলেন তাহা উল্লিখিত উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়। ক্রমে নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ গুরুভ্রাতাদের সহিত তিনি পরিচিত হন। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার এত গভীর প্রীতি হয় যে, উভয়ে কলিকাতার রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে প্রায়ই ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। কোন কোন দিন সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে রাত্রি একটা পর্যন্ত তাঁহাদের ধর্মপ্রসঙ্গ চলিত। ১৮৮৪ খ্রীঃ শীতকালে শরৎ ও শশী এক দ্বিপ্রহরে নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসেন। নরেন্দ্র তাঁহাদের নিকট রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ তুলিলেন। উক্ত প্রসঙ্গে তিনজন এত মাতিয়া গেলেন যে, স্থান বা কালের জ্ঞান তাঁহাদের আর রহিল না। ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল তখন তাঁহারা বুঝিলেন, প্রায় আট দশ ঘণ্টা সদালাপে অতিবাহিত। তৎপরে নরেন্দ্র বেড়াইতে বেড়াইতে শরতের বাড়ী পর্যন্ত গেলেন এবং তাঁহার অনুরোধে তথায় আহার করিলেন। শরতের বাড়ী দেখিয়া নরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, বাড়ীখানি যেন তাঁহার পূর্বদৃষ্ট এবং প্রত্যেক কক্ষটি পর্যন্ত তাঁহার পরিচিত। ইহা কি কোন পূর্বজন্মের স্মৃতি?

১৮৮৫ খ্রীঃ শরৎ এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার পিতার আগ্রহাতিশয্যে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। পিতার ঔষধালয়ে ডাক্তারের আবশ্যক ছিল। সেই জন্য পিতা পুত্রকে ডাক্তারী পড়িতে বলিলেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজে তাঁহার অধ্যয়ন কয়েক মাসের বেশী স্থায়ী হয় নাই। উক্ত বৎসরের মধ্যভাগে ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ শ্যামপুকুরে আনীত হন। পরে তাঁহাকে কাশীপুর বাগানবাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। তখন নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ বালকশিষ্যগণ মিলিত হইয়া শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা করেন। শরৎও লেখাপড়া ছাড়িয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংসার-বৈরাগ্য দর্শনে পিতা গিরীশচন্দ্র উদ্বিগ্ন হন।

কুলগুরু জগমোহন তর্কালঙ্কারকে কাশীপুরে ঠাকুরের নিকট লইয়া যান। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, পণ্ডিত জগমোহন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ তুলিয়া পুত্রের সমক্ষে ঠাকুরকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিবেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। পণ্ডিত জগমোহন উন্নত তন্ত্রসাধক ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া স্বশিষ্য গিরীশচন্দ্রকে বলিলেন, 'ইনি জ্বলন্ত অগ্নি। এঁর মত মহাপুরুষ বর্তমান যুগে দুর্লভ। তোমার পুত্রের পরম সৌভাগ্য যে, তার এমন গুরুলাভ হয়েছে।' পুত্রকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার সকল আশা পিতার হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইল।

১৮৮৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী কাশীপুর বাগানবাটীতে ঠাকুর কল্পতরু হন। শরৎ তখন ঠাকুরের বিছানাপত্র রৌদ্রে দিতে ছিলেন। কখন ঠাকুর উপরে উঠিয়া আসেন ঠিক নাই। সেইজন্য তিনি ঠাকুরের বিছানা রৌদ্র হইতে তুলিয়া খাটে পাতিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সকলে কৃপালাভের জন্য ঠাকুরের নিকট ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু শরৎ গুরুসেবায় ব্যাপৃত রহিলেন। ঠাকুরের কাছে না যাইবার কারণ সম্বন্ধে পরবর্তী জীবনে জিজ্ঞাসিত হইয়া শরৎ বলিয়াছিলেন, 'যাবার প্রয়োজন বোধ করি নি। কেন বা করব? তিনি কি আমাদের প্রিয়তম স্বজন অপেক্ষা প্রিয়তর ছিলেন না? আমার যা দরকার, তিনি স্বেচ্ছায় তা দিবেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া তিনি যে আমাদেরই ছিলেন।' 'আমাদেরই ছিলেন' বলিবার সময় তাঁহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। একদিন ঠাকুর তাঁহার তরুণ শিষ্যদিগকে ভিক্ষা করিতে আদেশ করেন। বালকগণ পরমানন্দে গুরুর আদেশ পালনে অগ্রসর হইলেন। শরৎ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ভিক্ষাকালে তাঁহার যে অপ্রিয় অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তিনি পরে সহাস্যে এইভাবে বর্ণনা করেন।—"আমি একটী ছোট গ্রামে গিয়া কোন গৃহদ্বারে 'নারায়ণ হরি' উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইলাম। আমার ডাক শুনিয়া এক বৃদ্ধা বাহিরে আসিলেন। তিনি আমার সুপুষ্ট দেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া ঘৃণাসূচক স্বরে বলিলেন, 'এমন সবল শরীর নিয়ে ভিক্ষা করতে লজ্জা হয় না? অন্ততঃ ট্রামের একটা কণ্ডাক্টার হয়ে দুপয়সা রোজগার

করতে পার!' ইহা বলিয়া বৃদ্ধা সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন।"

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শরৎপ্রমুখ ভক্তগণ ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর আপন মনে পাদচারণ করিতে করিতে হঠাৎ আসিয়া শরতের কোলে বসিলেন এবং খানিকক্ষণ বসিয়া উঠিয়া গেলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'দেখলাম ও কতটা ভার সইতে পারবে।' ইহার দ্বারা সূচিত হয় যে, তিনি ভবিষ্যতে শ্রীগুরুর নামাঙ্কিত বিশাল-সংঘের গুরুভার বহনে সমর্থ হইবেন। শরতের মাতা এবং এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন। ঠাকুর কনিষ্ঠ ভ্রাতাটির সহিত আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হন এবং শরৎকে বলেন, 'তোর ভাইটিকে টানব নাকি?' শরৎ ইহা শুনিয়া সুখী হইয়া বলিলেন, 'আপনি যদি তা করেন তো ভাল হয়।' ঠাকুর ইহা শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'না, তা ঠিক হবে না। এক বাড়ী থেকে দুজনকে টেনেছি। আর একটি নিলে মায়েদের খুব কষ্ট হবে।' ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শরতের মনে বিবেক ও বৈরাগ্য প্রবলতর হইল। তিনি গৃহ-ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে নবপ্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মঠে আসিতেন। পিতা পুত্রকে অনেক বুঝাইয়াও যখন নিরস্ত করিতে পারিলেন না তখন তাহাকে গৃহবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শরৎ ইহাতে চিন্তিত না হইয়া ধ্যানজপে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার যে ভাইটী ঠাকুরের কাছে যাইতেন তিনি দাদার প্রতি সমবেদনায় গোপনে গৃহদ্বার খুলিয়া দেন। শরৎ সোজা বরাহনগর মঠে উপস্থিত হইলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিরজা হোম সমাপনান্তে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক শরৎ সারদানন্দ নামে অভিহিত হন।

বরাহনগর মঠে স্বামী সারদানন্দ অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের সহিত শাস্ত্রাধ্যয়ন, ধ্যানজপ ও ধর্মালোচনায় প্রমত্ত হইলেন। তাঁহার আহার-নিদ্রা বিস্মৃত এবং ব্রহ্মদর্শনের আগ্রহ প্রবল হইল। নিশীথে গোপনে সারদানন্দজী কখনো স্বামী বিবেকানন্দের সহিত, কখনো বা একাকী কাশীপুর শ্মশানে বা দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে যাইয়া তপস্যা করিতেন। কখনো ফিরিয়া আসিতেন শেষরাত্রে

সকলের শয্যাত্যাগের পূর্বে, আবার কোন কোন বার সমস্ত রাত্রি তথায় কাটাইতেন। নারীকণ্ঠের ন্যায় স্বামী সারদানন্দের স্বর সুমিষ্ট ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও সাহায্যে তিনি সুগায়ক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার গলার স্বর স্বামিজীর এত অনুরূপ হইয়াছিল যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, 'দূর হতে বোঝা যেত না, শরৎ গাইছে কি স্বামিজী গাইছেন।' বরাহনগর মঠে একরাত্রে স্বামী সারদানন্দ 'দানাদের ঘরে' গান করিতেছিলেন। রাস্তা হইতে সেই সঙ্গীত রমণীকণ্ঠের স্বরবৎ সুমিষ্ট শ্রুত হইতেছিল। গভীর রাত্রে মঠে রমণীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে সন্দেহ করিয়া কয়েকটী প্রতিবাসী দেওয়ালে উঠিয়া সঙ্গীতস্থলে যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন এবং তন্মধ্যে একজন ক্ষমা চাহিলেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণপূর্বক স্বামী সারদানন্দ যখন সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি বা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করিতেন তৎশ্রবণে শ্রোতাদের মনে উচ্চ ধর্মভাবের উদয় হইত।

বরাহনগর মঠ হইতে পুরী যাইয়া স্বামী সারদানন্দ কয়েক মাস তপস্যা করেন। পুরী হইতে বরাহনগরে ফিরিয়া কিছুদিন পরে উত্তর ভারতের তীর্থসমূহ পর্য্যটনে তিনি বহির্গত হন। কাশী, অযোধ্যা, ও হরিদ্বার হইয়া তিনি হৃষীকেশে যান। হৃষীকেশের তপস্যানুকূল পবিত্র পরিবেশ তাঁহার খুব ভাল লাগিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অন্য এক গুরুভ্রাতার সহিত তিনি গঙ্গোত্রী হইয়া কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ তীর্থদর্শনে যান। এই তীর্থযাত্রায় তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। তাঁহাদের কোনদিন আহার, কোনদিন আশ্রয় মিলিত না। কোন কোন স্থানে তাঁহাদের জীবনও বিপন্ন হয়। এক চড়াই অতিক্রম করিবার সময় গুরুভ্রাতৃদ্বয় অগ্রবর্তী এবং তিনি পশ্চাদ্বর্তী ছিলেন। সর্বাবস্থায় তাঁহাকে অবিচলিত দেখা যাইত। প্রত্যেকের হাতে এক একটী পাহাড়ী লাঠী ছিল। লাঠী ব্যতীত পাহাড়ে চলা বিপজ্জনক, পা পিছ্‌লাইয়া যাইবার সমধিক সম্ভাবনা। স্বামী সারদানন্দের পশ্চাতে একদল গৃহী তীর্থযাত্রী ছিল। তন্মধ্যে এক বৃদ্ধার হাতে লাঠি ছিল না। লাঠির অভাবে বৃদ্ধার চড়াই করিতে খুব কষ্ট হইতেছিল। স্বামী সারদানন্দের দরদী হৃদয়ে অনুভূত হইল, বৃদ্ধার অভাব

তদপেক্ষা অধিকতর। তিনি নীরবে স্বীয় লাঠিখানি বৃদ্ধার হাতে দিয়া শূন্য হস্তে পাহাড় চড়াই করিতে লাগিলেন।

অত্যধিক শীতের জন্য তিনি কেদারনাথে এক রাত্রির অধিক থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই এক রাত্রির আনন্দ চিরকাল তাঁহার মনে মুদ্রিত ছিল। সেই রজনী ছিল জ্যোৎস্নাময়ী। তিনি গভীর রাত্রে বাহিরে আসিয়া হিমালয়ের সুশুভ্র সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের বর্ণনা তিনি একটী পত্রে এইভাবে দিয়াছেন: "বাহিরে আসিয়া আমি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। চতুর্দিকস্থ শৃঙ্গশ্রেণী শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, তুষারাবৃত পর্ব্বত-শ্রেণীতে উজ্জ্বলালোক প্রতিবিম্বিত। দশদিকে প্রলয়ের নীরবতা। মন্দাকিনী নদীর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ-শব্দ সেই নীরবতাকে প্রগাঢ়তর করিতেছিল। এমন সুন্দর, অথচ এমন ভয়ঙ্কর স্থান পূর্বে আর দেখি নাই।" বদ্রীনারায়ণে তাঁহার কিছু দিন তপস্যার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ এবং বদ্রীনারায়ণ দর্শনান্তে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে আলমোড়ায় আসিয়া লালা বদ্রীনাথ শাহের অতিথি হন। আগষ্টের শেষে স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ তথায় আসিলে তিনজনে একত্রে গাড়োয়ালে গমন করেন। তথা হইতে স্বামী বিবেকানন্দ একাকী অন্যত্র চলিয়া যান এবং অন্য স্বামীদ্বয় গাড়োয়ালের রাজধানী তেহরীতে উপস্থিত হন। তেহরীতে স্বামী অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তথায় সুচিকিৎসকের অভাবে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে লইয়া দেরাদুনে আসেন। পথে মুসৌরীর নিকট রাজপুরে আশাতীতভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত দেখা হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ কেদারনাথ যাইবার পথে স্বামী সারদানন্দকে ছাড়িয়া রাজপুরে তপস্যার্থ আসিয়াছিলেন। পুনর্মিলনে সকলে আনন্দিত হইলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি এলাহাবাদে প্রেরিত হন! অনন্তর স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ একত্রে হৃষীকেশ যাইয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন।

হৃষীকেশ হইতে স্বামী সারদানন্দ দিল্লী, বৃন্দাবন, মথুরা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান দেখিয়া কাশীধামে উপস্থিত হন। কাশীতে তিনি কিছুদিন

তপস্যামগ্ন ছিলেন। তথায় এক বৈরাগ্যবান্ ভক্ত দীর্ঘকাল গুরুর সন্ধানে ছিলেন। তিনি স্বামী সারদানন্দের প্রতি এত আকৃষ্ট হন যে, পরে তাঁহার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক স্বামী সচ্চিদানন্দ নাম ধারণ করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে স্বামী অভেদানন্দ কাশীধামে আসিয়া স্বামী সারদানন্দের সহিত মিলিত হন। উভয়ে স্বামী সচ্চিদানন্দের সহিত কাশীধাম পরিক্রমা করেন। পরিক্রমার পথ চল্লিশ বর্গমাইল। পথশ্রমে স্বামী সারদানন্দের জ্বর হয়, তৎপরে রক্তামাশয়। তিনি বাধ্য হইয়া ১৮৯১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। বরাহনগর মঠে কিছুদিন বাস করিবার পর তিনি সুস্থ হইয়া জয়রামবাটী গ্রামে সারদাদেবীকে দেখিতে যান। সারদাদেবীকে তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বা-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি মঠে ফিরিয়া আসেন। তখন মঠ বরাহনগর হইতে আলম বাজারে উঠিয়া যায়। আলমবাজার মঠে অবস্থানকালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে থাকিয়া ভিক্ষান্নে জীবনধারণপূর্বক কিছুদিন তপস্যা করেন। আলমবাজার মঠে ঠাকুরঘরে যাইয়া একদিন তিনি দেখিলেন, তথায় পাচকের কাদা পায়ের দাগ পড়িয়াছে। তিনি এই পবিত্র স্থান অপরিষ্কৃত হওয়ায় মর্মাহত হন এবং তিরস্কার ও সাবধান করিবার জন্য পাচককে ডাকিয়া পাঠান। পাচক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সম্মুখে আসিল। ইহাতে ক্রোধশূন্য সাধুর মন গলিয়া যায় এবং তিনি পাচককে কিছু বলিলেন না। তাঁহাকে দুঃখে বিপদে ক্রোধে অবিচলিত দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'শরতের রক্ত বেলে মাছের রক্তের মত ঠাণ্ডা, আদৌ গরম হয় না!'

১৮৯৮খ্রীঃ এপ্রিল মাসে স্বামী সারদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারার্থ লণ্ডনে উপস্থিত হন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল লণ্ডনে ছয় বৎসর পরে। স্বামিজী তখন আমেরিকা হইতে দ্বিতীয় বার লণ্ডনে আসিয়াছেন। লণ্ডনে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার পর স্বামী সারদানন্দ নিউইয়র্কে প্রেরিত হন। তথায় তিনি স্থানীয় বেদান্ত সমিতিতে প্রচার আরম্ভ করেন। গ্রীনেকার নামক স্থানে একটি তুলনামূলক

ধর্মালোচনা সভা হইতেছিল। তথায় তিনি বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। সভা সমাপ্ত হইলে তিনি ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ও বোষ্টন সহরে বক্তৃতাদানের জন্য আহুত হন। ব্রুকলিন নীতি সভাতে তিনি হিন্দু নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই সকল স্থানে তিনি ধর্মশিক্ষক-রূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। তাঁহার সরল স্বভাব, মিষ্ট বাক্য, ভদ্র ব্যবহার, শাস্ত্রজ্ঞান এবং গভীর আধ্যাত্মিকতা সকলকে মুগ্ধ করিল। পরে তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে স্থায়ীভাবে প্রচার-কার্য করেন। মণ্টক্লেয়ারেও তিনি বেদান্তপ্রচারে কৃতকার্য্য হন। মণ্টক্লেয়ার নিউইয়র্ক হইতে এক ঘণ্টার পথ এবং সুন্দর ছোট সহর। তথায় স্বামী সারদানন্দ যাঁহার বাড়ীতে থাকিতেন তাঁহার পত্নী অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। সারদানন্দজী ঠাকুরের কথা প্রায়ই বলিতেন। একদিন তিনি ঠাকুরের একখানি ফটো বাহির করিয়া উক্ত স্ত্রী-ভক্তটীকে দেখান। মহিলা ফটোটী দেখিয়াই আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'ও স্বামী! এই সেই মূর্তি!' স্বামী সারদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বলিতেছ?' মহিলাটী তখন বলিলেন, 'বিবাহের বহু পূর্বে যৌবনে আমি এক হিন্দু সাধুর পুণ্য দর্শন পাই। এই ফটো তাঁহারই ছবি। ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু এতদিন তাহা আমি জানিতাম না। দর্শনলাভে আমি এত বিমুগ্ধ ও প্রভাবিত হই যে, বহু বৎসর পূর্বে দৃষ্ট মুখখানি এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। দর্শনলাভের পর যখনই শুনিতাম, আমেরিকায় কোন হিন্দু আসিয়াছেন আমি এখানে ওখানে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতাম। কিন্তু পূর্বদৃষ্ট মনোহর মূর্তি না দেখিতে পাইয়া বিষণ্ণ হইতাম। অবশেষে আমি জানিলাম, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্যা হয়েছি।' স্বামী সারদানন্দ ভারতে চলিয়া আসিলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত মহিলার বাড়ীতে থাকিয়া মণ্টক্লেয়ারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেন। ভারত হইতে জাহাজে লণ্ডন যাইবার পথে স্বামী সারদানন্দ ভূমধ্যসাগর হইয়া রোম নগরীতে গমন করেন। ভূমধ্য-সাগরে তাঁহাদের জাহাজ বাত্যাবিক্ষুব্ধ হয়। জাহাজের যাত্রীগণ ভয়ে ও নৈরাশ্যে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করেন। অনেকে চীৎকার করিয়া

কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ অবিচলিত চিত্তে এই প্রলয় দৃশ্যের নীরব দ্রষ্টা রহিলেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও তিনি চিত্তের স্থৈর্য হারাইলেন না। রোমে যাইয়া তিনি পোপের ভাটিকান গ্রন্থাগার এবং উহার সুন্দর ভাস্কর্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। প্রসিদ্ধ সেণ্ট পিটার্স ক্যাথিড্রালে তিনি যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি দর্শনে সমাধিস্থ হন। ইহা হইতে কি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোন পূর্বজন্মে যীশুখ্রীষ্টের পার্ষদ ছিলেন? কারণ, ঠাকুর ভাবনেত্রে শশী ও শরৎকে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে দেখিয়াছিলেন। ১৮৯৮খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারী স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা ছাড়িয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে লণ্ডন, প্যারিস, রোম প্রভৃতি স্থান দেখিয়া ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হন। পাশ্চাত্যে প্রায় দুই বৎসর তাঁহার প্রবাস হয়। স্বামিজীর নির্দেশে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সংঘজননী সারদাদেবী বলিতেন, 'বাসুকি যেমন সহস্র ফণা বিস্তার করে পৃথিবীকে ধরে আছেন, তেমনি শরৎ সংঘকে ধরে আছে।' একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সংঘের প্রারম্ভ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর তিনি প্রাণপণে সংঘকে সংরক্ষণ করেছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারী প্রাদুর্ভূত হয়। স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ সংঘের সেবকগণ সেবাকার্য আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে স্বামী সারদানন্দ স্বামিজীর পীড়ার সংবাদ তারযোগে পাইয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে শ্রীনগরে তিনি ঘোড়ার গাড়িতে যাইতেছিলেন। মুরী পাহাড়ের কাছে ঘোড়া অকস্মাৎ ভীত হইয়া পা পিছলাইয়া চার পাঁচ হাজার ফুট নীচে গড়াইয়া পড়ে। গাড়ীটা অর্দ্ধেক গভীরতায় নামিয়া একটি গাছে আটকাইয়া যায়। এই সুযোগে স্বামী সারদানন্দ গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে লাফাইয়া পড়েন। ঠিক সেই সময় উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পর্বতখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে ও ঘোড়াটিকে বিচূর্ণ করে। আশ্চর্যভাবে স্বামী সারদানন্দের জীবনরক্ষা হইল। এই সঙ্কটময় সময়েও তাঁহার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয় নাই। 'গাড়ীর মধ্যে

থাকাকালে তাঁহার মনোভাব কিরূপ হইয়া ছিল' জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'আমার মন নিক্তির কাঁটার মত স্থির থাকিয়া এই প্রলয়-তাণ্ডব সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করিতেছিল'। আর একটী ঘটনা। একবার তিনি কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। সঙ্গে একটি ভক্ত ছিল। গঙ্গার মধ্যস্থলে নৌকা আসিবার পর তুমুল ঝড় উঠিল। উত্তাল তরঙ্গে নৌকা প্রায় নিমজ্জমান হইল। স্বামী সারদানন্দ তখন শান্তভাবে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন! ভক্তটি স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসীর প্রশান্ত ভাবদর্শনে ধৈর্যচ্যুত হইয়া তাঁহার হুঁকা-কলিকা গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন! ভক্তের এই অশিষ্টাচারেও মৃদুহাস্যে তিনি অবিচলিত রহিলেন। তিনি ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর এত নির্ভর করিতেন যে, কোন সংঘ-কেন্দ্রে গোলমাল উপস্থিত হইলে বলিতেন, 'স্থির হও, ঈশ্বরেচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

১৮৯৯খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বামী সারদানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত বেদান্ত-প্রচার ও অর্থ-সংগ্রহার্থ গুজরাটে গমন করেন। তাঁহারা কানপুর, আগ্রা, জয়পুর, আমেদাবাদ, লিম্বডি, জুনাগড়, ভাবনগর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া মে মাসের প্রথম ভাগে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। স্বামী সারদানন্দ এই ভ্রমণে ইংরাজি ও হিন্দী ভাষায় অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কাথিয়াবাড়ে ভাবনগর 'বেদের সারতত্ত্ব' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাহা শ্রোতৃবর্গের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। জনৈক শ্রোতা উক্ত ভাষণ সম্বন্ধে বলেন, 'স্বামী সারদানন্দের ভাষণটি শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে গভীর দাগ ফেলিয়াছিল। তাঁহার সৌম্যমূর্তি, গম্ভীর স্বর ও বাগ্মীতা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কোন ধর্মপ্রচারকের নিকট বেদান্ততত্ত্ব সম্বন্ধে এমন সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা আর শুনি নাই।' স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যে যাইবার পর সংঘচালনার গুরু দায়ীত্ব স্বামী সারদানন্দের উপর পড়ে। তিনি তখন বেলুড় মঠে থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যাপনা ও সাধনভজনাদিতে মগ্ন হন। সেই সময় তিনি এই নিয়ম প্রচলিত করেন যে, মঠের ঠাকুরঘরে সারারাত্রি সাধুব্রহ্মচারীগণ পালা করিয়া ধ্যানজপ

চালাইবেন। অবশ্য এই বিষয়ে তিনিই সর্বাগ্রণী হইলেন। এই সময়ে কোন কোন দিন তিনি উদয়াস্ত জপ-ধ্যান করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে নানা স্থানে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি করিতে হইত।

১৮৯৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে স্বামী সারদানন্দ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ঘুরিয়া বরিশালে গমন করেন। বরিশালে তিনি আট দিন ছিলেন এবং তিনটি বক্তৃতা দেন। বরিশালে প্রচার সম্বন্ধে ১৯০০ খ্রীঃ ১৬ই জানুয়ারী বেলুড় মঠ হইতে তিনি ঢাকার কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, 'বরিশালে একটি ইংরাজি, দুইটি বাংলা এবং দুইটি প্রশ্নোত্তর সভা হয়। সকলে বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছে। বরিশালে ছাত্রদের বেশ উৎসাহ। অশ্বিনীবাবু ও জগদীশবাবু দুইটি বেশ সাধু লোক এবং বেশ কাজ করিতেছেন। নিত্যানন্দ স্বামীর শিষ্যেরা বড়ই আদর-যত্ন করিয়াছে। আসিবার সময় তারা কান্নাকাটি করিতে লাগিল।' অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ীতেই তিনি দর্শকগণের সহিত আলাপাদি করিতেন। তিনি জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে তিনি তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করেন। শশী মহারাজের পিতা তন্ত্রসাধক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট তিনি পূর্ণাভিষিক্ত হন। তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তান্ত্রিক সাধনা অনুষ্ঠানে তিনি অচিরে সিদ্ধকাম হইলেন। সর্বভূতে জগন্মাতার দর্শন তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য। তিনি এই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত 'ভারতে শক্তিপূজা' নামক গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'এই পুস্তকখানি অশেষ ভক্তির সহিত তাঁহাদের নামে উৎসর্গীকৃত, যাঁহাদের কৃপায় গ্রন্থকার পৃথিবীস্থ প্রত্যেক নারীর মধ্যে জগদম্বার বিশেষ প্রকাশ অনুভব করিয়াছে।' ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গভীর অধ্যয়ন ও অনুভূতির ফলস্বরূপ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সানফ্রান্সিস্কো হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার স্থানে কার্য করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেরিত হন। স্বামী ত্রিগুণাতীত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ ও পরিচালক ছিলেন। তিনি আমেরিকা চলিয়া যাইবার পর পত্রিকা-পরিচালন দুষ্কর হইয়া পড়িল, অর্থাভাবে উহা বন্ধপ্রায় হইল। কেহ কেহ উহা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব

করিলেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ অগ্রসর হইয়া উহার সমগ্র দায়ীত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন, চাঁদা তুলিতেন এবং অর্থ সংগ্রহ ও তত্ত্বাবধানাদি করিতেন। ক্রমে পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইল। পত্রিকার স্থায়ী কার্যালয় এবং সংঘজননীর বাসস্থানের জন্য ভক্ত কেদার দাস কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর তিনি উদ্বোধন মঠ নির্মাণ করেন। নানা দিক হইতে বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি এই কার্য করিতে অগ্রসর হন এবং এই জন্য স্বীয় দায়ীত্বে বহু টাকা ধার করেন। শাপে বর হইল। ঋণ পরিশোধের জন্য স্বামী সারদানন্দ 'রামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তক পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক শ্রেণীভুক্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। কিন্তু পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ। কারণ, ঠাকুরের মহাসমাধির বর্ণনা ইহাতে নাই। পুস্তকখানি সমাপ্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে হইবে।' হায়! ঠাকুরের শুভেচ্ছা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আর হয় নাই। 'লীলাপ্রসঙ্গ' অবলম্বনে বহু ভাষায় ঠাকুরের দিব্য জীবনী রচিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দের দ্বারা ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ লিখাইয়া ইংলণ্ডে জার্মান মনীষী মোক্ষমূলরকে পাঠান। মোক্ষমূল উক্ত রচনার কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়াই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে উদ্বোধন কার্যালয় নব গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংঘজননী পরবর্তী বৎসরে মে মাসের শেষার্ধে তথায় প্রথম শুভাগমন করেন। সারদা দেবী আসিয়া উদ্বোধন মঠে অবস্থান করিলে স্বামী সারদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। শশী যেমন রামকৃষ্ণে আনন্দ পাইতেন তেমনি শরৎ সারদায় আনন্দ পাইতেন। সারদানন্দের নাম সার্থক হইয়াছিল। সংঘ-জননীর সেবা তাঁহার নিকট সাধনতুল্য পুণ্যকার্য ছিল। সংঘ-জননীর জন্মস্থান জয়রামবাটীর কুকুর-বিড়ালকেও তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি প্রায় সুদীর্ঘ একুশ বৎসরকাল সংঘ-জননীর অক্লান্ত সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে অন্তরঙ্গ মনে করিতেন এবং বলিতেন, 'আমার বোঝা নিতে পারে এমন কাউকে

দেখি না। যোগীন্ ছিল। শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে, শরৎ আমার ভারী।.... শরতের সমান কেউ নেই। তার যত বড় বুকখানি, তত বড় হৃদয়খানি।'

১৯০৯ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ সংঘ এক বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। মাণিকতলা বোমার মামলায় অভিযুক্ত দেবব্রত বসু এবং শচীন্দ্রনাথ সেন পূর্বসংস্রব ছাড়িয়া বেলুড় মঠে যোগদান করিতে আসেন। উভয়ে ঘোর বিদ্রোহীরূপে বিদিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে মঠে লইলে সংঘের উপর সরকারের কুনজর পড়িবে। এইজন্য কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ তাঁহাদিগকে সংঘে স্থান দিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ সহকর্মীগণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্রোহীদ্বয়কে মঠে গ্রহণ করেন। দেবব্রত সন্ন্যাস লইয়া প্রজ্ঞানন্দ নামে অভিহিত হন। তিনি তিন বৎসর 'উদ্বোধনে'র সম্পাদক এবং ছয় বৎসর মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক থাকিয়া ১৯১৮ খ্রীঃ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপ্রণীত 'ভারতের সাধনা' নামক পুস্তকের সুন্দর ভূমিকা স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক লিখিত।

বাংলা সরকারের বাৎসরিক শাসন-বিবৃতিতে একবার প্রকাশিত হয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী এই প্রদেশে বিদ্রোহমূলক আন্দোলনের উৎস। উক্ত বিবৃতি প্রকাশের পরে ১৯১৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ঢাকায় প্রদত্ত দরবার ভাষণে একই মর্মে কয়েকটী মন্তব্য করেন। ইহার ফলে সংঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্ত্রাস সঞ্চারিত হয় কর্তৃপক্ষের মনে। অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামী সারদানন্দ গভর্ণরকে একটী দরখাস্ত পাঠান এবং স্বয়ং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সংঘ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল ধারণা পরিবর্তিত করেন। লর্ড কারমাইকেল তাঁহাকে লিখিত এক সরকারী পত্রে উপরোক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী সারদানন্দ ১৯১৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরী যাইয়া পাঁচ ছয় মাস অবস্থান করেন। পুরীধামে তিনি বলরাম বসুর 'শশী নিকেতনে' থাকিতেন। এক সন্ধ্যায় ভ্রমণান্তে বাসায় ফিরিয়া দেখেন, ইহা

বুন্দীর রাজা কর্তৃক ভুলক্রমে অধিকৃত। মন্দিরের এক পাণ্ডার ভ্রমবশতঃ এই ঘটনা ঘটে। তিনি অস্থায়ীভাবে অন্য বাসায় উঠিয়া গেলেন। রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী সারদানন্দের সৌজন্যে ও শিষ্টতায় এত মুগ্ধ হন যে, তিনি ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য তাঁহার সময়ে দেশব্যাপী প্রসারলাভ করে। যেখানে দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, মহামারী, প্রভৃতি নৈসর্গিক দুর্ঘটনা হইত সেখানেই সেবকগণকে পাঠাইতেন। ১৯১৬ খ্রীঃ তিনি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রয়াগাদি তীর্থে দুই মাস অতিবাহিত করেন। ১৯১৭ খ্রীঃ প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দ কালাজ্বরের আক্রমণে বলরাম মন্দিরে শেষশয্যায় শায়িত হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা করেন। সংঘকার্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকাকালীনও তিনি অস্থির রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রাত কাটাইতেন। ভক্তগৃহেও তিনি রাত্রি জাগিয়া রোগীসেবা করিতেন। একদা কোন ভক্ত বসন্তরোগে পীড়িত হইয়া গঙ্গাতীরস্থ কুটীরে পড়িয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে রোগীর কাছে যাইয়া তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করেন। কোন ভক্তগৃহে এক যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষার আবশ্যক হওয়ায় তিনি নিজে যাইয়া সযত্নে রোগীসেবায় নিযুক্ত হন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কোন যক্ষ্মারোগী তাঁহাকে স্বহস্তে ফল কাটিয়া খাইতে দেন। মুমূর্ষু রোগীকে সান্ত্বনা দানার্থ তিনি নির্বিকার চিত্তে উক্ত ফলাহার করেন। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত এরূপ সপ্রেম সেবা ও সমবেদনা অসম্ভব।

১৯২০ খৃঃ সারদাদেবী স্বধামে প্রস্থান করিলে তাঁহার হৃদয় চিরতরে ভগ্ন হইয়া যায়। ইহার দুই বৎসর পরে ১৯২২ খ্রীঃ সংঘের প্রথমাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষা করেন। জয়রামবাটী গ্রামে স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক মাতৃমন্দির নির্মিত এবং ১৯২৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে উৎসর্গীকৃত হয়। মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন উক্ত গ্রামে মহোৎসব হয়। তিনি সেদিন কল্পতরুবৎ সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—কাহাকেও দীক্ষা, কাহাকেও ব্রহ্মচর্য, কাহাকেও বা সন্ন্যাস দেন। সেদিন

তিনি প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করেন নাই। সেদিন মাতৃশক্তি অন্তরঙ্গ সন্তানে অবতীর্ণ। তাঁহারই আগ্রহে ১৯২৬ খ্রীঃ বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ সংঘের সাধুসম্মেলন হয়। ইহাতে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রায় এক শত সাধু উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দেন তাহা অতি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ। ঐ বৎসর সংঘ-পরিচালনের জন্য একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। ইহার পরে তিনি সংঘের কার্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শেষ জীবনেও রোজ পূর্বাহ্নে তিনি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া জপধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। ইতোমধ্যে তাঁহার কর্মক্লান্ত জরাজীর্ণ দেহ ব্যাধিমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। ১৯২৭ খ্রীঃ ৭ই এপ্রিল শনিবার সান্ধ্য আরাত্রিকের পর তিনি উদ্বোধন মঠে স্বীয় কক্ষে সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হন। জীবনের বাকী বার তের দিন তাঁহার বাক্‌শক্তি এবং উত্থানশক্তি ছিল না। ১৯শে আগষ্ট ভোর রাত্রিতে তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন।

গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ স্বামী সারদানন্দের জীবনে সুপ্রকটিত ছিল। এমন দ্বন্দ্বাতীত স্থিতধী মহাপুরুষ বর্তমান যুগে বিরল। তাঁহার দিনলিপি হইতে জানা যায়, তিনি বহুবার জগদম্বার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'আমরা কি দক্ষিণেশ্বরে ঘাস কেটে-ছিলাম?' তৎপ্রণীত 'রামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধি-তত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, '"লীলাপ্রসঙ্গে' এমন কিছু লিখি নাই যাহা স্বানুভূত নয়।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষাকালে তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, 'ভাই শরৎ, তুই তো ব্রহ্মবিদ্যা জানিস্।' স্বামিজী একদিন বলিয়া-ছিলেন, 'ঠাকুরের দিক্ দিয়া মহারাজের স্থান যেমন অতি ঊর্ধ্বে, জগতের দিক্ দিয়া শরতের স্থান তেমনি ঊর্ধে।'

পঁচিশ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ *

“রামকৃষ্ণস্বভুৎ যেন পুত্রবান্ ভৌমমণ্ডলে।
ব্রহ্মানন্দং নমামি ত্বাং রাখালদলনায়কম্ ॥”

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্থান স্বামী বিবেকানন্দের ঠিক পরেই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরকোটী শিষ্য ও মানস পুত্ররূপে পূজিত। মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্থানীয় ভক্তগণকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘তোমরা ঠাকুরকে কেহ দেখ নাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখিলেই ঠাকুরকে দেখা হইল।’ অন্য এক সময় কোন ভক্ত ঠাকুরকে নিবেদনার্থ কিছু ফুলফল লইয়া মঠে আসেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভক্তটীকে বলিলেন, ‘এই ফুল ও ফল ব্রহ্মানন্দজীকে নিবেদন কর। তাঁহাকে নিবেদন করা, আর ঠাকুরকে নিবেদন করা একই কথা।’ বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তৎপ্রণীত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ’ নামক পুস্তিকাটী পড়িলে বোঝা যায়, ঠাকুরের উপদেশগুলি তিনি কেমন মনে রেখেছিলেন। তাঁহার ‘ধর্মপ্রসঙ্গ’ শীর্ষক পুস্তকে সাধনতত্ত্ব সরল ভাবায় বিবৃত।

পূর্বাশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম ছিল রাখালচন্দ্র ঘোষ। রাখাল ১৮৬৩ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাটের অদূরে সিক্‌রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দমোহন ঘোষ জমিদার ছিলেন। তাঁহার

---

* কলিকাতা উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ‘স্বামী ব্রহ্মানন্দ’ এবং মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত ও স্বামী প্রভাবানন্দ প্রণীত ‘The Eternal Companion’ নামক গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তৃত জীবনী আছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ‘অজাতশত্রু স্বামী ব্রহ্মানন্দ’ পুস্তকে বহু নূতন তথ্য পাওয়া যায়।

মাতা কৈলাসকামিনী কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। রাখাল পাঁচ বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। তখন আনন্দমোহন দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। রাখাল বিমাতা কর্তৃক প্রতিপালিত হন। আনন্দমোহন পুত্রের শিক্ষালাভার্থ স্বগ্রামে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহাতেই রাখাল ভর্তি হন। বালক কুস্তি প্রভৃতি খেলায় সুদক্ষ এবং অধ্যয়নে মনোযোগী ছিলেন। গ্রামের কালীবাড়ীর প্রাঙ্গনে তিনি অধিকাংশ দিন খেলাধূলা করিতেন। মাটীর দেবমূর্তি গড়িয়া পূজা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। বাড়ীতে যখন দুর্গাপূজা হইত তখন বালক মণ্ডপে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পূজা দেখিতেন। বার বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া হাই স্কুলে ভর্তি হন। তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাখাল নরেন্দ্রনাথের সহিত ব্রাহ্ম সমাজে যাইয়া কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। তখন হইতে তাঁহার মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। বিবেক-বৈরাগ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ কমিয়া গেল। ষোল বৎসর বয়সে আনন্দমোহন পুত্রের বিবাহ দেন। রামকৃষ্ণ-ভক্ত মনোমোহন মিত্রের সহোদরা বিশ্বেশ্বরীর সহিত রাখাল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কালে তাঁহার একটি পুত্রলাভ হয়। পুত্রের নাম ছিল সত্যানন্দ। দশ বৎসর বয়সে সত্যানন্দের মৃত্যু হয়। পুত্র-শোকে বিহ্বলা হইয়া বিশ্বেশ্বরী আত্মহত্যা করেন। রাখালের শ্বাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজে রাখাল ঠাকুরের নাম শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

বিবাহের পর মনোমোহন নৌকাযোগে রাখালকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যান। প্রথম দর্শনে ঠাকুর রাখালকে ভাবনেত্রে পূর্বদৃষ্ট অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে চিনিতে পারেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করেন। রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর মৃদু হাস্যে মনোমোহনকে বলিলেন, ‘এর অসাধারণ শুভ সংস্কার আছে।’ অনন্তর ঠাকুর নাম জিজ্ঞাসান্তে তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন। তাঁহার নাম ‘রাখাল’ শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন এবং স্নেহপূর্ণ মিষ্টবাক্যে বলেন, আবার এসো। প্রথম দর্শনেই রাখাল ঠাকুরের স্নেহে এত আকৃষ্ট হন যে, বাড়ীতে ফিরিয়াও তাঁহার কথা ভাবিতে লাগিলেন। যদিও তিনি স্কুলে যাইতে লাগিলেন,

তথাপি তাঁহার মন ঠাকুরের নিকট পড়িয়া রহিল। প্রথম দর্শনের কয়েকদিন পর স্কুলের ছুটি হইলে রাখাল পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। ইহার পর ঘন ঘন তিনি ঠাকুরের নিকট যাইতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের উপদেশে ধর্মজীবন গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্রকে সংসারে বিরাগী দেখিয়া পিতা আনন্দমোহন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিলেন। কঠোর নিষেধ, তীব্র তীরস্কার এবং ভীতিপ্রদর্শন যখন নিষ্ফল হইল, তখন পিতা পুত্রকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। একদিন আনন্দমোহন বৈঠকখানায় বসিয়া একাগ্র মনে দলিলপত্র দেখিতেছিলেন। পিতাকে কর্মব্যাপৃত দেখিয়া পুত্র গোপনে গৃহ হইতে পলাইয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন। রাখাল এইবার ঠাকুরের নিকট কয়েকদিন কালীবাড়ীতে অবস্থান করেন। পিতা পুত্রকে আনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। পুত্র পিতাকে দেখিয়া ভয়ে লুকাইতে চাহিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে তদ্রূপ করিতে দিলেন না। ঠাকুরের নির্দেশে পুত্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া আনন্দমোহনের মন পরিবর্তিত হয়। তখন হইতে তিনি আর পুত্রকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিতেন না। রাখালের সম্বন্ধে ঠাকুর বিভিন্ন সময় নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন—*"রাখাল আসিবার পূর্বে দেখিতেছি, মা (জগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এটী তোমার পুত্র'। ইহা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'সে কি? আমার আবার ছেলে কি?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সাধারণ সংসারী ভাবের ছেলে নহে, ত্যাগী মানস পুত্র। তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম, এই সেই বালক!"

রাখাল সম্বন্ধে অন্য এক সময়ে ঠাকুর স্বশিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল ঠিক যেন তিন চারি বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক্ মাতার ন্যায় দেখিত! থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া

* স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (দিব্য ভাব) পুস্তকে ৫৯-৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত। বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে এক পা নড়িতে চাহিত না! তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, সেজন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল। প্রথম প্রথম নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল, যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে। পরে যখন দেখিল, এখানে ধনী, বিদ্বান্ লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না! ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।

"শ্বশুরবাড়ীর তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা সম্বন্ধে কখনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ, মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা—সকলের এখানে আসা যাওয়া ছিল। রাখাল আসিবার কিছুকাল পরে যেদিন মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা বধূকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিল, সেদিন মনে হইল, বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত? এই ভাবিয়া তাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইতে মাথার কেশ পর্যন্ত শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম এবং বুঝিলাম, ভয়ের কারণ নাই, বধূ দেবী শক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনো হইবে না। তখন সন্তুষ্ট হইয়া নহবতে বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে! তখন যেই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, সেই অবাক্ হইয়া যাইত! আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলনা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি! ইহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না! তখনি কিন্তু বলিয়াছিলাম, বড় হইয়া স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিলে তাহার এই বালকের ন্যায় ভাবটি আর থাকিবে না।

"অন্যায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন কালীঘর হইতে প্রসাদী মাখন আসিলে সে ক্ষুধিত হইয়া আপনিই উহা লইয়া খাইয়াছিল।

তাহাতে বলিয়াছিলাম, 'তুই ত ভারী লোভী, এখানে আসিয়া কোথায় লোভ ত্যাগে যত্ন করিবি, তাহা না হইয়া আপনি মাখন লইয়া খাইলি?' সে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল ও আর কখনো ঐরূপ করে নাই।

"রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ, মা (জগদম্বা) যাহাদের এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।

"এখানে আসিবার প্রায় তিন বৎসর পরে রাখালের শরীর অসুস্থ হওয়ায় সে বলরামের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিল। উহার কিছু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তখন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'মা, ও (রাখাল) ছেলেমানুষ, বুঝে না। তাই কখন কখন অভিমান করে। যদি তোর কাজের নিমিত্ত ওকে এখান হইতে কিছু দিনের জন্য সরাইয়া দিস্, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস্।' উহার অল্প কাল পরেই তাহার বৃন্দাবনে যাওয়া হয়।

"বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল! যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেই জন্য ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায় তখন মার নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন। ঐরূপে রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

নরেন্দ্র, শশী, শরৎ, তারক, যোগেন, নিরঞ্জন প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণের সহিত রাখাল ঠাকুরের কাছে পরিচিত হন। বাবুরাম স্কুলে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে গোপনে বলিলেন, 'বিশাল রাজ্য চালাবার শক্তি ও

বুদ্ধি রাখালের আছে।' নরেন্দ্র এই বাক্যের গভীরার্থ বুঝিলেন। একদিন তিনি গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন, 'এস, এখন থেকে আমরা রাখালকে 'রাজা' বলে ডাকি।' সকলে এক বাক্যে সম্মত হইলেন। এই সংবাদ ঠাকুরের কর্ণগোচর হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া মন্তব্য করিলেন, 'রাখালের উপযুক্ত নামই হয়েছে।' রাখালের প্রতি পুত্রস্নেহ থাকিলেও ঠাকুর প্রিয় শিষ্যকে সংশোধনার্থ শাসন করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। একদিন রাখাল ঠাকুরের সম্মুখে আসিতেই ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোর মুখে একটা কালিমা পড়েছে কেন রে? কিছু অন্যায় করেছিস্?' রাখাল তাঁহার প্রশ্নে বিস্ময়ে নির্বাক্ রহিলেন, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে পড়িল না। পরে স্মরণ করিয়া জানিলেন, কৌতুকচ্ছলে তিনি একটী মিথ্যা বলিয়াছেন। তখন ঠাকুর তাঁহাকে ব্যঙ্গচ্ছলেও। মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিলেন। একদিন ঠাকুর রাখালকে লইয়া কোন ভক্তগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ধর্মোৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের উদ্যোক্তাগণ বড় বড় লোকদের অভ্যর্থনার জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন যে, ঠাকুরকে সমাদর করিতে পারেন নাই। রাখালের ইহা সহ্য হইল না। তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, 'চলুন, এখান থেকে চলে যাই!' কিন্তু ঠাকুর তাঁহার কথা না শুনিয়া এই অনাদর সহ্য করিয়া রহিলেন। পরে তিনি রাখালকে বলিলেন, 'রাগ করে চলে এলে ভক্তদের অকল্যাণ হতে পারে।' তখন রাখাল ঠাকুরের সামান্য কার্যের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিলেন।

একদিন রাখাল কালীমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। ঠাকুর কার্যোপলক্ষে তথায় উপস্থিত হন। রাখালকে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'এই তোমার মন্ত্র, এই তোমার ইষ্ট।' সেদিন ধ্যানে সৌভাগ্যক্রমে রাখালের ইষ্টদর্শন হইল। এখন হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, যাঁহার সঙ্গে তিনি এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেছেন তাঁহার আধ্যাত্মিকতা কত বিপুল! ঠাকুরের কৃপায় তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত হইতে লাগিলেন। এখন হইতে ধ্যানে তাঁহার এত তন্ময়তা আসিত যে, তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হইত। কখনো কখনো ঠাকুরও তাঁহার গভীর ধ্যান ভঙ্গ করিতে আসিতেন।

রাখাল দিবারাত্র মন্ত্রজপ করিতেন, সব সময় তাঁহার ঠোঁট নড়িত। ইহা দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে আপ্লুত হইতেন। ক্রমে তিনি তাঁহাকে গূহ্য সাধন-রহস্যে দীক্ষিত করিলেন। একদিন রাখাল কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে ধ্যানে বসিয়াছেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও মনকে ধ্যানমগ্ন করিতে পারিলেন না। আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। দৈবাৎ ঠাকুর তখন ঐদিক দিয়া যাইতেছিলেন। রাখালকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত শীঘ্র ধ্যান ছেড়ে উঠে পড়লি কেন?' রাখাল সরল ভাবে স্বীয় মনের বহির্মুখী বৃত্তির কথা তাঁহাকে জানাইলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ গম্ভীর ও চিন্তিত থাকিয়া রাখালকে তাঁহার জিভ দেখাইতে বলিলেন। তখন বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিয়া রাখালের জিহ্বায় তিনি কিছু লিখিয়া দিলেন। রাখালের মন তৎক্ষণাৎ ভারমুক্ত হইল এবং তাঁহার মনে আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল। ঠাকুর হাসিয়া তাঁহাকে পুনরায় ধ্যান করিতে বলিলেন। তখন তাঁহার মন অল্পায়াসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল।

ঠাকুর অসুস্থ হইয়া কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করেন। তাঁহার রোগযন্ত্রণা দেখিয়া রাখাল একদিন ব্যথিত চিত্তে ঠাকুরকে অনুরোধ করেন জগদম্বাকে তাঁহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা জানাইতে। কিন্তু ঠাকুর রাখালের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হইলে রাখাল তথায় আসিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক 'ব্রহ্মানন্দ' নামে অভিহিত হন। বরাহনগর' মঠে রাখাল কিছুকাল কঠোর তপস্যা করিবার পর পুরীধামে গমন করেন। তিনি তথায় ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন এবং দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় ধ্যান-জপে কাটাইতেন। ভক্ত বলরাম বসু তাঁহার কঠোরতা দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার পুরীধামস্থ বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করেন। উক্ত প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন বরাহনগর মঠে বাস করিবার পর পুনরায় তিনি তীর্থভ্রমণ ও তপস্যার জন্য কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী সুবোধানন্দ এবার তাঁহার সঙ্গী হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেওঘর হইয়া কাশী

ধামে উপস্থিত হন। কাশীধামে কিছুদিন থাকিয়া নর্মদাতীরে ওঁকারনাথে গমন করেন। নর্মদাতীরে তপস্যাকালে তিনি একবার ছয় দিন ও ছয় রাত্রি বাহ্য-সংজ্ঞাহীন ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ওঙ্কারনাথ হইতে গুরুভ্রাতৃদ্বয় পঞ্চবটী, দ্বারকা, পোরবন্দর, গিরনার পাহাড়, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনান্তে বৃন্দাবনে আগমন করেন। প্রত্যেক তীর্থেই তিনি কিছুদিন ধরিয়া তপস্যারত ছিলেন।

বৃন্দাবনে ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় বার আগমন। এই তীর্থে তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। স্বামী সুবোধানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার জন্য ভিক্ষাদি আনিতেন। ধ্যানপ্রবণতাহেতু উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা খুব অল্পই হইত। তখন বৈষ্ণব সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৃন্দাবনবাসী ছিলেন। তিনি ঠাকুরের নিকট যাইতেন এবং জানিতেন, ঠাকুর রাখালকে কত স্নেহ করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত দেখিয়া তিনি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার এত সাধনার দরকার কি? আধ্যাত্মিক জীবনে যাহা প্রার্থনীয় তাহা ত ঠাকুর আপনাকে অযাচিতভাবে দিয়াছেন।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'যে আধ্যাত্মিক সম্পদ আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তা আমি নিজস্ব করে নিতে চাই।' কিছুকাল পরে স্বামী সুবোধানন্দ হরিদ্বারে চলিয়া যান। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে একাকী রহিলেন। এই সময়ে তিনি পরম ভক্ত বলরাম বসুর মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন। এই দুঃসংবাদে তাঁহার বৈরাগ্য বহুগুণে বর্ধিত হইল। তিনি হিমালয়ের কোন নির্জন প্রান্তরে কঠোর সাধনার সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হরিদ্বারের নিকটে কনখলে উপস্থিত হন। অপ্রত্যাশিতভাবে তথায় স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মীরাটে লইয়া যান। ইহার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত পাঞ্জাবের জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থ এবং পরে রাজপুতানা, বোম্বাই ও সিন্ধুদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। বোম্বাইতে পুনরায় স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী তখন চিকাগো ধর্মমহাসভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বোম্বাই হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে আসেন। স্বামী

তুরীয়ানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মুমুক্ষু সাধকদ্বয় উক্ত তীর্থে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অদ্ভুত সাফল্যের কথা বৃন্দাবনে তাঁহারা শুনিতে পান। স্বামিজী আমেরিকা হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের পুনঃ পুনঃ লিখিতেছিলেন, ঠাকুরের ভাব প্রচারার্থ সংঘবদ্ধ হইতে। বৃন্দাবনস্থ গুরুভ্রাতাদ্বয়ের নিকট আলমবাজার মঠ হইতে পত্রের পর পত্র আসিতে লাগিল। প্রথমে স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং কিছুদিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আলমবাজার মঠে ফিরিলেন। ক্রমে অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ আলমবাজার মঠে একত্রিত হইলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি ব্রহ্মানন্দজীকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।' স্বামী ব্রহ্মানন্দও বিশ্ববিজয়ী গুরুভ্রাতাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রণামান্তে বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য শ্রদ্ধার্হ।' ভারতীয় কাজের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তাহা ব্রহ্মানন্দজীর হস্তে সমর্পণান্তে বলিলেন, 'এখন আমি নিশ্চিন্ত। যোগ্য ব্যক্তির হস্তে গুরুভার ন্যস্ত করেছি।' স্বামী বিবেকানন্দের সহযোগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সমিতির সাধারণ অধ্যক্ষ হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং কলিকাতা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রায় বিশ বৎসর আরূঢ় ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কর্মশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তায় স্বামী বিবেকানন্দ অটল বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিতেন, 'অপরে আমায় ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু রাজা শেষ পর্যন্ত আমায় ছেড়ে যাবে না।'

১৮৯৯ খ্রীঃ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ১৮৯৭ খ্রীঃ মান্দ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিমালয়ের মায়াবতীতে স্বামী স্বরূপানন্দের নায়কত্বে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত

হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় প্রচারক প্রেরিত হইল। অল্প কালের মধ্যেই উভয়ের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণ সংঘ অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষার পর সংঘ চালনার গুরু দায়িত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর পতিত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্মকৌশল, প্রশান্ত ভাব, উদার দৃষ্টি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বলে সংঘ-পরিচালনায় কৃতকার্য হন। তিনি বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ সংঘের আশ্রমগুলিকে সেবা ও সাধনার আদর্শ কেন্দ্রস্থলরূপে গড়িয়া তোলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গুরুভ্রাতাদের একদিন বলিলেন, 'তোমাদের জীবন, তোমাদের মঠ সংসারতপ্ত নরনারীগণের আশা-ভরসা ও সান্ত্বনার স্থল হইবে। সেইভাবে তোমাদের জীবন গঠন কর।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কর্মপদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। কর্মব্যস্ততায় তাঁহার মন কখনো চঞ্চল হইত না। তিনি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী-ভক্তগণকে বলিতেন, 'ষোল আনা মন ঈশ্বরে দাও। মানসিক শক্তির যদি অপব্যবহার না হয়, মনের এক সামান্য অংশ দ্বারা এত অধিক কাজ করিতে পার যে, জগৎ তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ ফলফুলের বাগান খুব ভাল বাসিতেন। তাঁহার চেষ্টায় বেলুড় মঠে এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ আশ্রমে ফল-ফুলের বাগান গড়িয়া উঠিল। তিনি বলিতেন, 'প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহ বিশ্বদেবের চরণে প্রকৃতির প্রেমাঞ্জলি।' কেহ বৃথা পুষ্প চয়ন করিলে বা ফুল গাছের ডাল ভাঙ্গিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তিনি সংঘ পরিচালনায় যে সুপরামর্শ দিতেন তাহা ভবিষ্যতে সুফল প্রসব করিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ সংঘের কোন তরুণ কর্মীকে বলিয়াছিলেন, 'যখন আমি কিছু বলি তখন তুমি বিচার করে দেখবে আমি ঠিক না ভুল বলেছি। কিন্তু রাজা মহারাজ যা বলেন তুমি নিঃসন্দেহে, বিনা বিচারে তা সত্য বলে গ্রহণ করবে।' স্বামী ব্রহ্মানন্দের কর্ম-কৌশল, অন্তর্দৃষ্টি, মিষ্ট বাক্য, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারাদি সংঘের কর্মীদের প্রাণে অসীম আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত করিত।

সংঘাধ্যক্ষরূপে স্বামী ব্রহ্মানন্দ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামে বহুবার গমন করেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেন স্থানীয় সাধুভক্তগণ ধর্মজীবনে অভিনব উদ্দীপনা পাইতেন। ইহা শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ 'ভাগবতে'র একটি শ্লোকোদ্ধারপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'যাঁরা হৃদয়ে শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করেন তাঁহারা সদ্‌ভাব ও প্রশান্তির উৎসস্বরূপ হন। তাঁহাদের জীবনে অনন্ত আনন্দোৎসব চলিতে থাকে। তাঁহাদের সংস্পর্শে যারা আসে তারাও সেই আনন্দের অংশীদার হয়।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন যে আশ্রমে যাইতেন তত্রস্থ সাধুদের বলিতেন, 'ধিক তোমাদের, যদি তোমরা সংসার ছেড়ে ও মাতাপিতা আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা ফেলে ঈশ্বর দর্শনার্থ সমগ্র মন দিতে না পার!' ভগবানলাভই সাধুজীবনের এক মাত্র লক্ষ্য—এই ভাব তাঁহাদের মনে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য তিনি বলিতেন, "চেষ্টা করে মনে একটা অতৃপ্তি জাগাও। আত্মজিজ্ঞাসা কর, সব মনের কতটুকু ঈশ্বরচিন্তায় দিয়েছ। রাত্রে শোবার আগে স্মরণ করে দেখ, সারাদিনের কত সময় জপধ্যানে ও শাস্ত্রপাঠে কাটিয়েছ এবং কত সময় অন্য কাজে গেছে। যে সময় অন্য কাজে দিয়েছ তা বৃথা ব্যয়িত হয়েছে।"

কিন্তু তিনি সাধু জীবনে কর্মহীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে নিষ্কাম কর্ম বা নিঃস্বার্থ সেবা নবযুগের সাধনা। একদিন কোন নবীন সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মহারাজ সংঘের কাজ কি শাস্ত্রোক্ত সাধনের বিরোধী নয়?' স্বামী ব্রহ্মানন্দ উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলেন, "স্বামিজীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হইও না। তিনি সংঘের জন্য, দেশের জন্য প্রাণপাত করেছেন। নর-নারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ কর। তোমরা সাধু, পরার্থে তোমাদের জীবন। সাধনের পথে মনোগত বাসনাসমূহই প্রধান বিঘ্ন, কাজের চাপ নহে। ঠাকুরের কাজে না হয় এই জীবনটা গেল। শত শত জীবন কি স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যয় কর নাই? নিঃস্বার্থভাবে ঠাকুরের কাজ করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে। তখন অনায়াসে মন ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবে যাবে।" সংঘের কোন কেন্দ্রে কর্মীদের মধ্যে মতভেদ ও তজ্জনিত বিরোধ

উপস্থিত হইলে তিনি তথায় যাইয়া সমস্যার সমাধানে নজর দিতেন না। উভয় পক্ষের কাহারো নিকট এই বিষয়ে তিনি কোন প্রশ্ন তুলিতেন না। তিনি তাঁহাদিগের কাছে বিবেক-বৈরাগ্যের কথা বলিয়া এবং সাধন-ভজনে উৎসাহ দিয়া আশ্রমে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার উপস্থিতিতে এবং উৎসাহে সকলে সাধনভজনে মনোনিবেশ করিতেন। তখন ক্ষুদ্র সমস্যাগুলি স্বতঃই মীমাংসিত হইত। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জীবনের সনাতন সমস্যাসমূহের সমাধানের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই ঐহিক সমস্যাগুলি অনায়াসে মীমাংসিত হয়।

১৯০২ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তে স্বামী সারদানন্দের সহযোগে তিনি সংঘের কাজকর্ম পরিচালনা করিতেন। সম্ভবতঃ ১৯০৪ খ্রীঃ তিনি কাশী যাইয়া কিছুদিন অদ্বৈত আশ্রমে অবস্থান করেন। তখন স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাশী হইতে তিনি কনখলে যান। তথায় স্বামী কল্যাণানন্দ যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। কনখল হইতে বৃন্দাবন যাইয়া তিনি তপস্যারত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত পূর্বে তিনি কয়েক বৎসর তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্বী গুরু-ভ্রাতার সহিত পুনর্মিলনে তাঁহার মনেও পুনরায় তপস্যার আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। তিনি তথায় মধ্যরাত্রিতে উঠিয়া নিয়মিতভাবে ধ্যান করিতেন। দৈহিক অসুস্থতাবশতঃ এক রাত্রিতে তিনি যথাসময়ে উঠিতে পারেন নাই। সেই রাত্রিতে একটি বৈষ্ণব প্রেত আসিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া ও ডাকিয়া জাগ্রত করেন। বৃন্দাবন হইতে তিনি প্রয়াগধামে যাইয়া গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হন। প্রয়াগধাম হইতে তিনি দেবীতীর্থ বিন্ধ্যাচলে আগমন করেন। বিন্ধ্যাচলে তিনি দিব্যভাবে সদা আবিষ্ট থাকিতেন। দেবীর মন্দিরে এক রাত্রে কোন সেবককে গান গাহিতে বলেন। গান শুনিতে শুনিতে তিনি দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং ভাবসমাধিস্থ হইলেন। তখন তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার

গণ্ডস্থল ও বক্ষদেশ প্লাবিত করিল। বিন্ধ্যাচলে অন্য এক মন্দিরে তাঁহার ভাবসমাধি হইয়াছিল।

বিন্ধ্যাচল হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। এই অসুখে তাঁহার স্বাস্থ্য এত ভগ্ন হয় যে, তিনি উক্ত বৎসর জুন মাসে বায়ু-পরিবর্তনার্থ পুরীধামে গমন করেন। মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নির্বন্ধাতিশয্যে ১৯০৮ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে তিনি মান্দ্রাজে গমন করেন। মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে অলঙ্ঘ্যনীয় ব্যবধান বিদ্যমান। কোন ব্রাহ্মণেতর ভক্ত তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ ভক্তগৃহে যাইয়া উ· স্থত হন। তাঁহার সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি এবং খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম ভক্তগণ যাইয়া একত্রে প্রসাদ গ্রহণ করেন. এইভাবে তিনি সামাজিক সংস্কারের নাম না করিয়াও যুগস্থায়ী জাতিভেদ দূরীকরণে সমর্থ হন। মান্দ্রাজ নগর হইতে তিনি রামেশ্বর ও মাদুরাতে তীর্থদর্শনে যান। মাদুরাতে মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে শিশুর মত মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থ হন। পাছে তিনি পড়িয়া যান এইজন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া রাখেন। ভাবসমাধিতে প্রায় একটি ঘণ্টা থাকিবার পর তাঁহার মন বাহ্য জগতে নামিয়া আসে। মাদুরা হইতে তিনি মান্দ্রাজ ফিরিয়া বাঙ্গালোর যান এবং তথায় রামকৃষ্ণ আশ্রমের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

১৯১৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুনরায় দক্ষিণ ভারতে পরিভ্রমণ করেন। মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর যাইয়া স্থানীয় আশ্রমে কিছুদিন কাটাইলেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য নিম্নজাতীয় অসংখ্য হিন্দু নরনারী আসিত। তাহাদের ধর্মভাব এবং সাধুভক্তি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া একদিন তাহাদের পল্লী দেখিতে যান। তাঁহার আগমনে পল্লীস্থ দেবালয়ে বহু নরনারী সমবেত হইয়া তাঁহার শুভাশীষ গ্রহণ করেন। এইবার তিনি মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুরে গিয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রীঃ

মে মাসে তিনি মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের নবগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। ত্রিবান্দ্রমে পর্বতোপরি অবস্থিত সুদৃশ্য রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তিও তৎকর্তৃক স্থাপিত হয়। ১৯২০ খ্রীঃ তিনি শেষবার দাক্ষিণাত্যে যান। ১৯১৬ খ্রীঃ তিনি পূর্ববঙ্গে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিং প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। সাধু দুর্গাচরণ নাগের পুণ্য জন্মস্থান দর্শনার্থ তিনি নারায়ণগঞ্জ হইতে দেওভোগ গ্রামে গিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ হইতে আসামে যাইয়া তিনি কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করেন। কাশী, বৃন্দাবন, পুরী ও হরিদ্বার তীর্থচতুষ্টয় তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। অবসর পাইলেই তিনি ইহাদের একটিতে যাইয়া কিছুকাল থাকিতেন। একদা অযোধ্যাধামে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি ধর্ম-সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। তখন মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। তিনি সঙ্গীত শ্রবণে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল! বৃষ্টি থামিবার বহুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

ঠাকুর বলিতেন, 'এক প্রকার আম আছে যা পাকলে বাহির থেকে বোঝা যায় না। রাখাল সেই আমের মত।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাবগোপনে সুনিপুণ ছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে গল্পগুজবে মাতিয়া থাকিতেন, ধর্মপ্রসঙ্গ কম করিতেন। কেহ কোন ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গম্ভীর হইয়া যাইতেন। দীক্ষাদি বিষয়ে তিনি কৃপণ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য তিনি উত্তম অধিকারীকে দীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দীক্ষাদান সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'গভীর ধ্যানে দীক্ষার্থীর ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টমূর্তি জানিয়া দীক্ষা দিই।' রামকৃষ্ণ সংঘের কর্ম্মকেন্দ্রগুলিতে সাধনভজনের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় তিনি ভুবনেশ্বর তীর্থের নির্জন প্রান্তে একটী মঠ স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বরকে তিনি 'গুপ্তকাশী' বলিতেন। পুরীধামে অবস্থান কালে একবার স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। স্বামী প্রভবানন্দকে তিনি তথায় একটি কাজ করিতে বলেন। কিন্তু, প্রভবানন্দজী তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া কাজটী করিতে অক্ষম হইলেন। মধ্যাহ্নভোজনের সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে প্রভবানন্দজী হাওয়া করিতেছিলেন।

তখনো ব্রহ্মানন্দজীর তিরস্কার বন্ধ হয় নাই। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভবানন্দজীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'অবনী, তোমায় মহারাজ কেন বক্‌ছেন জান?' স্বামী প্রভবানন্দ বলিলেন, 'আজ্ঞে না। আমি কি অপরাধ করেছি বুঝতে পারছি না।' তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, 'তিন শ্রেণীর শিষ্য আছে। তৃতীয় শ্রেণীর শিষ্য কেবল গুরুর আদেশ পালন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিষ্যকে আদেশ দিতে হয় না, সে গুরুর মনোভাব বুঝিয়াই কাজ করে। কিন্তু, প্রথম শ্রেণীর শিষ্য গুরুর মনে ইচ্ছা উদিত হইবার পূর্বেই তাহা পূর্ণ করে। মহারাজ চান, তোমরা সকলে প্রথম শ্রেণীর শিষ্য হও।' ইহা শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, 'দেখুন হরি ভাই, আমি বুড়ো হয়েছি। তাই, এরা এখন আমার কথা আর শোনে না। এদের মাথায় একটু সদ্বুদ্ধি জাগান ত।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দের গম্ভীর বহিরাবণের মধ্যে কোমল স্নেহময় মাতৃহৃদয় লুক্কায়িত ছিল। প্রথম পরিচয়ে যুবকগণ তাঁহার প্রতি চিরতরে আকৃষ্ট হইত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন একত্রে বৃন্দাবনে তপস্যারত ছিলেন তখন স্বামী অম্বিকানন্দ তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। অম্বিকানন্দজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে পূর্ব হইতে জানিতেন বলিয়া তাঁহার সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করিতেন। কিন্তু মহারাজের গম্ভীর প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার কাছে যাইতে সাহসী হইতেন না। স্বামী তুরীয়ানন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, 'নীরোদ, যাও মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম কর এবং তাঁহার কাছে কিছুক্ষণ বস।' অম্বিকানন্দজী সানন্দে তদ্রূপ করিলেন। তখন ব্রহ্মানন্দজী তাঁহার মাথায় ও পিঠে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহাতে অম্বিকানন্দজীর সঙ্কোচ চিরতরে অন্তর্হিত হইল এবং তিনি মহারাজের অসীম স্নেহে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার অনুরাগ দর্শনে মহারাজ একদিন কৌতুকচ্ছলে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, 'হরি ভাই, তোমার চেলাটি চুরি করে নিয়েছি!' তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'তার ভাগ্য ভাল, আপনার কৃপা পেয়েছে।' স্বামী যতীশ্বরানন্দ স্বীয় দীক্ষার বিবরণ এইভাবে দিয়াছেন।—'যেদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমাকে দীক্ষা দিলেন,আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম,বিদ্যুৎবৎ আধ্যাত্মিক

শক্তি তাঁহা হইতে আমাতে সঞ্চারিত হইল। দীক্ষান্তে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। যখন তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন তখন বিশ্বব্যাপী চিৎ-সত্তা ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিলাম, সেই শাশ্বত সত্তায় নাম-রূপময় জগৎ বিলীন হইল। সেদিন আমি গুরুর দিব্য স্বভাব ও শক্তির পরিচয় পাইলাম, আমার নবজীবন লাভ হইল। তৎকর্তৃক সঞ্চারিত শক্তি এখনো আমার জীবনে ক্রিয়াশীল।'

অমর নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলিতেন, "বয়সে আমার তুলনায় রাখাল বালকমাত্র। আমি জানি, ঠাকুর তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। কিন্তু সেই কারণেই যে আমি তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা করি তাহা নহে। একবার আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হই। তখন ঠাকুরের প্রতি আমার সকল বিশ্বাস তিরোহিত হয়, আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। গুরুভ্রাতৃগণের অনেকে আমায় দেখিতে আসিলেন। আমার মানসিক দুরবস্থার কথা তাঁহাদিগকে জানাইলাম, কিন্তু তাঁহারা নীরব রহিলেন। একদিন রাখাল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছেন?' উত্তরে আমি আমার হৃদয়ের শুষ্কতা ও অবিশ্বাসের কথা জানাইলাম। মনোযোগের সহিত শ্রবণান্তে সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, 'সমুদ্র হইতে তরঙ্গ উত্থিত হয়, আবার নামিয়া যায়, আবার উঠে। মনও তদ্রূপ। আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনার বর্ত্তমান নীরস ভাবটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিকাশের পূর্বাভাস।' রাখাল চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের শুষ্কতা অন্তর্হিত হইল এবং পূর্ববিশ্বাস ফিরিয়া আসিল এবং আমার মন উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিল।'

১৯১২ খ্রীঃ মার্চের শেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতায় বলরাম বসুর বাটীতে যাইয়া অবস্থান করেন। হঠাৎ ২৪শে মার্চ তাঁহার কলেরা হয়। চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থার ফলে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। কিন্তু ইহার পরেই বহুমূত্রের লক্ষণ দেখা দিল। তিনি সকলকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সকলের ভয় হইল, পাছে তিনি দেহরক্ষা করেন। ঠাকুর ভাবনেত্রে একদিন দেখিয়াছিলেন, 'গঙ্গাজলে ভাসমান সহস্রদল পদ্ম

দশদিক আলোকিত করিতেছে। পদ্মোপরি শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া একটি সুদর্শন বালক নৃত্যরত।' রাখাল আসিতেই ঠাকুর বুঝিলেন, এই সেই নৃত্যরত বালক। কিন্তু তিনি এই দর্শনটি গোপন রাখিয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ইহা জানিতেন। তিনি বলিতেন, রাখাল ইহা জানিলেই তাহার দেহত্যাগ হইবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাসমাধির পূর্বে এই অনুভূতিলাভান্তে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দেহরক্ষার পূর্বদিন তিনি সেবারত সেবককে বলিলেন, 'হঠাৎ জাগিয়া দেখিলাম, ঠাকুর অদূরে দণ্ডায়মান। তিনি কথা বলিলেন না, নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেলেন।' মহাসমাধির পূর্বে তাঁহার এই অলৌকিক অনুভূতি হয়, 'আমি ব্রহ্মসমুদ্রে বিশ্বাস ও জ্ঞানের পত্রে ভাসিতেছি।' তদন্তে ভাবনেত্রে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ ও যোগানন্দ প্রভৃতি গুরু-ভ্রাতৃগণকে দর্শনপূর্বক বর্ণনা করিলেন। পরে স্বামী সারদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ভাই শরৎ, ঠাকুর সত্য, তাঁর লীলাও সত্য।' অবশেষে পূর্ববর্ণিত কৃষ্ণদর্শন হয়। তখন বলিলেন, 'আমার খেলা শেষ। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আদর ও আহ্বান করছেন। আমি যাই।' ইহা বলিয়া ১৯২২ খ্রীঃ ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাসমাধিমগ্ন হইয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন।

ছাব্বিশ

স্বামী বিবেকানন্দ

"নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দসূরয়ে।
সচ্চিদ্‌সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিনে॥"

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য এবং বেলুড় মঠ, তথা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৩ খ্রীঃ চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বেদান্তবাণী প্রচার দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মকে তিনি বিশ্বব্যাপী করিয়াছেন। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ভারতীয় ধর্ম্ম যেমন সমগ্র প্রাচ্যে প্রচারিত, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা বেদান্ত সুদূর পাশ্চাত্যে প্রসারিত। শ্রীগুরুর শক্তিতে তিনি হিন্দুধর্ম্মের যে নবজাগরণ আনিয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং সুদূরপ্রসারী। তিনি বর্ত্তমান ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক এবং যুগাচার্য্য। রোমাঁ রোলাঁ, ভগ্নী নিবেদিতা, মতিলাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি মনীষিগণ স্বামিজীর যে সকল জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, সেগুলিতে তাঁহার বাণীর বিশেষত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত। ভগ্নী নিবেদিতা সত্যই বলিয়াছেন যে, বিবেকানন্দ বাণীর গভীরতা এবং বিশালতা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি উত্তর কলিকাতার সিম্‌লা পল্লীতে ১৮৬৩ খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারী সোমবার সম্ভ্রান্ত দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ দূর্গাচরণ দত্ত ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পুত্র বিশ্বনাথের জন্মের পর তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। বিশ্বনাথের কয়েকটি পুত্রকন্যার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রজ। বিশ্বনাথ ইংরাজী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্নী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী আদর্শ হিন্দু জননী ছিলেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির সহায়ে তিনি রামায়ণ-মহাভারতের নানা অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া

ছিলেন। মাতার কোলেই নরেন্দ্র বাংলা এবং ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা এবং রামায়ণ-মহাভারতের গল্পসমূহ শিক্ষা করেন। মাতার সকাশে সুশ্রুত গল্পগুলি তাঁহার আজীবন মনে ছিল। সীতারামের পুতুল ফুল দিয়া সাজাইতে বালক খুব ভালবাসিতেন, কখনও বা শিব-মূর্ত্তি পূজা করিতেন। পল্লীতে কোথাও রামায়ণগান হইলে বালক তাহা শুনিতে যাইতেন। বাল্যে তাঁহার ধ্যান-ক্রীড়া অতি প্রিয় ছিল। একদিন তিনি ছাদের উপরস্থ ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান এত গভীর হইল যে, তিনি বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন। তখন বাড়ীর লোকে আসিয়া দরজা খুলিয়া তাঁহাকে জোরে নাড়া দিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি বালকের আজন্ম আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। সাধু আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেই বালক ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেন এবং সাধু যাহা চাহিতেন তাহাই দিতেন। কথিত আছে, মাতা ভুবনেশ্বরী বীরেশ্বর শিবের নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়া এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। নরেন্দ্র বাল্যে এত দুষ্ট ও দুরন্ত ছিলেন যে, দুইটি পরিচারিকা তাঁহাকে সামলাইতে পারিত না।

অসাধারণ শুভসংস্কার লইয়া নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য বাল্য হইতেই তাঁহার অলৌকিক প্রত্যক্ষসমূহ উপস্থিত হইয়াছিল। নিদ্রা যাইবার পূর্বে তিনি ভ্রূমধ্যভাগে এক অপূর্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাইতেন। উক্ত বিন্দু নানা বর্ণে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিম্বাকার ধারণ করিত এবং পরিশেষে ফাটিয়া যাইয়া তাঁহার আপাদমস্তক শুভ্র তরল জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত। এইরূপ হইবামাত্র তিনি সংজ্ঞাশূন্য ও নিদ্রাভিভূত হইতেন। পরিণত বয়সে যখন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেই প্রথমেই ঐ জোতির্বিন্দু সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। একদিন ধ্যানকালে বালক ভগবান বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন। বালক নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মাতৃ-ভাষা পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন। গৃহশিক্ষকের নিকট যাহা শুনিতেন তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। সাত বৎসর বয়সে তিনি প্রায় সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন অংশ মুখস্থ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে তিনি প্রথমে ভর্ত্তি হন। তিনি খেলাধূলা খুবই ভালবাসিতেন। তাঁহার উপস্থিতিতে ক্লাশকক্ষটি খেলার মাঠে পরিণত হইত।

বালকের সাহসিকতাও অসামান্য ছিল। তাঁহার কোন বন্ধুর উঠানে একটি বড় ফুলগাছ ছিল। তিনি ঐ গাছে উঠিয়া মাথা নিচু করিয়া দোল খাইতেন। অতিরিক্ত উদ্যম ব্যয় করিবার জন্য ছুটাছুটি, খেলাধূলা ডিগ্‌বাজি খাওয়া প্রায়ই করিতেন। তাঁহাকে একদিন চাঁপাগাছে দোল খাইতে দেখিয়া বাড়ীর বৃদ্ধ অন্ধপ্রায় ঠাকুরদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ঐ গাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে। তোর ঘাড় মট্‌কে দেবে, নেমে যা!' বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিয়া তিনি তখন নামিয়া গেলেন। কিন্তু বৃদ্ধ দৃষ্টিবহির্ভূত হওয়া মাত্র তিনি পুনরায় গাছে উঠিলেন। তাঁহার এক বন্ধু বৃদ্ধের বাক্যে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে নামিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্র বন্ধুর কথায় হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি কি বোকা! যদি বুড়ো ঠাকুরদার কথা সত্যি হোত, তবে কত আগেই আমার ঘাড় ভেঙ্গে যেত!' ১৮৭৭ হইতে ১৮৭৯ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর পিতার সহিত মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুর নামক স্থানে অবস্থান করেন। রায়পুরে যাইবার সময় তিনি হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়িতেন। তিন বৎসর স্কুলে না পড়া সত্ত্বেও ১৮৭৯ খ্রীঃ কয়েক মাসমাত্র পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন, পরে জেনারেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউশনে। এই কলেজ হইতে তিনি ১৮৮৪ খ্রীঃ বি. এ. পাশ করিয়া আইন কলেজে ভর্তি হন।

ধর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতাদের নিকট প্রায়ই যাইতেন। তাঁহার কলেজের অধ্যক্ষ ডবলিউ. ডবলিউ. হেষ্টি সাহেব একদিন এফ. এ. ক্লাশের ছাত্রগণকে ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতে আসেন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি তাহাদিগকে

উক্ত অবস্থার কথা সাধ্যমত বুঝাইয়া পরিশেষে বলেন, 'এই অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার উক্ত অবস্থা একবার দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।' এইরূপে নরেন্দ্র হেষ্টি সাহেবের নিকট প্রথম ঠাকুরের কথা শুনিবার পর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের আলয়ে তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করেন। সম্ভবতঃ ব্রাহ্ম সমাজেও তিনি ঠাকুরের কথা শুনিয়াছিলেন।

১২৮৭ সালের হেমন্তের শেষভাগে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। প্রথম দর্শনের কয়েক সপ্তাহ পরেই দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে একটি গান গাহিতে বলেন। তখন নরেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া গাহিলেন। ঠাকুর তাঁহার গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি তাঁহার ঘরের উত্তর বারান্দায় নরেন্দ্রকে লইয়া যাইয়া পূর্বপরিচিতের ন্যায় পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এত দিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কতদিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি, তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পারিয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে।' ইত্যাদি। এইরূপ আচরণে নরেন্দ্র একেবারে নির্বাক, স্তম্ভিত!

প্রথম দর্শনের প্রায় মাসাধিক পর নরেন্দ্র একদিন একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন করেন। ঠাকুর তখন নিজ ঘরে ছোট খাটটীর উপরে একাকী আপন মনে বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া খাটের এক প্রান্তে বসাইলেন। অনন্তর ভাবাবিষ্ট হইয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে তৎসমীপে যাইয়া স্বীয় দক্ষিণ পদ তাঁহার অঙ্গে স্থাপন করিলেন। ঠাকুরের দিব্য স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে

নরেন্দ্রের এই অলৌকিক উপলব্ধি হইল। নরেন্দ্র চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, দেয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু তীব্র বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত তাঁহার আমিত্ব এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে বিলীন হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! নরেন্দ্র তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং নিজেকে সামলাইতে না পরিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'ওগো তুমি আমায় এ কি করলে? আমার যে বাপ মা আছেন!' নরেন্দ্রের ঐ কথা শুনিয়া দেবমানব খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং স্বহস্ত দ্বারা বালকের বক্ষ স্পর্শান্তে বলিলেন, 'তবে এখন থাক্। একেবারে কাজ নাই, পরে হইবে!' নরেন্দ্র এখন প্রকৃতিস্থ, পরিবর্তিত।

দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয় বার আগমনে ঠাকুর নরেন্দ্রকে যদুনাথ মল্লিকের পার্শ্ববর্তী উদ্যানে বেড়াইতে লইয়া যাইয়া সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহাকে স্পর্শ করেন। এই স্পর্শে পূর্ববারের মত তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা লুপ্ত হয়। ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুর জানিয়া লইলেন, নরেন্দ্র কোথা হইতে কেন আসিয়াছে এবং কতদিন এখানে থাকিবে ইত্যাদি। ইহার পরে ঠাকুর বলিতেন, 'নরেন্দ্র যে দিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ় সংকল্প সহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে। নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।' ঠাকুরের মন একদিন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে স্থূল জগৎ অতিক্রমপূর্বক সূক্ষ্ম ভাবজগতে উপস্থিত হইল। তথায় নানা দেবদেবীর ভাবঘন মূর্তি দর্শনান্তে সেই রাজ্য পার হইয়া অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে দেখিলেন, দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সমাধিস্থ। পরে অখণ্ড জ্যোতিঃমণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুতে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু সপ্তর্ষির একজনকে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'আমি মর্ত্যে যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' উক্ত ঋষির একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে নরেন্দ্ররূপে অবতীর্ণ। সেই দেবশিশুই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবিভূত। ঠাকুরের নিকট যাইবার অল্পদিনের মধ্যে নরেন্দ্র বুঝিলেন, তিনি কে এবং ঠাকুরই বা কে?

একদিন কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতৃগণ ঠাকুরের নিকট সমবেত। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জানিয়া বলিলেন, "দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে নরেন্দ্রের ভিতর সেইরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে। পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া মায়ামোহের রেখা পর্য্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে।" ঠাকুর স্বশিষ্য-ভক্তগণের মধ্যে নরেন্দ্রকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন এবং বলিতেন, "এত সব লোক এখানে আসিল নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না। ঈশ্বরকোটীদের মধ্যেও কেহ দশ, কেহ পনের, কেহ বা বিশ দল বিশিষ্ট। কিন্তু নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল!' অন্য সময়ে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ, নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ। নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত। জ্ঞান-খড়্গ সহায়ে সে মায়াময় বন্ধনকে নিত্য খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে। মহামায়া সেজন্য কোনমতে নরেন্দ্রকে নিজায়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না।" ঠাকুর নরেন্দ্রকে অতিশয় আপনার জ্ঞান করিতেন এবং নিজের ও তাঁহার শরীর পর পর দেখাইয়া বলিতেন, 'দেখ্‌ছি কি, এটা আমি আবার ওটাও আমি। সত্য বলছি, কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটা ভাগ দেখাচ্ছে। সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে।"

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সকলের সমক্ষে শত মুখে প্রশংসা করিতেন। ইহাতে নরেন্দ্র বিরক্ত হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিলে ঠাকুর বলিতেন, "কি করবো রে? তুই কি ভাবিস্ আমি ঐরূপ বলিয়াছি। মা আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি। মা ত সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনো দেখান নাই।" গুরু শিষ্যকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। তাঁহার ব্যাকুলতার একটী দৃষ্টান্ত 'স্বামী প্রেমানন্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লিখিত। শিষ্যকে দেখিবার জন্য গুরু কখনো কখনো কলিকাতায় যাইতেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে দেখিবার

জন্য সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত, বুকের ভিতরটা কে যেন গামছা নিংড়াইবার জন্য মোচড় দিতেছে! তখন নিজেকে আর সামলাইতে পারিতাম না। ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশে ঝাউতলায়, যেখানে কেউ বড় একটা যায় না, যাইয়া 'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না।' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম! খানিকটা এইরূপে কাঁদিয়া তবে নিজেকে সামলাইতে পারিতাম। ক্রমান্বয়ে ছয় মাস এইরূপ হইয়াছিল।" অন্যান্য শিষ্যদের কাহারো কাহারো জন্য গুরুর ব্যাকুলতা হইলেও নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তেমনটী আর কাহারো জন্য হয় নাই। এক দিন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে শিষ্যকে শ্রীগুরু দেখিতে যান। ঠাকুর সমাজ-গৃহে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেকে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তখন উপাসনা চলিতেছিল। বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য সমস্ত গ্যাসের আলোক নির্বাপিত হইল। নরেন্দ্র আসিয়া ঠাকুরকে ধরিয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহিরে কোনরূপে আনিলেন।

নরেন্দ্র যাহাতে বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ না হন সেই জন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া ঠাকুর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ দিতেন। গুরু শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'বার বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের ফলে মানবের মেধানাড়ী খুলিয়া যায়। তখন তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহে গভীর প্রবেশ ও উহাদিগের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। ঐরূপ বুদ্ধি সহায়েই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তিনি কেবলমাত্র ঐরূপ শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।" গুরুকৃপায় শিষ্য অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুরু শিষ্যকে অদ্বৈত বেদান্তের উপদেশ দিতেন। একদিন জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যসূচক অনেক কথা বলা সত্ত্বেও শিষ্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তিনি হাজরার নিকটে যাইয়া এই প্রসঙ্গ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন! নরেন্দ্রকে হাসিতে শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে পরিধানের কাপড়খানি বগলে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং মৃদু হাস্যে নিকটে যাইয়া নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। ঠাকুরের স্পর্শে নরেন্দ্রের অদ্ভুত উপলব্ধি হইল। তিনি সর্বভূতে

ব্রহ্মদর্শন করিলেন। সেই দর্শনের ঘোর দুই তিন দিন রহিল। সর্বদা নামরূপময় বিশ্ব স্বপ্নবৎ অসার বোধ হইল উক্ত অদ্বৈতানুভূতির ফলে।

১৮৮৩ খ্রীঃ শীতকালে নরেন্দ্র যখন বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন তাঁহার পিতা সহসা হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করেন। দানশীলতার জন্য পিতা বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার মৃত্যুতে স্ত্রীপুত্রগণ নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইলেন। কিছুকাল পরে নরেন্দ্রকে পরিবারবর্গ প্রতিপালনের জন্য চাকরী অন্বেষণ করিতে হইল। তিনি প্রথমে মেট্রোপলিটান হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তখন উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এটর্নীর অফিসে পরিশ্রম এবং কয়েক খানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতির দ্বারা সামান্য অর্থাগম হইল। কিন্তু কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হইল না। দারিদ্র্যমোচনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তিনি ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, 'মাতা ও ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মা কালীকে জানাইতে হইবে।' গুরু শিষ্যকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'আজ মঙ্গলবার। আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি তা পাবি। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি।' শিষ্য গুরুর নির্দেশে রাত্রিকালে মন্দিরে যাইবার পথে গাঢ় দিব্য নেশায় আচ্ছন্ন হইলেন এবং মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, মা সত্যই চিন্ময়ী, জীবিতা। শিষ্য ভক্তি-প্রেমে বিহ্বল হইয়া মাতৃচরণে প্রণিপাতপূর্বক বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও অবাধ দর্শন প্রার্থনা করিলেন। তিনবার কালীঘরে যাইয়া আর্থিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতে শিষ্য বিস্মৃত হইলেন! শিষ্য যখন মা কালীকে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে পারিলেন না তখন গুরু বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের আর কখনো অভাব হবে না।'

ঠাকুর যখন কাশীপুরে অন্তিম অসুখে শয্যাশায়ী তখন নরেন্দ্র নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য গুরুকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইলেন এবং সেইজন্য তিনি কিছুকাল নিত্য গভীর ধ্যান অভ্যাস করিলেন। গুরুকৃপায় শিষ্যের একদিন নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইল। সমাধিতে মনোবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ এবং দেহজ্ঞান

তিরোহিত হয়। উক্ত অবস্থায় নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। ঠাকুর এই সম্বন্ধে বলিতেন, 'তোর এই অনুভূতি এখন বন্ধ রইল। তোকে মায়ের অনেক কাজ করতে হবে। তোর অজ্ঞানের আবরণ এত পাতলা যে, তা যে কোন সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে!' ঠাকুরের দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্বে নরেন্দ্র একদিন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, এখন যদি ইনি বলেন ইনি অবতার, তা হলে বিশ্বাস করব। তখন গুরু শিষ্যের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই একাধারে রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' আর একদিন ঠাকুর স্বীয় সাধনলব্ধ সকল শক্তি নরেন্দ্রে সঞ্চারিত করিয়া বলিলেন, 'আজ আমি তোকে সব দিয়ে ফকির হলাম। এই শক্তি দ্বারা তোকে মায়ের অনেক কাজ করতে হবে।' সংঘজননী সারদা দেবী ঠাকুরের দেহত্যাগের পর একদিন ধ্যানে দর্শন করেন, ঠাকুর নরেন্দ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তি নরেন্দ্রপ্রমুখ শিষ্যগণের মাধ্যমে লোককল্যাণার্থ প্রবাহিত। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রপ্রমুখ ভক্তগণকে অর্ধবাহ্য দশায় বলিয়াছিলেন, 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' গুরু শিষ্যের নিকট যে তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন তাহা শিষ্য কর্তৃক বর্তমান যুগে সেবাধর্ম নামে প্রচারিত। স্বামী সারদানন্দ তাঁহার 'রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র পঞ্চম খণ্ডে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের দিব্য সম্বন্ধ সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বরাহনগরে প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নরেন্দ্রের নেতৃত্বে শিষ্যগণ তথায় আসিয়া সমবেত হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিরজা-হোম সমাপনান্তে নরেন্দ্র সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক 'বিবেকানন্দ' নামে অভিহিত হন। বরাহনগর মঠে নবীন সন্ন্যাসীগণ গুরুপ্রদর্শিত পথে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। প্রায় দুই বৎসর বরাহনগর মঠে থাকিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন ও হাথরাস পরিভ্রমণান্তে হিমালয়ে গমন করেন। হাথ্‌রাস রেলওয়ে ষ্টেশনে শরৎচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন ষ্টেশনমাষ্টার। শরৎবাবু অবিলম্বে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুনির্দেশে সংসার-

ত্যাগপূর্বক 'স্বামী সদানন্দ' নামে অভিহিত হন। স্বামী সদানন্দই স্বামিজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য। স্বামিজীর ছয়টি সন্ন্যাসী শিষ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই পুস্তকে প্রদত্ত। গাজীপুরে স্বামী বিবেকানন্দ বিখ্যাত সাধু পওহারী বাবাকে দর্শন করেন। পওহারী বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বামিজী একুশবার যাত্রা করেন এবং একুশ বারই ঠাকুরের দর্শন পাইয়া নিরস্ত হন। কাশীতে সুপণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি যাচ্ছি। যখন ফিরে আসব, তখন সমাজ আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করবে'

রাজপুতানায় আলোয়ারের মহারাজা মঙ্গল সিং স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মহারাজা মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। গুরুকৃপায় তিনি সেই বিশ্বাস লাভ করেন। সমগ্র ভারত ভ্রমণান্তে স্বামিজী কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। উক্ত দেবীমন্দিরে ধ্যানকালে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপ্রণালীর আভাস পাইলেন। স্বশিষ্য মহীশূরের মহারাজার নিকট তিনি পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। খাণ্ডোয়াতে অবস্থানকালে তিনি চিকাগো শহরে ধর্মমহাসভা হইবার কথা শুনিয়াছিলেন। উক্ত ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। আবু রোড ষ্টেশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'হরি ভাই, তোমাদের তথাকথিত ধর্ম কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে দেখলাম, জনসাধারণ দারিদ্র্যে পঙ্গু এবং অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। এদের জন্য কিছু করবার উদ্দেশ্যে আমি আমেরিকায় যাচ্ছি।' ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারী হইতে মাদ্রাজ গমন করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে স্বামিজীর মাদ্রাজী শিষ্যগণ অর্থসংগ্রহ করেন। স্বামিজী উক্ত বৎসর ৩১শে মে বোম্বাই হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং জুলাইর মধ্যভাগে চিকাগো সহরে উপস্থিত হন।

তখন ধর্মসভার অনেক দেরী। তিনি দারুণ অর্থকষ্টে পড়িলেন। কোন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি প্রেরিত না হওয়ায় ধর্মসভায় যোগদানের অসুবিধাও হইল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জে. এইচ-

রাইটের সহিত পরিচয়ান্তে এই বিষয়ে চার ঘণ্টা আলাপ করিলেন। উক্ত অধ্যাপক স্বামীজীর অসামান্য প্রতিভায় চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'স্বামী, ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিত্বের জন্য আপনাকে প্রশংসা-পত্র চাওয়া সূর্য্যকে কিরণ দানের অধিকার জিজ্ঞাসা করার মত।' তিনি তাঁহার বন্ধু প্রতিনিধি-মনোনয়ন সমিতির সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে স্বামীজীর সম্বন্ধে লিখিলেন, 'ইনি আমাদের সকল পণ্ডিত অধ্যাপক অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত।' চিকাগোর মিসেস্ জর্জ ডবলিউ হেলের সহিত তিনি দৈবাৎ পরিচিত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয় চিকাগো সহরের সুবৃহৎ কলম্বাস হলে। পৃথিবীর সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ মহাসভায় সমবেত। স্বামিজী সভাপতির নির্দেশে দাঁড়াইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিলেন, 'হে আমেরিকার ভগিনীগণ ও ভাইগণ!' এই সপ্রেম সম্বোধনে সকলে বিমুগ্ধ হইয়া দুই মিনিট কাল করতালি ও জয়-ধ্বনি দিলেন। শত শত নরনারীর আনন্দবিহ্বল কণ্ঠসমূহ বধির হইবার উপক্রম হইল। ধর্মসভায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তারূপে পরিগণিত হইলেন। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র লিখিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের মনে হয়, সুশিক্ষিত ভারতে পাদ্রী প্রেরণ নির্বুদ্ধিতার কার্য।'

ধর্মমহাসভা সমাপ্ত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তরাজ্যের নানা স্থানে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইলেন। কোন কোন দিন রাত্রে বক্তব্য বিষয়টি ঠাকুর তাঁহাকে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া যাইতেন। প্রায় বৎসর খানেক সমগ্র যুক্তরাজ্যে বক্তৃতাদানের পর তিনি নিউইয়র্কে আসিয়া নিয়মিত ভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন এবং ব্রুকলীন নৈতিক সমিতির উদ্যোগে ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। ক্রমে মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলিয়ড, মিসেস্ ওলিবুল, মিস্ এ. সি. ওয়াল্ডো, মিস্ গ্রীন্ ষ্টাইডেল ক্রিষ্টীনা, মিঃ লেগেট প্রভৃতি শিষ্যশিষ্যাদের সহিত তিনি পরিচিত হইলেন। মিস্ ওয়াল্ডো স্বামিজীর রাজযোগখানির শ্রুতিলিপি করেন। কর্মক্লান্ত হইয়া স্বামিজী শিষ্যা মিস্ ডুসারের সহস্র-

দ্বীপোদ্যানস্থিত গৃহে কিছুদিন বিশ্রামার্থ গেলেন। উক্ত গৃহ সেণ্ট লরেন্স নদীর বক্ষে অবস্থিত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত। তথায় স্বামিজী যে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন তাহার সারাংশ মিস্ ওয়াল্ডো কর্তৃক সংগৃহীত এবং 'দেববাণী' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। 'সন্ন্যাসীর গীতি' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি স্বামিজী তথায় রচনা করেন। তথা হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া তিনি বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। মিস্ ক্রিস্টিনা পরে ভগ্নী ক্রীষ্টিন নামে পরিচিতা হন। তিনি ভারতে আসিয়া ভগ্নী নিবেদিতার সহকর্মিণী হন। তাঁহার জীবনী মৎপ্রণীত 'দেশবিদেশের মহামানবে' প্রদত্ত।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে আগমন করেন। ইহার পর ১৮৯৬ খ্রীঃ এপ্রিলে এবং অক্টোবরে তিনি দুইবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা 'জ্ঞানযোগে' প্রকাশিত। এই সকল বক্তৃতায় বেদান্তের দুর্বোধ্য তত্ত্ব বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যাত। ইংলণ্ডে তিনি মিস্ মার্গারেট নোব্ল, অধ্যাপক মোক্ষমূলর, গুডউইন, ও কাপ্তেন সেভিয়ার প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন। মিস্ নোবেল ভগিনী নিবেদিতা নামে স্বামিজীর জীবনী রচনা এবং কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতীষ্ঠা করেন। কাপ্তেন এবং মিসেস্ সেভিয়ার নামক ইংরাজ দম্পতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক ভারতে আসিয়া হিমালয়ে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মৎপ্রণীত 'সাধিকামালা' পুস্তকে ভগ্নী নিবেদিতার জীবনী প্রদত্ত। স্বামিজী জার্মানীতে যাইয়া কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পল ডয়সনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এইরূপে প্রায় তিন বৎসরাধিক ইউরোপে ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া স্বামিজী শিষ্যগণের সহিত ১৮৯৭ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভারতের ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্র। ভারত আমার নিকট পূণ্য তীর্থ।' স্বামিজী সেইসময় কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেগুলি 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামক পুস্তকে প্রকাশিত। এইসকল বক্তৃতাদানের ফলে দেশে অভূতপূর্ব ধর্মজাগরণ উপস্থিত হয়। ইহাই নব

যুগের সূচনা। স্বামিজী হিন্দু ধর্মের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা এই সকল বক্তৃতায় দিয়াছিলেন।

তখন রামকৃষ্ণ মঠ আলমবাজারে অবস্থিত। কলিকাতা টাউনহলে স্বামিজীকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। তদুত্তরে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় স্বদেশপ্রেম এবং জনসেবার ভাবে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। আলমবাজার হইতে বেলুড় গ্রামে এক ভাড়া-বাড়ীতে মঠ উঠিয়া আসিল। বেলুড় গ্রামে গঙ্গাতীরে মঠের জন্য ভূমিক্রয় ও গৃহনির্মাণ হইল। মার্কিন শিষ্যা মিসেস্ গুলিবুলের অর্থানুকূল্যে বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারী বেলুড় মঠে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'তুই আমাকে যেখানে রাখবি সেখানে থাকব।' সেইজন্য স্বামিজী 'আত্মারামের কৌটা' মাথায় করিয়া বেলুড় মঠে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ১লা মে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও ভক্ত শিষ্যগণ স্বামিজীর নেতৃত্বে মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের মুক্তি এবং জগতের হিতসাধন এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯০৯ খ্রীঃ এই সংঘ রেজিষ্টার্ড হয়। ১৮৯৭ খ্রীঃ মে হইতে ১৮৯৮ খ্রীঃ জানুয়ারী পর্য্যন্ত আট নয় মাস স্বামিজী সমগ্র উত্তর ভারতে ঘুরিয়া বক্তৃতা দেন। স্বামী শিবানন্দ সিংহলে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মান্দ্রাজে, স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ গুজরাটে মঠ স্থাপন এবং বেদান্ত প্রচারার্থ প্রেরিত হন।

স্বামীজী ইউরোপে আল্পস্ পাহাড়ে ভ্রমণকালে হিমালয়ে মঠ স্থাপনের সংকল্প করেন। তাঁহার নির্দেশ এবং তাঁহার শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দের সাহায্যে কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার কর্তৃক ১৮৯৯ খ্রীঃ মার্চ মাসে হিমালয়ের মধ্যে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৯৮ খ্রীঃ জুলাই মাসের শেষে স্বামী বিবেকানন্দ ভগ্নী নিবেদিতার সহিত কাশ্মীরে তুষারতীর্থ অমরনাথ পরিদর্শন করেন। ২রা আগষ্ট শ্রাবণী পূর্ণিমা দিবসে পর্বতগুহায় তুষারময় শিবলিঙ্গ দর্শন কালে তাঁহার অলৌকিক অনুভূতি হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার 'গুরুদেবকে যেমনটী দেখিয়াছি' নামক সারগর্ভ অপূর্ব ইংরাজী গ্রন্থে দিয়াছেন। তৎপরে

স্বামিজী ক্ষীরভবানী দেবীর মন্দির দর্শন করেন। কাশ্মীরে তাঁহার একটি মঠ স্থাপনের ইচ্ছা ছিল। মহারাজা প্রতাপ সিং ইহাতে সম্মত এবং আবশ্যকীয় ভূমি ও অর্থদানে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ইংরাজ রেসিডেন্ট ইহাতে ঘোর আপত্তি করায় স্বামিজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কাশ্মীরে মাতৃভক্তিতে গদগদ হইয়া তিনি 'মা কালী' শীর্ষক ইংরাজী কবিতা রচনা করেন। উক্ত কবিতার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ আছে পদ্যে। ১৮৯৯ খ্রীঃ জুন মাসে স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ভগ্নী নিবেদিতার সহিত দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যে গমন করেন। লণ্ডনে কয়েক দিন বিশ্রামান্তে তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে উপস্থিত হয়।

কালিফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে সান্তা ক্লারা জেলায় তৎশিষ্যা মিস মিনি বুকের একশত ষাট একর বন্যভূমি ছিল। বেদান্ত আশ্রম স্থাপনার্থ উক্ত ভূমিখণ্ড শিষ্যা গুরুকে প্রদান করেন। স্বামীজির নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ তথায় আশ্রম স্থাপনার্থ চলিলেন। প্রায় এক বৎসর যাবৎ আমেরিকায় আরব্ধ কার্য্য পরিদর্শনান্তে স্বামীজি ১৯০০ খ্রীঃ জুলাই মাসে প্যারিসে আসিয়া ধর্মেতিহাসের মহাসভায় যোগদান করেন। প্যারিসে তিন মাস অবস্থানান্তে মাদাম কাল্‌ভে প্রভৃতি শিষ্যার সহিত ভিয়েনা, মিশর, কনস্টান্টিনোপল এবং এথেন্স প্রভৃতি দেখিয়া ১৯০০ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি ভগ্নী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, 'পাশ্চাত্যে সামাজিক জীবন বাহিরে হাস্যময় হইলেও ভিতরে বিষাদ-বিষে জর্জরিত। ইহা দীর্ঘ নিশ্বাসে পর্য্যবসিত হয়। ওদের হাস্যকৌতুক সব বাহিরে, শোক দুঃখে ওদের অন্তর প্রজ্বলিত। ভারতে বহির্জীবনে বিষাদ ও দুঃখের ছায়া পড়িলেও অন্তরে তৎপ্রতি উপেক্ষা এবং আনন্দ আছে।' ১৯০০ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর তৎশিষ্য কাপ্তেন সেভিয়ার মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। সেভিয়ার-পত্নীকে সান্ত্বনা দানার্থ স্বামিজী ১৯০১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে উক্ত আশ্রমে যাইয়া তিন সপ্তাহ অবস্থান করেন। মায়াবতী হইতে ফিরিয়া তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ

করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি জাপানের মনীষি ওকাকুরার সহিত বুদ্ধগয়া ও সারনাথ গিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠে ফিরিয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহার 'বাঘা' কুকুর, 'হাঁসি' ছাগল ও হরিণ প্রভৃতি প্রিয় পশুদের লইয়া আনন্দে কাটাইলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বুঝিলেন, তাঁহার শরীর আর বেশী দিন থাকিবে না। সেই সময় কোন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামিজী, আপনি কি আপনার স্বস্বরূপ এখন বুঝতে পেরেছেন ?' স্বামিজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই।' এই উত্তর শুনিয়া সকলে চিন্তান্বিত হইলেন। ১৯০০ খ্রীঃ তিনি আমেরিকা হইতে মার্কিন শিষ্যা মিস্ ম্যাকলিয়ডকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "যুদ্ধে হার জিত সবই হোলো। আমি এখন বোচকা বেঁধে মহামুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। আমি সেই বালকমাত্র যে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে ঠাকুরের অদ্ভুত উপদেশ অবাক্ হয়ে শুনত। ইহাই আমার প্রকৃত স্বভাব। কাজ-কর্ম, বেদান্ত-প্রচারাদি সবই আমার উপর আরোপিত ক্ষণিক অবস্থামাত্র। এখন আমি প্রভুর সেই বাণী শুনতে পাচ্ছি। সেই পুরানো বাণী আমার অন্তরকে আলোড়িত করছে। বন্ধন ছিঁড়ে যাচ্ছে, প্রেম শুকিয়ে যাচ্ছে, কর্মে অনুরাগ উড়ে যাচ্ছে, জীবনের প্রতি মায়াও চলে যাচ্ছে। আমি সেই প্রভুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক গে, তুই আমার পেছনে চলে আয়।' যাই, প্রভু যাই! নির্বাণ আমার সম্মুখে। প্রায়ই আমি অনুভব করি, নিস্তরঙ্গ অসীম শান্তি-সমুদ্র আমার সম্মুখে প্রসারিত।"

বেলুড় মঠে একদিন স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরঘরে পূজা করিবার জন্য যাইতে-ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'কোথায় ব্রহ্মের সন্ধানে যাচ্ছ ? তাঁকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ দেখ্ছি করামলকবৎ। এই, এই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। যারা এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে না দেখে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করে, তাদের ধিক্!' স্বামিজীর এই ব্রহ্মানুভূতিতে সকলেই অনুপ্রাণিত হইলেন। শেষ জীবনে ঈশ্বর-কোটী নরেন্দ্র ব্রহ্মানুভূতিতে সদা ভরপূর থাকিতেন। বেলুড় মঠে সাঁওতাল শ্রমিকেরা কাজ করিত। একদিন স্বামিজী তাহাদিগকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া

বলিলেন, 'তোমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ। আজ আমি নররূপী নারায়ণগণকে সেবা করলাম।' তারপর তিনি স্বশিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দেখ, এই দরিদ্র অশিক্ষিত লোকেরা কত সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নচেৎ গেরুয়া পরে লাভ কি? বিদ্যাভিমান, তপস্যানুষ্ঠান এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষা ফেলে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে ধন্য হও।'

জীবনের শেষ কয়েক মাস স্বামিজী গভীর ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি তখন এত অন্তর্মুখীন ছিলেন যে, কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিত না। ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই সকালে তিনিঠাকুর-ঘরে যাইয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া তিন ঘণ্টা গভীর ধ্যানে সমাহিত রহিলেন। ধ্যানান্তে একটি মাতৃ-সঙ্গীত তিনি সুমধুর কণ্ঠে গাহিলেন। সন্ন্যাসীগণ তাঁহার এই প্রাণ-মাতান সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইলেন। ঠাকুর-ঘর হইতে নামিয়া তিনি মঠ-প্রাঙ্গণে আপন মনে পায়চারী করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে অস্পষ্টস্বরে বলিতে শোনা গেল, 'যদি আর একটি বিবেকানন্দ থাকৃত সে বুঝত, এই বিবেকানন্দ কি করেছে। কিন্তু তথাপি, কালে আরও অনেক বিবেকানন্দের আবির্ভাব হবে।' স্বামিজীর স্বগতোক্তি শুনিয়া গুরুভ্রাতৃগণ চমৎকৃত ও চিন্তিত হইলেন। আহার ও বিশ্রা-মান্তে স্বামীজি শিষ্যগণকে তিন ঘণ্টা সংস্কৃত পড়াইলেন। অপরাহ্নে কোন গুরু-ভ্রাতার সহিত মঠপ্রাঙ্গণে বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় বেদবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলেন। সান্ধ্য আরাত্রিকের সময় তিনি স্বকক্ষে যাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ধ্যানস্থ রহিলেন। পরে জপমালা হাতে লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে মহাসমাধিমগ্ন হইলেন। স্বামিজী প্রায়ই বলিতেন, 'চল্লিশ বছরের বেশী বাঁচব না।' তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইল।

সাতাইশ

স্বামী তুরীয়ানন্দ *

"ফুল্লচিত্তায় ধীরায় গীতানির্মাল্যমালিনে।
তুরীয়াম্বুধিমগ্নায় তুরীয়ায় নমোঽস্তু মে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী তুরীয়ানন্দ আজন্ম ত্যাগ তপস্যা, তিতিক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতির জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তিনি আমেরিকায় তিন বৎসর বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকর্তৃক সানফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত সমিতি এবং সান আন্তোন উপত্যকায় শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রীঃ একটী পত্রে আমেরিকা হইতে লিখিয়াছিলেন, 'যখনই আমি হরিভাইয়ের অদ্ভুত তপস্যা এবং প্রগাঢ় নিষ্ঠার কথা ভাবি তখনই আমি নতুন বল পাই।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'যে বাক্যমনাতীত ভাবরাজ্য হইতে নামরূপের সৃষ্টি হয় হরিনাথ সেই লোক থেকে এসেছে।' ১৯২৯ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার স্বামী তুরীয়ানন্দের জন্মদিনে স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠে সাধুব্রহ্মচারীদিগকে বলিয়াছিলেন, "আজ খুব শুভ দিন। হরি মহারাজ মহাপুরুষ লোক, শুদ্ধসত্ত্ব শুকদেবের মত পবিত্র ছিলেন। ছোট বেলা থেকে 'গীতা', 'বিবেকচূড়ামণি' প্রভৃতি খুব পড়তেন। এ সব বই তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি ধ্যানপরায়ণ নির্জনতাপ্রিয় যোগী জ্ঞানী তপস্বী ছিলেন।....সংঘের উপর তাঁর কি অগাধ ভালবাসা! সংঘ সম্বন্ধে স্বামীজির উপদেশ তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল।....তাঁর জীবনে এতটুকুও দোষ নেই, সব গুণ, পূত পবিত্র জীবন। যোগ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম সব তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।"

পূর্বাশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে পরিচিত

* স্বামী তুরীয়ানন্দের বিস্তৃত জীবনী মৎকর্তৃক লিখিত হইয়াছে এবং শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

ছিলেন। তাঁহার পিতা চন্দ্রনাথ কলিকাতার বাগবাজার পল্লীর দেবভক্ত সত্যানুরাগী ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ডবলিউ. ওয়াট্‌সন কোম্পানীর গুদাম সরকারের কাজ করিতেন। তাঁহার অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান ছিল। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা। কনিষ্ঠ পুত্র হরিনাথই রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। হরিলুঠের সময় সন্তানের জন্ম বলিয়া পিতা পুত্রের নাম রাখেন হরিনাথ। জননী প্রসন্নময়ী দেবীর নিঃশঙ্ক অঙ্কে সুস্থ সবল শিশু প্রতিপদের শশাঙ্কবৎ দিন দিন বাড়ীতে লাগিলেন। কিন্তু শিশুর বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর তখন এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল। কলিকাতার উত্তরাংশ তখন পল্লীগ্রামের ন্যায় অপেক্ষাকৃত জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রাত্রির ত কথাই নাই, দিনেও শৃগালের কোলাহল শোনা যাইত। একদিন হঠাৎ একটী ক্ষিপ্ত শৃগাল আসিয়া শিশুকে আক্রমণ করিল। সন্তানগতপ্রাণা জননী ছুটিয়া যাইয়া ভীত শিশুকে ঊর্ধে তুলিয়া ধরিলেন। শৃগাল আক্রান্ত শিশুকে না পাইয়া মাতাকে দংশন করিল। তখনকার প্রচলিত চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। প্রিয় পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ জননী আত্মবলি দিলেন। হরিনাথ মাত্র তিন বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইলেন।†

জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার উপর মাতৃহীন শিশুর লালন পালনের ভার পড়িল। বার বৎসর বয়সে হরিনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পূর্ব হইতেই তিনি কম্বুলিয়াটোলা বাংলা স্কুলে পড়িতেছিলেন। তখন হইতেই তিনি শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মচর্চাদিতে নিযুক্ত হন। রোজ আখড়ায় যাইয়া কুস্তী করিতেন এবং ডন-বৈঠক দিতেন। একসঙ্গে তিনি এক শত ডন এবং পাঁচ শত বৈঠক দিতে পারিতেন। বাল্যেই ধর্মসাধনায় তাঁহার সমান অনুরাগ দৃষ্ট হয়। উপনয়নের পরে হরিনাথ গায়ত্রী-জপ ও আহ্নিকাদিতে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত নিমগ্ন হইলেন। তিনি প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান, স্বপাক হবিষ্যান্ন ভোজন এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন

† 'মাসিক বসুমতী'র ১৩২৯ ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক লিখিত 'স্বামী তুরীয়ানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে ঘটনাটি উল্লিখিত।

করিতেন। বাল্যকাল হইতেই কঠোরতা তাঁহার ভাল লাগিত। রাত্রে একখানি কম্বলের উপর নিদ্রা যাইতেন এবং ভোর চারটায় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন বিচিলির ঘাটে। একদিন চাঁদের আলোতে রাত্রি বুঝিতে না পারিয়া দুইটার সময় গঙ্গাস্নানে যান। পথে লোকজন বিশেষ দেখিতে না পাইয়া বুঝিলেন, তখনও চারটা বাজে নাই। তাঁহার ঘড়ি ছিল না, আন্দাজেই সময় ঠিক করিতে হইত। গঙ্গাতীরে আসিয়া স্থির করিলেন, যখন ভুলে এতদূর এসে পড়েছি স্নানটা সেরেই ফিরি। স্নানার্থ একগলা জলে নামিয়া দেখিলেন, যেন একটা খড়ের তাল ভেসে আসছে। ভাবিলেন, বোধ হয়, নৌকা থেকে বিচিলি পড়ে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা যখন খুব কাছে আসিল তিনি দেখিলেন সেটা একটা কুমীর, খড়ের তাল নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি জল হইতে উঠিয়া আসিতে লাগিলেন। একগলা জল হইতে যখন এক হাঁটু জলে উঠিয়া আসিলেন তখন তাঁহার বেদান্ত-বোধ জাগিয়া উঠিল। তিনি পুনরায় একগলা জলে নামিয়া স্থিরভাবে বিচার করিতে লাগিলেন, 'আমি তো শুদ্ধ আত্মা, আমি দেহ নহি। তবে আমি মৃত্যুভয়ে পলাইব কেন?' অল্পশব্দেই কুমীরটা চলিয়া গেল। তীরে যাহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা উপরে উঠিবার জন্য হরিনাথকে বারবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। তখন তিনি ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে আসিলেন।

হরিনাথ জেনারেল এসেম্‌ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউশনে পড়িতেন। উক্ত খ্রীষ্টান শিক্ষালয়ে যে বাইবেল ক্লাশ হইত তাহাতে তিনি নিয়মিতভাবে যাইতেন। কিন্তু তাঁহার ইংরাজি-পড়া ভাল লাগিল না। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা এবং ধর্মানুষ্ঠান বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে লাগিল। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মত দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ এবং অনুক্ষণ সঙ্গী ছিলেন গঙ্গাধর, যিনি পরে রামকৃষ্ণ সংঘে 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' নামে সুপরিচিত। দুই বন্ধুতে মিলিয়া সারাদিন জপতপ ও শাস্ত্রচর্চায় কাটাইতেন। চিৎপুরে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে এক সাধু আসিয়াছিলেন। হরিনাথ ও গঙ্গাধর প্রায় নিত্যই তাঁহার নিকট যাইতেন।

লোকে তাঁহার নিকট কত কিছু চাহিত, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যবান্ তরুণদ্বয় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। একদিন সাধু হরিনাথকে বলিলেন, 'বেটা, তুমি আস যাও, কিছু তো বল না। কি চাও?' হরিনাথ উত্তর দিলেন 'সাধন-ভজন ও ভগবান লাভ।' উত্তর শুনিয়া সাধু উল্লসিত চিত্তে বলিলেন, 'বেশ, বেশ। কিন্তু এখন ঘরে থেকে সাধনা কর। সময় হয় নাই, একটু দেরী আছে।' হরিনাথ সাধুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। ইতোমধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা পাত্র দেখিতে আসিতেন, পাত্রের মুখে সজীব বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তাঁহারা আর দ্বিতীয় দর্শন দিতেন না।

হরিনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শন লাভ করেন সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে। এই দর্শনের কথা তিনি এক পত্রে* কোন ভক্তকে এইভাবে লিখিয়াছিলেন।—"আমি বাগবাজারে শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুর বাটীতে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম। তখন তিনি অধিকাংশ সময় সমাধিস্থ থাকিতেন। সবে কেশব বাবুর সহিত ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছে। দীননাথ বসুর ভ্রাতা কালীনাথ কেশববাবুর অনুচর ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। আমরা তখন বালক, তের চৌদ্দ বৎসরের হইব। পরমহংস আসিবেন, একথা পল্লীতে রাষ্ট্র হইলে দর্শনার্থ আমরা তথায় সমবেত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া দুইটি পুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইলে সকলেই 'পরমহংস আসিয়াছেন', 'পরমহংস আসিয়াছেন' বলিয়া সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। প্রথমে একজন অবতরণ করিলেন।....তিনি † নামিয়া একজনকে গাড়ী হইতে নামাইতে লাগিলেন। ইনি দেখিতে অত্যন্ত কৃশ। তাঁহার গায়ে একটি পিরান, পরিহিত বস্ত্র কোমরে বাঁধা। একপা গাড়ীর পাদানে এবং অন্য পা গাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে। একেবারে সংজ্ঞাহীন! বোধ হইল, যেন মহা-মাতালকে ধরিয়া নামাইতেছে।"

* স্বামী তুরীয়ানন্দের 'পত্রাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত।

† ইনি ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

"যখন নামিলেন দেখিলাম, কি অপূর্ব জ্যোতিঃ তাঁর মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। মনে হইল, শাস্ত্রে যে শুকদেবের কথা শুনিয়াছি, ইনি কি সেই শুকদেব! ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইলে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা পাইয়া দেওয়ালে বৃহৎ কালীমূর্তি দেখিয়া তিনি প্রণাম করিলেন এবং একটি মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতে উপস্থিত সকলের মনে এক অপূর্ব ভক্তি ও সমন্বয়ের ভাবস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। কালী-কৃষ্ণের একত্বসূচক গানটী এই।—

"যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা করালবদনী শ্যামা॥"

এই গানের দ্বারা লোকের মনে কি যে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। তারপর অনেক পরমার্থ প্রসঙ্গ হয়েছিল। তিনি আরও একবার দীননাথের বাড়ীতে এসেছিলেন। পরে আবার দুই তিন বৎসর অন্তে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম।"

অনুমান ১৮৭৯।৮০ খ্রীঃ হরিনাথ ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে। শীঘ্রই তিনি ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ঘন ঘন তাঁহার নিকট যাইতে আরম্ভ করেন। অদ্বৈত বেদান্তের গ্রন্থ 'রামগীতা' যুবক হরিনাথের প্রিয় পুস্তক জানিয়া ঠাকুর চমৎকৃত হইলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে হরিনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, যখন আপনার কাছে আসি তখন অতিশয় উদ্দীপনা পাই। কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে সে উদ্দীপনা আর থাকে না কেন?' তরুণ শিষ্যের প্রাণস্পর্শী প্রশ্নে গুরু উত্তর দিলেন, 'তা কিরূপে হতে পারে? তুমি হরিদাস, হরির দাস। তোমার পক্ষে হরিকে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব?' হরিনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, 'আমি তো তা বুঝতে পারি না!' তাহাতে ঠাকুর প্রত্যুত্তর দিলেন, 'কোন বস্তুর সত্যতা কারোর জানা বা না জানার উপর নির্ভর করে না তুমি জান আর নাই জান, তুমি হরির সেবক, হরির সন্তান।' গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচর্যব্রতী শিষ্য গুরুকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশায়, কামটা একেবারে যায় কিরূপে?' উত্তর শুনিয়া হরিনাথ স্তম্ভিত। ঠাকুর বলিলেন, 'যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দে না!' শিষ্য

ঠাকুরের সরল উপদেশে নবালোক পাইলেন। কামজয়ের চেষ্টা না করিয়া মনকে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন করিলেই সাধক এই প্রবল রিপুর কবল হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন।

হরিনাথ বাল্যকাল হইতে নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। সেইজন্য মাতৃস্থানীয়া ভ্রাতৃজায়ার হস্তে আহার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। এমন কি, বালিকাদিগকেও তাঁহার কাছে আসিতে দিতেন না। একদিন উক্ত বিষয়ে ঠাকুর তাঁহাকে কিছু উপদেশ দেওয়াতে তিনি বলিলেন, 'উঃ! আমি তাদের হাওয়া সহিতে পারি না।' তিরস্কারের সুরে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তুই বোকার মত কথা বল্‌ছিস্। নারীদিগকে অবজ্ঞার চোখে দেখার কারণ কি? তারা জগদম্বার মানবী মূর্তি। তাদের জননীর মত দেখবে ও শ্রদ্ধা করবে। তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার এই একমাত্র উপায়। যতই তাদের ঘৃণা করবে, ততই তাদের প্রভাবে পড়বে।' ঠাকুরের অভিনব উপদেশে নারীদের প্রতি হরিনাথের ভ্রান্ত ধারণা আমূল পরিবর্তিত হইল। ঠাকুর ছিলেন উত্তম গুরু। তিনি বিভিন্ন শিষ্যকে বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। হরিনাথকে তিনি শুধু ধ্যান-জপের উপদেশ দিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যকে একদিন বলিলেন, 'গভীর রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে ধ্যান করবি।' ইহার কিছুদিন পরে গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, ন্যাংটো হয়ে ধ্যান করিস্ তো?' সাধক শিষ্য উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' গুরু—কেমন বোধ হয়? শিষ্য—যেন সমস্ত বন্ধন চলে যায়। গুরু—হাঁ, ঐরূপ ধ্যান করবি, খুব উপকার পাবি।

স্বামী সারদানন্দ বলেন, "হরিনাথ এক সময়ে বেদান্ত-চর্চায় খুব মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্ত-চর্চা এবং ধ্যান-ভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া হরিনাথ পূর্বে পূর্বে যেমন ঠাকুরের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন, সেরূপ কিছুদিন করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিষয় অলক্ষিত ছিল না। হরিনাথের সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি

রে, তুই যে একলা, সে আসেনি?' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, 'সে মশায়, আজকাল খুব বেদান্ত-চর্চায় মন দিয়েছে। রাতদিন পাঠ, বিচারতর্ক নিয়ে আছে। তাই, বোধ হয়, সময় নষ্ট হবে বলে আসেনি।' ঠাকুর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। উহার কিছুদিন পরেই হরিনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্ত-বিচার করছ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, না আর কিছু?' হরিনাথ—আজ্ঞে হাঁ, আর কি? হরিনাথ বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, এই কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বোঝা হইল।''*

সাধনসহায়ে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার জন্য হরিনাথ যখন কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত, তখন ঠাকুর একদিন বলরাম বসুর বাটীতে আসেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া বাগবাজারের গিরীশ ঘোষ প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন। হরিনাথের গৃহ অতি নিকটেই ছিল। আসন গ্রহণান্তে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে ছেলেটি (হরি) কোথা গা? তাকে একবার ডাক না।' জনৈক প্রতিবেশী যুবক তৎক্ষণাৎ যাইয়া হরিনাথকে ডাকিয়া আনিলেন। হরিনাথ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণামপূর্বক একপাশে বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সহাস্যে কুশল-প্রশ্ন মাত্র করিয়াই ঈশ্বর-কৃপা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। হরিনাথ বুঝিলেন, তাঁহার মনের ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য ঠাকুর উক্ত প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন, 'কামকাঞ্চনকে ঠিক্ ঠিক্ মিথ্যা বলে বোধ হওয়া কি কম কথা? তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে যদি ঐরূপ ধারণা করিয়ে দেন তো হয়। মানুষের কতটুকু শক্তি?' এইরূপে ঈশ্বর-কৃপার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভাবাবেশে এই গানটি ধরিলেন।—

"ওরে কুশীলব করিস্ কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে?"

---

* স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ" ৩য় ভাগ, ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কুশীলব যখন মহাবীরকে বাঁধিয়াছিলেন, তখন মহাবীর এই গানটি গাহিয়াছিলেন। এই গানটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। হরিনাথও অপূর্ব ভক্তিভাবে দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল! কিছুক্ষণ পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেন। হরিনাথ বলেন, 'ঠাকুরের সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেইদিন হইতেই বুঝিলাম, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।'

জীবন্মুক্তিলাভের বাসনা হরিনাথের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই বলবতী ছিল। তিনি তখন শঙ্করাচার্যের এই শ্লোকটি পড়িয়াছিলেন।—

"জীবন্মুক্তি-সুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতম্।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন নতু সংসারকাম্যয়া॥"

অর্থাৎ, নিত্যমুক্ত আত্মার দেহধারণ জীবন্মুক্তি সুখ লাভের জন্য, সংসার ভোগের জন্য নহে। এই সম্বন্ধে হরিনাথ পরবর্তী জীবনে একটী পত্রে লিখিয়াছিলেন— "যখন শঙ্করাচার্য্যকৃত এই শ্লোকটি প্রথম পড়িয়াছিলাম, কি এক অদ্ভুত আনন্দ ও আলোকের অবতারণা তখন মনে হইয়াছিল, তাহা আর কি জানাইব? যেন জীবনের ইতিকর্তব্যতা তখনই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল এবং সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আপনা হইতেই হইয়া গেল।"

ঠাকুরের পূত সঙ্গে হরিনাথ ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ব্যাকুলতার আধিক্যে তিনি কখনো কখনো নির্জনে বসিয়া কাঁদিতেন। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে বসিয়া এক রাত্রে তিনি ঈশ্বরলাভের জন্য অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। সেই সময়ে ঠাকুর স্বকক্ষে বসিয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন, 'হরি কোথায়?' যখন হরিনাথ ফিরিলেন তখন ঠাকুর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'কেহ ঈশ্বরের জন্য কাঁদিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হন। পূর্ব পূর্ব জন্মে মনে যে ময়লা জমেছে তা প্রেমাশ্রু দ্বারা বিধৌত হয়। ঈশ্বরের জন্য কাঁদা খুব ভাল।' আর একদিন হরিনাথ কালীবাড়ীর পঞ্চবটীতে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। তখন ঠাকুর হঠাৎ সেখানে আসিলেন। তিনি ধ্যানমগ্ন শিষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই শিষ্য কাঁদিয়া উঠিলেন। ঠাকুর তাঁহার পার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান। হরিনাথ অনুভব করিলেন,

'তাঁহার মূলাধার হইতে সুপ্তা শক্তি সড় সড় করিয়া হৃদয়ে উঠিতেছে এবং তজ্জন্য তাঁহার শরীর খুব কাঁপিতেছে।' তিনি চেষ্টা করিয়াও সেই কম্পন বন্ধ করিতে পারিলেন না। হরিনাথের কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'তোমার কাঁদা নিষ্ফল হয় নাই। এই কম্পন ভাব-সমাধির এক প্রকার লক্ষণ।' উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের পক্ষে কাহারো কুণ্ডলিনী জাগরণ করা সহজ ব্যাপার ছিল। তিনি এই কার্য্য স্পর্শ না করিয়াই, কেবলমাত্র পাশে দাঁড়াইয়াই, করিতে পারিতেন।'

নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ গুরুভ্রাতাদের সহিত হরিনাথের গভীর প্রীতি ছিল। নরেন্দ্রনাথ একদিন হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরি ভাই, কিছু বলুন শুনি।' হরিনাথ উত্তর দিলেন, 'কি আর বলবার আছে?' পরে শিবমহিম্ন স্তোত্র হইতে 'অসিতগিরি সমং স্যাৎ....' শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রনাথ ওজস্বিনী ভাষায় অনর্গল নানা কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'ঠাকুরের কথা আর কি বল্‌বো? তিনি l-o-v-e personified অর্থাৎ প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ।' ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানবাটীতে শেষ অসুখের সময় শয্যাশায়ী তখন একদিন হরিনাথ তাঁহার কাছে গিয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছেন?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'বড় কষ্ট হচ্ছে, খেতে পাচ্ছি না, অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে।' ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়াই হরিনাথের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন, 'ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান, আনন্দের সাগর এবং রোগ-যন্ত্রণার অতীত।' কিন্তু ঠাকুর পূর্ববৎ স্বীয় রোগযন্ত্রণার কথা আবার হরিনাথকে বলিলেন। ইহা সত্ত্বেও হরিনাথের একই অনুভূতি হইল। তখন তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, 'আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি প্রত্যক্ষ দেখছি আপনি অনন্ত আনন্দ-সাগর।' ইহা শুনিয়া ঠাকুর মৃদুহাস্যে স্বগতোক্তি করিলেন, 'শালা ধরে ফেলেছে রে!' শেষ জীবনে যখন হরি মহারাজ অসহনীয় রোগযন্ত্রণায় ভুগিতে-ছিলেন তখন বলেছিলেন, 'ঠাকুরের পূত সঙ্গে যে পরমানন্দ পেয়েছি তার তুলনায় সারা জীবনের দুঃখকষ্ট অতি তুচ্ছ!'

ঠাকুরের তিরোভাবের পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভে হরিনাথ বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তাঁহার নাম হইল তুরীয়ানন্দ। বরাহনগর মঠে কিছুদিন তপস্যা করিবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ তীর্থ পর্য্যটন ও নির্জন তপস্যার জন্য বহির্গত হইলেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে, অধিকাংশ পথ পদব্রজে, রিক্তহস্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উত্তর ভারতের তীব্র শীতকালে তিনি একটি তুলার চাদরে নগ্নপদে থাকিতেন। তপস্যার সময় মাধুকরীই ছিল তাঁহার উদরপূর্তির একমাত্র উপায়। গ্রীষ্মকালে এক দ্বিপ্রহরে এলাহাবাদের নিকটে মাধুকরী করিয়া ফিরিবার পর তিনি তপ্তদেহে জল ঢালিয়া স্নান করেন। জল ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। প্রয়াগধামের অদূরে কোন আম্র কাননে এই ঘটনা ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি দুই দিনের মধ্যে সংজ্ঞা ফিরিয়া পান। স্থানীয় কোন সাধুভক্ত সেবা করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। উত্তরাখণ্ডে তিনি বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। গাড়োয়াল পাহাড়ে অবস্থানকালে তপস্যার মগ্নতায় তিনি বাহ্য জগৎ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতায় তিনি তখন দিবারাত্র অভিভূত থাকিতেন। গাড়োয়ালের কথা তিনি এই ভাবে বলিয়াছিলেন; 'আমি তখন নিরন্তর এক উচ্চ ভাবে আরূঢ় ছিলাম। ঈশ্বরদর্শনই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। আটটি উপনিষদের শ্লোকগুলি মুখস্থ করেছিলাম এবং প্রত্যেক শ্লোকের ভাবার্থের উপর গভীর ধ্যান করিতাম।'

মথুরায় কেশীঘাটে অবস্থান কালে তাঁহার এই অদ্ভুত অনুভূতি হয়। তাঁহার মনকে এই চিন্তা তখন আলোড়িত করিল যে, জগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করিতেছে, আর তিনি ভবঘুরের ব্যর্থ জীবন যাপন করিতেছেন! অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি এই দুশ্চিন্তা মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। অবসাদে বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িলেন এবং একটু পরে নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি এই স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি ভূমির উপর শায়িত এবং তাঁহার দেহ দশদিকে বিস্তৃত হইতেছে। দেহটি বিস্তৃত হইয়া সমগ্র

বিশ্ব ব্যাপ্ত করিল। তখন তাঁহাকে কে যেন বলিলেন, 'দেখ, তুমি মহান্। তুমি নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। কেন তুমি ভাব, তোমার জীবন ব্যর্থ? পরমার্থ সত্যের একটী মাত্র কণা মোহগ্রস্ত বিশ্বকে উদ্ধার করিতে পারে। ওঠ, জাগ এবং পরমার্থ সত্য লাভ কর। ইহাই মহত্তম জীবন।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত একত্রে কয়েক বৎসর তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা করেন। তিনি আবু পাহাড়ে কিছুদিন ছিলেন। সেখান হইতে আজমীর ও পুষ্কর তীর্থ দেখিয়া বৃন্দাবনে যান। বৃন্দাবনে গুরুভ্রাতৃদ্বয় কঠোর তপস্যায় এত নিমগ্ন থাকিতেন যে, উভয়ের মধ্যে কয়েক দিন আদৌ কথাবার্তা হইত না। তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনের তীব্র শীত সূতার কাপড় ও সূতার চাদরে কাটাইতেন। গরম জামা-কাপড়ের অভাবে শীতের জন্য রাত্রে ভাল ঘুম হইত না, রাত দুই তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তখন উঠিয়া পাতকুয়ার জল তুলিয়া স্নান করিতেন। পাতকুয়ার জল রাত্রে একটু গরম থাকে। ঐ জলে স্নান করিলে বেশ আরাম হইত। স্নানান্তে তিনি ধ্যানে বসিতেন। ধ্যান জমিলে শরীরে ঘাম বাহির হইত। শীতের প্রকোপে তাঁহার মুখ হাত পা ফাটিয়া রক্ত পড়িত। বৃন্দাবনে কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার যে অলৌকিক দর্শনাদি হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন। রাধারাণীর দর্শনলাভের আশায় তিনি মাঝে মাঝে নিধুবনে যাইতেন। একদিন তমাল গাছের তলে শ্রীরাধার আলুলায়িত বেণী দর্শন করেন। প্রথমে সেই বেণীকে ময়ূর-পুচ্ছ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হয়। কিন্তু পরে বুঝিতে পারেন, ইহা রাধারাণীর বেণী।

তীর্থভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতার সহিত মাঝে মাঝে তাঁহার দেখা হইত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে বোম্বাইতে তাঁহার সহিত দেখা হয়। তখন স্বামিজী আমেরিকা-যাত্রার জন্য প্রস্তুত। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, 'স্বামিজীর ভাস্বর মুখমণ্ডল দেখিয়া তখন মনে হইল, তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন এবং পাশ্চাত্য জগতে শ্রীগুরুর বাণী প্রচারার্থ যাইতেছেন।' ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ-ভাগে হরি মহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। ইহার কয়েক মাস পরে স্বামিজী পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাগমন করেন। বেলুড় মঠেও স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামিজীর সহিত কিছুকাল বাস করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ জুন মাসে দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যে গমন কালে স্বামিজী হরি মহারাজকে সঙ্গে লইয়া যান। হরি মহারাজ প্রথমে পাশ্চাত্যে যাইতে সম্মত হন নাই। কিন্তু স্বামিজী তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'হরি ভাই, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি বিন্দু বিন্দু রক্তপাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমাকে এই কাজে সাহায্য করবে না?' তখন হরি মহারাজ সমুদ্রপারে যাইতে রাজী হইলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ আগষ্ট মাসের শেষে হরি মহারাজ ইংলণ্ড হইয়া নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। প্রথমে তথায় তিনি স্বামী অভেদানন্দের সহকারীরূপে স্থানীয় বেদান্ত সমিতিতে কাজ করেন। স্থানীয় ভক্তগণ বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা বেদান্তের আলোকে ধর্মজীবন গঠনে নিযুক্ত হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মার্কিন শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, 'আমার মধ্যে তোমরা ক্ষাত্র শক্তির প্রকাশ দেখেছ। আমি তোমাদের কাছে এমন এক গুরুভাইকে পাঠাব, যিনি ব্রাহ্মণের গুণাবলীর বিমূর্ত বিগ্রহ। তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ। মানব জীবনের উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার বিকাশ কিরূপ হয়, তা তাঁকে দেখলে বুঝতে পারবে।' সেইজন্য স্থানীয় ভক্তগণ আগ্রহ সহকারে হরি মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশে নিয়মিতভাবে ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ব্রুকলীন নৈতিক সমিতির সভাপতি ডক্টর লুইস জেন্‌সের আমন্ত্রণে তথায় যাইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি কেম্ব্রিজ, বোষ্টন এবং নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানেও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শনিবার বৈকালে শিশুদের জন্য একটি ক্লাশ হইত। ইহাতে হিতোপদেশের এবং অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থের গল্পগুলি সরল ইংরাজীতে বলিয়া তিনি শিশুদিগকে নীতিশিক্ষা দিতেন। মৌমাছিরা যেমন মধুলোভে সুগন্ধি ফুলের চারিদিকে ঘিরিয়া বসে, তদ্রূপ শিশুরা স্বামী তুরীয়ানন্দের সুমিষ্ট বাক্যে এবং মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিত।

স্বামী সারদানন্দ ভারতে চলিয়া আসিলে স্বামী তুরীয়ানন্দ মণ্টক্লেয়ারে যাইয়া থাকেন। এই সহরটি নিউইয়র্ক হইতে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। নিউইয়র্কের ন্যায় মণ্টক্লেয়ারেও স্বামী তুরীয়ানন্দ অল্পকালের মধ্যে স্থানীয় বন্ধু-ভক্তগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। নিউইয়র্কে প্রায় এক বৎসর কাজ করিবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিস্কোতে গমন করেন। সান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে ওক্‌ল্যাণ্ডে যাইয়া সাত সপ্তাহকাল বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। * তথায় তিনি এফ. এস. রোডহ্যামেলের গৃহে অতিথি ছিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ কালিফোর্ণিয়ার পাহাড়ে সান্ আন্তোন উপত্যকায় সান্তা ক্লারা জেলায় শান্তি আশ্রম স্থাপন করিতে যান। শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। ১৯০০ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে তিনি তথায় উপস্থিত হন। সান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে সান্ জোস পর্যন্ত ট্রেনে, তথা হইতে বাইশ মাইল চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়াই-উৎরাই পথে ৪৪০০ ফুট উচ্চ হ্যামিল্টন পাহাড়ে যাইতে হয়। উক্ত পাহাড়ের উপরে বিশ্ববিখ্যাত লেক অবজারভেটারী অবস্থিত। ইহার আঠার মাইল দূরে শান্তি আশ্রম।

শান্তি-আশ্রম দেড় মাইল দীর্ঘ এবং এক মাইল প্রস্থ। উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের কেবিন বা তাঁবুতে ছাত্র-ছাত্রীগণ বাস করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের তপস্যায় শান্তি আশ্রম তপোবনে পরিণত হইল। তাঁহার দিব্য প্রভাবে সকলের জীবন রূপান্তরিত হইল এবং কেহ কেহ সন্ন্যাসী হইলেন। তিনি তথায় প্রায় দুই বৎসর ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভারতে আসিয়া স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। শান্তি আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্বে তাঁহার এক অলৌকিক দর্শন হইল। এক সন্ধ্যায় গুরুদাস মহারাজ তাঁহার কেবিনে আসিতেই তিনি সত্যলব্ধ দর্শনের কথা বলিলেন। দর্শনে জগন্মাতা তৎসম্মুখে আসিয়া

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৩ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত মিঃ এফ. এস. রোডহ্যামেলের প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

তাঁহাকে শান্তি আশ্রমে থাকিতে বলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাতে অস্বীকৃত হন। ইহাতে জগন্মাতা বলেন যে, 'তুমি থাকিলে আশ্রম শ্রীসম্পন্ন এবং ইহাতে সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্মিত হইবে।' তথাপি হরি মহারাজ অস্বীকৃত হওয়ায় জগদম্বা তাঁহাকে একটী, শিয়্যোপশোভিত স্থান দেখান। হরি মহারাজ বলিলেন, 'স্বামীজীকে দেখিবার জন্য আমি একবার ভারতে যাইবই।' ইহাতে জগন্মাতা গম্ভীরাননে অন্তর্হিতা হইলেন।*

১৯০২ খ্রীঃ জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বামী তুরীয়ানন্দ বেলুড় মঠে আসিলেন। তৎপূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হয়। স্বামিজীকে দেখিতে না পাইয়া তিনি মর্মাহত হন। তিনি অল্পকাল বেলুড় মঠে থাকিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া তপস্যামগ্ন হইলেন। তৎপরে গড়মুক্তেশ্বর, নাঙ্গোল, উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থানে প্রায় আট বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। ইহার ফলে তিনি ব্রহ্মানুভূতি লাভে কৃতার্থ হন, কিন্তু তাঁহার দেহ ব্যাধি-মন্দিরে পরিণত হয়। বহুমূত্র ও পৃষ্ঠব্রণাদি রোগে তিনি শেষ জীবনে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি ১৯১১ এবং ১৯১৭ খ্রীঃ পুরীধামে গমন করেন। উক্ত তীর্থে অবস্থানকালে তিনি একদিন জগন্নাথদেবের দর্শনে যান দিনের বেলা। অরুণ স্তম্ভের পাশ দিয়া মন্দিরের সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, সিঁড়ির অন্য পাশ দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ নামিতেছেন। ঠাকুরের গলায় ফুলের মালা এবং দেহে সাধারণ জামা-কাপড়। ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তিনি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। কিন্তু যখন তিনি প্রণামান্তে ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন তখন ঠাকুর অদৃশ্য হইলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার চমক ভাঙিল। হরি মহারাজ বলিতেন, 'জগন্নাথদেবই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। এইজন্যই ঠাকুর পুরীতে যাইতেন না এবং বলিতেন, পুরীতে গেলে তাঁর শরীরত্যাগ হইবে।' পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে তিনি একদিন যোগশাস্ত্রোক্ত অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করেন।

---

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৫ জানুয়ারী সংখ্যায় স্বামী অতুলানন্দের প্রবন্ধে ঘটনাটি বিবৃত।

পুরীধামে তাঁহার দেহে বিস্ফোটকাদির জন্য প্রথম অস্ত্রোপচার হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবনের শেষ সাড়ে তিন বৎসর তিনি কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অবস্থান করেন। তথায় তাঁহার শরীরে দুষ্টব্রণাদির জন্য কয়েক বার অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁহাকে ক্লোরোফর্ম দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিতে হইত না। তিনি অম্লান বদনে অস্ত্রোপচারের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। রক্ত-মাংসময় দেহের উপর কেবল সমাধিবান্ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের এইরূপ আধিপত্য সম্ভব। শেষ জীবনে যম-যন্ত্রণা ভোগ কালেও তাঁহাকে কখনও বিষণ্ন দেখা যায় নাই। সমস্ত পীঠ অস্ত্রোপচারজনিত এবং দুই পাশে শয্যাজনিত ক্ষতসমূহের জন্য তিনি চিৎ হইয়া বা পাশ ফিরিয়া শুইতে পারিতেন না। এইরূপ অবস্থায় তিনি ব্রহ্মভাবে সদা লীন থাকিতেন। তাঁহার কষ্ট দেখিয়া সেবকগণ সহানুভূতির সুরে কিছু বলিলে বেদান্তকেশরী তুরীয়ানন্দের কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত হইত, 'কি হয়েছে? কার হয়েছে?' যতই মহাপ্রস্থানের দিন সন্নিকট হইল ততই তাঁহার দেহবুদ্ধি তিরোহিত এবং ব্রহ্মজ্ঞান সম্প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। শেষ সপ্তাহে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আর পাঁচ ছয় দিন খুব আনন্দ করে নাও।' দেহত্যাগের পূর্বদিন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'কাল শেষ দিন, কাল শেষ দিন!'

শেষদিন আবাল্য-বন্ধু স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলিলেন, 'বল ভাই, আমরা মায়ের, মা আমাদের। বল, বল।' অনন্তর মহামায়াকে প্রণামান্তে তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকদ্বয় আবৃত্তি করিলেন। সেদিন তিনি অনুরক্ত সেবক স্বামী প্রবোধানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।' উক্ত সেবক তদুত্তরে বলিলেন, 'আমরা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি; আপনি নিশ্চিন্ত হোন।' তখন তিনি বলিলেন, 'তবে যাই, তবে যাই।' বৈকালে শরৎ মহারাজ, গুরুদাস মহারাজ প্রভৃতির নাম তাঁহার মুখে শোনা গেল। শেষ দিন আদৌ ঔষধ খাইলেন না, ঠাকুরের চরণামৃত পান করিলেন। মহাসমাধির পূর্বে চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। সব সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ। ঠাকুর

সত্যস্বরূপ।' স্বামী অখণ্ডানন্দ এই মহাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, 'ওঁ সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।' ইহা শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ খুব আনন্দিত হইলেন এবং স্থির চিত্তে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিলেন। মুখে ভয়, বিষাদ বা ক্ষোভের চিহ্নমাত্র নাই। আছে কেবল বিদেহমুক্তির, ব্রহ্মজ্ঞানের নিবিড় আনন্দ, গভীর প্রশান্তি। তাঁহার দেহ ভাগীরথীতে জল সমাধি দেওয়া হইল। তাঁহার মহাসমাধির * দিন ১৩২৯ সালের ৫ই শ্রাবণ শুক্রবার বা ১৯২২ খ্রীঃ ২১শে জুলাই।

---

* মহাসমাধির বিস্তৃত বিবরণ 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩২৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

আঠাইশ

স্বামী বিমলানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী বিমলানন্দ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সন্ন্যাস-জীবন দশ এগার বৎসরমাত্র স্থায়ী হয়। রামকৃষ্ণ সংঘের ইংরাজি মুখ-পত্র 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র তিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। গুরুভ্রাতা স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন তাঁহার সহপাঠী। স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার গভীর সৌহার্দ ছিল পূর্বাশ্রম হইতেই। তাঁহার গুরুভক্তি, আদর্শনিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতা অনুকরণীয়। যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের যে যুগোপযোগী নবীন আদর্শ প্রদর্শন ও প্রচার করিলেন স্বামী বিমলানন্দ ছিলেন উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী জগৎবল্লভপুর থানায় বাগাণ্ডা গ্রামে বেণীমাধব চট্টোপাধায় নামে এক স্বধর্মনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পরে আন্দুল গ্রামে উঠিয়া যান। রংপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের এষ্টেটে তিনি প্রথমে ইঞ্জিনীয়ার ও পরে ম্যানেজার হইয়াছিলেন। কলিকাতার পটলডাঙ্গা পল্লীতে ক্যাথিড্রাল মিশন লেনে তাঁহার নিজস্ব গৃহ ছিল। কার্যানুরোধে তিনি উক্ত গৃহে মাঝে মাঝে সপরিবারে থাকিতেন। কাজের চাপে যেদিন পূজা-আহ্নিকাদির অবসর পাইতেন না, সেদিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া পূজাদি সমাপনান্তে আহার করিতেন। তাঁহার গৃহিণীও ভক্তিমতী তেজস্বিনী এবং লক্ষীর ন্যায় সুশ্রী ছিলেন। পুত্রকন্যাগণের ধর্মে মতি আনিবার কামনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। বেণীমাধবের দীর্ঘস্থায়ী অজীর্ণ রোগটি তাঁহার পুত্রকন্যাগণে সঞ্চারিত হয়। তাঁহার দুই তিনটি পুত্রকন্যা যক্ষারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বেণীমাধবের দ্বিতীয় পুত্র খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় স্বামী বিমলানন্দ নামে পরিচিত। খগেন্দ্রনাথ ১২৭৯ সালে, ইংরাজি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বালক

খগেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সরলতা, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি সদ্গুণ অসাধারণ ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। যখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন হইতেই তাঁহার ধর্মানুরাগে বন্ধুগণ আকৃষ্ট হন। সেই সময়ে তাঁহার নায়কত্বে একদল যুবক ধর্মজীবন গঠনে ব্রতী হন। উক্ত দলের পাঁচ জন স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী-শিষ্য হইয়াছিলেন। যে দুই একজন সংসারে ছিলেন তাঁহারাও চিরকুমার-ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। এইরূপে খগেন্দ্র যৌবনে বহু তরুণকে ধর্মপথে আনিয়াছিলেন। তাঁহার এক সহপাঠী বলেন, "খগেনের সৎসঙ্গ ও উপদেশ না পাইলে আমাদের অনেকের জীবনগতি নিশ্চয়ই অন্যপথে যাইত।' কোথাও সাধুভক্তের সন্ধান পাইলেই খগেন তাঁহার কাছে যাইতেন। কোন বন্ধুর বাগানবাড়ীতে বা অন্য নির্জন স্থানে বন্ধুদের লইয়া তিনি সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। কোন কোন সময়ে তাঁহারা সংসারের সমস্ত কথা ভুলিয়া সমস্ত দিন ধর্মালোচনা ও ধ্যান-ভজনে কাটাইতেন। ঐ সকল দিনে তাঁহারাই অন্নাদি রন্ধন করিতেন। সকলেরই ব্রহ্মচর্য-পালন এবং ধর্মসাধনার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুরের গৃহী শিষ্য সুরেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি' নামক পুস্তিকাখানি খগেন পাঠ করেন। অনন্তর রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব দেখিতে যান। তৎপরে তাঁহারা যোগোদ্যানে প্রায়ই যাইতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইলেন। এই সময়ে খগেন এক বন্ধুর সহিত স্থির করিলেন, সংসার ছাড়িয়া হিমালয়ে নিবাসপূর্বক সাধন-ভজন করিবেন। উভয়ের দার্জিলিঙ্গে যাওয়া স্থির হইল। কিন্তু কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিষেধে তথায় যাওয়া বন্ধ হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শেষে খগেন রিপন কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকার একটি বৃত্তি পাইলেন। তৎপরে তিনি রিপন কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত'কার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেই কলেজের অধ্যক্ষ। মহেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার পর খগেন ধর্মালোচনা শুনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতে

লাগিলেন। তাঁহারই পরামর্শে খগেন বরাহনগর মঠে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রথম দিন তিনি বরাহনগর মঠে বন্ধুগণের সহিত পদব্রজে গিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি অবসর পাইলেই বরাহনগর মঠে যাইয়া ঠাকুরের শিষ্যগণের পূত সঙ্গ করিতেন। কলেজের বন্ধুদের লইয়া তিনি ধর্মালোচনায় এত মাতিয়া যাইতেন যে, কোন কোন দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া যাইত।

১৮৯২ খৃঃ এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহারা বরাহনগর মঠে গমন করেন। তখন খগেনের লম্বা লম্বা চুল ছিল। চুলগুলি ঘাড়ের উপর এবং মুখের চতুর্দিকে ঝুলিয়া পড়ায় তাঁহার তরুণ মুখ অপূর্ব শ্রী-মণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার মুখটি যেমন সুন্দর, ব্যবহারও তেমনি মধুর ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই লোকের মনে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি উদিত হইত। তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক ব্যক্তিও তাঁহার সদুপদেশে এবং সাধু দৃষ্টান্তে ধর্মপথে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি রিপন কলেজেই বি. এ. পড়িতেন। বাল্য হইতেই অজীর্ণ রোগের আক্রমণে তাঁহার দেহ কৃশ ও রুগ্ন ছিল। যখন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। তিনি আর বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারিলেন না এবং পড়া ছাড়িয়া কিছুকাল বাড়ীতে থাকিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলেন। তখন সম্ভবতঃ ১৮৯৪।৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। এইভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। কলেজের পড়া না থাকায় অধিকতর অবসর মিলিল এবং তিনি অধিকাংশ সময় ধর্মচর্চায় নিযুক্ত রহিলেন। ১৮৯১ হইতে ১৮৯৬ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় ছয় বৎসর ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসজীবনের জন্য প্রস্তুতি চলিল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্তের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। বজবজে জাহাজ হইতে নামিয়া তিনি ট্রেণে শিয়ালদহে আসেন। দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও খগেন কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে স্বামীজীর গাড়ী টানিয়া আনিলেন। কলিকাতার যে যে স্থানে স্বামীজীর ধর্মব্যাখ্যা বা বক্তৃতাদি হইত সেই সেই স্থানে যাইয়া তাঁহার পুণ্য দর্শন ও ওজস্বিনী বাণী শ্রবণে

নয়ন মন সার্থক করিতে লাগিলেন। আলমবাজার মঠে ও গোপাললাল শীলের বাগানবাটী প্রভৃতি যে যে স্থানে স্বামীজী রহিলেন তথায় খগেন উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে এবং অমায়িক ব্যবহার দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে স্বামীজীকে গুরুপদে বরণান্তে তিনি পিতামাতার অনুমতি লইয়া চিরদিনের জন্য গৃহ ছাড়িলেন এবং আলমবাজার মঠে যোগ দিয়া গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক বিমলানন্দ নামে অভিহিত হইলেন। স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন আলমবাজার মঠস্থ সাধুব্রহ্মচারীগণকে উপনিষদাদি বেদান্তগ্রন্থ পড়াইতেন। নবীন যতি বিমলানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরুনির্দেশে জপধ্যান ও সাধুসেবায় মগ্ন হইলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বভাগে বেলুড় মঠের নব গৃহ নির্মিত হয়। তখন স্বামী বিমলানন্দ শ্রীগুরুর পূত সঙ্গে বেলুড় মঠে বাস করেন। এইরূপে প্রায় দুই তিন বৎসর গুরুসঙ্গে থাকিবার পর তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন। তথায় যাইয়া তিনি প্রথমে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ও পরে যুগ্ম সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ইংরাজি ভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজি লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। স্বামীজি শিষ্যের ইংরাজি ভাষার খুব সুখ্যাতি করিতেন। রোগযন্ত্রণার তিক্তানুভব তাঁহার ছিল বলিয়াই বোধ হয় মঠে কেহ পীড়িত হইলে স্বামী বিমলানন্দ সযত্নে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন।*

মায়াবতীতে প্রথম দুই বৎসর তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল হয়। ১৯০০ খ্রীঃ কোন কারণে তাঁহাকে কিছুকালের জন্য কলিকাতায় আসিতে হয়। উক্ত বৎসরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় 'সাধারণ ভ্রান্তি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেন। তাহাতে তিনি বিশ্বাসের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিশ্বাস ভাবপ্রবণতার আকস্মিক উচ্ছ্বাস বা বুদ্ধিমত্তার বিস্ময়কর প্রকাশ নহে। জীবনের কঠিন ঘটনাবলীর সম্মুখে কর্পূরবৎ ঐ সব হাওয়ায় বিলীন হয়। প্রকৃত বিশ্বাস অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অটল শক্তিরূপে অবস্থিত। ইহা

---

* ১৩১৫ সালের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'স্বামী বিমলানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

সুদীর্ঘ নীতিনিষ্ঠার ফল। জগতের পরিবর্তনশীল ঘটনার মধ্যেও ইহা বিশ্বাসীর প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যে প্রকটিত হয়। পরমার্থ সৎবস্তুর সহিত যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অন্তর্দৃষ্টিবলে অনুভূত হয় তাহাই আসল বিশ্বাস। বাক্য-মনাতীত ব্রহ্মসত্তায় যাঁহার যতটুকু বিশ্বাস আছে তাঁহার জীবনের মূল্যও ততটুকু। যাঁর যেমন বিশ্বাস তাঁর জীবনে গতিও তদ্রূপ। বিশ্বাসবলে অসম্ভব সম্ভব হয়!" স্বামী বিমলানন্দ বিশ্বাসের যে সারগর্ভ সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই স্বানুভূত। গুরুপদে অটল বিশ্বাস আসিলেই শিষ্য কিরূপে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হন, তাহা একটি সরল আখ্যায়িকার দ্বারা উক্ত প্রবন্ধে তিনি এইরূপে বুঝাইয়াছেন।—

পুরাকালে হিমালয়ে এক জ্ঞানী মুনি বাস করিতেন। শিষ্যগণকে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী করিবার জন্য তিনি সদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। যে কয়টি শিষ্য তাঁহার নিকট পূর্ব হইতে ছিলেন তাঁহারা মনে করিতেন, গুরু তাঁহাদিগকে সমানভাবে ভালবাসেন। হঠাৎ এক প্রতিভাশালী শিষ্য আশ্রমে আসিয়া রহিলেন। তিনি উত্তম অধিকারী ছিলেন বলিয়া গুরু তাঁহাকে অশেষ স্নেহ-কৃপা করিতেন। ইহাতে পূর্বশিষ্যগণ একটু ঈর্ষান্বিত হইলেন। অন্তর্দর্শী গুরু ইহা বুঝিতে পারিয়াও কাহাকে কিছু বলিলেন না। তাঁহাদের এই ভ্রান্তি দূরীকরণার্থ একদিন প্রাতে মুনিবর তাঁহার শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। তোমরা যদি উহার চিকিৎসার ভার না নাও আমার মৃত্যু হবে।' নবাগত প্রিয় শিষ্যটি উত্তর দিলেন, 'আপনার আরোগ্যের জন্য আমি হৃদয়ের রক্তদান করিতে প্রস্তুত।' মুনি বলিলেন, 'তুমি একা কেন, তোমরা সকলেই তাহা করিতে পার। একেবারে জনশূন্য স্থানে একটি ঘুঘু পাখীর মাথা কাটিয়া আনিলে সেই রক্তপ্রয়োগে আমার রোগ সারিবে। কিন্তু সাবধান! কেহ যেন তোমাদের এই হত্যাকাণ্ড দেখিতে না পায়।' গুরুভক্তি প্রদর্শনার্থ প্রত্যেক শিষ্য নির্জনস্থানে ঘুঘুর মাথা কাটিয়া আনিবার জন্য বহির্গত হইলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই প্রত্যেকে এক একটি ঘুঘু পাখী ধরিয়া মাথা কাটিয়া আনিলেন। কিন্তু নবাগত শিষ্যটি ফিরিলেন না। অপরাহ্ন অতীত, সন্ধ্যা আসন্ন। তখনো তাঁহার দেখা নাই। প্রিয় শিষ্যের অপেক্ষায় গুরু সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন।

অরুণোদয়ের সময় ক্ষুৎপিপাসার্ত, পরিশ্রান্ত শিষ্য একটি জীবন্ত ঘুঘু হাতে লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক গুরুকে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, 'আমার অশেষ দুর্ভাগ্য যে, আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না। নির্জন স্থানের অন্বেষণে গভীর অরণ্যে, পর্বতগহ্বরে গেলাম। কিন্তু সর্বত্রই আমি বিশ্বতশ্চক্ষু ব্রহ্মপুরুষের দৃষ্টি দেখিতে পাইলাম। এমন স্থান নাই যেখানে তাঁহার দৃষ্টি নাই। সুতরাং ঘুঘু-হত্যা সম্ভব হইল না। এখন কোথায় ঘুঘুহত্যা করি?' গুরু ইহা শুনিয়া পরমানন্দে শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। এইজন্যই তোমাকে এত স্নেহ করি। তুমি আমার আশ্রমের গৌরব।' এই ঘটনায় অন্য শিষ্যগণের ভুল ভাঙ্গিল।

১৯০১ খ্রীঃ স্বামিজীর ইংরাজ শিষ্য কাপ্তেন সেভিয়ার হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় মিসেস্ সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দানের জন্য স্বামিজী মায়াবতী গিয়াছিলেন। তখন স্বামী বিমলানন্দ সাধ মিটাইয়া গুরুসেবা করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর শীতকালে স্বামী স্বরূপানন্দের সহিত তিনি এলাহাবাদে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। তখন তিনি তথায় বেদান্ত সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা ইংরেজীতে প্রদান করেন। ইংরেজীতে ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দান। তাঁহার বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তথায় আশ্রম স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। ১৯০১ খ্রীঃ জুলাই মাসে হরিদ্বারের নিকটবর্তী কন্‌খলে গুরুভ্রাতা স্বামী কল্যাণানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত বৎসর আগষ্ট মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় কন্‌খল সেবাশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহার্থ তিনি একটি সুলিখিত আবেদন প্রকাশ করেন। ১৯০২ খ্রীঃ হৃষীকেশে কন্‌খল সেবাশ্রমের একটি শাখা স্থাপিত হয়। উহার সাহায্যার্থ উক্ত বৎসর জানুয়ারী মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় তৎকর্তৃক একটি আবেদন প্রকাশিত হয়।

মায়াবতীতে স্বামী বিমলানন্দের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হওয়ায় সমুদ্রতীরবর্তী কোন স্থানে থাকিবার জন্য ১৯০৩ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে হিমালয় হইতে তিনি বেলুড় মঠে আসিলেন। তৎপরে ওয়াল্‌টেয়ারে কিছুদিন থাকিয়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে গমন করেন। মাদ্রাজ মঠাধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার চিকিৎসা ও ঔষধ-

পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করিলেন। চিকিৎসক বন্ধু নঞ্জুণ্ডা রাওয়ের পরামর্শে তিনি মাদ্রাজে কয়েকমাস রহিলেন। তৎপরে তিনি বাঙ্গালোরস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমে গমন করেন। বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ। মাদ্রাজের ন্যায় বাঙ্গালোরেও স্বামী বিমলানন্দ সহরে নানাস্থানে ক্লাশ ও বক্তৃতাদি করিতেন। স্বামী বিমলানন্দের উদ্যমে বাঙ্গালোর আশ্রমটি চিরপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং সহপাঠী আশ্রমাধ্যক্ষ আত্মানন্দজী এই কয়েক মাস বিশ্রামলাভে সুস্থ হইলেন। কঠোর পরিশ্রমে স্বামী বিমলানন্দের স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা খারাপ হইল। এইবার তিনি তাঁহার পরম সুহৃৎ গুরুভ্রাতা স্বামী স্বরূপানন্দের দেহরক্ষার দুঃসংবাদ পাইয়া মর্মাহত হইলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। বেলুড়ে অবস্থান কালে বেহালা হিতকরী সভার উদ্যোগে একটী সুন্দর ইংরাজি বক্তৃতা দেন।

নিউইয়র্ক এবং সান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির পরিচালক সন্ন্যাসিগণ স্বামী বিমলানন্দকে তথায় যাইবার জন্য বারবার সাদর আহ্বান করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেইসময় তিনি স্বগ্রাম আন্দুলে যাইয়া পিতামাতার নিকট কিছুদিন ছিলেন এবং রামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠের সমস্ত সন্ন্যাসিগণকে তথায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। ১৯০৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে তিনি সেভিয়ার-পত্নীর সহিত পুনরায় মায়াবতীতে উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ সবল হইল। তখন অদ্বৈতাশ্রম হইতে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছিল। স্বামী বিমলানন্দ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ছয় মাস উক্ত কার্য্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন। একটি প্রবাদ আছে যে, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় তাঁহারা স্বল্পায়ুঃ হন। স্বামী বিমলানন্দ জীবনের শেষ ষোল মাস মায়াবতীতে ছিলেন। শেষ ছয় মাস তিনি ক্ষয়-রোগে ও তজ্জনিত জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে তাঁহার জ্বর হইল। একমাস সেই জ্বরে ভুগিয়া তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। কিন্তু চিকিৎসক তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার পরামর্শ দিলেন। তিনি চিকিৎসকের

নিষেধসত্ত্বেও আশ্রমের কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। শাস্ত্রকার সত্যই বলিয়াছেন, 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো, বিনাশে নিয়তে সতি।' অর্থাৎ শরীরের বিনাশ যখন নিশ্চিত তখন মহৎ কার্য্যেই ইহা ব্যয়িত হউক। ১৯০৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় জ্বরে পড়িলেন। ডাঃ কর্পোরয়ন পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ইহা ক্ষয়-রোগ, তবে সারিয়া যাইবে।' কলিকাতা বা অন্যত্র লইয়া যাইবার কথা হইলে স্বামী বিমলানন্দ নিজেই অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং সেইখানেই তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইল। কিন্তু সুচিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার মারাত্মক রোগের কিঞ্চিৎমাত্র উপশম হইল না। এত অসুখেও তিনি একদিনের জন্য কিছুতে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই, অথবা তাঁহার মেজাজ আদৌ খিটখিটে হয় নাই! গুরুকৃপায় নিশ্চয়ই তাঁহার দৃঢ়ানুভব হইয়াছিল, তিনি অজরামর আত্মা, রোগ দেহের। সুতরাং জরা-ব্যাধিতে তাঁহার ব্রহ্মানন্দের হ্রাস হইবে কেন? তিনি রোগযন্ত্রণায় নিরানন্দ হইলেন না। তিনি ধীর স্থিরভাবে প্রারব্ধক্ষয়ে ব্রহ্মধামে গমনার্থ প্রস্তুত রহিলেন।

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি একদিন বলিলেন, আর বেশী দিন দেরী নাই। আমার শরীর প্রত্যূষে যাইবে, রাত্রিতে নহে।' আবার বলিলেন, 'আমার গোটা কয়েক টাকা আছে। আমার ইচ্ছা, একদিন তোমরা নিমকি গজা প্রভৃতি খাবার তৈয়ার করিয়া আমার সামনে সকলে মিলিয়া খাও এবং কুলায় ত আমাদের আশ্রমের চাকরদের দিও।' তাঁহার শেষেচ্ছা অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা হইলে তিনি বিছানায় শুইয়াই এক ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া দিয়া সুন্দর নিমকি ও গজাদি প্রস্তুত করাইলেন এবং সকলকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি এত দুর্বল হইয়াছিলেন যে, কাহারো সাহায্য ব্যতীত বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। আশ্চর্য্য এই যে, তখনো তাঁহার মুখে বিষাদের বিন্দুমাত্র কালিমা পড়ে নাই। শেষ কয়েকদিন তাঁহার জ্বর হয় নাই, ভীষণ দুর্বলতা ব্যতীত অন্য রোগলক্ষণ দেহে ছিল না। গুরুদেবের সহিত চির মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাসে রোগও সরিয়া পড়িল। ১৩১৫ সালের ৮ই শ্রাবণ, ইংরাজি ২৩শে জুলাই

রাত্রি দুইটার সময় ঔষধ ও দুগ্ধ খাইলেন এবং এক বোতল গরম জল করিয়া রাখিতে বলিলেন। রাত্রি ৪টায় বোধ হইল, তিনি নিদ্রিত। বেলা ৬টা পর্য্যন্ত সেই ভাবে রহিলেন—তাঁহার নাড়ী সুতার মত অতি ক্ষীণ, নিশ্বাস অতি ধীর। চক্ষুদ্বয় অনেকক্ষণ পরে উন্মীলিত এবং কিছুক্ষণ পরে মুদ্রিত হইতেছিল। তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। মুখমণ্ডল প্রশান্ত, সুস্থির। ডাকিয়া কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে তাঁহার মুখ হইতে দুই তিন বার ওঃ ওঃ ওঃ এই প্রকার অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল। পরক্ষণেই সব স্থির হইয়া গেল।*

স্বামী বিমলানন্দের মৃত্যু তাঁহার জীবনের মতই শান্তিপূর্ণ ছিল। জীবন-জ্বর হইতে চিরতরে অব্যাহতি পাইয়া মুক্ত যতি জগদম্বার ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। তাঁহার মহানিদ্রামগ্ন মুখমণ্ডল অবর্ণনীয় প্রশান্তি ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত। পার্থিব জীবন ছাড়িয়া মৃত্যুঞ্জয়ী যতি অনন্ত জীবন লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ছত্রিশ বৎসর ছিল। গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ এবং গুরুভ্রাতা স্বামী স্বরূপানন্দের মত তিনি অল্পায়ু ছিলেন। তিনি মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। তাঁহার দেহ গুরুভ্রাতৃগণ কর্তৃক পুষ্পে ও মাল্যে সজ্জিত হইয়া আশ্রমের নিম্নদেশে দুই পার্বত্য নদীর সঙ্গমস্থলে প্রয়াগভূমিতে চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। প্রজ্বলিত চিতার সম্মুখে গুরুভ্রাতৃগণ কর্তৃক বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছিল। জ্ঞানী যতি পৃথিবীর পঞ্চভূত পৃথিবীকে প্রত্যর্পণ করিয়া আত্মরূপে পরম ধামে উপনীত হইলেন।

---

* 'প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার ১৯০৮ আগষ্ট সংখ্যায় স্বামী বিমলানন্দ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

উনত্রিশ

স্বামী অভেদানন্দ *

"শাস্ত্রজ্ঞায় প্রশান্তায় বেদান্তপ্রতিপাদিনে।
নমোঽস্ত্বভেদপাদায় জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্তয়ে॥"

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শ সন্ন্যাসী শিষ্যের একজন ও রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বামী বিবেকানন্দের সময় হইতে তিনি পঁচিশ বৎসরের অধিককাল পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে ব্রতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সতের বার আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রণেতা ও আধুনিক হিন্দু ধর্মের স্মরণীয় প্রচারক ও আচার্য্য। ১৮৯৬ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি লণ্ডনে যাইয়া ক্রাইষ্টো থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে ইংরাজি ভাষায় প্রথম বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দাতিশয্যে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাই এই প্রিয় মুখে আমার বাণী ধ্বনিত হইবে এবং জগৎ তাহা শুনিবে।' উক্ত বক্তৃতাটী বেদান্ত সম্বন্ধে এবং সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্বাশ্রমে স্বামী অভেদানন্দের নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র। তাঁহার পিতা রসিকলাল চন্দ্র কলিকাতার বিখ্যাত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে খ্যাতনামা ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতার তৎকালীন অনেক প্রসিদ্ধ নাগরিক কৃষ্ণদাস পাল, নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ, রসরাজ অমৃতলাল বসু, স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। রসিকলাল দুইবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী বিহারীলাল নামক একটী

* দক্ষিণ ভারতের 'হিউম্যান এ্যাফেয়াস' নামক ইংরাজী মাসিকে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধাবলম্বনে রচিত। স্বামী শঙ্করানন্দের 'জীবন কথা' এবং রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের 'স্বামী অভেদানন্দ' পুস্তকে বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত।

পুত্র রাখিয়া যৌবনেই ইহধাম ত্যাগ করেন। আলেকজাণ্ডার ডাফের ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে ছাত্রাবস্থায় বিহারীলাল খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গৃহত্যাগ করিয়া মিশনারীদের দলে যোগ দেন। রসিকলাল ইহাতে এতদূর মর্মাহত হইয়াছিলেন যে, গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত হন। এমন সময় তিনি এই অশরীরী বাণী শুনিতে পান—'গৃহে ফিরিয়া যাও এবং আবার বিবাহ কর। আত্মহত্যা করিও না। উহা মহাপাপ।' আটাশ বৎসর বয়সে রসিকলাল নয়নতারা নাম্নী এক ধর্মশীলা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। নয়নতারার পুত্রগণের মধ্যে কালীপ্রসাদ ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৭ই অক্টোবর (১২৭৩ সালের ১৭ই আশ্বিন) মঙ্গলবার ভূমিষ্ঠ হন।

নয়নতারা ছিলেন সুশীলা ও ধর্মপ্রাণা জননী। তিনি প্রত্যহ পূজাদি সারিয়া রামায়ণ বা মহাভারতের কিয়দংশ পাঠ করিতেন। কালীঘাটের কালী মন্দিরে দেবীর নিকট তিনি বংশের মুখোজ্জ্বলকারী এক সৎপুত্রের কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ হইল। মা কালীর প্রসাদে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তজ্জন্য পুত্রের নাম রাখা হইল কালীপ্রসাদ। জন্মকালে শিশুর সর্বাঙ্গ নাড়ী-বিজড়িত ছিল। বহুযত্নে নাড়ীগুলি কাটিয়া শিশুকে উহাদের অষ্টপাশ হইতে মুক্ত করা হইল। কিন্তু শিশুর দেহে কিছুকাল নাড়ীর দাগ লাগিয়া ছিল। জন্মের পরমুহূর্তে শিশুর কোন স্পন্দন ছিল না। কিন্তু তাঁহার মুদ্রিত নেত্রে লঙ্কার গুঁড়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু কাঁদিয়া নড়াচড়া করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে শিশুকে গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় ভর্তি করান হয়। এই পাঠশালায় দুই বৎসর পড়িবার পর যদু পণ্ডিতের বিদ্যালয়ে তিনি তিন বৎসর পড়েন। শেষোক্ত বিদ্যালয়ে বাবুরাম ঘোষ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। বাবুরাম রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী প্রেমানন্দ নামে সুখ্যাত। বাল্যে কালীপ্রসাদ লেখাপড়ায়ও যেমন খেলাধূলাতেও তেমনি মনোযোগী ছিলেন। জননীর মুখে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পাদি শুনিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন।

ইহার পর কালীপ্রসাদ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। তীক্ষ্ণ মেধা ও

অধ্যবসায়ের গুণে এখানে তিনি প্রতি বৎসর ডবল প্রমোশন পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ,ছন্দমঞ্জরী ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। তিনি সুন্দর ছবি আঁকিতেও পারিতেন। উইলসন কৃত 'ভারতের ইতিহাস' পড়িবার সময় তিনি জানিতে পারেন যে, শংকরাচার্য ভারতের অদ্বিতীয় দার্শনিক। তখন হইতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র পড়িবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল আগ্রহ জাগিল। তাঁহার অনির্বাণ জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল। সেইজন্য তাঁহার পিতা একদা বলিয়াছিলেন, 'আমি কখনও এরূপ অনুসন্ধিৎসু বালকের সংস্পর্শে আসি নাই।' আঠার বৎসর বয়সে কালীপ্রসাদ সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতোমধ্যে তিনি এরূপ সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতে কথা বলিতে ও কবিতা লিখিতে পারিতেন। সেই বয়সে তিনি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'লজিক', 'দি এসেজ অন রিলিজিয়ন,' হারস্কেলের 'এ্যাষ্ট্রনমি,' গ্যানোর 'ফিজিক্স্', লুইসের 'হিস্ট্রি অফ ফিলজফি,' হ্যামিলটনের 'ফিলজফি' এবং আরও বহু বিখ্যাত ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কালীদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতি ভারতীয় কবিদের সংস্কৃত গ্রন্থাদিও তিনি অধ্যয়ন করেন। এইরূপ অদ্ভুত জ্ঞানতৃষ্ণা অসাধারণ প্রতিভাশালিগণের মধ্যেই লক্ষিত হয়।

যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তৎকালীন কলিকাতার বিভিন্ন ধর্মান্দোলন্দনের সহিত কালীপ্রসাদ সংযোগ স্থাপন করেন। সেই সময় রেভারেণ্ড ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য মিশনারীগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে নিযুক্ত। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মজুমদার ও অন্যান্য ব্রাহ্মনেতৃগণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে প্রয়াসী। অন্যপক্ষে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি প্রচারকগণ হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও নব ব্যাখ্যান প্রদানে ব্রতী। এইরূপ সকল ধর্মান্দোলনের সহিত কালীপ্রসাদ সংযোগ রাখিতেন। হিন্দু দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে পণ্ডিত শশধরের জ্বালাময়ী বক্তৃতা তখন সমগ্র বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে কলিকাতা আলবার্ট হলে প্রদত্ত হিন্দু ষড়দর্শন সম্বন্ধে শশধরের ধারাবাহিক মনোজ্ঞ বক্তৃতা কালীপ্রসাদের তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি হিন্দু দর্শন

সম্বন্ধে জানিতে আগ্রহান্বিত হইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট পতঞ্জলির যোগদর্শন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পতঞ্জলি ও ব্যাসদেব কর্তৃক সমাধি বর্ণনা পাঠে সমাধি লাভের আগ্রহ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী যোগীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই সময় সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের নিকট তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনি উৎগ্রীব হইলেন। এক শুভ প্রভাতে তিনি দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন এবং তথায় পদব্রজে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই উপনীত হইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ঠাকুরের যুবা শিষ্য শশী তাঁহাকে এই সংবাদ দেন। শশীর সহিত কালীর এই প্রথম পরিচয়। শশী পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে পরিচিত হন। তাঁহার অনুরোধে কালী তথায় স্নানাহার সারিয়া ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর সেদিন রাত্রি নয়টার সময় কালীমন্দিরে ফিরিলেন। কালী ঠাকুরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া প্রণামান্তে নিবেদন করিলেন, 'আমি যোগাভ্যাস করিতে চাই। আপনি কি আমাকে যোগসাধন শিক্ষা দিবেন?' কালীর এই প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া ঠাকুর বলিলেন, 'গত জন্মে তুমি একজন যোগী ছিলে। যোগ সিদ্ধিলাভের একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম। এস, আমি তোমাকে যোগশিক্ষা দিব।' এই কথাতেই ঠাকুর কালীপ্রাদের অন্তর জয় করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকে যোগাসনে বসাইয়া একটী অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার জিহ্বায় মন্ত্র লিখিয়া দিলেন ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কালীর বক্ষে স্থাপন করিলেন। ঠাকুরের অলৌকিক স্পর্শে বালকের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইল। তৎক্ষণাৎ বালক গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ঠাকুরের অমিয় স্পর্শ তাঁহার মনে অপূর্ব পরিবর্তন আনিল। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে ঠাকুর তাঁহাকে সাধনরহস্য শিক্ষা দিলেন।

সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খ্রীঃ কোন সময়ে কালীপ্রসাদ ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দেব-মানব এবং কেবল স্পর্শ দ্বারা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রদান করিতে পারেন। জীবন-সায়াহ্নে

শ্রীগুরু সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ 'কনটেম্পোরারী ইণ্ডিয়ান ফিলজফি, আধুনিক ভারতীয় দর্শন) নামক ইংরেজি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'জগতের সাম্প্রদায়িক ধর্মসমূহের অন্তরে বিশ্বধর্ম ও উচ্চতম দর্শনের যে সনাতন তত্ত্ব নিহিত উহার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন রামকৃষ্ণ।' 'পৃথিবীর ধর্মসমূহ' নামক বৃহৎ ইংরাজি গ্রন্থে (প্রথম ভাগ, ১২২ পৃষ্ঠা) স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার গুরুর বিষয় লিখিয়াছেন, 'তাঁহাকে আমরা সচরাচর একটি অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। সেই শক্তির বলে তিনি সাধারণ মানুষের মনকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইতে ও পাপীর চরিত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। তাঁহার পূত স্পর্শে ভক্তগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইত। তিনি অপরের পাপভার গ্রহণ এবং স্বীয় ধর্মভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চার দ্বারা লোকের জীবন পরিবর্তিত করিতেন।'

কলিকাতা হইতে প্রায়ই কালীপ্রসাদ ঠাকুরকে দেখিতে যাইতেন। ধর্ম-পিপাসু উৎসুক জনগণের নিমিত্ত ঠাকুরের মুখ-নিঃসৃত দিব্য জ্ঞানের অমিয় নির্ঝর তাঁহার তৃষিত প্রাণ আকণ্ঠ পান করিত। ধর্মজীবনে কালী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার ধ্যান গভীরতর হইতে লাগিল। গভীর ধ্যানে তিনি শিব, দুর্গা, কালী ও অন্যান্য দেবদেবীগণের মূর্তি দেখিতে পাইলেন। ধর্মবিষয়ে বহুবিধ জ্ঞানে ও অনুভবে তিনি ধন্য হইলেন। একদিন তিনি মনাকাশে বৈদিক ঋষিগণ-বর্ণিত ঈশ্বরের সর্বব্যাপী দৃষ্টি 'দিবীব চক্ষুরাততম্' দর্শন করিলেন। অন্যদিন দেখিলেন, সকল দেবদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দেহে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি এইকথা ঠাকুরকে বলিলে ঠাকুর বলিলেন, 'তোমার বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়েছে। আর তোমার সাকার দর্শন হইবে না। তোমার মন এখন নিরাকার ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে চাহিতেছে।'

ইতিমধ্যে কালীর সহিত নরেন্দ্র, রাখাল, লাটু ও ঠাকুরের অন্যান্য যুবা শিষ্যগণের পরিচয় হইয়াছে। নরেন্দ্রের সহিত কালীর পরিচয় শীঘ্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। লেখাপড়ায়, ধ্যানভজনে এবং অন্যান্য বিষয়ে কালী নরেন্দ্রকে অনুসরণ করিতেন। বাল্যে কালী ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি বাল্যভাব স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন, 'বাল্যকাল হইতেই আমি সকল জিনিষের মূল কারণ জানিতে

চাহিতাম ও সব বিষয়েই খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিতাম।' এমন কি, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াও তিনি যুক্তিবাদ পরিত্যাগ করেন নাই। এইরূপ যুক্তি-বন্দিতার ফলে পাছে তিনি নাস্তিক হইয়া যান সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?' কালী উত্তর দিলেন, না। শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি বেদে বিশ্বাসী? কালী—না। শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি শাস্ত্র মান? কালী—না। শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কি প্রাচীন প্রথাতে বিশ্বাস আছে? কালী—না।

সব প্রশ্নেরই নেতিবাচক উত্তর শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অপর কাহাকে এরূপ বলিলে সে তোমাকে চড় মারিত।' স্পষ্টবাদী কালী উত্তর করিলেন, 'আপনিও আমায় চড় মারিতে পারেন। কিন্তু আমি অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করিতে পারি না। যতদিন না ঈশ্বরকে জানিতেছি ততদিন কেমন করিয়া বলিব যে, আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করি? তাঁহাকে জানাইয়া দিন। তবেই তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বান্তরিক বিশ্বাস হইবে।' ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, সময়ে তুমি সব কিছু জানিতে পারিবে। গুরুর প্রতি কালীর অচলা ভক্তি ছিল। ঈশ্বরপ্রতিম গুরুর নির্দেশে কালী ধ্যান, জপ ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানে ডুবিয়া গেলেন। একদিন গুরুর নিকট তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, সময়ে তুমি উহা পাইবে। আহার, নিদ্রা ও জীবনের অন্যান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া কালী আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তৃষিত হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই তিনি উহা লাভ করেন। তাঁহার সাধনলব্ধ অনুভূতির পরিচয় পাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'হাঁ, উহা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান!' শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে তিনি কি শিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিতে সুব্যক্ত হইয়াছে।—'শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে আমি শিখিয়াছি, জগৎকারণের অনুসন্ধান কালে দ্বৈত জ্ঞান হইতেই রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞানে যাওয়া যায়। জগৎকারণ এক এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম। অদ্বৈত বেদান্ত অনুযায়ী যেদিন অনুভূতি হইবে যে, ব্রহ্মই জীব ও জগৎ হইয়াছেন, সেই দিন সত্যানুসন্ধান সমাপ্ত হইবে। এই তিনটীই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিভিন্ন পত্র মাত্র।'

এইরূপ দিব্যানুভূতির পর কালীর সম্পূর্ণ রূপান্তর হইল। দিনমণির উদয়ে অন্ধকারনাশের মত সংসারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ অপসৃত হইল। তিনি ঠাকুরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা আসিয়া পুত্রকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। সত্য গোপন না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'যুগে যুগে তোমার পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহার নব জন্ম লাভ হয়েছে। সে আর এখন তোমার পুত্র নয়। এ জীবনেও সে আমার সহচর হইবে।' ১৮৮৬ খ্রীঃ কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুরের শেষ পীড়ার সময় কালী তাঁহাকে আপ্রাণ সেবা করেন। ঠাকুর তথায় তাঁহার যে একাদশ শিষ্যকে সন্ন্যাসের প্রতীক গৈরিক বসন দান করেন স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ঠাকুরের প্রতি কালীর অকপট সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'কালী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুরক্ত সেবক।' কাশীপুর উদ্যানে বিশ্রামকালে কালী বিখ্যাত পুস্তকাদি মনোযোগের সহিত অধ্যয়নান্তে গুরু-ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানতৃষ্ণা দেখিয়া ঠাকুর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমিই ঐসব যুবকদের মধ্যে সৎগ্রন্থ পাঠ প্রবর্তন করেছ। আর একদিন ঠাকুর আশীর্বাদপূর্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'ছেলেদের মধ্যে তুমি খুব বুদ্ধিমান। তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ঠিক নরেনের পরেই। তাহার মত তুমিও নূতন ধর্মান্দোলন চালাইতে পারিবে।' ঠাকুরের এই ভবিষ্যৎ বাণী কালে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। ঠাকুরের তিরোধানের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বরাহনগরে প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়। কালী উক্ত মঠে যোগ দিলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তাঁহার নাম হইল অভেদানন্দ। তাঁহার নামকরণ যথার্থই হইয়াছিল। কারণ, অভেদ জ্ঞানে তিনি আজীবন সত্যই আনন্দ পাইতেন। বরাহনগর মঠে প্রত্যহ বহু ঘণ্টা তিনি অধ্যয়নে ও গভীর ধ্যানে কাটাইতেন। গুরুভাইগণ আদর করিয়া তাঁহাকে 'কালী তপস্বী' বা 'কালী বেদান্তী' বলিতেন। এমন দিনও গিয়াছে যেদিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আদৌ বিশ্রাম না লইয়াই তিনি ধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছেন। বরাহনগর মঠে তাঁহার কঠোর তপস্যা সম্বন্ধে

এক হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। মঠের বারান্দায় শায়িত অবস্থায় কালী তপস্বী একদিন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাঁহার শরীর মৃতদেহের মত অনমনীয় ও স্পন্দনহীন হইয়াছিল। সূর্য পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে অস্তগামী হইলেন। তখন প্রখর সৌরকরে বারান্দার ধূলিকণাগুলি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ছিল। কিন্তু কালীর বাহ্য সংজ্ঞা তিরোহিত হওয়ায় বহির্জগতের কোন জ্ঞান তাঁহার ছিল না। কিয়ৎকাল পরে এক গৃহী শিষ্য মঠ দর্শনে আসিয়া কালীকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কালীর দেহ স্পর্শ করিয়া তিনি দেখিলেন, বালুকণার ন্যায়ই উহা উত্তপ্ত। ইহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তপঃক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া কালী দেহত্যাগ করিয়াছেন! এইরূপ বেদনাদায়ক চিন্তায় মর্মাহত হইয়া তিনি স্বামী যোগানন্দের নিকট এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। তৎশ্রবণে স্বামী যোগানন্দ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'নারে, সে মরে নি। ও এমনি করেই ধ্যান করে।' যৌবনে স্বামী অভেদানন্দ এমনই কঠোর তপশ্চর্যা করেন। সংঘ-জননী সারদা দেবীর উদ্দেশ্যে তিনি একটি সুন্দর সংস্কৃত স্তব রচনা করিয়াছিলেন। স্তবটী এখন রামকৃষ্ণ সংঘের বহু আশ্রমে নিত্য পঠিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার খুব দখল ছিল। সারদা দেবী উক্ত স্তব শ্রবণে তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'তোমার জিহ্বায় বিদ্যাদেবী সরস্বতী অধিষ্ঠান করুন।' ইহার কিয়ৎকাল পরে বরাহনগর মঠ হইতে স্বামী অভেদানন্দ সুদীর্ঘ তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া ভারতের প্রায় সকল তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেন। পরিব্রাজক জীবনে তিনি অর্থ স্পর্শ করেন নাই, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেন। তখন নগ্নপদে বিচরণ, বৃক্ষতলে ইষ্টকোপাধানে রাত্রিযাপন ও একটী চীরবসনে দেহাচ্ছাদন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তখন তিনি এইভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন যে, 'নামরূপের জগৎ অলীক ও অনিত্য এবং বেদান্তোক্ত বিকাররহিত পরমাত্মার মত তিনি এই বিশ্বক্রীড়ার এক দ্রষ্টা মাত্র। কখনো বা তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীরে ভ্রমণ করিতেন। কখনো বা দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় আরোহণ করিতেন! একদা চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ চির-তুষারাবৃত পর্বতের এক গুহায় তিনি ধ্যানে বসিয়াছিলেন। হৃষীকেশের বিখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী এবং কৈলাস

মঠের স্বামী ধনরাজ গিরির সহিত তাঁহার হরিদ্বারে আলাপ হয়। তাঁহার নিকট স্বামী অভেদানন্দ হিন্দুর ষড় দর্শন অধ্যয়ন করেন। বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধনরাজ গিরি স্বামী অভেদানন্দের অসাধারণ মেধা দর্শনে বিমোহিত হইয়া পরে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট বলিয়াছিলেন, 'অভেদানন্দের অলোকিকী প্রজ্ঞা!' হৃষীকেশে স্বামী অভেদানন্দ চন্দন ও বিষ্ঠার অভেদ জ্ঞানের কঠিন পরীক্ষা করিয়া অনুভূতি-বলে উহাতে উত্তীর্ণ হন।

স্বীয় বাক্‌সিদ্ধির সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে রোগ আহ্বান করিতেন। রোগাহ্বানের পর শীঘ্রই তাঁহার রোগ আসিত এবং তিনি কিছুদিন শয্যাশায়ী হইতেন। কিন্তু অসুস্থাবস্থাতেও তিনি বিচার করিতেন, আমি অজর অমর আত্মা।' এইভাবে নিয়মিত ভাবে আত্ম-পীড়ন ও আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা তিনি ধর্মানুভূতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার 'আধ্যাত্মিক বিকাশ' নামক ইংরাজি গ্রন্থে এই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, 'ভাগবত চেতনা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থার কথা আমরা ভাবিতে পারি না। কারণ, এই অবস্থায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয় এবং আত্মা তখন প্রেম, জ্ঞান ও চিৎ স্বরূপের অসীম উৎসের সহিত সংযুক্ত হন।' এলাহাবাদের নিকটবর্তী যমুনাতীরে তিনি কোন সময় কিছুকাল রোজ একাসনে দশ বার ঘণ্টা ধ্যান করিতেন! তথায় তাঁহার ধ্যান এত গভীর হইত যে, তিনি নিকটবর্তী দুর্গের তোপধ্বনি শুনিতে পাইতেন না। হিন্দুস্থানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ব্যাপিয়া প্রায় দশ বৎসর ব্যাপী পরিব্রাজক জীবনে তিনি পওহারী বাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি কতিপয় অনুভূতিবান্ মহাত্মার দর্শন লাভ করেন।

১৮৯৬ খ্রীঃ স্বামী অভেদানন্দ লণ্ডন হইতে স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্র পান। উহাতে তিনি পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারার্থ যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। তিনি দলপতির অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই বৎসরেই লণ্ডন যাত্রা করেন ও প্রিয় গুরুভ্রাতার সহিত তথায় মিলিত হন। পূর্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়াই লণ্ডনে তিনি তাঁহার প্রথম ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল বেদান্তগ্রন্থ 'পঞ্চদশী'। বক্তৃতাটী বেশ সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজ শিষ্য কাপ্তেন সেভিয়ার উক্ত বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'স্বামী অভেদানন্দ আজন্ম সুবক্তা। তিনি যেখানেই যাইবেন সেখানে সফলকাম হইবেন।' স্বামী অভেদানন্দ লণ্ডনে প্রায় এক বৎসর ছিলেন এবং স্থানীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতিরূপে কৃতিত্বের সহিত কাজ করেন। লণ্ডনে অবস্থান কালে তিনি সংস্কৃতবিৎ জার্মান অধ্যাপক মোক্ষমূলারের সহিত সংযোগ রক্ষা করেন। তাঁহার বক্তৃতাসমূহে পল ডয়সন, মিঃ ষ্টার্ডি, ভগ্নী নিবেদিতা ও বহু শিক্ষিত নরনারী নিয়মিতভাবে যোগ দান করিতেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া নিরাপদে নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। তিনি মহোত্তমে তথায় বেদান্ত প্রচার করেন এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাজ্যে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ ছয় মাসের মধ্যে নিউইয়র্কস্থ মট মেমোরিয়াল হলে তিনি ক্রমান্বয়ে নব্বইটা বক্তৃতা দেন। একজন আমেরিকাবাসী তাঁহার কয়েকটী বক্তৃতায় যোগ দিয়া লিখিয়াছেন,'তাঁহার বক্তৃতা ছিল বিশদ, চিত্তগ্রাহী, ও প্রাঞ্জল। ইহা ধীর গম্ভীর ভাবে প্রদত্ত এবং বেদান্ত দর্শনের সুযুক্তিপূর্ণ সহজবোধ্য ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য চিন্তাধারানুযায়ী বেদান্ত প্রচারোদ্দেশ্যে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার বিখ্যাত বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিতভাবে প্রাণীবিদ্যা, শারীর তত্ত্ব, শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, স্নায়ুবিদ্যা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলি যথাসাধ্য আয়ত্ত করেন। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত বেদান্ত আন্দোলন মূলতঃ ভারতীয় চিন্তাধারার অনুরাগী ও সমর্থক একটা ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের অর্ধার্ধ শতক ব্যাপী প্রচেষ্টায় উহা বিস্তৃত হইয়া আমেরিকার ধর্মচিন্তায় এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিল।' আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের এক সহকারী বন্ধু প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "স্বামী অভেদানন্দ জনপ্রিয় হইলেন ও তাঁহার কাজ বাড়িয়া চলিল। তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকিতেন—বক্তৃতা দিতেন, ক্লাশ করিতেন, সাধন শিক্ষা দিতেন এবং বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিতেন। বেদান্ত সমিতি দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল, সমিতিতে শিক্ষিত সমাজ আকৃষ্ট হইলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় বক্তৃতা দানের জন্য তাঁহার আমন্ত্রণ

আসিল।” অন্যান্য সংঘ সমিতিও তাঁহাকে বক্তৃতা দানার্থ আহ্বান করিত। যাহা নিভৃতে অনাড়ম্বরে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সাধারণ আন্দোলনের আকার ধারণ করিল। হারবার্ট নিউটন লানমান, হিরাম করসন, জোসিয়া রয়েস, উইলিয়াম জেমস ও অন্যান্য বিখ্যাত আমেরিকান মনীষিগণ তাঁহার বন্ধু ও অনুগামী হইলেন। এই নূতন মহাদেশে হিন্দু দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে তিনি সংবাদপত্রসমূহ ও জনসাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হইলেন। পরমার্থ সত্তার একত্ব সম্বন্ধে মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের সহিত ১৮৯৯ খ্রীঃ তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। টরণ্টো সাটারডে নাইট নামক সংবাদপত্র সেই বৎসরেই লিখিয়াছিল, ‘সম্ভবতঃ তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিৎ অধ্যাপক জেমসও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, স্বামিজীর দৃষ্টিকোণ হইতে পারমার্থিক ঐক্য অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু তিনি ঘোষণা করিলেন, অবশ্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আমি অক্ষম।’ ‘কনটেম্পোরারী ইণ্ডিয়ান ফিলজফি’ গ্রন্থে এই বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, ‘১৮৯৮ খ্রীঃ পরমার্থ তত্ত্ব ও একত্ব বিষয়ে অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স স্বগৃহে আমার সহিত আলোচনা করেন। এই বিতর্ক প্রায় চার ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। উহাতে অধ্যাপক রয়েস, অধ্যাপক লানমান, অধ্যাপক শেলার ও কেম্ব্রিজ দর্শন সভাসমূহের সভাপতি ডাঃ লুইস্ জেমস্ একত্বের স্বপক্ষে আমাকে সমর্থন করেন।’ ঠিক সেই বৎসরেই আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিন্‌লি অভেদানন্দ স্বামিজীকে ওয়াশিংটনস্থ হোয়াইট হাউসে সাদর সম্বর্ধনা করেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় প্রচারে যান এবং স্থায়ী গৃহে নিউইয়র্কস্থ বেদান্ত সমিতিকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আনন্দিত হন। স্বামী অভেদানন্দের অপূর্ব সাফল্যে উল্লসিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, ‘নিউইয়র্কের দ্বারে আমি তিনবার আঘাত করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া পাই নাই। আমি আহ্লাদিত যে, তুমি ইহাতে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছ। নিউইয়র্কে এই প্রথম আমরা আমাদের সমিতির নিজস্ব গৃহ দেখিলাম।’ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের গুরুভার স্বামী অভেদানন্দের উপর ন্যস্ত করিয়া

তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি ভারত হইতে তাঁহাকে এক পত্রে লিখিলেন, 'তোমাকে নির্দেশ দিবার আমার কিছুই নাই। আমি পাশ্চাত্যের সমগ্র কর্মভার তোমার উপর ছাড়িয়া দিলাম।' ১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দের এক শিষ্যা সানফ্রানসিস্কো সহর হইতে অনেক দূরে এক শত ষাট একর পার্ব্বত্য জমি দান করেন। সেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক শান্তি আশ্রম স্থাপিত হয়। স্বামী অভেদানন্দের সহকর্মীরূপে উক্ত বৎসর স্বামী তুরীয়ানন্দ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি এক বৎসর নিউইয়র্কে কাজ করিবার পর কালিফোর্নিয়ায় যাইয়া ১৯০০ খ্রীঃ শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। হার্ভাড, ক্লার্ক, বার্কেলে, কলাম্বিয়া, করনেল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, বিভিন্ন সহরের ধর্ম-প্রতিষ্ঠান ও সমিতি হইতে, নানা গির্জা ও সংঘ হইতে বক্তৃতা দানের জন্য স্বামী অভেদানন্দের নিকট আহ্বান আসিল। একজন আমেরিকান লিখিয়াছেন, 'স্বামী অভেদানন্দ চলিলেন নূতন ভূমি কর্ষণ, ও নবীন বীজ রোপন করিয়া আর স্বামী তুরীয়ানন্দ নব-রোপিত চারাগাছের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন।'

দিন সান, দি নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন, দি ক্রীটীক, দি লিটারারী ডাইজেষ্ট, দি টাইমস্, দি ইন্টেলিজেন্স ও দি মাইণ্ড এবং আমেরিকার অন্যান্য বিখ্যাত পত্রিকাসমূহ স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা [illegible]ন। 'পুনর্জন্ম', 'ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্ম', 'কোনটি বৈজ্ঞানিক—পুনর্জন্ম বা পুনরুত্থান' প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতাগুলি এত চমৎকার, মনোজ্ঞ ও চিন্তাপূর্ণ হইয়াছিল যে, ভাণ্ডার-বিল্ট নামে একজন আমেরিকান ঐ তিনটি বক্তৃতা 'পুনর্জন্ম' নামক পুস্তকে প্রকাশিত করেন। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক যুক্তি স্বামী বিবেকানন্দের উচ্চ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দের অন্যান্য বক্তৃতা-সমূহ 'আত্মজ্ঞান' 'মানবের ভাগবত অধিকার' 'যোগশিক্ষা' 'কর্মযোগ' 'আধ্যাত্মিক বিকাশ' প্রভৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকের ভাবরাশি আমেরিকার জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। বেদান্তের বাণী বিস্তৃতভাবে প্রচারের জন্য নিউইয়র্ক হইতে তিনি বেদান্ত মাসিক পত্রিকা

প্রকাশ করেন। নিউইয়র্কস্থ বেদান্ত সমিতি হইতে ১৯০৩ খ্রীঃ তাঁহার ভূমিকা সম্বলিত হইয়া 'রামকৃষ্ণ কথামৃতে'র ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মোক্ষমূলারের পুস্তকের পর ইংরাজীতে ঠাকুরের বাণী সম্বন্ধে সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম পুস্তক। পাশ্চাত্যের অগণ্য নরনারী এই বিখ্যাত পুস্তক হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। অস্ট্রিয়ার শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক এই পুস্তক পাঠ করিয়া এতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুন্দর আলেখ্য অঙ্কণ এবং উহা নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দের নিকট প্রেরণ করেন। ব্রুকলিন ইনস্টিটিউট অফ আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সের ডিরেক্টার ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন ডবলিউ হুপার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক সুচিন্তিত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপল' (ভারত ও উহার অধিবাসীবৃন্দ) পুস্তকে এই বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে এরূপ সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ ও ঐতিহাসিক পুস্তক নাই বলিলেই হয়। পাশ্চাত্যে স্বামী অভেদানন্দ ভারতীয় সংস্কৃতির যে কত বড় বার্তাবহ ছিলেন তাহা এই পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়। 'ওয়াশিংটন ইভনিং ষ্টার' নামক সংবাদপত্র উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেন, "ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডারে ইহা এক অমূল্য সম্পদ। আমেরিকানগণ ভারত সম্বন্ধে যাহা জানিতে চান তাহা সংক্ষেপে এই পুস্তকে বিবৃত।" অন্য এক পত্রিকা লিখিয়াছিল, 'এই পুস্তকের প্রতিবাদ করা অসম্ভব। স্বামী অভেদানন্দ কর্তৃক অতি প্রাঞ্জল ভাবে ইহা লিখিত এবং ইহা সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত।' আমেরিকার অসংখ্য শিক্ষিত নরনারী এই পুস্তক পাঠে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে জানিতে অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠেন! ব্রিটিশ সরকার ভারতে এই পুস্তক প্রচার বন্ধ করেন এবং বহু বৎসর পরে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। স্বামী অভেদানন্দের কী গভীর স্বদেশপ্রেম তাহা এই পুস্তকপাঠে জানা যায়।

প্রায় দশ বৎসর এই প্রকার তীব্র কর্মের পর ১৯০৬ খ্রীঃ স্বামী অভেদানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং কলম্বো, মাদ্রাজ, মহীশূর, বোম্বাই, কলিকাতা,

কাশী ও অন্যান্য নগরী কর্তৃক সাদরে-সম্বর্ধিত হন। দেশবাসী তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিলেন। তৎকালে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিবার সময় তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন তখন সমগ্র বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ এই ভাবে দেশবাসীগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, 'একটি উচ্চাদর্শের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই ব্যক্তিগত মত বিসর্জন দিতে হইবে। অন্যথায় আমরা অধিকতর শক্তিশালী সংঘবদ্ধ শক্তি দ্বারা বিনষ্ট হইব। সেই শক্তি সুদূর সাগরপার হইতে আমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হইতে পারি পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে।' আমাদের জাতীয় দুর্বলতার নিন্দা করিয়া এবং স্বাধীনতার জন্য ঐক্যের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'চার কোটী ইংরাজের এক মত, চার কোটী ত্রিশ লক্ষ জার্মাণের এক উদ্দেশ্য, সাড়ে সাত কোটী আমেরিকানের এক মন। কিন্তু আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে, ত্রিশ কোটী ভারতীয়ের ত্রিশ কোটী মত ও ত্রিশ কোটী লক্ষ্য! জাতীয় উন্নতির জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় নির্বিচারে নেতার আজ্ঞাবহতা, নিয়মানুবর্তিতা ও উদ্দেশ্যের একতানতা।' সমগ্র ভারতে সাত মাস ধরিয়া স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার এবং জাতীয় স্বাধীনতার পথে বাধাস্বরূপ অন্যান্য দোষগুলি দূর করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট প্রাণস্পর্শী আবেদন করিয়াছিলেন।

লণ্ডনে এক পক্ষ কাল অবস্থানান্তে স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া স্বামী অভেদানন্দ ভারত হইতে নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আটলান্টিকের উভয় পার্শ্বে তিনি তখন নবীন উৎসাহে তাঁহার বেদান্ত প্রচার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিলেন। তিনি কানাডা, আমেরিকার প্রায় সকল রাজ্য, আলাস্কা, মেক্সিকো এবং অক্সফোর্ড, প্যারিস, জেনেভা, বার্লিন, কীল, প্রেগ, ও ইউরোপের অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ধর্মবোধে ইউরোপ ও আমেরিকার সহস্র সহস্র নরনারী বেদান্তের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় বোষ্টনস্থ উইমেন্স কলেজের নারী অধ্যক্ষ সংসার ত্যাগ করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ও গ্রামোফোনের আবিষ্কর্তা এডিসনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। এই পরিচয় শীঘ্রই গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাঁহার গবেষণাগারে একদিন প্রবেশ করিয়া উক্ত বৈজ্ঞানিক-যোগীকে হিন্দু ঋষির মত গভীর ধ্যানমগ্ন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দকে এডিসন একটি সুন্দর গ্রামোফোন উপহার দেন। উহা অদ্যাপিও দার্জিলিং রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে রক্ষিত আছে। ভূ-পর্যটক ও আবিষ্কর্তা নানসেন, মনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ এমার গেটস্, মনীষী র‍্যালফ ওয়াল্‌ডো ট্রাইন, ঔপন্যাসিক ডীন হাওয়েল, বিখ্যাত বিশপ রেভারেণ্ড পটার এবং আমেরিকার বিখ্যাত বুধ-মণ্ডলী তাঁহার অনুরাগী ও গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন। বার্কশায়ারে এক শিষ্য কর্তৃক প্রদত্ত বার শত একর বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর স্বামী অভেদানন্দ এক সুবৃহৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় মার্কিন ছাত্রগণকে যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। এইরূপে বেদান্তকেশরী অভেদানন্দ ১৮৯৬ খ্রীঃ হইতে ১৯২১ খ্রীঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় অবস্থানপূর্বক বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। নরকযন্ত্রণা, পরলোকে অনন্ত নরকভোগ, ও গীর্জা-প্রচারিত অন্যান্য ভীতিপ্রদ মতবাদ দ্বারা প্রপীড়িত পাশ্চাত্য জনসাধারণ তাঁহার নিকট বেদান্তের উদার ভাব পাইয়া বহুল পরিমাণে কুসংস্কার-মুক্ত হইয়াছিলেন। একদা ভবিষ্যদ্বাণী কালে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছিলেন, 'যেখানে বিজ্ঞানের জয় সেখানে বেদান্তের ও জয়।' আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় তিনি বেদান্ত-ব্যাখ্যা করিতেন। বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেদান্ত প্রচারকগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য। গীর্জার সংকীর্ণ মতবাদের সমালোচনা করিয়া বেদান্তানুযায়ী খ্রিষ্টবাণী ব্যাখা করিবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করা হইত এবং উহা আমেরিকার যুক্তিবাদী জনসাধারণের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ধর্মজীবনের নৈতিক ভিত্তির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার 'আধ্যাত্মিক বিকাশ' নামক ইংরাজি পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি বা না করি, কোন অবতারে আমাদের বিশ্বাস থাকুক

বা নাই থাকুক, আমাদের যদি আত্মসংযম, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম থাকে তবেই আমরা ধর্মলাভের পথে অগ্রসর হইতেছি বুঝিতে হইবে। অপর দিকে যদি কেহ ভগবান্ বা কোন মতবাদে বিশ্বাস করেন, অথচ তাঁহার যদি উপরোক্ত চারিটি গুণ না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ সংসারী লোক অপেক্ষা তিনি কোন অংশে ধার্মিক নহেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিশ্বাস মৌখিক মাত্র।"

ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ক তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আটলাণ্টা মনোবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি লিখিয়াছিলেন, 'দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিষয়টি যথাযোগ্য ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইরূপ আলোচনায় মন ও প্রাণ তৃপ্ত হয়। ইহার দ্বারা প্রমাণিক হয় যে, সকল বিজ্ঞানই ভগবানের পথে লইয়া যায়।' একটী ইংরাজি পুস্তিকায় স্বামী অভেদানন্দ গ্রীষ্টীয়ান জেনিন কেলি নামক এক বিখ্যাত গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন, 'সাহসী খৃষ্টান সৈন্যের মত এগিয়ে চল, ক্রশ হস্তে ধারণ কর এবং লক্ষ্যে না পৌছান পর্যন্ত থামিও না।' স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তের আলোকে গ্রীষ্টধর্মের উদার ব্যাখ্যা করিয়া বহু আমেরিকান ও ইউরোপীয়ানকে উন্নততর গ্রীষ্টানে পরিণত করিয়াছেন। গ্রীষ্টান জেনিন কেলির নিম্নে উল্লিখিত উক্তিতে সহস্র সহস্র পাশ্চাত্যবাসীর মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, গ্রীষ্টের কর্মের সুবিশাল গভীরতা এবং তাঁহার বাক্যের পূর্ণতর ভাব-গাম্ভীর্য্য স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত-ব্যাখ্যা দ্বারা আমার নিকট প্রকটিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ ও রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিউ থট, গ্রীষ্টীয়ান সায়েন্স, স্পিরিচুয়ালিজম ও আমেরিকার অন্যান্য নবীন ভাবধারাসমূহ প্রভাবিত হইয়াছে। গীর্জা-প্রচারিত গ্রীষ্টবাণী অপেক্ষা বেদান্ত-ব্যাখ্যাত গ্রীষ্টতত্ত্ব তাহাদের অধিকতর মর্মস্পর্শী হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ স্বামী বিবেকানন্দের যে জীবনী লিখিয়াছেন, ইহাতে যথার্থই উল্লিখিত হইয়াছে, '১৮৯৭ গ্রীঃ ৬ই আগষ্ট স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে বেদান্ত দর্শনের প্রতি সকলেরই আগ্রহ বর্ধিত হইল। তাঁহার শিক্ষার প্রতি সকলে শ্রদ্ধান্বিত হন।

বেদান্তের কোন কোন বিশেষ মতবাদের সহিত টিণ্ডাল, কাণ্ট, স্পেন্সার বা হাক্সলির মতের সাদৃশ্য না দেখিলে যাঁহারা বেদান্তে বিশ্বাসী হইতেন না তাঁহারাও দলভুক্ত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিন ভূমিতে যে বীজসমূহ বপন করিয়াছিলেন সতেজে জাতির হৃদয়ে সেইগুলি অবিলম্বে দৃঢ়মূল প্রোথিত করিল।' মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'দি মিশন অব আওয়ার মাষ্টার' নামক ইংরাজি পুস্তকে (৪৫৮—৪৩০ পৃষ্ঠায়) এইভাবে মন্তব্য করা হইয়াছে।—"স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় শুধু যে সুযোগ্য ও সমর্থ বেদান্তশিক্ষকের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু বেদান্ত সমিতির ছোট বড় সব প্রয়োজনের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি, স্বীয় অসাধারণ সংগঠনশক্তি, প্রগাঢ় বিচার ও বিবেচনা শক্তি এবং পাশ্চাত্য কর্ম ও শিক্ষার পদ্ধতি অবলম্বনে প্রচার দ্বারা তিনি কর্ম সাফল্যের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও বিশ্বস্ততার জন্য বেদান্তবাণী বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রচারিত এবং বহু মার্কিন নরনারীর জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার সুনিপুণ পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে বেদান্ত সমিতির কার্য্য এমনভাবে সংঘবদ্ধ হইল যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং এমন কি, খৃষ্টান গির্জার পাদ্রীগণও, ইহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য আমেরিকান তাঁহাকে ধর্মগুরু এবং স্নেহশীল আচার্য্যরূপে শ্রদ্ধা করিতেন। আমেরিকা ত্যাগের পূর্বে তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাগণ বিদায় অভিনন্দনে বলিয়াছিলেন, "বেদান্ত আশ্রমের অধিবাসী আমরা আন্তরিক দুঃখ ও অনিচ্ছার সহিত আপনাকে বিদায় অভিনন্দন দিতেছি এবং হৃদয়ের গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তথাপি আপনার মত একজনও নাই যাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার এত বিশাল এবং যিনি নিষ্ঠাবান্ সত্যান্বেষীর হৃদয়ে জ্ঞানপ্রদীপ দ্রুত জ্বালিতে সমর্থ। সুতরাং আপনার অনুপস্থিতিতে বিপদসঙ্কুল মহাসাগরে কর্ণধারহীন জলযানে বিহারের ন্যায় আমরা জীবনপথে বিচরণ করিব। আমাদের ভাবিতেও কষ্ট হইতেছে যে, আপনি এত শীঘ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।"

১৯২১ খৃঃ স্বামী অভেদানন্দ সানফ্রান্সিস্কো হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা

করেন। পথে তিনি নিখিল প্রশান্ত শিক্ষা মহাসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। জাপান, চীন, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, কোয়ালালামপুর ও রেঙ্গুন ভ্রমণান্তে উক্ত বৎসরের শেষে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হন। আমেরিকায় অবস্থানকালে রুশদেশীয় ভূপর্যটক ডাঃ নটোভিক প্রণীত 'খ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবন' পুস্তকখানি তিনি সাগ্রহে পড়িয়াছিলেন। তিনি সেই পুস্তকে ইহা জানিয়া চমৎকৃত হন যে, নটোভিক তিব্বতে গিয়াছিলেন। নটোভিক তিব্বতের হেমিস মঠের লামাদের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, 'জিশুখৃষ্ট ভারতে আসিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ তাঁহাকে একটী হস্তলিখিত পুঁথি দেখান যাহাতে খ্রীষ্টের ভারতভ্রমণের বিবরণ আছে। রুশদেশীয় পর্য্যটক উক্ত বিবরণের ইংরাজি অনুবাদ লইয়া স্বীয় পুস্তকে প্রকাশ করেন। স্বামী অভেদানন্দের বয়স তখন ৫৬।৫৭ বৎসর হইলেও এই প্রবাদের ঐতিহাসিকতা নিশ্চয় করিবার জন্য তিনি তিব্বত যাইতে সংকল্প করেন। ভ্রমণেচ্ছা ও জ্ঞান-তৃষ্ণা তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সেও আকুল করিল। তিনি কাশ্মীর-ভ্রমণান্তে তিব্বতে যাইয়া হেমিস মঠ দর্শন করেন। তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত একটি বৃহৎ বাংলা গ্রন্থে প্রকাশিত। তিব্বত হইতে ভারতে ফিরিয়া তিনি লাহোরে ফোরমান খ্রীষ্টিয়ান কলেজে অধ্যক্ষ লিউকাসের সভাপতিত্বে কর্মযোগ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া মন্তব্য করেন, "আমি একজন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক। ধর্মবিষয়ে আমি সমগ্র জীবন আলোচনা করিতেছি। কিন্তু এই বিদ্বান্ সন্ন্যাসী আজ এখানে যে বক্তৃতা দিলেন, সেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা আমি জীবনে কখনো শুনি নাই। ভারতের প্রায় সমস্ত বাগ্মীর বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া আমার স্পষ্ট ধারণা হইল যে, তাঁহার মত সুবক্তা ভারতে এখন আর নাই। যখন আমি নিউইয়র্কে ছিলাম ইহার নাম শুনিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ হয় নাই। তাঁহার সারগর্ভ ভাষণ শুনিয়া আমি আজ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম।"

স্বামী অভেদানন্দ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বেলুড় মঠে ফিরিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করেন। অনন্তর তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

তিনি কলিকাতায় এবং দার্জিলিঙ্গে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলিকাতায় এবং বাংলার অন্যান্য সহরে অসংখ্য ধর্মব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালেই তৎপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমদ্বয়ের স্থায়ী ভূমি ও গৃহ হয়। কলিকাতায় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার জগদীশ বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং বাংলার অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ১৯৩৭ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতায় একটি ধর্মমহাসভা আহূত হয়। উক্ত মহাসভার দুইটি অধিবেশনে স্বামী অভেদানন্দ পৌরহিত্য করেন এবং তৎপ্রদত্ত অভিভাষণের উপসংহারে বলেন, 'আমি আশা করি, এই ধর্মমহাসভার ফলে সকল সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান এবং ধর্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে।'

স্বামী অভেদানন্দ ১৯৩৯ খৃঃ ৮ই সেপ্টেম্বর তৎপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার ভৌতিক দেহ কাশীপুর শ্মশানে ভস্মীভূত হয়। উক্ত স্থানে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। এই শ্মশানে শ্রীরামকৃষ্ণ, গৌরীমা এবং মাষ্টার মহাশয়ের দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। কলিকাতা আলবার্ট হলে স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতিসভায় ব্যারিষ্টার বি. সি. চট্টোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছিলেন, 'কলম্বাস আমেরিকার দেহ আবিষ্কার করেন, কিন্তু ভারতের দুই অমর সন্তান বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ আমেরিকার আত্মা আবিষ্কার করেন।' স্বামী অভেদানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের প্রশংসা দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি করিয়াছেন। সার. এস. রাধাকৃষ্ণান ১৯৪১ খৃঃ ২০শে জুন মাদ্রাজ হইতে লিখিয়াছিলেন, 'স্বামী অভেদানন্দকে দুই একবার দর্শন করিবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং ধর্মতত্ত্ব তিনি যেভাবে পাশ্চাত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রচার করেছেন,উহার উচ্চ প্রশংসা আমি সর্বত্র শুনেছি। ভারতে আমরা অনেকে তাঁর রচনা পাঠে উপকৃত।'

সার সি. ভি. রমণ ১৯৪১ খ্রীঃ ৫ই আগষ্ট বাঙ্গালোর হইতে লিখিয়াছিলেন,

'আমি ১৯৩২ খ্রীঃ দার্জিলিঙ্গ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে স্বামী অভেদানন্দজীকে
দর্শন করেছিলাম। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও পাণ্ডিত্যে আমি বিমুগ্ধ। তিনি বিদেশে
আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির যে ভাবে প্রচার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয়।'
স্বামী অভেদানন্দ বাংলা ও ইংরাজীতে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে কতগুলি
দেশবিদেশে পাঠকপ্রিয় হইয়াছে। সার এস. রাধাকৃষ্ণান এবং মিঃ জে. এইচ.
মুইরহেড কর্তৃক সম্পাদিত 'আধুনিক ভারতীয় দর্শন' নামক সুবৃহৎ ইংরাজী
গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের 'ভারতীয় হিন্দু দর্শন' শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে।
উক্ত অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন, 'অদ্বৈত বেদান্ত পৃথিবীর সমস্ত
দর্শনের শীর্ষস্থানীয়। খুব কম দার্শনিক এই বেদান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।
অথচ, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের সকল জটিল সমস্যার সমাধান উহাতে নিহিত।'
'বিংশ শতাব্দীর ধর্ম' নামক বক্তৃতায় স্বামী অভেদানন্দ দেখাইয়াছেন, 'বর্তমান
জগৎ চায় একটী বৈজ্ঞানিক ধর্ম এবং অন্ধ বিশ্বাসের উপর যুক্তির আধিপত্য।
অদ্বৈত বেদান্তে আধুনিক যুক্তিবাদী মানব মনের জ্ঞান-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয়।'

স্বামী অভেদানন্দের একটি বক্তৃতার নাম 'কেন হিন্দু যিশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ এবং
গীর্জার ধর্মকে বর্জন করে।' তিনি উক্ত বক্তৃতায় বলেন, 'খ্রীষ্টবাণী হইতে গীর্জার
ধর্ম স্বতন্ত্র। খৃষ্ট এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণ যে ধর্ম প্রচার করেন, উহার
সহিত ভারতীয় ধর্মের নিকট সাদৃশ্য আছে।' 'বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও উদ্দেশ্য'
শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'যখন আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় তখন
মানবাত্মা উহার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। পার্থিব জীবনে প্রতি মুহূর্তে
ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দিব্য ভাব বিকাশ করেন। তখনই ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ
হয়। আমরা সকলে নিশ্চয়ই সে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করিয়া ধন্য হইব।'
বেদান্তকেশরী ব্রহ্মবিদ্ অভেদানন্দ স্বীয় উপলব্ধি হইতেই নিশ্চয় এই শাশ্বত সত্য
অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ত্রিশ

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার *

"দ্বিজন্মায় নমস্তভ্যং দেবেন্দ্রায় দিবৌকসে।
পূর্ণচন্দ্রসমোল্লাসঃ প্রফুল্লকমলোপমঃ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্যগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কলিকাতার এণ্টালি পল্লীস্থ রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তৎরচিত 'গুর্বাষ্টক' এবং 'রামকৃষ্ণাষ্টক' সমগ্র বঙ্গে প্রচারিত। গুর্বাষ্টকের প্রথমাংশটী এই।—

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে।
রবিনন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে॥
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

রামকৃষ্ণাষ্টকের শেষাংশটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

জয় পুরুষোত্তম অনুপম সংযম
জয় জয় অন্তরযামী।
খরতর-সাধন নরদুঃখ-বারণ
জয় রামকৃষ্ণ নমামি॥

দেবেন্দ্রনাথ আরও অনেক সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সেইগুলি 'দেব-গীতি' পুস্তকে প্রকাশিত।

১৯১১ খ্রীঃ নভেম্বর-সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এই সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়।—"বিগত ১৪ই অক্টোবর রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের অধ্যক্ষ পরম

* ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার প্রণীত 'মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ' পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দেহত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত অর্চনালয় তৎকর্তৃক
১৯০০ খৃঃ কলিকাতার এণ্টালী পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি
গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি, দুঃস্থ ও দরিদ্রের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও চিত্তের
প্রসারতা, সুমিষ্ট স্বভাব ও শিশুসুলভ সারল্য, নিরভিমানিতা ও নিঃস্বার্থপরতার
গুণে দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ সংঘের সম্মান ও সম্প্রীতির অধিকারী হইয়াছিলেন।
সেইজন্য তৎপ্রতি একদল তরুণ ভক্ত আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হন। তাঁহাদের
জীবনাদর্শ ছিল ভক্তিসাধন ও জনসেবা।....আমাদের পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই
মনে আছে, কিরূপে অর্চনালয়ের একনিষ্ঠ ভক্তসেবক নফরচন্দ্র কুণ্ডু ১৯০৭ খৃঃ
১২ই মে কলিকাতার এক নর্দমা-গর্তে পতিত ও মূর্চ্ছিত মুসলমান কুলীদ্বয়কে
রক্ষা করিবার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। নফরচন্দ্রের
আত্মোৎসর্গের স্মৃতি রক্ষার্থ ঘটনাস্থলে জনসাধারণের অর্থসাহায্যে নির্মিত
স্মৃতিস্তম্ভের পৌরহিত্য করেন বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর।”

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াইল মহকুমার অধীন জগন্নাথপুর গ্রামে
ব্রাহ্মণকুলে ১২৫০ সালে ২৪শে পৌষ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা প্রসন্ননাথ দেবেন্দ্রনাথের জন্মের দুইমাস পূর্বে
স্বর্গারোহণ করেন। মাতা বামাসুন্দরী বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

জগন্নাথপুর গ্রামে বৈষ্ণবাচার্য্য রূপসনাতনের বসতবাটী এবং রাজা বল্লাল সেন
ও তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন প্রতিষ্ঠিত দেবালয় আছে। দেবেন্দ্রনাথের গৃহদেবতা
গোবিন্দজী বিশেষ জাগ্রত ছিলেন। তিনি বংশধরগণকে অনেক সময়
অলৌকিক দর্শনাদি দিয়া কৃতার্থ করিতেন। শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ গোবিন্দজীর
সহিত খেলা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি সুকুমার ও গৌরবর্ণ ছিলেন।
তাঁহার হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর ছিল। এক চতুর বালকের পরামর্শে তিনি
একদিন মাঠে দৌড়াইয়া আকাশ ধরিতে চেষ্টা করেন। অবশেষে আকাশের
সীমা না পাইয়া বিষন্ন চিত্তে নিবৃত্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
সুকবি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী কলিকাতা বসুমতী সাহিত্য-মন্দির
কর্তৃক প্রকাশিত। তাঁহার সহিত নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল।

রামকৃষ্ণভক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অধর সেন ছাত্রজীবনে সুরেন্দ্রনাথের নিকট ইতিহাস পড়িতেন।

দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। সেতারবাদ্যে তাঁহার হাত খুব মিষ্ট ছিল। শৈশবাবধি কোন অন্যায় কার্য্য করিলেই তাঁহার মানসিক কষ্ট হইত। একদিন এক প্রতিবেশী মুদী দেবেন্দ্রনাথকে বিশ্বাসী জানিয়া তাঁহাকে দোকানে রাখিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্যত্র যায়। মুদির ফিরিতে বিলম্ব হয়। ক্ষুধার্ত বালক দোকানের পাত্র হইতে এক মুষ্টি মুড়কি লইয়া খাইয়াছিলেন! মুদির বিনানুমতিতে এই কার্য্য করায় তিনি একেবারে নিস্তব্ধ ও বিবর্ণ হইয়া যান। মুদি ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিয়া বালককে সহাস্যে সান্ত্বনা দেয়। সুরেন্দ্রনাথ যোগসাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিকট দেবেন্দ্রনাথ যোগশিক্ষা এবং চৌষট্টি প্রকার আসন আয়ত্ত করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে তাঁহার পাঠ অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। ১২৭৭ সালে সাতাইশ বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নবম বর্ষীয়া কন্যা মেঘাম্বরী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার উপর সংসারের গুরুভার পড়ে। তিনি তখন জোড়াসাঁকোনিবাসী ঠাকুরদিগের জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী গ্রহণ করেন। জমীদারীর কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের পিতা এটর্ণী বিশ্বনাথ দত্ত এবং পিতৃব্য হাইকোর্টের উকীল তারকনাথ দত্ত প্রভৃতির বাড়ীতে যাইতে হইত রামচন্দ্র দত্ত ছাত্ররূপে তখন সেই বাড়ীতে থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথ, ও রামচন্দ্র প্রভৃতির সহিত দেবেন্দ্রনাথ তখন হইতেই পরিচিত হন। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে নস্য চাহিয়া লইয়া আমোদ করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ প্রায় এগার বৎসর যোগাভ্যাস করেন। তখন তাঁহার অনেক দেবদেবীর দর্শনলাভ হয়। কখনো বা তাঁহার অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শন, কখনো বা অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি শ্রবণ হইত। কখনো তাঁহার দেহ এত লঘু মনে হইত, যেন তিনি আকাশমার্গে বিচরণ করিতেছেন। একদিন দেখিলেন, ভ্রূমধ্য হইতে একটী জ্যোতিবিন্দু নির্গত এবং ক্রমে বর্ধিত হইয়া কক্ষে পূর্ণচন্দ্রের

আকার ধারণ করিল। এই সকল অনুভূতি সত্ত্বেও তিনি প্রাণে শান্তি পাইলেন
না। তিনি স্বমাতুল হরিশচন্দ্র মুস্তফীর সহিত ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন।
কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপাসনা তাঁহার খুব ভাল লাগিত। কিন্তু তাহাতেও
প্রাণ তৃপ্ত হইল না। তিনি গুরুকরণের জন্য যারপরনাই অস্থির হইলেন এবং
আগ্রহের আতিশয্যে তিন দিন ও তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইলেন।
পাথুরিয়াঘাটার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তক
'ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা'তে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম দৈবাৎ পড়িলেন। নাম
পড়িয়াই তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। তিনি পূর্বাহ্নে
আহিরীটোলা হইতে নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। কালীবাড়ীর ঘাটে
আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তখন যেন কাহার প্রতীক্ষায় গঙ্গাতীরস্থ ফুলবনে
দণ্ডায়মান! নিরঞ্জন মহারাজ তখন গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ
তখন কাহাকেও চিনিতেন না।

ঠাকুরের ঘরে যাইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্বক পদধূলি
গ্রহণান্তে মেঁজেতে মাদুরের উপর বসিলেন। ঠাকুর তখন লাল পাড় কাপড়
পরিহিত এবং তাঁহার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটী গলদেশে সংলগ্ন। ঠাকুর দেবেন্দ্রকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে? দেবেন্দ্র—কলিকাতা থেকে।
তখন ঠাকুর হাতের পর হাত রাখিয়া ত্রিভঙ্গিমঠাম বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্তির
অনুকরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, কি এমনি এমনি দেখতে? দেবেন্দ্র—আজ্ঞে
না। আপনাকে দেখতে এসেছি। ইহা শুনিয়া ঠাকুর ঈষৎ ক্রন্দনের স্বরে
বলিলেন, "আর আমায় কি দেখবে বল? পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে
গেছে। হাত দিয়ে দেখনা এই জায়গাটা, হাড় ভেঙ্গে গেছে কি না? বড়
যন্ত্রণা! কি করি?" দেবেন্দ্র অগত্যা ঠাকুরের ভাঙ্গা হাতটী একটু টিপিয়া
দেখিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করে ভেঙ্গেছে? ঠাকুর কাঁদ কাঁদ
হইয়া বলিলেন, "ও একটা অবস্থা হয় তাইতে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে।
ওষুধ দিলে আবার বাড়ে। অধর সেন ওষুধ দিয়েছিল, তাতে আবার ফুলে
গেল। তাই আর কিছু দিই নি। হাঁ গা সারবে ত?" দেবেন্দ্র বলিলেন,

'আজ্ঞে সেরে যাবে বৈ কি? ইহা শুনিয়া ঠাকুর বালকবৎ আহ্লাদে আটখানা হইয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওগো ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। ইনি কলিকাতা হ'তে এসেছেন!'

শ্রীরামকৃষ্ণের বালকভাব দেখিয়া দেবেন্দ্র মুগ্ধ হইলেন। বেলা প্রায় দশটার সময় ঠাকুরের নির্দেশে হরিশ দেবেন্দ্রের জন্য জলখাবার আনিলেন। অনন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ, প্রেম কাকে বলে জান? যখন ভগবানের নামে সমস্ত জগৎ ভুল হয়ে যাবে, নিজেকে ভুল হয়ে যাবে—ঝড় উঠলে যেমন গাছপালা সব চেনা যায় না, সব এক রকম দেখায় তেমনি ভগবৎপ্রেমের উদয় হলে সব ভেদবুদ্ধি চলে যায়।" মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এইরূপ অমৃত প্রসঙ্গ চলিল। তখন ঠাকুর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে বলিলেন দেবেন্দ্রের জন্য বিষ্ণুঘর হইতে প্রসাদ আনিয়া দিতে। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দেবেন্দ্র দেবালয়াদি দর্শন করিলেন। তখন তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হইল, পূর্বে তাঁহার এইরূপ জ্বর হইত। ঠাকুর দেবেন্দ্রকে বাবুরামের সঙ্গে নৌকায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্র একচল্লিশ দিন এই জ্বরে ভুগিলেন। জ্বরের মধ্যে অজ্ঞানাবস্থায় তিনি অনুচ্চ স্বরে প্রলাপের মধ্যেও ঠাকুরের নাম করিতেন। যখনই রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ঊর্ধদিকে তাকাইতেন তখনই যেন শিয়রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে পাইতেন। দেবেন্দ্র ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন ১২৯১ সালে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

জ্বর সারিবার পর দেবেন্দ্র একমনে গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলেন। জপের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতে লাগিল। শেষে জপ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত। পূর্বোক্ত নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় পড়িলেন, অদ্য বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে ভক্তসহ মিলিত হইবেন। তিনি যথাসময়ে বলরাম মন্দিরে যাইয়া ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিলেন। ঠাকুর তখন সস্নেহে তাঁহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, 'কি গো কেমন আছ? এতদিন ওখানকে যাওনি কেন? আমি যে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি।

ঠাকুর সেদিন কীর্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতে লাগিলেন। একদিন তিনি ঠাকুরের নিকট মন্ত্র লইবার উদ্দেশ্যে ফুল-মালাদি লইয়া কালীবাড়ীতে গেলেন। ফুল ও মালা দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে বলিলেন, 'বেশ ফুল, বেশ মালা তো! যাও দেবতাদের দিয়ে এস।' ইহা শুনিয়া দেবেন্দ্র ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিলেন, 'এই মালা আপনার জন্য এনেছি।' ঠাকুর তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, 'ফুলে দেবতাদের ও বাবুদের অধিকার।' দেবেন্দ্রকে ব্যথিত দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন, 'আচ্ছা আমি একটি নিচ্ছি, বাকীগুলি মায়ের ঘরে দিয়ে এস।'

দেবেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণপূর্বক তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্র পরে বলিতেন, 'আমি তখন ঠাকুরকে সর্বত্র দর্শন করিতাম। রাস্তায় চলিতেছি, দেখি, ঠাকুর আমার দিকে তাকাইয়া আগে আগে চলিতেছেন। আমি দাঁড়াইলে তিনি দাঁড়াইতেন। আমি বিশ্রাম করিতে বসিলে তিনিও বসিতেন। সর্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরিতেন।' ঠাকুর কেন ফুলের মালা লইতেন না, সেই সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, 'আমরা দেখিয়াছি, কেহ তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ক্ষণেকের জন্য তিরোহিত হইত পরে তিনি ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সহজ অবস্থায় নামিয়া আসিতেন।' একবার দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে গুরু-সেবা করিবার ইচ্ছা হয়। তিনি গুরুভাইদের নিকট এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। একদিন রামকৃষ্ণদেব শৌচে যাইতেছেন, অমনি গাড়ুটি লইয়া দেবেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। পঞ্চবটীর কাছে যাইয়া ঠাকুর পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, দেবেন্দ্র গাড়ু ও গামছা লইয়া আসিতেছেন। দেখিবামাত্র তিনি যেন কত অপ্রতিভ হইয়া জিভ্ কাটিয়া কহিলেন, 'অ্যাঁ, তুমি কেন নিয়ে আসছ? তোমার সঙ্গে যে আমার ও ভাব নয়। তোমার সঙ্গে যে আমার ও ভাব নয় গো!'

ঠাকুরের কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র চিন্তাকুল হইলেন। তিনি পঞ্চবটীমূলে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল।*

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেবেন্দ্র দেখিলেন, ঠাকুর প্রসন্ন বদনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। পরে ঠাকুর মধুর বাক্যে বলিলেন, 'দেখ তোমায় কিছু করতে হবেক্‌নি। তুমি সকাল বেলা আর সন্ধ্যাবেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম কর, তা হলেই হবেক্। হরিনাম চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন, ইহা বড় সিদ্ধ নাম। আর এখানকে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবেক্।' দেবেন্দ্র বলিতেন, ঠাকুরের কৃপায় সেদিন তাঁহার দিব্য দর্শন হয়। তদবধি তিনি সকাল-সন্ধ্যা হাততালি দিয়া হরিনাম করিতেন। যখনই তিনি হরিনাম করিতেন, তখনই ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার যে আনন্দলাভ হইয়াছিল, তদ্রূপ আনন্দে তাঁহার মন-প্রাণ পরিপূর্ণ হইত। ঠাকুর আর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি অনেক করেছ বটে, কিন্তু খাপে খাপে লাগেনি। কি জান, যে ঘরের যে।' গুরুর নির্দেশে শিষ্য এখন হইতে নির্জন গৃহে থাকিয়া একাহারী হইয়া দিবারাত্র হরিনাম জপ করিতেন। নাম-জপে তাঁহার মন এত মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলেও মুখ হইতে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি উচ্চারিত হইত। জপের ফলে তখন তাঁহার অনেক আশ্চর্য্য দর্শনাদি হইয়াছিল।

একদিন ধ্যানকালে তিনি দেখিলেন, কতগুলি স্ত্রীলোক সাদা কাপড় পরিয়া তিলক কাটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এই অদ্ভুত দর্শনের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া গুরুকে শিষ্য ইহা জানাইলেন। গুরু বলিলেন, 'উহারা অবিদ্যার সহচরী, তোমাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। এখন হইতে তোমার অবিদ্যা ধ্বংস হইল।'

আর একদিন দেবেন্দ্রনাথ ধ্যানে দর্শন করিলেন, তাঁহার দেহ পতিত রহিয়াছে এবং তিনি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পা হইতে মাথার চুল পর্যন্ত দেখিতেছেন। সেই সময় একদিন ঠাকুর দেবেন্দ্র সম্বন্ধে জগৎমাতাকে বলিয়া-

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩৩ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত এবং প্রিয়নাথ সিংহ লিখিত প্রবন্ধে ঘটনাটি উল্লিখিত।

ছিলেন, 'মা ওকে এত দিস্ না। আহা, ও ছাঁ-পোষা লোক। ওর মুখ চেয়ে অনেকগুলি রয়েছে।' ইহার পর হইতে দেবেন্দ্র ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন। কালী মহারাজের বাটীর সন্নিকটে দেবেন্দ্র বাস করিতেন। ঠাকুর কালীকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের পাড়ায় দেবেন্দ্র থাকে, তার সঙ্গে আলাপ কোরো। সে বড় প্রেমিক ভক্ত লোক। দেবেন কেমন শ্রীকৃষ্ণের গান বেঁধেছে, শোনো।' কালী তদনুযায়ী দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎরচিত কৃষ্ণসঙ্গীত শুনিয়াছিলেন। ঠাকুর সেই গানটী নিজে গাহিতে গাহিতে ভাবস্থ হইয়াছিলেন এবং আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমাকে তাহা বলিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রই গিরীশ ঘোষকে ঠাকুরের নিকট যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি যে ঠাকুরদের বাড়ীতে কাজ করিতেন, 'রামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রণেতা অক্ষয়কুমার সেন সেখানে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং উক্ত বাড়ীর একটি ঘরে থাকিতেন। তখন হইতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্র অক্ষয়কুমারকে প্রথম ঠাকুরের নিকট লইয়া যান এবং তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ-পুঁথি' লিখিতে পরামর্শ দেন। অক্ষয়কুমার যখন যতটুকু লিখিতেন তাহা দেবেন্দ্রকে শুনাইতেন। তিনি তাঁহার এই গ্রন্থে উক্ত দুটী বিষয় কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন।

দেবেন্দ্র স্বচক্ষে অনেকবার দেখিয়াছেন, ঠাকুর টাকা স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের কাঞ্চন ত্যাগ পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন তিনি ছোট খাটের তোষকের তলায় রূপার দুআনি একটী রাখিয়া দেন। ঠাকুর কালীমন্দিরে গিয়াছিলেন। একটু পরেই ঘরে ফিরিয়া ছোট খাটটির উপর বসিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। বারত্রয় চেষ্টা করিয়াও যখন শয্যা স্পর্শ করিতে পারিলেন না, তখন নীচে মাটিতে উপবিষ্ট দেবেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হ্যাগা, এমন হচ্ছে কেন? আমি বিছানা ছুঁতে পাচ্ছি না কেন?' তখন দেবেন্দ্র লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া দুআনিটী শয্যাতল হইতে বাহির করিয়া লইলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে শয্যায় বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কি আমায় বিড়ে দেখছ না কি? তা বেশ, বেশ।' শিষ্য অধোবদনে নীরব রহিলেন। একদিন দেবেন্দ্র হুগলী আদালত হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার পথে মোকদ্দমার দলিলপত্র সহ ঠাকুরের নিকট

গমন করেন। পাছে ঠাকুর বিরক্ত হন, এইজন্য তিনি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর তখন তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া গৃহমধ্যে আনিলেন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গে প্রমত্ত হইলেন। শিষ্যের প্রতি গুরুর গভীর স্নেহ ও করুণা অসীম ছিল।

একদিন দেবেন্দ্র ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের একটি ফটো দেখিয়া তাহা লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন। ঠাকুর তাঁহাকে সেই ফটোটি না দিয়া বলিলেন, 'অবিনাশ সেদিন ফটো তুলে নিয়েছে, তার কাছে পাবেক্। তুমি ভবনাথকে বলো, সে অবিনাশকে তাগাদা দিয়ে আনিয়ে দিবেক্।' ঠাকুর গরম মিহিদানার মিঠাই খাইতে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্র একদিন ঠাকুরের জন্য মিহিদানার মিঠাই আনিয়াছিলেন। তিনি নৌকায় মিঠাইয়ের ঠোঙ্গাটি ক্রোড়ে রাখিয়া বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট একটি মুসলমান গল্প করিতে লাগিল। তাহার কথার সঙ্গে থুৎকার-বিন্দু পড়িতেছিল। ঠোঙ্গাটিতে থুৎকার-বিন্দু পড়িয়া অশুদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া দেবেন্দ্র উহা দূরের তাকের একটি কোণে রাখিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে একটু ক্ষিদে পাচ্ছে।' ইহা শুনিয়া বালক ভক্তদের কেহ উঠিয়া তাঁহার জন্য কিছু আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর খাট হইতে উঠিয়া তাক হইতে ঠোঙ্গাটি বাহির করিয়া মিঠাই খাইতে লাগিলেন এবং সমবেত ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। অহেতুকী গুরুকৃপা অনুভব করিয়া দেবেন্দ্র আনন্দাপ্লুত হইলেন।*

দেবেন্দ্র ঠাকুরকে স্বগৃহে আনিয়া একবার মহোৎসব করিয়াছিলেন। ইহার চাক্ষুষ বর্ণনা শ্রীম তাঁহার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে দিয়াছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩৪ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রিয়নাথ সিংহের প্রবন্ধে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত। সেদিন দেবেন্দ্রের গৃহে ছোট নরেন, রাম, মাষ্টার, অক্ষয়, উপেন্দ্র, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। খোল-করতাল সহযোগে সঙ্কীর্তন হইয়াছিল এবং কীর্তনানন্দে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছিলেন। দেবেন্দ্র এই ঘটনার অল্পদিন পরে স্বীয় গর্ভধারিণী ও সহধর্মিণীকে লইয়া ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলেন। একদিন তিনি স্বপ্নে

* উদ্বোধন পত্রিকার ১৩৩৩ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রিয়নাথ সিংহের প্রবন্ধে ঘটনাটি বিবৃত।

দেখিলেন, তিনি স্ত্রীলোক এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পত্নী হইয়াছেন। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত তিনি ঠাকুরের নিকট বিবৃত করেন। ঠাকুর ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'এই রকম স্বপ্ন দেখা বড় ভাগ্যের কথা।' অনন্তর একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, 'কি জান, তোমার গোপীভাব কি না। তাই ওরকমটা স্বপ্নে দেখেছ। ওরকম স্বপ্ন হলে কামটামগুলো ক্রমে মন থেকে চলে যায়।'

একদা দেবেন্দ্রের প্রবল ইচ্ছা হয় সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। তিনি ঠাকুরের চরণে পতিত হইয়া সন্ন্যাসের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গুরু শিষ্যকে ভূমি হইতে উঠাইয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন, 'তোমায় সংসার ত্যাগ করতে হবে না। আমি বলছি, ঘরে থাক।' দেবেন্দ্রের বাড়ীতে আহার করিতে যাইয়া ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, 'আর লুচি খাবো নাই।' শিষ্যের বাড়ীতে কুল্পী বরফ খাইবার পর হইতেই গুরুর গলদেশে বেদনা আরম্ভ হয় এবং তদবধি তাঁহার আর লুচি খাওয়া হয় নাই। কাশীপুর বাগানবাটীতে ১লা জানুয়ারী দিবস ঠাকুর 'কল্পতরু' হইলেন। সেদিন তথায় দেবেন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপা লাভ করেন। তিনি বলিতেন, 'সেদিন বুঝিলাম, দুরারোগ্য ব্যাধি সত্ত্বেও ঠাকুর নির্বিকার। আমার ঠাকুর চিন্ময়!' ঠাকুরের তিরোভাবের যে শেষ ফটো তোলা হয় উহাতে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেবেন্দ্রকে শোকতপ্ত চিত্তে দণ্ডায়মান দেখা যায়। গুরুর অদর্শনে শিষ্যের শোক এত দুর্বিষহ হয় যে, তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া উক্ত সংকল্প হইতে নিরস্ত করেন। দেবেন্দ্র বরাহনগর, আলমবাজার ও বেলুড় মঠে এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইয়া গুরুভ্রাতৃদের সহিত সৎসঙ্গ করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বড় ইচ্ছা ছিল দেবেন্দ্র সন্ন্যাস লইয়া মঠে থাকেন। স্বামীজী একদিন দেবেন্দ্রকে বরাহনগর মঠে জোর করিয়া গেরুয়া কাপড় ও কৌপিন পরাইয়া দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতিতে উত্তমরূপে সন্ন্যাসীর বেশে স্বহস্তে সাজাইয়া দেন। তৎপরে সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে দেবেন্দ্রের ফটো তোলা হয়। দেবেন্দ্র

বলিতেন, 'সন্ন্যাসের ঘোর প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত ছিল।' স্বামীজি একদিন সন্ধ্যার পর কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে ফিরিবার সময় সঙ্গী দেবেন্দ্রকে অনেক তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ দেবেন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারের কোষাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ও দ্রুত ছিল। তিনি কিছুদিন গিরীশ ঘোষের লেখকরূপে কার্য করেন। এই সময়ে গিরীশের কয়েকখানি নাটকের তিনি শ্রুতিলিপিকার হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ তিনি এণ্টালীর মহেন্দ্রনারায়ণ দেবের এষ্টেটে দেওয়ান নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় বাহান্ন বৎসর। ১৮৯৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সাধ্বী সহধর্মিণী বসন্তরোগে দেহত্যাগ করেন। দেবেন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১৩০৭ সালে, ১৯০০ খ্রীঃ এণ্টালীতে তৎকর্তৃক রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় স্থাপিত হয়। ১৯০১ সালে স্বামীজি উহার নাম রামকৃষ্ণ মিশন রাখিয়া যান। এই নাম ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। রামকৃষ্ণ মিশন রেজিষ্টার্ড হইবার পর উক্ত নাম পরিত্যক্ত এবং বর্তমান নাম পরিগৃহীত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে দেবেন্দ্রের পূত স্পর্শে আসিয়া বহু যুবক ধর্মজীবন লাভ করেন।

ভবানীপুর নিবাসী নফরচন্দ্র কুণ্ডু বাথগেটের দোকানে চাকরী করিতেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ অফিস হইতে অর্চ্চনালয়ে আসিতেন এবং রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন। দেবেন্দ্রনাথ নিঃস্বার্থ সেবার গূঢ়তত্ত্ব তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। একদিন উক্ত প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি তুমি কোন পুকুরে একটি ছেলে ডুবে যাচ্ছে দেখ, তাহলে কি করবে?' নফর উত্তর দিলেন, 'আমি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছেলেটীকে রক্ষার চেষ্টা করবো।' তিনি সর্বদা সাধ্যমত পরোপকারের চেষ্টা করিতেন। ১৩১৩ সালের ১৯শে বৈশাখ (১৯০৭ খ্রীঃ ১২ই মে) নফর অফিস যাইবার সময় সাউথ চক্রবেড়িয়া রোডে আসিয়া দেখিলেন, নর্দামার গর্তে দুইটি মুসলমান কুলী পড়িয়া মূর্ছিত হইয়াছে। কৌতূহলাকৃষ্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় বহু লোক চতুর্দিকে দণ্ডায়মান, কিন্তু কেহই মরণাপন্ন বালকদ্বয়কে বাঁচাইতে অগ্রসর হইতেছে না। নফর পায়ের বুটজুতার ফিতা জোরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া

অন্যের নিষেধ সত্ত্বেও গর্তের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। লাফাইবার পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি দুটি লোককে বাঁচাতে পারি আমার জীবন সার্থক হবে।' তখন 'জয় গুরু' ধ্বনি তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু গর্তের দূষিত বাষ্পে কুলী বালকদ্বয়ের ন্যায় তিনিও প্রাণত্যাগ করেন।

এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের উদাহরণ সংবাদপত্রসমূহে প্রশংসিত হইল। প্রথমে অক্সফোর্ড মিশনের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ব্রাউন সাহেব এই বিষয়ে লেখেন। নফরচন্দ্রের স্মৃতি এবং স্ত্রীপুত্রগণের সাহায্যার্থ একটি কমিটি গঠিত ও অর্থ সংগৃহীত হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন সার চার্লস এ্যালেন, এবং সভ্যগণ 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। সংগৃহীত অর্থে আত্মত্যাগের ঘটনাস্থলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত আছে—"যে নফরচন্দ্র কুণ্ডু নিকটবর্তী নর্দমাগর্তে পতিত দুইটি মুসলমান কুলীকে বাঁচাইবার সাহসিক প্রচেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করেন তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্তম্ভ নির্মিত। তিনি এণ্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের সেবক ছিলেন। তাঁহার জীবন জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে পরোপকারে অনুরক্ত ছিল। এই স্মৃতিস্তম্ভ জনসাধারণের অর্থসাহায্যে তাঁহার ইউরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধুগণ কর্তৃক নির্মিত। তিনি ১৮৮১ খ্রীঃ ২২শে মার্চ জাত এবং ১৯০৭ খ্রীঃ ১২ই মে মৃত।"*

বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর এণ্ড্রু ফ্রেজার কর্তৃক ১৯০৭ খ্রীঃ ১১ই জানুয়ারী স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচিত হয়। মহামান্য গভর্ণর এবং কমিটির সভাপতি নফরের আত্মোৎসর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এক একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় 'একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে এই আত্মত্যাগ প্রশংসিত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন ভবানীপুরে নফর কুণ্ডুর নামে একটী রাস্তার নামকরণ করিয়াছেন। এই ঘটনার পর গিরিশবাবু দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়া ছিলেন, 'দেবেনবাবু, স্বামিজী বাঁচিয়া থাকিলে আজ আপনাকে কোলে করিয়া নাচিতেন।' দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে ১২ই মে দিবস নফরচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভের

* ১৯০৮ খ্রীঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ফেব্রুয়ারী-মার্চ সংখ্যায় উহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

নিকট অর্চনালয়ের সেবকগণ কর্তৃক ঠাকুরের জন্মোৎসব ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ অর্চনালয়ে শুভাগমন করেন। দেবেন্দ্র বলিতেন, 'এবারে রামকৃষ্ণ অবতারে দুই জনের আলোকে জগৎ আলোকিত। স্বামিজীর আলোক সূর্যালোকের ন্যায় প্রখর দীপ্তিশালী, উহাতে নয়ন ঝলসিয়া যায়। আর সাধু নাগ মহাশয়ের আলোক চন্দ্রালোকের ন্যায় সুস্নিগ্ধ সুশীতল, মনপ্রাণ প্রশান্ত করিয়া দেয়।' ১৩১০ সালে, ১৯০৩ খ্রীঃ রথযাত্রার সময় সারদা দেবী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ে শুভাগমন করেন। একখানি কাগজের রথ পত্র-পুষ্পে শোভিত করিয়া উহাতে ঠাকুরকে বসাইয়া টানা হয়। দেবেন্দ্র একটি গান রচনা করিয়া বালকগণের দ্বারা গাওয়াইয়া শ্রীমাকে শোনান। উক্ত গানের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

ইমন্ খাম্বাজ—দাদরা

এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা, বাবা নিদয় গেছেন ফেলে॥

*　　*　　*　　*　　*

সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা, প্রসবে পান সমান ব্যথা।
একি মা দারুণ কথা, নাই ব্যথা কুপুত্র বলে॥
যা হবার হবে রে ভাই, মা বলে ডাকি সবাই।
দেখি মা কেমন করে, থাকতে পারে ছেলে ভুলে॥

এই গান শুনিয়া শ্রীমা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বালকগণকে কোলে টানিয়া লইয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইবার জন্য দেবেন্দ্রের হাতে দুইটি টাকা দিয়া যান।

জীবনের শেষ বৎসরে ১৯১২ খ্রীঃ দেবেন্দ্র পূর্বোক্ত গুর্বাষ্টক রচনা করেন। ইহা অল্পদিনের মধ্যেই মুখে মুখে বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হইয়া যায়। স্তবটি ভক্ত কৃষ্ণকুমারের মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত হইতে শুনিয়া স্বামী প্রেমানন্দ অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন, 'দেবেন বাবু

যে উচ্চ অবস্থায় অবস্থান করিয়া এই স্তবটী লিখিয়াছেন, তাহা অনেকেরই দুর্লভ।' স্বামী তুরীয়ানন্দ অতি গম্ভীরভাবে উক্ত স্তবের 'মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে' পদটী বার বার উচ্চারণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেন। এখন এই স্তবটি নানা বিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে প্রত্যহ পঠিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণকে দেবেন্দ্র একদিন অর্চনালয়ে আনাইয়া নানারূপ সুখাদ্য রন্ধন করাইয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান। তিনি দুই বার মীরাটে যাইয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। পুরীধাম, ঢাকা, মধুপুর ও হেতমপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি গিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালে,১৯১১ খ্রীঃ অর্চনালয়ের বার্ষিক রামকৃষ্ণোৎসবে গৌরীমাতা, স্বামী প্রেমানন্দ, গিরিশবাবু, ভাই ভূপতি, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি নামকীর্তনে নৃত্য করিতে করিতে ভাবস্থ হইয়াছিলেন।

১৩২৮ সালের মধ্যভাগে দেবেন্দ্রনাথের শরীর খুব খারাপ হইল। আশ্বিন মাসে তাঁহার জ্বর হইতে লাগিল। একদিন বৈকালে তাঁহার দেহে ভীষণ কম্প উপস্থিত হয়। পার্শ্বে উপবিষ্ট ভক্তকে তিনি কথায় কথায় বলিলেন, 'আর রক্ষা নাই, আর রাখতে পাচ্ছ না, এইবার শেষ।' অন্তিম সময়ে তিনি একবার প্রায় বাইশ ঘণ্টা ভাবাবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁহার হর্ষ, কম্প, পুলক ও রোমাঞ্চ হইতেছিল এবং তিনি শিবনেত্র ছিলেন। মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট ওঁকার-ধ্বনি এবং রামকৃষ্ণ নাম তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইতেছিল। অবশেষে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত একটু খাইলেন। স্বামী সুবোধানন্দ এবং শ্রীম প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণ এবং ভক্তমণ্ডলীর সমাগমে অর্চনালয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত এবং রামকৃষ্ণ নামে মুখরিত হইল। ১৩১৯ সালে ২৭ আশ্বিন শনিবার, ১৯১১ খ্রীঃ ১১ই সেপ্টেম্বর দেবেন্দ্র মহাসমাধিস্থ হইলেন। তখন তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত, সর্বাঙ্গ পুলকিত এবং নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁহার ভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হয়।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ঘটনাপঞ্জী

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ১২৪২ সাল ৬ই ফাল্গুন (১৮৩৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী) বুধবার ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যু ১২৯২ সাল ৩১শে শ্রাবণ (১৮৮৬ খৃঃ ১৬ আগষ্ট) রবিবার রাত্রি ১টা।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা ১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৫৬ খৃঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের গয়া দর্শন ১২৪১ সাল (১৮৩৫ খৃঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ ১৮৫৯ খৃঃ (১২৬৫ সাল)

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা ১৮৯৯ খৃঃ (১৩০৫ সাল)

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খৃঃ ১২ই জানুয়ারী সোমবার এবং মৃত্যু ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর

সংঘজননী সারদা দেবীর জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৮৫৩ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এবং ১৯২০ খৃঃ ২০শে জুলাই।

বেলুড় মঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা ১৮৩৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারী

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বরাহনগরে আদি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৮৭ খৃঃ জানুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির বিরজাহোম সমাপনান্তে সন্ন্যাসগ্রহণ।

স্বামী স্বরূপানন্দের নায়কত্বে সেভিয়ার দম্পতি কর্তৃক মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন ১৮৯৯ খৃঃ

১৯২২ খৃঃ সংঘের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগ এবং ১৮৬৩ খৃঃ মাঘী শুক্লা দ্বিতীয়াতে জন্ম।

১৮৯৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৪ খৃঃ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের দেহত্যাগ এবং জন্ম ১৮৫৪ খৃঃ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক মুর্শিদাবাদে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সেবাকার্য্য ১৮৯৭ খৃঃ

১৯৩৮ খৃঃ সংঘের তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগ এবং ১২৭১ সালে (১৮৬৪ খৃঃ) মহালয়া দিবসে জন্ম।

কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে ১২৯২ সাল ৭ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) জন্মাষ্টমী দিবসে ঠাকুরের অস্থি প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৮ খৃঃ ২৫শে এপ্রিল সংঘের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দেহত্যাগ এবং ১০৬৮ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর কার্তিক শুক্লা চতুর্দশীতে জন্ম।

১৯০৬ খৃঃ স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক সানফ্রান্সিস্কোতে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৮ খৃঃ ২৩শে অক্টোবর সংঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দের দেহত্যাগ।

১৮৯৫ খৃঃ মাদ্রাজে ইংরাজি মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৯৮ খৃঃ মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশ।

১৮৯৭ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত এবং ১৯০৯ খৃঃ রেজিষ্টার্ড হয়।

কালিফোর্ণিয়ার সান আন্তোন উপত্যকায় ১৯০০ খৃঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

স্বামী অদ্বৈতানন্দের জন্ম ১৮২৮ খৃঃ শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশীতে এবং মৃত্যু ১৯০৯ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বরে।

সানফ্রান্সিস্কো সহরে ১৯০০ খৃঃ বেদান্ত সমিতি স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় স্থাপিত।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের জন্ম ১৮৬৪ খৃঃ শ্রাবণী পূর্ণিমায় এবং মৃত্যু ১৯০৪ খৃঃ মে মাসে।

নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতি ১৮৯৪ খৃঃ স্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক

১৮৯৯ খৃঃ ঢাকাতে মঠ স্থাপন।

নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র ১৯৩৩ খৃঃ স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক স্থাপিত।

পরিশিষ্ট

স্বামী প্রেমানন্দের জন্ম ১৮৬১ খৃঃ অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমীতে এবং মৃত্যু ১৯১৮ খৃঃ ৩০শে জুলাই।

রোডস্ দ্বীপের প্রভিডেন্স নগরে ১৯২৮ খৃঃ স্বামী অখিলানন্দ কর্তৃক বেদান্ত সমিতি স্থাপিত।

১৯২৪ খৃঃ ত্রিবাঙ্কুরে এবং ১৯২৫ খৃঃ মহীশূরে এবং ১৯২৮ খৃঃ নাগপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

১৯৩০ খৃঃ চিকাগোতে বিবেকানন্দ বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ কর্তৃক।

স্বামী যোগানন্দের জন্ম ১৮৬১ খৃঃ ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্থীতে এবং মৃত্যু ১৮৯৯ খৃঃ ২৮শে মার্চ (১৩০৫ সাল ১৫ই মাঘ)।

১৯৩০ খৃঃ স্বামী প্রভবানন্দ কর্তৃক বিবেকানন্দ হোম স্থাপন হলিউডে।

১৯৩৮খৃঃ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ কর্তৃক সেণ্ট লুইস সহরে বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন।

১৯৩৯ খৃঃ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক বার্কেলে সহরে বেদান্ত সমিতি স্থাপন।

১৯৪১ খৃঃ স্বামী অখিলানন্দ কর্তৃক বোষ্টনে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন।

বয়েনস্ এয়ারস্ (আর্জেণ্টাইনা, দক্ষিণ আমেরিকা) সহরে স্বামী বিজয়ানন্দ কর্তৃক ১৯৩৩ খৃঃ রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন।

১৯৩৪ খৃঃ স্বামী অব্যক্তানন্দ কর্তৃক লণ্ডনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সমিতি স্থাপন।

১৮৩৮ খৃঃ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ কর্তৃক প্যারিসে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সমিতি স্থাপন

আমেরিকার সিয়েটল্ সহরে ১৯৩৮ খৃঃ স্বামী বিবিদিষানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন।

১৯২৫ খৃঃ পোর্টল্যাণ্ডে স্বামী দেবাত্মানন্দ কর্তৃক বৈদিক মন্দির স্থাপন।

ফিজির রাজধানী নাদি সহরে ১৯৩৭ খৃঃ স্বামী অবিনাশানন্দ কর্তৃক বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন।

মরিশাসের রাজধানী প্রোর্ট লুইস্ নগরে স্বামী ঘনানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ১৯৪১ খৃঃ।

১৯৩৬ খৃঃ বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, এবং কলিকাতায় ধর্মমহাসভা এবং Cultural Heritage of India (তিন খণ্ডে) প্রকাশ।

রেঙ্গুনে, কলম্বোতে এবং সিঙ্গাপুরে যথাক্রমে ১৯২১, ১৯৩০ এবং ১৯২৮ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা।

১৯০৩ খৃঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক বাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

স্বামী অভেদানন্দের জন্ম ১২৭৩ সালে ১৭ই আশ্বিন (১৮৬৬ খৃঃ ২রা অক্টোবর) মঙ্গলবার কৃষ্ণা নবমী এবং মৃত্যু ১৯৩৯ খৃঃ ৮ই সেপ্টেম্বর।

আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ কুটীর স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক ১৯১৮ খৃঃ স্থাপিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খৃঃ আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী এবং মৃত্যু ১৯১১ খৃঃ (১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র) সোমবার।

রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান স্থাপিত ১৮৮৩ খৃঃ কাঁকুড়গাছিতে এবং ১৯৪৩ খৃঃ বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঠাকুরের মহাসমাধির স্থান কাশীপুর বাটি ১৯৪৬ খৃঃ আগষ্ট মাসে বেলুড় মঠ কর্তৃক অধিকৃত।

স্বামী সুবোধানন্দের জন্ম ১২৭৪ সালের ২৩শে কার্তিক (১৮৬৭ খৃঃ ৮ই নভেম্বর) উত্থান একাদশীতে এবং মৃত্যু ১৩৩৯ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ (১৯৩২ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর)।

১৯০২ খৃঃ স্বামী শিবানন্দ কর্তৃক কাশীধামে অদ্বৈতাশ্রম স্থাপন।

রেঙ্গুনে, কাশীতে, এবং বৃন্দাবনে হাসপাতাল স্থাপন যথাক্রমে ১৯২০, ১৯০০, এবং ১৯০৭ খৃঃ।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের জন্ম ১২৭১ সাল ১৮ই মাঘ ১৮ই মাঘ (১৮৬৫ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারী) শুক্লা চতুর্থীতে এবং মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃ ৯ই জানুয়ারীতে।

১৯০২ খৃঃ ভগ্নী নিবেদিতা কর্তৃক কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের জন্ম মাঘী পূর্ণিমা তিথি এবং মৃত্যু ১৯২০ খৃঃ ২৪শে এপ্রিল।

১৯১৯ খৃঃ ভুবনেশ্বরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন

১৯০৮ খৃঃ এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক মঠ প্রতিষ্ঠা।

স্বামী শর্বানন্দ কর্তৃক দিল্লীতে, বোম্বাইতে ও করাচীতে আশ্রম স্থাপন যথাক্রমে ১৯২৭, ১৯২৩ এবং ১৯৩৬ খৃঃ।

স্বামী সারদানন্দের জন্ম ১২৭২ সাল ৯ই পৌষ (১৮৬৫ খৃঃ ২৩শে ডিসেম্বর) শুক্লা ষষ্ঠী এবং মৃত্যু ১৯২৭ খৃঃ ১৮শে আগষ্ট।

স্বামী তুরীয়ানন্দের জন্ম ১২৬৯ সাল ২০শে পৌষ (১৮৬৩ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী) এবং মৃত্যু ১৯২২ খৃঃ ২১শে জুলাই।

বেলুড়ে এবং মাদ্রাজে কলেজ স্থাপন যথাক্রমে ১৯৪১ এবং ১৯৪৬ খৃঃ।

বৈদ্যনাথ ধামে ১৯২২ খৃঃ স্বামী সদ্ভাবানন্দ কর্তৃক বিদ্যাপীঠ স্থাপন।

১৮৯৯ খৃঃ (১৩০৫ সালে) স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক উদ্বোধন পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃগৃহ ১৯৩৭ খৃঃ মার্চ মাসে বেলুড় মঠ কর্তৃক অধিকৃত।

১৩০৮ সালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ১ম ভাগ প্রকাশিত।

ফ্রেডারিক মোক্ষমূলার কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ প্রথম ইংরাজিতে প্রকাশিত ১৯০০ খৃঃ।

রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত ১৯২৯ খৃঃ জানুয়ারী মাসে।

১৯০১ খৃঃ স্বামী কল্যাণানন্দ কর্তৃক কনখলে সেবাশ্রম স্থাপন।

স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক ১৩২৩ সালে 'রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' প্রকাশ।